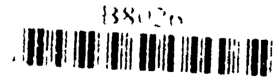
গীতা-মাধুরী





শ্রীল রূপ, সনাতন এবং জীব গোস্বামীপাদ এবং শ্রীমৎ বিশ্বনাথ
চক্রবর্ত্তীর অনুভূতি-সম্বলিত এবং চৈতন্যচরিতামৃত,
চৈতন্যভাগবত এবং উপনিষদ-
সমূহ হইতে উদ্ধৃতি-
সহযোগে
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা।

প্রকাশক :—
শ্রীজয়নারায়ণ কাপুর
৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন,
কলিকাতা-৩।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহেশ লাইব্রেরী .... কলিকাতা-১২।
২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার .... কলিকাতা-৬।
৩। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং .... ভবানীপুর, কলিকাতা।
৪। এন, কে, চক্রবর্ত্তী .... ভবানীপুর, কলিকাতা।
৫। অশোক লাইব্রেরী .... কলিকাতা-৯।
৬। আর, এম, আচার্য্য ... সি, আই, টি, বিল্ডিংস, ব্লক নং ৩, ফ্ল্যাট নং ৩২, কলিকাতা—১০।

শ্রীসুদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম-পত্রিকা কার্য্যালয়েও পাওয়া যায়।

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৭

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ
রাণীশ্রী প্রেসের পক্ষে
শ্রীবামাচরণ মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

'দেশ' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং সাংবাদিক হিসাবে বাবা (শ্রীগুরুদেব) যত বেশী ব্যক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব বা ভক্ত হিসাবে তিনি তত বেশী গুপ্ত। এইটিই বোধ হয় ভক্তের স্বভাব—'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি'। তাঁর সঙ্গ না করলে তিনি যে 'ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী' তা বুঝে উঠা মুশকিল। এমন কি তাঁর ভারতী বা বচনে যে ভক্তির ভাগীরথীস্বরূপে সর্ব্বক্ষণ সকলকে তিনি স্নান করাচ্ছেন এবং নিজেও সেই ভাগীরথীতে প্রতিনিয়ত স্নান করছেন তাও বোঝা যায় না।

গত দুই তিন বছর ধরেই তিনি গীতার বিভিন্ন সূত্র অবলম্বন করে নানা ধর্ম্ম পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখে আসছেন। আমরা সেগুলি একত্র করে তাঁকে অনুরোধ করি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুযায়ী গীতার ভাষ্য লেখা হলে একটা মহৎ কাজ হবে। কেননা ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষায় প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুযায়ী গীতার কোন ভাষ্য লেখা হয় নি! তিনিও এতে সায় দেন এবং বলেন—'তাতে ভাল ত হয়ই, কিন্তু কাজটা যে সোজা নয়। এ কি আমার দ্বারা হয়, আমি মূর্খ লোক! আমি নাম নিয়ে পড়ে আছি। পড়ে আছি মহাপ্রভুর ভক্তদের কৃপার দিকে চেয়ে। দু'টো কথা গুছিয়ে বলবার শক্তি নাই। আবোল তাবোল বকি। আমার কাছে এলে মানুষের কষ্ট হয়। গীতার আমি কি জানি, আমি তো পড়িই নাই।' আমরা বিশেষ করে বলাতে শেষটা কিছুটা রাজী হন, বলেন—'দেখা যাক্ মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা!' তার পরই আমরা একাজে ব্রতী হই। নানা অসুবিধার ভিতর দিয়ে আমাদের এগোতে হয়।

সত্যি কথা বলতে কি বর্ত্তমান গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপি আগে থেকে লেখা হয়ে ছিল না, যাতে তা সংশোধন এবং পরিবর্দ্ধন করে প্রেসে দিয়ে দেয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধকে ভিত্তি করে প্রুফ দেখার সূত্রে পরিবর্দ্ধিত হয়ে গ্রন্থখানি বর্ত্তমান রূপ পেয়েছে।

কারণ যখনই বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম তিনি বলতেন 'এমনিতেই সময় পাই না, আবার লিখব কখন'? তাঁকে শরীরের জন্য জোর করাও যেত না। প্রুফ্ দেখতে দেখতে তাঁর মুখ থেকে স্বতঃ-স্ফূর্তভাবেই গ্রন্থের পরবর্ত্তী উপাদানসমূহ আমরা পেয়েছি। গ্রন্থের বিষয়ীভূত উদ্ধৃতিসমূহ তিনি বলে যেতেন—আমরা লিখে নিতাম। কোন কোন সময় আমাদের সন্দেহ হ'লে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, 'আমার ত মুখস্থ নয়—দেখে লেখো। আমার অত মনে থাকে না।' বাস্তবিক পক্ষে যত গ্রন্থের ভিতর থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে, তার এক-অষ্টমাংশ গ্রন্থও তাঁর হাতের কাছে নেই। এমনও কোন কোন সময় তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে 'শ্লোকগুলি গ্রন্থ এনে দেখে মিলিয়ে নাও। লিখেছি যখন তখন আছেই সেই গ্রন্থে।' বলা বাহুল্য যে সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে। ভেবে আমাদের আশ্চর্য্য লাগে এই জন্য যে, গ্রন্থ পাঠও তাঁকে করতে দেখি না অথচ প্রুফ্ দেখতে বসলে এত নানা ধরণের উদ্ধৃতি কি করে তিনি বলেন! মনে হয় তখন, একেই বলে বুঝি স্ফুরণ।

বাবার লেখা 'জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে' গ্রন্থের প্রকাশকের নিবেদনে আমার গুরু-ভ্রাতা লিখেছিলেন যে তাঁর সাধনার ধারা সাংবাদিকতার যে বাহ্যিক আবরণে আবৃত ছিল, তা ভেদ করে ১৯৪৪ সাল থেকেই সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু ভাবটি গোপন থাকায় তাঁর সঙ্গ না করলে তাঁকে বুঝে উঠা দায় হয়ে পড়ে। সে জন্যই সকলের পক্ষে তাঁকে সহ্য করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যে একবার তাঁর সঙ্গ-সুধা লাভ করেছে তাঁর কিছুতেই 'অন্যত্র না চলে মন।' উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় পরম ভাগবত শ্রীদিলীপ কুমার রায় লিখেছেন যে তিনি* 'ইন্দিরা ও আমাকে বসিয়ে কথার পর কথা বলে

---

*যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে জানতে চান, তাঁরা যেন বাবার লেখা 'জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে', শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দত্ত সম্পাদিত 'ভক্তি ভারতী' এবং শ্রীসুরেন্দ্র প্রসাদ সম্পাদিত 'ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী' (হিন্দী সংস্করণ) গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন।

চললেন উজিয়ে উঠে—সে কি নির্ব্বারিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস—যার বাদী সুর ছিল ধর্ম্মের বাণী, ভক্তির সুধা ঝঙ্কার! তিনি একটি প্রশ্নও করলেন না আমাদের, শুধু উচ্ছসিত আবেগে, নানা উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়, কথিকায় আনন্দ জ্ঞাপন যে, ভক্তের দেখা পেলেন।' পরম ভাগবত স্বামী সত্যানন্দজী এবং প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী মহাশয়ও একদিন বলেছিলেন যে, 'ওঁর মত ভক্ত আজকাল দেখা যায় না। ভিতর বাহির এক না হয়ে গেলে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নাম নিয়ে থাকা সম্ভব নয়।' বর্ত্তমান গ্রন্থের 'গীতা পরিচয়ে' বৈষ্ণবাচার্য্য ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীও বলেছেন যে, গীতা জননীর নিরন্তর ক্ষীরধারায় যে সন্তান সঞ্জীবিত 'গীতা-মাধুরী' বিতরণে সে-ই অধিকারী। পরম ভাগবত অধ্যক্ষ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তীও বলেছেন— 'শ্রীভগবানের অর্চন বন্দন ছাড়া যাঁহার অন্য কর্ম স্বয়ং ভগবানই চুকাইয়া দিয়া যোগ-ক্ষেম বহনের প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন, যাঁহার সখ্য ও দাস্যের অভিব্যক্তি প্রতিনিয়ত সর্বচিত্তগ্রাহী হইয়া উঠে, আত্ম-নিবেদন যাঁহার অতি সহজ ও স্বতঃস্ফুর্ত্ত, এমন একটি ভাগবতের অনুভবের মাধ্যমে আমরা পাইতে চলিয়াছি উপায় ও উপেয়তত্ত্ব।' পূজ্যপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ অনুভূতিসম্পন্ন পুরুষ, তিনি বাবার ভাবটি ঠিকই ধরেছেন। বাবা সর্ব্বক্ষণই ভগবৎ-প্রেম ধারায় অভিষিক্ত হচ্ছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, তাঁর 'নান্যচিন্তা, নান্যবাচা।' তাঁকে যতই দেখছি ততই যেন আরও দেখার আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। যেন 'নিতুই নব।' তিনি সর্ব্বক্ষণ নাম পরিবেশনে উন্মুখ। তাঁর মুখে শুনেছি '....রয়েছে অনন্ত আরও দিতে।'

তাঁর সঙ্গ লাভ করলেই বুঝতে পারা যায় এতকাল ধরে সনাতন-ধর্ম্ম কিভাবে স্বমহিমায় ব্যক্ত হয়ে আছে। তিনি সব কথার মধ্যেই ভগবানকে দেখিয়ে দেন। মহাপ্রভুর ভাষায়—'প্রেম বিনা অন্য কিছু না স্ফুরে আমার।' তাঁর কোন গোঁড়ামি নেই, সাম্প্রদায়িক অনুরোধ

নেই। আছে ভগবানকে পাবার জন্য আকুলতা, আছে সকলকে আপন করার জন্য আত্মসংবেদনের তীব্রতা।

আমরা মহাজনদের মুখে শুনি, কোন ভক্ত ভগবানকে নিত্য বিভূতিতে বিরাজ করতে দেখেন আর কখনও বা তাঁকে লীলা-বিভূতিতে অর্থাৎ জগতে প্রত্যক্ষ করেন। বাবার কাছে লীলাই সত্য এবং নিত্য। সাকার এবং নিরাকার দুই কথাই তিনি বলেন, কিন্তু সাকারেই তাঁর আত্যান্তিকতা। তাঁর মতে নিরাকার একটা দিক্ মাত্র—পূর্ণ নয়। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' মায়াবাদমূলক এই মতের স্থাপক এবং প্রবর্ত্তক হয়েও স্বয়ং আচার্য্য শঙ্কর শ্রীভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বীকার করতে হয়েছে তাঁকেও সাকারকে। 'শঙ্করবিলাসে' তিনি জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করে বলেছেন—

'সাকার-শ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকারপ্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবি তদ্দোষং ক্ষন্তুমর্হসি।
বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্য বিপর্য্যয়ঃ।
বেদানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনং।
স্বমতং স্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি দুষ্কৃতম্।'

বাবার কাছে 'ব্রহ্মও নিত্য, জগৎও নিত্য' এবং জগতেই ব্রহ্মের নিত্যত্ব প্রেম-মাধুর্য্যে আস্বাদিত হয়। তাঁর মতে এই মাধুর্য্য আস্বাদনই ভক্তি, আমাদের স্বরূপ-ধর্ম্মের উজ্জীবক এই ভক্তি এবং আমাদের জীবন সার্থক হয় এই ভক্তিরই পথে ভগবৎ-প্রাপ্তির পরিপূর্ণতায় সর্ব্বার্থের সঙ্গতিতে। শ্রীমন্মহাপ্রভু আট-প্রহরিয়া ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলেছিলেন—

'গীতা-শাস্ত্র পড়াও—বাখানো ভক্তি মাত্র।'

বাবার কথায় সে ভাবই আমাদের মনে জাগে। তাঁর বচনে এবং আচরণে সব সময় আমাদের মত সংসারী জীবকে ভগবানকেই তিনি দেখাতে চান, দেখাতে চান রূপে, গুণে, নিরাকার-তত্ত্বে নয়—চিদাকারে

লীলায়, সর্ব্ব জীবের মধ্যে সর্ব্বত্র। তাঁর কাছে গেলে আমাদের কি করতে হবে সে কথা খুবই কম বলেন। ভগবান আমাদের জন্য কি করছেন শুধু সেই কথাই তাঁর মুখে। অন্য কোন কথাই নয়। অন্য কথা বলতে গেলেও ঠেলে ফেলেন।

শ্রীগুরুর কৃপায় যখন জগৎগুরুর অধরামৃত প্রকাশনার ভার পেয়েছি, তখন 'মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু'কে নমস্কার। প্রেমাবতার মহাপ্রভুকে নমস্কার। নমস্কার তাঁর ভক্তজনকে।

'শ্রীসুদর্শন' সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং 'প্রবর্ত্তক' সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী মহাশয় আমাদের নানা উপদেশাদি দিয়ে এ গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। এজন্য আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ইতি

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত

শ্রীজয় নারায়ণ কাপুর

গীতা পরিচয়

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিনীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী
মম্ব! ত্বামনুসন্ধধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥

হে মাতঃ ভগবদ্গীতে! প্রাচীন আচার্য্যপাদগণ তোমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন। তোমার মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন এই গ্রন্থে পূজ্যপাদ মনস্বী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহোদয়। এই জীবাধমের উপর আদেশ হইয়াছে ভূমিকার পাদপীঠ রচনার। এ কার্য্যে আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সদা সচেতন। তথাপি মহতের আদেশ শিরে ধরিয়া ব্রতী হইলাম গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিতে।

ভূমিকা আর কি লিখিব! একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা পাইব গীতা-জননীর, যাঁহারা পথিকৃৎ তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে। উপরোক্ত শ্লোকটি গীতার একটি সুন্দর পরিচয়-বাহক। শ্লোকটি কাহার সার্থক লেখনী-প্রসূত তাহা জানি না। প্রাচীন কালের গীতার কোন মর্ম্মিভক্তের অন্তস্তলের নিবিড় অনুভূতি হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকিবে এই অপূর্ব্ব সন্দেশটি। অজ্ঞাতনামা সেই ভক্ত প্রবরকে প্রণাম করিয়া আস্বাদন করি তাঁহার অনবদ্য এই অবদানটি।

হে ভগবদ্গীতে জননি, তোমার অনুধ্যান করিতেছি। জননীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কয়েকটি অপূর্ব্ব বিশেষণ দ্বারা। গীতা-জননীর স্থান মহাভারতের মধ্যে—'মধ্যে মহাভারতম্'। মহাভারত বলিতে তিনটি বস্তু বুঝায়। মহাভারত একটি গ্রন্থের নাম, মহাভারত একটি ভূখণ্ডের নাম, মহাভারত সেই ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির নাম। প্রায় লক্ষ শ্লোকযুক্ত অষ্টাদশ পর্ব্ববিশিষ্ট বিরাট গ্রন্থখানির নাম—মহাভারত। এইরূপ তথ্যবহুল, তত্ত্ববহুল একাধারে ইতিহাস ও

সাহিত্য—মহাভারতের মত অদ্ভুত গ্রন্থ মানবেতিহাসে আর নাই। এই গ্রন্থখানির মধ্যস্থলে গীতার স্থান।

মহাভারতের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। ভীষ্ম-পর্ব্ব হইতে সেই যুদ্ধের আরম্ভ। দুই পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। ইহাই গ্রন্থের মধ্যস্থল। ইহার আগে সূচনা ও প্রস্তুতি ইহার শেষে সংগ্রাম ও পরিণতির মধ্যস্থলে গীতার আবির্ভাব। এইরূপ সংকটময় স্থলে গীতার মত একখানি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ গ্রন্থের জন্ম আর কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাস খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না।

মহাভারত বলিতে শুধু গ্রন্থখানিকেই বুঝায় না একটি বিরাট ভূখণ্ডকেও বুঝায়। তুষারশুভ্র হিমগিরি যাহার শিরের শোভা বাড়ায় অসীম নীলসমুদ্র যাহার চরণ ধোয়ায় সেই বিশাল ভূমিখণ্ডের নাম—মহাভারত। অংশবিশেষ খণ্ডিত, কর্ত্তিত বা অপহৃত নহে। নীলনদী হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভারতের (Greater India) নাম মহাভারত। ইহার মধ্যস্থলে গীতার স্থান। স্কেলে মাপিলে—কুরুক্ষেত্র হয়ত ঠিক মধ্যস্থল নহে। কিন্তু তাৎকালীন ভারতের কর্ম্মময় জীবন-চাঞ্চল্যের ইহা তখন মধ্যস্থল। কুরুক্ষেত্র কর্ম্মভূমি, যুদ্ধভূমি। ব্রহ্মতত্ত্ব-গবেষণার ভূমি নহে অথচ সেইখানেই গীতার জন্ম। ইহা এক বিচিত্র বার্ত্তা।

ভারতের ঋষিদের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশস্থান অরণ্য। আরণ্যক নাম তাহাদের গায়ে এখনও লাগিয়া আছে। ভোগজীবনের অবসানে বানপ্রস্থী হইয়া বনে গিয়া তাঁহারা ব্রহ্মধ্যানে ডুবিয়া গিয়াছেন ও নিজেদের উপলব্ধ সম্পদ আমাদের দিয়াছেন। বন মানবীয় বাসভূমির প্রান্তে (Outskirt), জীবনের কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের বাহিরে। শান্ত-রসাস্পদ তপোবনই ব্রহ্ম-তপস্যার যোগ্য স্থান। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বশাস্ত্রের নির্য্যাস ব্রহ্মতত্ত্বময় গীতার আবির্ভাব জীবনের প্রান্তে নহে, সংগ্রামময় জীবনের কেন্দ্রস্থলে। ভীষণ যুদ্ধের

শঙ্খতুন্দুভি-নিনাদ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে—গীতার প্রশান্ত সঙ্গীত-ঝঙ্কার। 'মধ্যে মহাভারতম্।'

মহাভারত নামক বিরাট দেবভূমির যে অখণ্ড সংস্কৃতি —তাহারও নাম মহাভারত। এই সংস্কৃতি বহুমুখী। বিশাল বটবৃক্ষের মত অসংখ্য শাখাপল্লব। দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীতকলা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি, ব্যষ্টি সমষ্টির জীবন-নীতি, বর্ণ, আশ্রম, শিক্ষা, ক্রীড়া—জীবনের এমন কোন দিক নাই যে দিকে আর্য্য ঋষির মনীষা প্রকাশিত হয় নাই। এই বহুমুখী সংস্কৃতির মধ্যে একটী অখণ্ডতা আছে। ইউরোপের সভ্যতা বহুমুখী, কিন্তু একতার বন্ধন নাই। এই বিরাট উপমহাদেশের বহু বৈচিত্র্যময় ভাব, ভাষা ও জীবন যাত্রার মধ্যে এক অপূর্ব্ব একত্ব বিদ্যমান। বহুবিধ পুষ্পকে যেমন সূত্র একত্রীভূত করিয়া মালিকায় পরিণত করে মহাভারতীয় বহুমুখী সংস্কৃতিকেও সেইরূপ অখণ্ডরূপ দিয়াছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বহুর মধ্যে এক ও একের মধ্যে বহু দর্শনেই ঋষি মণীষার চরম ফল প্রকাশিত। এই তত্ত্বের অনবদ্য রূপায়ন শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায়। সমস্ত আর্য্য সংস্কৃতিই গীতা-কেন্দ্রিক—"সূত্রে মণিগণা ইব।" বহুমুখী সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও পোষক শ্রীগীতার সূত্র। সূত্রের স্থান মালাখানির মধ্যেই—'মধ্যে মহাভারতম্।' পার্থকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান নারায়ণ এই গীতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। নারায়ণ শব্দের অর্থ নর সমূহের অয়ন বা আশ্রয় বা অবলম্বন। নারায়ণের স্থান প্রতি জীবের অন্তরে আত্মান্তর্য্যামিরূপে। সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে থাকিয়া নারায়ণ আমাদের সকলের ব্যষ্টি এবং সমষ্টি ভাবে পরম আশ্রয়। অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা আমাদের ধী বা বুদ্ধিকে প্রচোদিত করিয়া কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া প্রবুদ্ধ করেন। বিবেকের বাণীরূপে আমরা নারায়ণের বাণী শুনি। যখনই অন্যায়-পথে চলি, অনুচিত কার্য্য করি তখনই অন্তরে থাকিয়া নারায়ণ আমাদিগকে কল্যাণ-পথে চলিবার জন্য নির্দ্দেশ দেন। তবে নারায়ণের ঐ নির্দ্দেশ আমরা সকল সময় শুনিতে পাই না, শুনিতে

পাইলেও তাঁহার ইঙ্গিত মত পথ চলিতে পারি না। আজ যাহাতে আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পাই এই জন্য তিনি উদাত্তকণ্ঠে মর্ম্মবাণী শুনাইতেছেন।

যিনি আমাদের সকলের অন্তর্য্যামী তিনি আজ অর্জ্জুনের রথে উপবিষ্ট। ইনি শুধু অর্জ্জুনের রথের সারথী নহেন। জীবনের সারথী। শুধু অর্জ্জুনের জীবন সারথী নহেন, আমাদের সকলের জীবন রথের সারথী, নারায়ণ।

অর্জ্জুনও শুধু একটি ব্যক্তি নহেন। তিনি আমাদের সকলের প্রতীক ব্যক্তি। সকল মানবের প্রতিনিধি ব্যক্তি। আমরা সকলে যেন তাহাকে ভোট দিয়া পাঠাইয়াছি। শাস্ত্রকার অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে নর-নারায়ণ বলিয়াছেন। অর্জ্জুন নর, নর মানুষ। সকল মানবের প্রতিরূপ মানুষ (Typical man) অর্জ্জুনের বিষাদ আমাদের সকলের বিষাদ। বিশ্বমানবের সকলের জীবনযুদ্ধের সংঘর্ষ। অর্জ্জুন দাঁড়াইয়াছেন কুরুক্ষেত্রে। কুরুরাজার. ক্ষেত্রে ত বটেই আরও কিছু। 'কুরু' শব্দের অর্থ কর। যে ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে চারিদিক হইতে কেবল কর কর ডাক আসে, কর্ত্তব্যের আহ্বান আসে।

আপনি পিতা, পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য করুন। আপনি পুত্র পিতার প্রতি কর্ত্তব্য করুন। আপনি পতি, পত্নীর উপর কর্ত্তব্য করুন। আপনি পত্নী, পতির প্রতি কর্ত্তব্য করুন। আপনি শিক্ষক, ছাত্রের প্রতি কর্ত্তব্য করুন। আপনি ছাত্র অধ্যাপকের প্রতি কর্ত্তব্য করুন। আপনি শাসক, শাসিতের প্রতি কর্ত্তব্য করুন। আপনি শাসিত, শাসকের প্রতি কর্ত্তব্য করুন। যেখানে যে ভূমিকায় আপনি আছেন চারিদিক হইতে কর্ত্তব্যের ডাক। কে ডাকে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু ডাকটি বড় কঠোর। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায়—Stern Daughter of the Voice of God. ইহাই আমাদের প্রত্যেকের কর্ম্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র। এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিরুদ্ধমুখী কর্ত্তব্যের সজ্ঘাতে আমরা ভাঙ্গিয়া পড়ি। অর্জ্জুনের

রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য বলে, যুদ্ধ কর। তার পারিবারিক কর্ত্তব্য বলে, আত্মীয়ের রক্তে হস্ত কলুষিত করিও না। এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে অর্জ্জুন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। বিষাদযুক্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াছেন। এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই এইরূপ অসংখ্য দ্বন্দ্বের আঘাতে বেদনার্ত্ত। তাই অর্জ্জুন আমাদের সকলের প্রতীক নয়।

হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে অন্তর্য্যামীর বাণী আসে তাহা আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাই না। আজ সর্ব্বজীবান্তর্য্যামী নারায়ণ বিষাদিত অর্জ্জুনকে প্রতিবোধিত করিবার জন্য যে মহাবাণী দিতেছেন তাহা শুধু ব্যষ্টি জীবের অন্তরের কোণ হইতে নহে, বিপদসঙ্কুল সমষ্টি জীবকুলের যুদ্ধ-প্রান্তরের মধ্য হইতে। মৃদু স্বরে নহে, উচ্চ স্বরগ্রামে গান করিতেছেন। গান হইয়াছে বলিয়াই গীতা নাম। ভগবান গান করিয়াছেন বলিয়া ভগবদ্‌গীতা এই সার্থক নাম।

এই নর নারায়ণের মহাবাণী জগতের কল্যাণের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন মহামুনি বেদব্যাস। ব্যাস একটি উপাধি, ব্যক্তিটির আসল নাম কৃষ্ণ। অর্জ্জুনের অনেকগুলি নাম, তার মধ্যে একটি নাম কৃষ্ণ। বক্তাও কৃষ্ণ শ্রোতাও কৃষ্ণ তাঁহাদের বাণীর প্রচারকও কৃষ্ণ। এই একত্ব শুধু নামে নয়, কামেও। নিজেই বলিয়াছেন আমি "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ", আর 'মুনিনামপ্যহং ব্যাসঃ।'

মায়ের স্বরূপে অষ্টাদশটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বেদব্যাসের যত কিছু লেখা সবই অষ্টাদশাঙ্গ। পুরাণে সংখ্যা অষ্টাদশ, মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব্ব। ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক। ভারত সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অষ্টাদশ দিন ব্যাপী যুদ্ধ। গীতারও অষ্টাদশ অধ্যায়। ইহার কারণ কি রসিক ভক্ত চিন্তা করিবেন। আমরা শুধু আপনার ভাবনার একটি রহস্যময় খোরাক দিলাম।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় যেন অষ্টাদশখানি সিঁড়ি। নিম্নের সিঁড়িতে "বিষাদ" আর সর্ব্বোচ্চ সিঁড়িতে "মোক্ষ"। জীবনের আরম্ভ বিষাদে। পরিণতি মুক্তিতে। বিষাদ জীবনের শেষ কথা নয়। জীবনে দুঃখ আছে,

কিন্তু ইহাই চরম বার্ত্তা নয়। চরম সংবাদ দুঃখ-মুক্তিতে, সুখময়ের সান্নিধ্যে পরানন্দ প্রাপ্তিতে। অর্জ্জুন গীতার সিঁড়ি বাহিয়া ভূমির অশান্তি হইতে ভূমার প্রশান্তিতে পৌঁছিয়াছেন। অর্জ্জুন পথিকৃৎ। আমাদিগকেও ঐ পথে চলিতে হইবে। এই জীবনেই পৌঁছিতে হইবে। কারণ গীতা জীবন্মুক্তিবাদী।

মায়ের কর্ম্ম সন্তান-পালন। পালন কার্য্যের দুইটি মুখ্য অঙ্গ। ক্ষতিকারী শত্রু-বিতাড়ন ও পুষ্টিকারী খাদ্য-বিতরণ। সন্তানের যে শত্রু মা তাহাকে আদর করেন না—বিদ্বেষ করেন, দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন। স্তন্য ক্ষীর সন্তানের পুষ্টিকারী। মা তাহা দিয়া তাহার পোষণ করেন। গীতা জননীরও এই দুই কাজ 'ভবদ্বেষিনীং' আর "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং।" ভূ ধাতু হইতে ভব। যাহার জন্ম আছে, সুতরাং মৃত্যু আছে তাহাই ভব। যাহা জন্মমৃত্যুর অধীন তাহাই ভব। আমাদের দেহদৈহিক যাবদ্ বস্তুই ভব। নশ্বর বস্তুর জন্মমৃত্যুর প্রবাহকেও ভব বলা হয়। এই ভবই দুঃখময় সংসার সমুদ্র। ইহাই আমাদিগের দুঃখের মূলীভূত হেতু। এই জন্য জননী 'ভব' কে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন। কেমন করিয়া ভব নাশ করিয়া সন্তানদিগকে শান্তির সন্ধান দিবেন প্রতিনিয়ত করুণাময়ী তাহাই চিন্তা করেন।

নশ্বর বস্তুতে আসক্ত হওয়াই দুঃখের হেতু। আচার্য্যেরা ইহাকে "দ্বিতীয়াভিনিবেশ" বলেন। অদ্বিতীয় বস্তু ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই সকল ভয় ও দুঃখের জনক। এই ব্যাধির ঔষধই হইল অদ্বিতীয় বস্তুর অনুধ্যানে। অদ্বয়তত্ত্বের জ্ঞানলাভ। ভব নামক ব্যাধি নাশ করিবার জন্য জননী তাই অদ্বৈতামৃত বর্ষণ করেন। এই অমৃত কেবল ভবনাশই করে না। জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া স্বভাবে পরিণত করিয়া আনন্দঘন ঈশ্বরভাবে পরিপূর্ণতা আনিয়া দেয়—'পূতাঃ মদ্ভাবমাগতাঃ।'

অ-মৃত কি? যে বস্তুর আস্বাদনে মরণ-ধর্ম্ম নাশ হয়। অমরণধর্ম্মী অদ্বৈতামৃতটি কি? তিনি ছাড়া কিছুই নাই এই জ্ঞান। তিনিই সব, তাতেই সব, সকলের মধ্যে তিনি, তাহার মধ্যে সকল—এই উপলব্ধি।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"—ইহাই অদ্বৈতামৃত। জননীর স্তন্য হইতে এই অমৃতময়ী ক্ষীরধারা নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছে। এই ক্ষীর ধারায় যে সন্তান সঞ্জীবিত গীতামাধুরী বিতরণে সেই অধিকারী। দেশ-জননীর সুসন্তান, আমাদের প্রাণের দাদা শ্রীবঙ্কিম সেন গীতামাতার অঙ্কে আরোহণ করিয়া সেই অমৃত লুটিয়া তাহার 'মাধুরী' পরিবেশন করিয়াছেন এই গ্রন্থে। "সুধীর্ভোক্তা"—সুধীজন ভোগ করুন। আমি মায়ের হীন সন্তান। তাই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াই বিরত হইলাম। তবে অযোগ্য হইলেও লালসা রহিল অন্তরে আপনাদের অধরামৃতের। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন
মহানাম যজ্ঞক্ষেত্র
ফরিদপুর

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

প্রণিপাত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সূচনা করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে দুঃখ করিয়াছেন—

'গীতা-ভাগবত যে যে জনে যা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥'

এই মহাদুঃখ শেল হইয়া যাঁহার বুকে বাজিয়াছিল।—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্বলোকে ধন্য ॥
....
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র-পরচার।
সর্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার ॥
তুলসী-মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতূহলে ॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনেই হইল সাক্ষাৎ।"

যুগধর্ম্মপাল করুণাবতার বিশ্বম্ভর-শক্তির যুগল প্রকাশে এই মহাদুঃখের অবসান ঘটিল। "সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি।" সুজন-সমীপে সেই বার্তা ঘোষণা করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পয়ারে গাঁথিয়া বলিলেন—

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু গীতা-ভাগবতের নামপ্রেমময় মধুর সুরঝঙ্কার তুলিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীব রঘুনাথ সার্ব্বভৌম-রামানন্দ কৃষ্ণদাস-নরোত্তম নানাভাবে তাহার স্বরবিতান করিলেন। ভক্তজনের তাহা নিত্যকালের আস্বাদনের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহোদয় কৃষ্ণকথা ও গৌরকথার সমান্তরাল ধারায় তাঁহার ভক্তস্বভাব-সিদ্ধ প্রজ্ঞা-প্রেম-প্রদীপ্ত স্বানুভব-সমৃদ্ধ ভজন চাতুর্যময় সাধনোচ্ছল নিজস্ব ভঙ্গীতে সেই সুরভারতী বহাইয়া দিতেছেন। ভক্তসমাজে সেই বার্তা পৌঁছাইয়া দিবার ভার পড়িয়াছে এই অ-ভাজন অকিঞ্চনের উপর। "বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।" ইহাদের মাঝখানে দাঁড়াইবার ধৃষ্টতা থাকিতে পারে কাহার? চন্দ্রের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার প্লাবন কাঁপিয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। আঁধারের জোনাকি কেন মাঝখানে জ্বলিবে, নিভিবে?

সর্বোপনিষদ ধেনু। দোহন করিয়াছিলেন গোপালনন্দন। অগ্রপায়ী বৎস ভারতের ক্ষাত্রমনুষ্যত্বের সর্বোত্তম বিগ্রহ। সুধীভক্ত সেই দুগ্ধামৃতের নিত্য ভোক্তা। আজ জীবের ভাগবত জীবনধারার পুষ্টিকর অকৃত্রিম দুগ্ধের বড়ো অভাব। এ-কালে সুধাময় ভাণ্ড হাতে করিয়া করুণায় বেদনায় বিগলিত হইয়া প্রেমিক ভজনপ্রবীণ ভক্ত আগাইয়া আসিতেছেন আমাদিগের দিকে। কে আছেন পিপাসু বুভুক্ষু আর্ত জিজ্ঞাসু? ছুটিয়া আসুন।

শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া ভগীরথ চলিয়াছেন। কুলুকুলু ধ্বনিতে বহিয়া চলিয়াছেন পতিতপাবনী ভাগীরথী। চারিদিক বিকীর্ণ নিরীশ্বরতার পাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষের অস্থিকঙ্কাল। ভক্ত ভগীরথের সুকৃতিতে প্রাণসঞ্চার হইবে তাহাতে। ঊর্ধ্বায়িত, দেবায়িত হইবে তাহার গতি। ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, অমল প্রমাণ, সাধুজনের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে ভগবদ্‌বীর্য্যপ্রকাশক শ্রবণমঙ্গল চিত্তহারী কথার উদ্ভব হয়। তাহার আস্বাদনের ফলে অতি শীঘ্রই শ্রদ্ধারতি ভক্তির অনুক্রমণ ঘটে ক্রমান্বয়ে, স্তরে স্তরে।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

ভক্তিলাভের সুনির্দিষ্ট ক্রমবিন্যস্ত উপায়-পরম্পরার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন ভক্তিশাস্ত্র।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"

এই সমস্ত উপায়ের সমাশ্রয়ে যিনি কোটিজন্মসুদুর্লভ ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়াছেন এমন একজন ভক্ত সেই সম্পদ বিলাইতে আসিয়াছেন। অন্তঃকর্ণ দিয়া নিরন্তর তিনি স্বতঃপরতঃ শ্রীভগবানের নামগুণ শ্রবণ করিতেছেন। ভগবৎ লীলা-বাচাল প্রেমনৃত্য-চপল অশ্রান্ত রসনায় তিনি শ্রীভগবানের গুণানুবাদ করিয়া চলিয়াছেন। জীবনব্যাপী গভীর অধ্যয়ন ও স্মরণ-মননের পথে ভগবৎ-ভজনের অধ্যবসায়ে তাঁহার কোনও কালাকাল নাই, "স্মরণে ন কালঃ", অথবা ভগবৎ-স্মরণের দ্বারা তিনি দুরন্ত কালকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন (স্মরণেন কালঃ)। অদূরে নিষণ্ণ একটি মার্জার অথবা রাজপথে সঞ্চরণশীল একটি উপবাসী সারমেয়ের প্রতিও যিনি সেবা ও প্রণামের জন্য মন ও হাত বাড়াইয়া দেন।

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ।"

করুণারতার প্রেমের ঠাকুরের এই উক্তি এ-কালেও যাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তবৃন্দ ধন্য হইতেছেন। শ্রীভগবানের অর্চন-বন্দন ছাড়া যাঁহার অন্যকর্ম স্বয়ং-ভগবানই চুকাইয়া দিয়া যোগ-ক্ষেম বহনের প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন। যাঁহার সখ্য ও দাস্যের অভিব্যক্তি প্রতিনিয়ত সর্ব্বচিত্তগ্রাহী হইয়া উঠে। আত্মনিবেদন

যাঁহার অতি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। এমন একটি পরম ভাগবতের অনুভবের মাধ্যমে আমরা পাইতে চলিয়াছি উপায় ও উপেয়তত্ত্ব, প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ-তত্ত্বের গোপন কথাটি। বলিতে পারি, এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে এই 'গোপত' কথা একালে আর কেহ 'বেকত' করিতে পারিবেন না। এই কণ্ঠ যিনি শুনিবেন তিনিই বুঝিবেন, কখনও ইহা বিষাণের মতো বাজিয়া উঠে। কখনও মেঘমন্দ্রে ধ্বনিত হয়। ইহার ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাতে কখনও শ্রবণ জরিয়া যায়। কখনও আনন্দ-কলরোলে অন্য সব গণ্ডগোল চুকাইয়া ডুবাইয়া দিয়া ইহা বাঁশরীর সুরে শ্রবণ পরিপূরিত করে।

"কথার যেখানে শেষ, গানের সেখানে আরম্ভ"—বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, কথা যাঁহার ছিল অফুরন্ত, গানও অজস্র। শাস্ত্রের উক্তি, "গানাৎ পরতরং নহি।" "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যম্"—এই ভাগবতী কথার নাম তাই গীতা। গান ছাড়া সমন্বয় হয় না। সুর এবং তাল ছাড়া লয় হইবে কিরূপে? কিন্তু গান কখনও কাহারো একলার নয়। যুগল-মিলন চাই। যে গাইবে আর যে শুনিবে এই দুইয়ের মিলন।

"একাকী গায়কের নহে তো গান মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আর জন গাবে মনে।"

সমরাঙ্গনে বিশাল বাহিনী চতুরঙ্গে সজ্জিত। রথারূঢ় মহাধনুর্ধর যোদ্ধা ও সুনিপুণ সারথি। যোদ্ধার হস্তপদাদি অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে। হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে। কেন? তিনিই বলিতেছেন যুদ্ধার্থ সমাগত সকলেই আমার স্বজন। রাজ্য ভোগ সুখ আমি চাই না, তাহা নয়। কিন্তু চাই আমি একলা আমার জন্য নহে, ইহাদের সকলের জন্য। "যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।" এই উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া তিনি আর্তনাদ করিতেছেন, কার্পণ্য আসিয়া আমার স্ব-ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। "কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ।" কার্পণ্য কি? একটু পরেই পাওয়া যাইতেছে। "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।" অভিসন্ধি লইয়া কাজ করাই

কার্পণ্য। আমি করিতেছি, এই কাজ করিয়া আমার এই মতলব হাসিল করিব এই কর্ত্তৃত্বাভিমান কৃপণতা। একটি সত্য কথা মধুর করিয়া বলিতে যাইতেছি। সেখানেও মতলব, যশও জনপ্রীতি অর্জন করিব। আমিই সকলকে রাখিব অথবা মারিব। রাখহরি আমি, মারহরিও আমি। "অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ হনিষ্যে চাপরান্ অপি।" আমি একলা খাইব সব কিছুর মধ্য দিয়া আমিই আমার জন্য পোটলা বাঁধিব, কাহাকেও কিছুমাত্র দিব না। কৃপণতা আর কাহাকে বলে? কোথায় "নাহম্", কোথায় "তুহুঁ।"

কার্পণ্যের আরও একটি দিক আছে। ব্রহ্মবাদী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন ব্রহ্মবাদিনী সহধর্ম্মিণীকে। "য এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা-হস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।" নিজেকে না জানিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ না করিয়া স্বভাবে উদ্বুদ্ধ ও স্বধর্মে উজ্জীবিত না হইয়া বিশ্বনাথের বিশ্ব হইতে যে খাইয়া দাইয়া মজা লুটিয়া হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যায় সেই তো কৃপণ। নির্বিণ্ণ-চিত্ত যোদ্ধা তাই বলিলেন, "কিসে আমার ভালো হইবে, আমি তাহা বুঝি না। তুমি নিশ্চিন্ত করিয়া বলিয়া দাও। ওগো, তোমার যে আমি শাসনাধীন। আমাকে শাসনের মধ্য দিয়া আপন করিয়া লও। আমি তোমাতে প্রপন্ন, তোমার শরণাগত।" এই প্রপত্তি, শরণাগতি ছাড়া হৃদয়ের জটিল গ্রন্থি ভেদ হয় না। সংশয় ছিন্ন হয় না। করম-বিপাকে আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়িতে হয়। শরণাগত-বৎসল সুনিপুণ সারথি যোদ্ধাকে স্ব-ভাবে উদ্দীপিত করিবার জন্য সমন্বয়ের গান ধরিলেন। সেই গানে তাহার সমস্ত সংশয় সমস্ত ভেদাভেদ চুকিয়া গেল।

কাজের মানুষ, জ্ঞানের মানুষ, ভাবের মানুষ, এদের দলাদলি মিটিয়া গেল। সকল কর্ম্মই হইয়া উঠিল "কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর-সমুদ্ভবম্।" কাজের মানুষ হইল কল্যাণকৃৎ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিকাম। জ্ঞানের মানুষ হইল 'একভক্তিঃ' 'অনন্যা ভক্তির' অধিকারী। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' আমি মারিতে পারি, রাখিতে পারি, এই

অভিমান চলিয়া গেল, সম্মুখে প্রসারিত উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল মরণাম্বুধি স্তব্ধ হইল। ভয় ভয় পাইয়া ভাগিয়া গেল। শাশ্বত আত্মার দীপ্তিতে সমগ্র সত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পৃথানন্দন বহিঃকর্ণ দিয়া, অন্তঃকর্ণ দিয়া সেই অপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব সমন্বয়ী গাথা শুনিলেন। সপ্তশতী গীতার শ্রুতিফলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, মোহ আমার কাটিয়াছে, সংশয় টুটিয়াছে। হারানো স্মৃতি আমি ফিরাইয়া পাইয়াছি, তোমারই প্রসাদে, আমার কৃতিত্বে নহে। মেধা দিয়া নয়, শ্রুতি দিয়া নয়, দানে নয়, যজ্ঞে নয়। কৃপায়, শুধু তোমার কৃপায়। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা।" তোমাকে আমি কথা দিলাম, "করিষ্যে বচনং তব।" তোমার কথায় চলিব, খাইব, শুইব, যুদ্ধ অথবা তপস্যা করিব, দান অথবা যজ্ঞ করিব, সবই তোমার জন্য করিব। আমি বুঝিয়াছি, তোমার মতন আমার আর কেহ নাই। তোমা ছাড়া আমার চলিবে না। বেদনার পথ বাহিয়া, মৃত্যুর ভয় অবিদ্যার মোহ কাটাইয়া আমি ইহা বুঝিয়াছি। আরও বুঝিয়াছি, তুমিও আমাকে চিরদিন চাহিয়া আসিতেছ। আমাকেও তুমি ভজনা করিতেছ। হাঁ, আমার সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, 'হামারি গরব তুহুঁ বাঢ়ায়লি।' তাই একথা বলিতেছি—

"বেদনা-দূতী গাহিছে ওরে গান
তোমার লাগি জাগেন ভগবান্।"

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম।" 'অস্তি'—তিনি আছেন, আমার প্রাণ-মন ইন্দ্রিয় জুড়াইয়া সব কিছুর মধ্যেই আছেন।

"রয়েছো তুমি এ কথা কবে জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিব সব কাজে।"

"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ", আমারও জ্ঞান-ভাব ইচ্ছার অনন্য লক্ষ্য তিনি। সৎস্বরূপ তাঁহাকে জানাই আমার জ্ঞান—সাধনার অনন্য লক্ষ্য। "যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।" 'ভাতি' তিনি

শোভমান, সুন্দর, সৌন্দর্যানুধ্যানে, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির অনুশীলনে, ভাবে ভক্তিতে তাঁহাকে পাওয়া আমার সব-পাওয়ার বড়ো পাওয়া। "যং লব্ধা চাপরং লাভং নাধিকং মন্যতে ততঃ।" 'প্রিয়ম্' তিনি আমার সহিত সকল সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত ভালবাসার বস্তু। আমার সর্বসঙ্কল্প সর্ববিধ কল্যাণপ্রয়াসের তিনিই একমাত্র লক্ষ্য। তিনি আমার পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অন্য সব কিছু হইতে প্রিয়তর। "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ।" তিনি আমার প্রিয়তম সুহৃত্তম। "গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।"

এই অনুভবের পথে এদেশের সকল সাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে, সর্বদর্শনের সমন্বয় ঘটিয়াছে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ভেদ, অভেদ, অচিন্ত্যভেদাভেদ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য, তান্ত্রিক, যোগী, তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, প্রেমিক, মীমাংসক, বেদান্তী, নৈয়ায়িক, গৃহী, সন্ন্যাসী সকলে মিলিয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস,. মীরাবাঈ, রামানন্দ, কবি রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শিবাজী তিলক-গান্ধী, চিত্তরঞ্জন-সুভাষ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ, অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ সকলেরই জীবন বিকাশ হইয়াছে এই ধারায়। আত্মতত্ত্ব, স্থিতধী-তত্ত্ব নিষ্কামকর্ম কর্মসন্ন্যাস, যজ্ঞরহস্য, স্বধর্ম-রহস্য, স্বার্থ-পরার্থ, রাজবিদ্যা, ভগবদ্‌বিভূতি, বিশ্বরূপ, গুণত্রয় বিভাগ, দৈব ও অসুর সম্পদ্‌-বিভাগ, এই সমস্ত অতিনিগূঢ় দুরঙ্গম রহস্য অনন্যভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্ত প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়া বুঝাইয়াছেন, আস্বাদন করিয়া আস্বাদন করাইতে আসিয়াছেন। "প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্তু্মব্যয়ম্।" যাহা গুহাহিত তাহা তাঁহার প্রজ্ঞা ও প্রেমের আলোকে করুণার বেদনায় সৌজন্যে দীনতায় প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া আমি শুধু "প্রণিপাতেন" সাধুসঙ্গের তরণীতে পারের কড়ি না দিয়া

চড়িয়া বসিলাম। পরিপ্রশ্ন ও সেবার সামর্থ্য ও সুকৃতি আমার কোথায়? "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।" ভগবানের হৃদয়ের ভাণ্ডারী অন্তর্যামী সাধু শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অগণিত ভক্ত অনুরাগীর পতিতপাবন মহিমা এবং মার্জনাবুদ্ধি আমার সহায়।

ভক্ত-চরণারবিন্দ-রজো-লুব্ধ
জনার্দন চক্রবর্তী

সূচীপত্র

গীতা-মাধুরী

প্রথম ষট্‌ক

বিষাদ-যোগ

১। দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

২। কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

৩। পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্ ॥ ৩৬ ॥

৪। যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ॥
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রথম অধ্যায়

অর্জ্জুনের মোহ

অর্জ্জুন মহাবীর। তিনি নিবাতকবচ নামক মহাদৈত্যদিগকে নিধন করিয়া স্বর্গলোক জয় করিয়া মহেন্দ্রের সন্তোষ সাধন করেন। কিরাতরূপী শঙ্করকে সাক্ষাৎ-সংগ্রামে পরাজিত করিয়া আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে তিনি পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুনের বীরত্ব শুধু বাহুবলের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, অন্তরের সম্পদেও তিনি শূর, তিনি বীর। তিনি গুড়াকেশ। জিতনিদ্র পুরুষ তিনি। তিনি জিতেন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উর্ব্বশী অনুপম রূপ-লাবণ্যে অপ্সরাগণের গরীয়সী। ভূষণের ভূষণ তাঁহার অঙ্গ। উর্ব্বশীর শরীর আভরণের আভরণ, সর্ব্বাধিক প্রসাধনের প্রধান বিশেষণরূপে তাঁহার হাস্য-লাস্য, কটাক্ষ-লীলার উন্মেষ। উর্ব্বশী স্বয়ং অভিসারিকা বেশে অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া তাঁহার সঙ্গ কামনা করেন। কিন্তু অর্জ্জুনের চিত্তে কামবৃত্তির উদ্দীপনে উর্ব্বশীর সব কারুকৃত্য ব্যর্থ হয়। অর্জ্জুন তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া যান। সুতরাং ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষগণের মধ্যে অর্জ্জুন অতুলনীয়। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে স্বজনগণকে যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া এমন মহাবীর বিচলিত হইয়া পড়েন। অর্জ্জুনের এই ব্যাকুলতা সত্যই বিস্ময়কর। অহং-মমতা বুদ্ধিতে তিনি একেবারে অভিভূত।

একদিকে রাজ্যসুখ ভোগের সম্বন্ধে সচেতনতা অন্যদিকে সেই ভোগের অন্তরায়স্বরূপে স্বজনবধের ভীতি-সঙ্কুল মানসিক শঙ্কাতে কুরুক্ষেত্ররূপ রণাঙ্গনে অর্জ্জুন কাতর। যাঁহাদের জন্য রাজ্যভোগ, তাঁহারাই যদি নিধনপ্রাপ্ত হন, তবে রাজ্য লইয়া কি করিব? তবে ভোগসুখেই বা কি হইবে? আত্মীয়-স্বজনের মায়া—মহাবীর অর্জ্জুনকে যেন একেবারে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের চিত্তে স্বজনবন্ধুগণের জন্য এতটা আসক্তি, এবংবিধ আকর্ষণ কতকটা

আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। কারণ অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম। বিশেষভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াই তিনি রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন। তিনি নিজে গিয়া যুদ্ধে তাঁহাদের সাহচর্য্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সারথ্য করিতে স্বীকৃত হন। তবু স্বজনগণের সঙ্কট চিন্তায় অর্জ্জুনের চিত্তে এমন বিকার উপস্থিত। অর্জ্জুন বলিতেছেন, আত্মীয়-স্বজনগণের কুলক্ষয়-কৃত পাপ প্রত্যক্ষ করিয়াও পাণ্ডবগণ সেই মহাপাপ হইতে কেন নিবৃত্ত হইবেন না, তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শুধু ইহাই নহে, আত্মীয়-স্বজনগণের বধের কারণ সৃষ্টি না করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও তিনি শ্রেয় মনে করিতেছেন। বস্তুতঃ এস্থলে অর্জ্জুনের ভিক্ষাপ্রবৃত্তি বৈরাগ্যজনিত নহে, পরন্তু মমতাসক্ত চিত্তের দুর্ব্বলতানিবন্ধন তাহা মানসিক বিকার-মাত্র। অর্জ্জুন স্বার্থভীরু। তিনি মায়াবদ্ধ সাধারণ জীবের মতই দুর্ব্বল। তিনি আত্মীয় বন্ধুবর্গের বিরুদ্ধতায় নিজের দোষ তো দেখিতেছেনই, এমন কি তাঁহার সখা কৃষ্ণকেও যেন দোষী করিতেছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র কেন অর্জ্জুনকে এমন পাপ কাজ হইতে নিবৃত্ত করেন নাই, ইহাই যেন তাঁহার বিরুদ্ধে অর্জ্জুনের অভিযোগ।

"অভিমানী ভক্তিহীন ধরামাঝে সেই দীন"। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে আমরা মহাবীর অর্জ্জুনকে এমন দৈন্যে একান্ত অভিভূত অবস্থায় দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রের সমগ্র প্রতিবেশটিই অহং-মমতায় এমনই অভিদ্রুত। 'আমি' এবং 'আমার' সকলের মুখে এই একই বুলি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সংবাদ জানিবার জন্য উদ্‌ব্যস্ত, মায়ার টানে পড়িয়া তিনি অন্ধ, তিনি অজ্ঞান। ইহার পর দুর্যোধন। আত্মাভিমানের অবতারণা করিয়া আচার্য দ্রোণকে তিনি উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহার পক্ষসমর্থনে শূরবীরগণকে সমবেত দেখিয়া তাঁহার অহঙ্কারের সীমা নাই। বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্রের এমন প্রতিবেশে আমরা মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের ভাবটি পুরাপুরি রকমে পাই। অহঙ্কারের বশে আমরা প্রত্যেকেই এখানে কর্ত্তা হইয়া

বসিয়াছি। অথচ এই সংসারই ধর্ম্মক্ষেত্র, ইহা যজ্ঞাগারস্বরূপ। আমরা সকলেই যজ্ঞের প্রবৃত্তি লইয়া এখানে আসিয়াছি। "কৃষ্ণ ভজি-বার তরে সংসারেতে আইনু, মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু"—কেশবার্জ্জুন সংবাদসূত্রে গীতায় এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতায় মানবধর্ম্মের মহতী বাণী সার্ব্বভৌম সংবেদনে ধ্বনিত হইয়াছে। অমৃত-নিস্যন্দিনী সেই বাণী বিশ্বমানবের পক্ষে সঞ্জীবনী সুধাস্বরূপ।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বদ্ধজীবের আর্ত্তি এবং বেদনা বুকে লইয়া অর্জ্জুন আজ শ্রীভগবানের দিকে তাকাইয়াছেন। এই বেদনার স্বরূপটি কিরূপ সূক্ষ্ম এবং সেই বেদনার তাড়না কিরূপ দুঃসহ, অর্জ্জুনের আর্ত্তিতে আমরা তাহারই অভিব্যক্তি অনুভব করিতেছি। "রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।" মহাপ্রভু বলিয়াছেন "কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া, জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া।" ফলতঃ মানুষের জীবন কতকগুলি নৈতিক সূত্রকে ভিত্তি করিয়াই গঠিত নয়। নীতিবোধের পরিমিতিতে মানব-ধর্ম্মের সর্বাত্মক স্বরূপটি ধরা পড়ে না। নীতির উর্দ্ধস্তরে সর্ব্বাত্ম-সংবেদনময় অনুভূতির প্রদীপ্তিতেই মানবচিত্তের সঙ্গতি সাধিত হয়। নীতিবিচার বুদ্ধির গণ্ডির মধ্যেই নিবদ্ধ। বুদ্ধি স্বৈরিণী—স্বার্থের সহিত তাহার সংশ্লেষ রহিয়াছে। বুদ্ধির উপরে আত্মার স্তর। প্রাকৃত জীবন হইতে অপ্রাকৃত জীবনের স্পর্শে মানুষের সংপ্রতিষ্ঠা। মানবচিত্ত আত্মার স্তরে উন্নীত হইয়া সর্ব্বাত্মক অখণ্ড সত্যের সহিত সংস্পৃষ্ট না হইলে মানুষের নিবৃত্তি নাই। এই স্পর্শটি আবার অনুমান বা প্রমাণের বস্তুও নয়। প্রত্যক্ষাবগম সত্যে মানবচিত্তে ইহার ঘনিষ্ঠতা প্রমূর্ত্ত হইয়া থাকে। ব্যক্তাব্যক্ত জুড়িয়া সর্ব্বাত্মক এই লীলার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গিয়া মানুষের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই স্পর্শটি না পাইলে অমর্ষ দূর হয় না। কামবীজ স্বরূপে অখিল রসামৃতমূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীভগবানের প্রীতিরসে মানব চিত্ত সংপৃক্ত না হইলে মানুষের এই চিরন্তন কাম-পিপাসা অতৃপ্ত থাকে এবং তাহা দুরন্ত হইয়া উঠিয়া পশুত্বের দিকে ছুটে। গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান বস্তুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে

প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিদগ্ধপুরুষ। নব তারুণ্য তাঁহার নিত্য লক্ষণ। প্রেয়সী সত্যভামা দেবীর বশে পড়িয়া যিনি মহেন্দ্রকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া স্বর্গ হইতে পারিজাত তরু হরণ করেন, তিনিই অর্জ্জুনের রথে অশ্বরজ্জু এবং বেত্রহস্তে সারথ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্যাপার এমনই বিচিত্র! জীবের প্রতি কারুণ্যের রসাস্বাদক স্বরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপ-ধর্ম্মগত তারুণ্যের এমনই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবের প্রতি তাঁহার করুণার মূলে তাঁহার স্বরূপতত্ত্বই বীর্য সঞ্চার করে। অর্জ্জুনের মনটি সর্ব্ববিধ সংস্কারমুক্ত হইয়া ভগবৎস্বরূপে সংস্থিত হয় নাই। তাঁহার মন মায়ামোহে সমাচ্ছন্নই রহিয়াছে; এজন্য প্রত্যক্ষভাবে পরম দেবতাকে সম্মুখে লাভ করিয়াও তাঁহার অপরিচ্ছন্ন সম্মূর্ত্তি তিনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না। বিশ্বের বেদনা বুকে লইয়া যিনি তাঁহাকে উপদেশ করিতেছেন, তাঁহার বেদনা তিনি অন্তর দিয়া অনুভব করিতে অক্ষম। প্রত্যুত অর্জ্জুন বিশ্বাত্মদেবতার এই বেদনাটি যদি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে সর্ব্বসংশয় হইতে তাঁহার মন মুক্ত হইত এবং অসংমূঢ় চিত্তে তিনি শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করিতেন। বাস্তবিক পক্ষে সারথিস্বরূপে শ্রীভগবানের ব্যক্ত ভাবের মূলে তাঁহার সর্ব্বাত্মক সংবেদনের স্বরূপটি অর্জ্জুন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে প্রজ্ঞা তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হয় নাই। মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় সংসারের আজ্ঞা পালনে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সচেতন রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের বচনের ভিতর দিয়া তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ যদি অর্জ্জুনের অন্তরে উদ্দীপ্ত হইত তবে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের অবতারণা প্রসঙ্গে গুরুরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ত্বটি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইতেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইতেন না। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র। তাঁহার জন্ম কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছে, সুতরাং সূর্য্যকে যোগ সম্বন্ধে উপদেশ করা তাঁহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, পার্থের ইহাই বিস্ময়ের কারণ। বিস্ময়ের এই কারণটি অর্জ্জুনের চিত্তে না জাগিলে, যুদ্ধার্থ শ্রীভগবানের আদেশ তাঁহার

কর্ণকুহরে অনুপ্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি আত্মনিবেদন করিতেন। "দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণচরণ সেবয়।" সুতরাং গীতার সেইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিত। ইহার ফলে আমরা শ্রীভগবানের মুখে কৃষ্ণরূপে নিত্যভাবে জাগ্রত চিন্ময় তাঁহার আত্মলীলার শ্রবণ মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত থাকিতাম।

সাংখ্য-যোগ

১। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

২। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

৩। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

৪। কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের প্ররোচনা

গীতা অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী। ভাগবত বলিয়াছেন—দ্বিতীয়ের সম্বন্ধে চিত্তের অভিনিবেশ বা দ্বৈত-বুদ্ধি হইতেই ভয়ের কারণ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভেদবুদ্ধির সূত্র ধরিয়াই যেন গীতা উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে ভীষ্মদ্রোণাদি কুরুপক্ষীয়গণের সহিত রক্তপাত-মূলক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত প্রত্যক্ষভাবে প্ররোচিত করিতেছেন; আমরা তো ইহাই দেখিতে পাই। "যিনি সর্ব্বভূতে আমাকে দর্শন করেন এবং সকলকে আমাতে অবস্থিত দেখেন, আমি সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্ত থাকি এবং তিনি আমার সঙ্গে সর্ব্বাবস্থায় যুক্ত থাকেন। যিনি সকল ভূতের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখের ন্যায় অনুভব করেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী"—উপদেশকারী যিনি তিনিই আবার যুদ্ধের জন্য অর্জ্জুনকে প্ররোচিত করিয়া বলিয়াছেন, হে পার্থ, তোমার ভাগ্য-গুণে এমন যুদ্ধের সুযোগ অযাচিত ভাবে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগ লাভ করিলে ক্ষত্রিয়মাত্রেই সুখী হয়। হে অর্জ্জুন, যদি তুমি এ যুদ্ধে নিহত হও, তবে স্বর্গ লাভ করিবে, আর যুদ্ধে যদি জয়লাভ কর তবে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্য-সুখ ভোগ করিবে। সুতরাং যুদ্ধ কর, উভয় দিক হইতে বিচারেই যুদ্ধ তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক জানিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াও। শ্রীভগবানের মুখে যুদ্ধের প্ররোচনামূলক এই সব উক্তি এবং সর্ব্বভূতে সমাত্মদর্শনের জন্য নানাভাবে তৎ-কর্ত্তৃক গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপিত অধ্যাত্মতত্ত্বের আদর্শ কি পরস্পর-বিরোধী নহে?

গীতার কোন কোন ভাষ্যকার পরস্পর-বিরোধীরূপে প্রতীয়মান ভগবদুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য গীতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা স্বীকার করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। তাঁহারা গীতাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বার্থমূলক রূপক স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মক্ষেত্রের

অর্থ কর্ম্মময় এই জগৎ বা নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ। ধৃতরাষ্ট্র, কৌরবগণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতায় প্রভাবিত মনোবৃত্তি মাত্র। ইঁহারা সকলে কাল্পনিক বস্তু, জড়দেহধারী মানুষ নহেন। গীতার এই সকল ভাষ্য-কারগণ অহিংসবাদী। তাঁহারা কুরুক্ষেত্রকে মনোভূমিতে উন্নীত করিয়া তাঁহাদের আদর্শবাদের সহিত গীতোক্তির সঙ্গতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

এই ধরণের তত্ত্ববাদিগণের যুক্তির গুরুত্ব আমরাও উপলব্ধি করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে কোন নীতি বা আদর্শ মানবচিত্তকে উদ্দীপিত করিবার উপযোগী সনাতন সত্যের বীর্য্যবিশিষ্ট হইলে দেশ, কাল এবং পাত্রের পরিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করিয়া তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বসংবেদ্য প্রভাবে তত্ত্বে পরিণত হইয়া থাকে। তত্ত্ব আবার হৃদয়ের সংবেদন-ধর্ম্মে মনকে উদ্দীপিত করিয়া লীলাতে জাগে। গীতার ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম এবং সার্ব্ব-জনীন সত্যে বিধৃত; সুতরাং দেশ, কাল এবং পাত্রে পরিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিতেও মানব-চিত্তকে একান্ত সত্যে উদ্দীপিত করিবার উপযোগী তত্ত্ব-বীর্য্য তাহাতে থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। গীতোক্ত উপদেশের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইলে, তাহার মূলগত তত্ত্বরূপটি প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দারা এ কথা বলা চলে না যে, গীতোক্ত উপদেশের বিচার করিতে গিয়া আমরা যাহাকে সাময়িকতা বা ঐতিহাসিকতা বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃত পক্ষে তাহার মূলে সত্য কিছু নাই। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক তেমন একটি পটভূমি না থাকিলে গীতোক্ত উপদেশে সংবেদ্য তত্ত্ববস্তুটি আমাদের জড় মনে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে উদ্দীপিত হইতে পারে না। এজন্য গীতোক্ত উপদেশের অন্তর্গূঢ় ভাবটি আমাদের পক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সর্ব্বভাবে তাহা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করিতে পরাঙ্মুখ হয়। আমাদের মানসিক প্রতিবেশে মিথ্যাচার আসিয়া দেখা দেয়। অর্জ্জুন নিখিল মানবের সর্ব্বাত্মক প্রতিনিধি স্বরূপেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রপন্ন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই দেবগণ

তাঁহার নিকট প্রপন্ন হইয়াছিলেন। প্রপন্নতার সেই রীতিটি এক্ষেত্রে আমাদের অনুধাবনযোগ্য। ভাগবতের দশম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে দেখা যায়, ব্রহ্মা সহ নারদাদি মুনিগণ শ্রীভগবানকে "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। সতস্য সত্যমৃত-সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ"—এই মন্ত্রে বন্দনা করেন। তাঁহারা বলেন, হে ভগবান্ আপনার ভজন সত্য, ভজন ফল সত্য, এবং ভক্ত, ভজন ও ভজনফল—এই তিনটিই সত্য। আপনি জগতের উপাদান কারণ স্বরূপে সত্য এবং জগতের নিমিত্ত কারণ স্বরূপেও আপনি সত্য। আপনি নিত্যধামে সত্যস্বরূপে অবস্থিত, আপনি প্রকৃতি ও পুরুষ সমস্ত পদার্থের পরম সত্ত্বাস্বরূপ। আপনি সত্য বাণীর উপদেশক এবং সত্য-দর্শনের প্রবর্ত্তক। এইরূপ সর্ব্বভাবে সত্যাত্মক আপনার চরণে আমরা প্রপন্ন হইলাম। সুতরাং প্রপন্ন হইবার মন্ত্রটি শ্রীভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে এই মন্ত্রের ভজন, ভজন ফল এবং ভক্ত এই ত্রয়ীতত্ত্ব আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইল। ভক্তকে আশ্রয় করিয়া ভগবান প্রপন্নার্ত্তিহারী হরিরূপে ব্যক্ত হইলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের প্রতিবেশই শ্রীভগবানের এমন সর্ব্বভাবে সত্যাত্মক স্বরূপটি অভিব্যক্ত করিবার পক্ষে উপযোগী। বস্তুতঃ এইরূপ প্রতিবেশটি গীতার দেবতা যদি অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে উদ্ভূত মানবচিত্তের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের তিনি নিরসন করিতে পারিতেন না। গীতা মানুষের জীবনের সকল প্রশ্ন সমাধানের উপযোগিতা লাভ করিত না। সুতরাং গীতার আধ্যাত্মিক তত্ত্বটিই গ্রহণযোগ্য এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি শুধু সেই অধ্যাত্মতত্ত্বটি পরিস্ফুটনোপযোগী কাল্পনিক—আমরা যদি গীতার্থকে এই দিক হইতে বিচার করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করি; তবে গীতার সামগ্রিক তাৎপর্য্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। সত্যধর্ম্মকে দীপ্ত করাই গীতার একমাত্র লক্ষ্য। শ্রীভগবানের "ঋত সত্য নেত্র" সত্যব্রত, সত্যপর এইরূপ স্বরূপটি অসংমূঢ়ভাবে গীতোক্ত উপদেশের

বিন্যাস-রীতির সূত্রে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই উপদেশের সংবেদন-রসে নিজেদের চিত্তবৃত্তিকে নিষিক্ত করিয়া মানুষ হিসাবে আমরা সর্ব্বাবস্থার মধ্যে অমৃতের রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হই। সকলের যিনি অভীষ্ট আমরা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাই। অধিকার-নির্ব্বিশেষে গীতা সর্ব্বাধীশ্বরের অবিকারী নিত্য স্বরূপটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অধ্যাত্মরাজ্যেই মানুষের প্রতিষ্ঠা; নিত্য সত্যের আশ্রয়েই মানুষের অমৃতত্বলাভ। ফাঁকিবাজীতে এ বস্তু মিলে না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বলহীন যে, তাঁহার মুখে অহিংসার কথা বুজরুকি মাত্র। স্বার্থভীরু সেই দুর্ব্বলতার পথে মানব-চিত্তের উন্নয়ন ঘটে না, পরন্তু তাহাতে অধঃপতনের কারণই সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ধর্ম্ম হিংসা এবং অহিংসা এই দুইয়েরই উর্দ্ধে শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত। দেহে আত্মবুদ্ধি যতদিন আছে হিংসাও আছে। প্রকৃতপক্ষে দেহে আত্মবুদ্ধির সহিত হিংসার ভাবটি জড়ানো মাখানো রহিয়াছে। আমি যেখানে হিংসা করিতেছি সেখানে যেমন দেহাত্মবুদ্ধির খেলা চলে, অহিংসায় যেখানে আমার অভিমান সেখানেও সেই বুদ্ধিরই চাকা ঘুরিতে থাকে। নিখিলাত্মদেবতার উপলব্ধিতে দেহাত্মবুদ্ধির বিলয় ঘটিলে অহিংসার অবস্থাটি আমাদের পক্ষে অধিগত হয়। অহিংসা আমাদের কৃত্য নহে, নিত্য সত্যের উপলব্ধিতে অহিংসাকে আমরা আমাদের জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বস্তু স্বরূপে পাই। আমি শাকপাতা খাই, সুতরাং আমি অহিংসার চূড়ায় চড়িয়া বসিয়াছি—মিথ্যাচারের এরূপ ভ্রান্ত মোহ এবং তজ্জনিত এমন অভিমান হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া সার্ব্বভৌম শাশ্বত সত্যের আশ্রয়ে তাহাকে অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার আহ্বানটি গীতার দেবতার কণ্ঠে পাঞ্চজন্য ছন্দে উদ্গীত হইয়াছে।

রণের ক্ষেত্রে এই অরণ, যুদ্ধের ভূমিতে এই প্রবোধ, মৃত্যুময় মর্ত্তলোকে এই অমৃতের উজ্জীবন—"ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি", এমন বীর্য্যের উদ্দীপন-চাতুর্যে গীতোক্ত উপদেশের অনু-গতির রীতিতে সাধ্যতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণই গীতার বাণীমূর্ত্তি—ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ

বিগ্রহের বাঙ্ময় তনুতে তাঁহার চিন্ময় উদয়। "বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং ; আবিরাবির্ম্ম এধি" এই প্রার্থনার উদ্গীতিতে গীতায় বাগর্থের প্রতিপত্তি। গীতোক্ত উপদেশের অনুগতিতে সর্ব্বাত্মস্নপন শ্রীভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষী সংবেদনের অখণ্ডৈকরসামৃত-ধারার প্রবাহে পড়িয়া আমাদের আত্মনিবেদন। ফলতঃ কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির প্রকরণ-ভেদের বিচার গীতার দেবতাকে আমরা যেখানে আপন করিতে পারি না, শুধু সেখানেই। এই বিচারে গীতার অদ্বৈতামৃত আমাদের আস্বাদ্য হয় না—আমরা শুধু যুদ্ধই দেখি। এইভাবে নিজেকে খুঁজিতে গেলে এ বিপদ থাকিবেই, ভগবদ্ভক্তির রসসংস্পর্শো-জ্জীবিত ভক্তির রীতিটি আমরা অতর্কিতভাবে চিত্তে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না। গীতার দেবতার যুদ্ধের প্ররোচনাসূত্রে আমাদের প্রতি তাঁহার সমাত্ম-সম্বন্ধের ব্যঞ্জনার ভঙ্গি বা কৌশলই সুবিন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার উপদেশের অন্তর্গূঢ় রসটি আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করিলে কুরুক্ষেত্রের কোলাহল স্তব্ধ হয়—ভক্ত-প্রিয় ভগবানেরই তখন জয় দিতে হয়—জয় দিতে হয় ভক্তির।

সাধ্যতত্ত্বের সন্ধান

ভগবান্ জীবকে কেন্দ্র করিয়া কথা সুরু করিলেন। "কে আমি, আমারে কেন জারে তাপত্রয়," এ প্রশ্ন কিন্তু শিষ্যের—গুরুর নহে। গীতার প্রথম ষট্‌কে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ভগবান্ নিজে যেন শিষ্যের আসনে বসিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবটি রহিল আড়ালে। আড়ালে থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করাই তাঁহার কৌশল। বৃন্দাবনে গোপীসনে তিনি এই কৌশলই অবলম্বন করেন—আড়ালে চলিয়া যান। যখন ধরা দিতে হইল, কৈফিয়ৎ দিলেন আমার ভজনায় তোমাদের আগ্রহ জাগ্রত করিবার জন্যই আমি নিজেকে গোপন করিয়াছিলাম। অর্জ্জুনকে জীবাত্মার স্বরূপ-তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট করিবার কৌশলটিও এইরূপ। ভগবানকে না পাইলে জীবের স্বরূপধর্ম্ম কিছুতেই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। এইটি বুঝাইবার জন্যই সাংখ্য-তত্ত্বের অবতারণা। জীবাত্মার অমরত্বকে আগে প্রতিষ্ঠিত না করিলে জীবকে শাশ্বত ধর্ম্মের সংশ্রয় দান করা সম্ভব হয় না এবং তাহাকে তাহার নিত্য জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। প্রত্যুত বিষয়াসক্তিজনিত বন্ধনে পড়িয়াই মানুষ বিড়ম্বিত হয়। কিন্তু এই মানুষও তো সামান্য নয়। শ্রুতি বলেন—জীব কেশাগ্রের শতভাগের এক ভাগ, সেই কল্পিত এক ভাগেরও শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম, তথাপি অনন্তের আস্বাদনে সে অধিকারী। শ্রীভগবান্ গীতাতে জীবের স্বরূপতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আমার অপরা প্রকৃতি বা শক্তি। এই শক্তি ভূতাত্মক বিশ্বের উপাদান। শ্রীভগবানের অপরা এই প্রকৃতি হইতে অন্য আর একটি শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি জীবভূতা এবং তাহার দ্বারাই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। সুতরাং চিতিশক্তি জীবের স্বরূপ এবং চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অংশস্বরূপে অংশী ভগবানের সেবাসুখের আস্বাদনে জীব সনাতন অধিকারে অধিকারী। ফলতঃ অংশকে না

পাইলে অংশীর পূর্ণত্ব সাধিত হয় না ; আবার অংশীকে না পাইলে অংশ তাহার স্বরূপধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার এই সনাতন স্বরূপের সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে মৃত্যুর মহামোহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি প্রথমেই আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন। জীবকে অনিত্য বিষয়সংশ্রিত আসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে তাহার সনাতন সত্তার প্রতি উন্মুখ করাই মুখ্যতঃ সাংখ্যের উদ্দেশ্য। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাংখ্যের ভাবটি সন্ন্যাসে—"নেতি" "নেতি" এই বিচারে অনিত্য বস্তুকে বর্জ্জন করিয়া নিত্য বস্তুর সন্ধান আমরা উপলব্ধি করি। জীবের চিত্তের উপর ক্ষর প্রকৃতির প্রভাবই বন্ধন। সেই প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে জীব তাহার অক্ষর স্বরূপটি উপলব্ধি করে—সে মুক্ত হয়। ইহাই সাংখ্যের সার কথা। ফলতঃ সাংখ্যে জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান বা বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত অক্ষর-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠাই পরম তত্ত্ব। গীতায় এইরূপ নিরীশ্বর সাংখ্য-স্বীকৃত হয় নাই।

আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন বস্তু। দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। সদসদ্ বিচারের পথে এই আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া মোক্ষ লাভের উপায়কেই সাংখ্য বা জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হয়। আচার্য্য রামানুজ বলেন—"সাংখ্য বুদ্ধিঃ বুদ্ধ্যাবধারণীয়ম্ আত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্"। এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করিবার উপযোগী সাধনাকেই জ্ঞানযোগ বলা হইয়া থাকে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ এই সাধনার বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, দিয়াছেন অন্যভাবে। তিনি বলিয়াছেন, কর্ম্মই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব কোন অবস্থাতেই কর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে না। প্রত্যুত কর্ম্মের এই বন্ধন অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইলে বেদবিহিত ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। সাংখ্য হইতে বেদের ভিত্তিতে গীতোক্ত কর্ম্মযোগে ঈশ্বরবাদের পত্তন বা প্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ এ কথাও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেদোক্ত সকল উপদেশ

সকলের পক্ষে কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, বহু লোকের বহু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জলাশয় খনন করিতে হয়, কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির জলাশয়ের সে সমস্ত প্রয়োজন নাই। তাঁহার তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন, তিনি জলাশয় হইতে ততটুকু জল পান করেন। সেইরূপ মুমুক্ষু পুরুষগণের পক্ষে বেদের মোক্ষসাধনোপযোগী অংশটিই প্রয়োজন; কিন্তু সমগ্র বেদ নহে। শাস্ত্রে বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক সাধারণ জীবের মধ্যে আস্তিক্য-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য বেদে কাম্যকর্ম্মের বিধানও পরিদৃষ্ট হয় ইহা সত্য। সর্ব্ব জীবের প্রতি ভগবৎ-আজ্ঞারূপ বেদের কৃপারই ইহা পরিচায়ক। ফলতঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন প্রকার অধিকারীর জন্য তাঁহাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্মের বিধান বেদে প্রদত্ত হইয়াছে। যদি বেদ এইভাবে সকলের নিজ নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী উপদেশ না দিতেন তবে লোক সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে চিত্তের ক্রমোন্নতি সাধনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইত এবং অহিতকর বিষয়কে একান্ত হিতকর মনে করিয়া পরিশেষে বিনষ্ট হইত। শ্রীভগবান্ বেদোক্ত বিধির রহস্য উন্মুক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে সাত্ত্বিক পুরুষসুলভ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে প্ররোচিত করিয়াছেন। এই সব কর্ম্ম আত্মাভিমুখী চিন্তাশক্তি আমাদের চিত্তে জাগ্রত করিতে সাহায্য করে। সুতরাং এইগুলি অনুষ্ঠানের ফলে জ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। এই জ্ঞান বলিতে কি বুঝিব ? গীতা কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে ভগবদুপলব্ধিকেই জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কাম্যকর্ম্ম, ভক্তিসম্পর্কবিহীন কর্ম্ম, এ সব গীতায় নিন্দিত হইয়াছে। স্বর্গাদি ভোগকামনামূলক কর্ম্মের বিধানদাতৃগণকে গীতার দেবতা অবিবেকী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গীতার কর্ম্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে সাধন-ভক্তিরই ক্রম। সাধক কর্ম্মের মূলে যে পরিমাণ ভগবৎ-ভাব উপলব্ধি করেন, তিনি তাঁহার চিত্তে সেই পরিমাণ আনন্দে সংস্থিতিরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে বৈধী কর্ম্মসমূহ যদি এই জ্ঞানময় না হয়, অর্থাৎ সেই কর্ম্মগুলি যদি আমাদের চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া

জ্ঞানকে জাগ্রত করিতে না পারে—অর্থাৎ বিভিন্ন কর্ম্মের ক্রিয়মান অংশে নিখিলাত্মভাব দীপ্ত করিয়া এক অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যময় সত্তায় আমাদের মন প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে কর্ম্ম-সাধনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে জীবের বিভিন্ন কর্ম্ম-সাধনাই চেতনা, তাড়না, বা বেদনা অখণ্ড চৈতন্যময় আত্মসত্তার উপলব্ধিতে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অন্য কথায় কর্ম্মের কৃত্য ভাবটি অখণ্ড আত্মোপলব্ধিতে নিবৃত্তি লাভ করে। আমাদের অন্তরে পূর্ণস্বরূপ আত্মদেবতার এই উপলব্ধিই জ্ঞান। সুতরাং গীতার উপদিষ্ট জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে ভক্তি। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন, ভক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ভজন। চিত্ত হইতে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নিরাকৃত হইলে কর্ম্মমূলে ভক্তির ঔজ্জ্বল্য অনুভূত হয়। এই ভক্তি ইহ-পরলোকের উপাধি বা ভোগকামনার নিরসন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রমুখ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিনিয়োগে প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। ইহার সাধকগণের সর্ব্বকর্ম্মের ধ্বংস হয় অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ হয়। তাঁহারা কেবলা বা নিষ্কাম ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন। এই অবস্থায় সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে প্রিয়স্বরূপ আত্মদেবতার প্রণতি আমাদের জীবনে সত্য হয়। কর্ম্মের ক্রিয়মানাংশে নিজের অহংকৃত ভাবটি সর্ব্ব-সম্বন্ধে আমাদের স্বরূপধর্ম্মে নিষ্ঠিত ভগবৎ-কৃপার সঞ্চারে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন আমরা নিরুপাধিক চৈতন্যময় সত্তাকে অন্তরে একান্ত ভাবে উপলব্ধি ক ি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পতির পরিতৃপ্তির জন্য পত্নী পতিকে ভালবাসে না, পতিকে ভালবাসিয়া আপনিই পরিতৃপ্ত হয়, তাই পত্নী পতিকে ভালবাসে। এই-রূপ জায়ার প্রীতির জন্য পতি জায়াকে ভালবাসে না, পত্নীকে ভালবাসিয়া আপনি সুখী হয় তাই পতি পত্নীকে ভালবাসে। পুত্রের জন্য পিতা পুত্রকে ভালবাসে না, আত্মতৃপ্তির জন্যই পিতা পুত্রকে ভালবাসেন। এইরূপ সকলের তৃপ্তির জন্য সকলে সকলকে ভালবাসে না; নিজ নিজ তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যেই সকলে সকলকে ভালবাসে। ইহারই নাম জ্ঞান। কর্ম্ম-সাধনার অন্তঃস্তলে নিখিলাত্মদেবতার এই ভাবটি যিনি উপলব্ধি

কামনাহেন তিনিই জ্ঞানী। গীতায় এই অবস্থাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞস্বরূপ তিনি সকলকেই ভালবাসেন, সকলেরই উপকার করেন। কিন্তু আবার একথাও বলা চলে যে তিনি কাহাকেও ভালবাসেন না কিংবা কাহারও উপকার করেন না; কারণ সকলের মধ্যেই তিনি নিজেকে বিশ্ববীজে খুঁজিয়া পান। তিনি নিজেকে ভালবাসিতে গিয়া ভগবানকে ভালবাসিয়া ফেলেন। কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে আর বন্ধন থাকে না, সর্ব্বতোময় সংবেদনে কর্ম্ম ভগবৎ-সম্বন্ধে তাঁহাকে উজ্জীবিত করে। এইভাবে তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানে এবং জ্ঞান ভক্তিযোগে পরিপূর্ত্তি লাভ করে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ যিনি তাঁহার লক্ষণ কি? তাঁহার কথাবার্ত্তা এবং চলাফেরাই বা কেমন? উত্তরে শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সিদ্ধাবস্থা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্ববিধ কামনা-বাসনা হইতে মুক্ত, তিনি সর্ব্বত্র আত্মাকেই অনুভব করেন এবং অদ্বয় আত্মতত্ত্বের অনুভূতিতে তিনি সংপ্রতিষ্ঠ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় তিনি আত্মতত্ত্বেই সর্ব্বদা মনন-পরায়ণ এবং দেহসম্পর্কিত সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন। ইহারও পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ প্রথম অবস্থাটি সাধনাঙ্গের প্রকরণ-প্রধান। এই অবস্থায় সাধক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিতে যত্নশীল হন এবং অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যসত্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিতে উন্মুখ থাকেন। স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাধিস্থ এবং স্থিতধী—অর্জ্জুনের প্রশ্নে সাংখ্যযোগীর এই তিনটি অবস্থার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিতত্ত্বের এই তিনটি অবস্থা। বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে পারিলেই চৈতন্যময় আত্মসত্তার উপলব্ধি হয়। সাংখ্যদর্শনের ভাষায় এই স্থানকে মহৎ-তত্ত্ব বলা যায় বুদ্ধিময় ভূমির সংস্পর্শে মনের বিস্তারমূলক অনুভূতিতেই ধী-শক্তির উন্মেষ ঘটিয়া থাকে এবং

প্রজ্ঞা বা অতীতের সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির ভূমির ক্ষেত্রে মনের সংস্থিত অবস্থাই সমাধি।

গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা কর্ম্মযোগী তাঁহারা কামাসক্তি হইতে ইন্দ্রিয় সমূহের প্রত্যাহার-মূলক যতমান সাধনাংশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলের সিদ্ধান্তই সমীচীন ; কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবানের আদেশটি কি, ইহাই কি সর্ব্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য নহে ? তিনি জীবের প্রতি পরম করুণাপরায়ণ। তাঁহার উক্তিতে জীবের প্রতি পরম কারুণ্য-প্রণোদিত ভাবটির স্পর্শ অন্তরে উপলব্ধি করা ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার উপদেশের ভিতর পতিতপাবন স্বরূপটির স্বীকৃতি ব্যতীত গীতার্থের প্রতিপত্তি আমাদের জীবনে সম্ভব নয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের স্বরূপ:এবং তটস্থ, উভয় লক্ষণের পরিচয় দিয়া তিনি বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন, ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা আত্মানুসন্ধানে যত্নশীল বিবেকবান্ পুরুষদের মনকেও প্রবল এবং দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিষয়াসক্ত করে। যাঁহারা আমার প্রতি চিত্তকে নিবিষ্ট রাখেন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমনে আমার কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহারা আমার অনুকম্পা-বলে ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"সরাগ-বিষয়নিবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্।" এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, প্রজ্ঞার মূলে সরাগ বা আসঙ্গরসে ইষ্টতত্ত্বে অভিনিবেশ প্রয়োজন। অন্য কথায় স্বারসিকী ভাব থাকা আবশ্যক। অভীষ্টরসের এইরূপ সংপ্রতিষ্ঠা সাধকের চিত্তবৃত্তিকে অন্যাভিলাষশূন্য চৈতন্যধর্ম্মে উদ্দীপিত করে। কোষকার হেমচন্দ্রের মতে ইষ্টতত্ত্বে মন সংবৃত্ত হইলে আভিমুখ্যমূলক তাহার যে গতি তাহাকে মতি বলা হয়। এই অবস্থায় অবিলম্বে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হইবে এইরূপ একটি আগ্রহ চিত্তে জাগ্রত হয় এবং মন আশ্বাসমূলক আগামিকা সংজ্ঞাযুক্ত

হইয়া থাকে। অভীষ্ট বস্তুতে এইরূপ উন্মুখতা বা আগ্রহে মনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে চিত্ত নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি লাভ করে এবং বর্ত্তমান কালের পরিপ্রেক্ষায় সংস্থিত হয়। ইহাই বুদ্ধির ক্রিয়া, "বুদ্ধিস্তৎকাল-দর্শিনী।" সত্যের সংবেদনে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে নিষ্ঠিত হইবার ফলে চিত্ত সে অবস্থায় প্রাক-সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আত্মসত্তায় অতীতের সম্বন্ধে সনাতন স্মৃতি লাভ করে। ইহাকে প্রজ্ঞা বলা হইয়া থাকে। প্রজ্ঞায় চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূত, ভবিষ্যৎ বিলীন হইয়া যায়, এবং চিত্তে বর্ত্তমানের নিত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাকেই বলা হয় মেধা। "মেধা কাল-লয়াত্মিকা।" মেধায় দেশ এবং কালের ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া থাকে। "সত্ত্ব সত্ত্ব রসধাম"—আত্ম-স্বরূপের উপপত্তিতে চিত্তের সে ক্ষেত্রে নিবৃত্তি। শ্রুতিতে মেধাকে সর্ব্ববেত্ত্যাবগাহনক্ষমা (all-penetrating) প্রতিভা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মেধা জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্তই পুরুষার্থ লাভের অনুপযোগী দুষ্টা শব্দের প্রতি বা ভাব সম্পর্কে চিত্তবৃত্তির আকর্ষণ থাকে। মেধা লাভ হইলে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপে অবস্থিত এবং সর্ব্বশব্দের মূল স্বরূপ শ্রীভগবানের ব্যক্ত-ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভে চিত্তবৃত্তি অদ্বয় আনন্দ সত্তায় অধিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থা লাভই স্থিতপ্রজ্ঞতা। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-কৃপার আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই জীব আত্মনিষ্ঠ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

দেখা যায় মায়ামোহ-সমাচ্ছন্ন চিত্তের কাঠিন্য হইতে অর্জ্জুন মুক্ত হন নাই। তাই তাঁহার চিত্তে শ্রীভগবানে প্রীতির ভাব উদ্ভূত হয় নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতার উপদেশে শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় সংবেদনে অর্জ্জুনের অন্তরে ভাবের উদ্দীপ্তিই মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ গীতোক্ত নানাবাদের নিরসনে সতত অনুপ্রবৃত্ত তথাকথিত জ্ঞানকে এবং ফল্গু বৈরাগ্যকে সাংখ্যযোগে প্রশ্রয় দেন নাই। এইরূপ মিথ্যাচার গীতায় তীব্র ভাষায় নিন্দিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে মূঢ় ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য

বিষয়ের চিন্তা করে সে মিথ্যাচারী। প্রত্যুত গীতার জ্ঞান বলিতে ভগবানে একান্ত এবং জীবন্ত নৈষ্ঠিক বৃত্তির স্ফুর্ত্তি এবং বৈরাগ্য বলিতে অনাসক্ত চিত্তে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিয়া আত্যন্তিক আগ্রহে সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে কৃষ্ণের অনুগতিই বুঝানো হইয়াছে এবং সাংখ্যযোগের ইহাই ভিত্তি।

স্থিতপ্রজ্ঞতার পথ

ভগবান আত্মার অমরত্বকে ভিত্তি করিয়া গীতোক্ত ধর্ম্মের সূচনা করেন। দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ জীব আত্মার এই নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। সে মায়ার বন্ধনে পড়িয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জীবকে এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান শাস্ত্র, গুরু এবং আত্মারূপে কার্য্য করেন। জীব ইহার ফলে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সে অবিদ্যা এবং অজ্ঞানতাজনিত দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হয়। ক্রমে সাধন-প্রভাবে পরম-পুরুষার্থ লাভ করে এবং মায়াবদ্ধ জীব দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়। মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশকালে বলিয়াছেন, কোন দরিদ্র ব্যক্তির ঘরে যেমন কোন সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া তাহাকে বলে—"তুমি কেন এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।" "সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ, ঐছে বেদপুরাণে জীবে কৃষ্ণ উপদেশ।" "সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ"। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই স্বয়ং ভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবকে তাঁহার স্বরূপধর্ম্মনিষ্ঠিত ধনের উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি এই অধ্যায়ের ৫৩ তম শ্লোকে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আমি আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিয়াছি। আমার উপদেশ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেহাত্মবুদ্ধি হইতে তুমি মুক্ত হইবে এবং অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তোমার চিত্ত নির্ম্মলতা লাভ করিবে। এইরূপে স্বরূপধর্ম্মরূপ ধনের সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মিলে দেহাত্মবুদ্ধিজনিত মোহ আর তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। তুমি তখন স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা লাভ করিবে। স্থিতপ্রজ্ঞ কাহারা? ভগবান তাঁহাদের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। প্রথমে বলিলেন, তাঁহারা উদাসীন। প্রিয়জনের বিয়োগজনিত দুঃখ যেমন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ সুখের অবস্থাতেও তাঁহারা আত্মহারা হন না। রাগ এবং দ্বেষের অতীত তাঁহারা, সর্ব্বাবস্থার মধ্যে তাঁহারা অচঞ্চল।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের আকর্ষণ হইতে তাঁহারা মুক্ত। কিরূপে সে অবস্থা লাভ করা যায়? শ্রীভগবান্ অতি সহজ ভাবে এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বিচার করিতে গেলে কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই তিনটি ধারা আসিয়া পড়ে। গীতায় এই তিনের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, ইহাই মনীষিবর্গের অভিমত। আমরা কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভক্তিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।" গীতার সাংখ্যযোগের ধারাও এই ভক্তিকে ধরিয়া। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৮তম শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত প্রবল তাহারা মনকেও বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে। শ্রীভগবানের এই উক্তির দ্বারা তাঁহার পারতন্ত্র্য ব্যতীত জীবের সব চেষ্টাকে নিরসন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১তম শ্লোকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তমাসীত মৎপরঃ।" 'মৎপর' এই শব্দে ভগবানই আমাদের এক-মাত্র আশ্রয় ইহাই বুঝাইতেছে। তিনিই সর্ব্বাশ্রয় এইরূপ বুদ্ধিতে তাঁহার প্রতি প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া তাঁহার কৃপায় চিত্তকে নিবিষ্ট করাই ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিবার একমাত্র পন্থা। 'আসীত' এই আদেশা-ত্মক ক্রিয়াপদে অন্য উপায় বর্জ্জন করিতেই উপদেশ করা হইয়াছে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়সমূহের মূলীভূত তৃষ্ণার উপশমের উপযোগী কল্যাণগুণ-নিচয় একমাত্র ভগবানেই রহিয়াছে। আমাদের চিত্ত হইতে উদ্ভূত সকল ভাবের প্রভব-বীজ তিনি। সুতরাং তাঁহার আশ্রয়ে তদ্ভাবজনিত রসোপচিতি বা রসের অনুভূতিতে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের চাঞ্চল্য পরম নিবৃত্তি লাভ করে। ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৯ তম শ্লোকে এই তত্ত্বটি পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পরতত্ত্বস্বরূপে তাঁহাকে উপলব্ধির পথেই বিষয়রস সম্পর্ক হইতে মুক্ত মন পরানন্দে নিষ্ঠিত হইয়া আত্যন্তিকভাবে নিবৃত্তি লাভ করে। নতুবা তপস্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় একথা স্পষ্টই তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় প্রভাবিত না হইলে মনের গোড়ায় বিষয়-

রস লাগিয়াই থাকে এবং একটু অনুকূল প্রতিবেশ পাইলেই তাহা নিজ-মূর্ত্তি ধরিয়া বসে। পিশাচ নখ-দংষ্ট্রা বিকাশ করিয়া ভিতর হইতে বাহির হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধনাভিমানী পুরুষের সর্ব্বনাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তর হইতে অন্তরে রহিয়াছেন ভগবান। আমা-দিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে তাঁহার কৃপা। তাঁহার কৃপার সাগরে আমরা ডুবিয়া আছি। এই কৃপাকে স্বীকার করাই আমাদের স্বভাব-নিষ্ঠিত ধর্ম্ম। এই স্বভাব হইতে আমরা বিচ্যুত হই—বিষয়সম্পর্কে আমাদের মনের ঘটে বিকার। শাস্ত্র বলিয়াছেন, বিষ এবং বিষয় এই দুইয়ের মধ্যে বিষয়ই সমধিক ভয়াবহ। কারণ, বিষ পান করিলে তবে মানুষের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু বিষয়ের চিন্তামাত্রেই মানুষের পক্ষে মৃত্যুর কারণ সৃষ্ট হয়। আমরা অহঙ্কারের বশে শ্রীভগবানের কৃপা উপলব্ধি করিতে পারি না এ জন্যই এমন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছেই রহিয়াছে আলো, তবু আমরা আঁধারে ঘুরিয়া মরিতেছি। চরিতামৃত-কার বলেন—"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ, উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।" বিষয়াসক্ত আমরা কামনা-বাসনার কণ্টক চর্ব্বণে উষ্ট্রের মত প্রতিনিয়ত ক্লিষ্ট হইয়াও বেশ হৃষ্ট আছি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, শকুনের দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬৯ তম শ্লোকে আমাদের এই দুর্গত অবস্থা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন, সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা রাত্রি, বিষয়-বাসনা হইতে মুক্তচিত্ত সাধকের পক্ষে তাহাই দিন। সেইরূপ সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা দিবস, মুক্তচিত্ত সাধকের পক্ষে তাহাই রাত্রি অর্থাৎ অজ্ঞানী বিষয়রসে মাতিয়া থাকিয়াই আনন্দ পায়, আলো দেখে সেইখানে। ভাগবতের ভাষায় গৃহ, অপত্য, কলত্র প্রভৃতি আত্মসৈন্যের দ্বারা কেল্লা বাঁধিয়া আমরা মনে করি এখানে পাকা বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছি। যূপবদ্ধ পশু নিজের সম্মুখে অপর একটি পশুকে নিহত হইতে দেখিয়াও মনের আনন্দে বিল্বপত্র চর্ব্বণ করে, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ বলির পাঁঠার মত।

আমরা সংসারের মায়া-মরীচিকার মোহে মৃত্যুর অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছি। পশুর মতই আপাত প্রয়োজনে নিজের দেহে আমাদের প্রীতি। আমাদের মনের গতিতে কেবল কামের রীতি। জীবনে আমাদের সংযম নাই, নাই শুদ্ধতার সৌষ্ঠব। রক্তমাংসোপভোগের পিপাসা অন্তরে লইয়া আমরা প্রতিনিয়ত কাম-কুক্কুরের পোষণ করিয়া চলিতেছি। দুর্গতি আমাদের ঘুচে না। জ্ঞানী যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে এই অবস্থা বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে। তাঁহারা বিষয়ভোগ বিষস্বরূপ মনে করেন। ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় তাঁহারা পশুর কদর্য্য জীবনের গ্লানি অনুভব করেন। বিষয়কূপ হইতে উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের চিত্ত ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়। ভগবানের দিকে চিত্তবৃত্তির এমন উন্মুখতাজনিত উপশমাত্মক অনুভূতিই প্রসাদ। চিত্ত এই প্রসাদরসে স্পৃষ্ট হইলে আমাদের মন অন্তরস্থ আনন্দের উৎস-মুখে লগ্ন হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় আমরা সর্ব্বাবস্থার মধ্যে অন্তরে অনপেক্ষ একটি অনাময় আশ্রয় উপলব্ধি করি। ভাবনার ইহাই ভূমি। নিত্য জীবনের এখান হইতেই চেতনা সুরু হয়। প্রজ্ঞার এইখানে প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞানময় কোষের ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধ সত্ত্বের এই স্তর। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৬ তম শ্লোকে ভগবান এই সত্যেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা ভগবানে চিত্ত নিবেশিত করে না, নিজেদের চেষ্টা দ্বারা ইন্দ্রিয়দমনের চেষ্টা করে তাহারা কোন ক্রমেই ইন্দ্রিয়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। ভাগবতের শ্রুত্যাধ্যায়ের বাণী এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—"বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ" অর্থাৎ মন অত্যন্ত চঞ্চল। ইন্দ্রিয়, এবং প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করিয়া যোগিগণও মনোরূপ দুরন্ত অশ্বকে বশীভূত করিতে পারেন না। কারণ মনের মূলে সত্যকার সংশ্রয় স্বরূপ ভাবনা তাঁহাদের জাগে না। বিষয়ের আকর্ষণে তাঁহাদেরও চিত্ত প্রতিনিয়ত বিক্ষিপ্ত হয়। শান্তি তাঁহাদের মিলে না। অশান্ত যে তাহার আবার সুখ কোথায়? মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মুক্তিকামী সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত কৃষ্ণভক্ত

নিষ্কাম অতএব শান্ত"। প্রভুর শ্রীমুখের উক্তিই এখানে স্মরণীয়—"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়।" গীতার দেবতা ঐকান্তিক সুখের উৎস-মুখে আমাদের দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়াছেন। গীতোক্ত সাংখ্য হইতে যোগের এইখানেই সূচনা।

কর্ম্মযোগ

১। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫ ॥

২। তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯ ॥

৩। ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০ ॥

৪। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মের আদর্শ

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রশ্ন তাঁহার এই যে, বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তিকে নিবৃত্ত করাই যদি শান্তি লাভের উপায় হয়, তবে আমাকে যুদ্ধরূপ ঘোরতর কর্ম্মে কেন প্রণোদিত করিতেছ। তবে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধরূপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই তো আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এই উভয়ের মধ্যে কোনটি অবলম্বন করিলে আমার শ্রেয় লাভ হইবে, তুমি নিশ্চিত করিয়া বল। প্রকৃতপক্ষে শ্রেয়লাভের পথ কি ভগবান স্পষ্টরূপেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার বশীভূত হইয়াছে, তিনিই প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সাংখ্যকারিকাতেও দেখা যায়—"ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলঃ"। যাঁহার চিত্ত তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্তিলাভ করিয়াছে, তিনিই কুশল—তাঁহাকে আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। "যুক্ত আসীত মৎপরঃ"—এই আদেশের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিবার উপায়ও ভগবান্ সুনিশ্চিতরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যাঁহারা আমাতে মনোনিবেশ না করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টা দ্বারাই ইন্দ্রিয় জয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন না এবং সংসারে নিমগ্ন হইয়া তাঁহারা বিনষ্ট হন।" শ্রীভগবানের এমন উক্তিতে ইন্দ্রিয় জয়ের ক্ষেত্রে তাঁহার কৃপার আশ্রয় সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। ফলতঃ জীবের সহিত শ্রীভগবানের স্বরূপগত যে সম্বন্ধে যোগের সমগ্র রহস্যটি নিহিত রহিয়াছে, সেইটি পরিস্ফুট করাই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য। "বুদ্ধিং মোহয়সীব মে" অর্জ্জুনের এই উক্তিতে তাঁহার নিজের অনুপলব্ধিজনিত অজ্ঞতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধগত যোগের এই রহস্যটি উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল-ব্রহ্ম উপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥
কেবল-ব্রহ্ম উপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয় ॥"

প্রকৃতপ্রস্তাবে জ্ঞান বলিতে পরাভক্তিতে জীবের স্বরূপধর্ম্মের পরিপূর্ত্তিই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মনির্ব্বাণ কথাটি আমরা ভগবানের মুখে সর্ব্বপ্রথম শুনিয়াছি। পরবর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শুনিতে পাইব। এস্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলিতে বৌদ্ধমতের শূন্যবাদ কিংবা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ-সিদ্ধান্তমূলক মোক্ষও গীতায় সমর্থিত হয় নাই। "ব্রহ্ম বৈ ভূমা।" নির্ব্বাণ অর্থে লয়। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্মে আমাদের ক্ষুদ্র অহঙ্কারকে লয় বুঝায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যাঁহারা তদ্গতচিত্ত এবং তাহাতে যাঁহাদের মন একাগ্রতা লাভ করিয়াছে তাঁহারাই—"শান্তিং নির্ব্বাণ-পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি"—তাঁহার স্বরূপে সংস্থিত নির্ব্বাণ-পরমা শান্তি লাভ করেন এ কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ শব্দের খোলা-মেলা অর্থ টি আমরা সেখানে পাই। নির্ব্বাণ বলিতে সবিশেষ তত্ত্বে প্রমূর্ত্ত ভগবানে আত্মনিবেদন আমাদের উপলব্ধিতে স্পষ্ট হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম সেখানে মায়াবাদী সিদ্ধান্ত সম্মত অস্পষ্ট অথবা অনির্দ্দেশ্য থাকেন না। ফলতঃ এই কথাটি মোক্ষ বা মুক্তিরই সমার্থজ্ঞাপক। মায়াবাদী জ্ঞান-মার্গিগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। তাঁহারা মায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহেন, ভগবানের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু কেবল-ব্রহ্মের উপাসকগণ ভগবানের সবিশেষরূপ স্বীকার করেন। তাঁহারা সেই স্বরূপের সেবা করিয়া তাঁহার চরণে নির্ব্বিশেষস্বরূপে সাযুজ্যরূপ মোক্ষ কামনা করেন। ভক্তির সহায়তায় যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, তাঁহারাই

প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়। ভক্তিদেবীর কৃপা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। কৃপার শক্তি অমোঘ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাধক ব্রহ্মে লয় হইবার পর এই কৃপা তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট করে। তাঁহারা বিশেষে নির্ব্বিশেষ এবং নির্ব্বিশেষে সবিশেষ চিদৈশ্বর্য্যময় পরিপূর্ণ কৃষ্ণমাধুর্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। গীতায় ভগবদুক্তি এই পথেই উপদিষ্ট হইয়াছে। মায়াবাদী সিদ্ধান্তে মোক্ষকামীর পক্ষে এই অবস্থা সাধ্যতত্ত্ব নয়। গীতাভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাস্মীতি স্মৃতিরেব মেধা" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে স্মৃতি তাহাই মেধা। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের উপদিষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞতার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংহত করিবার জন্য ভগবানে চিত্তবৃত্তি অভিনিবিষ্ট করিবার প্রয়োজন স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত শ্রুতি-স্মৃতি সম্মত নহে। মেধার দ্বারা মধু লাভ হয়। সর্ব্বভূতের পক্ষে যিনি মধু তাঁহাকে পাওয়া যায়। আকাশে খোলে মধু, বাতাসে খেলে মধু, চরাচর মধুময় হইয়া যায় শ্রুতিতে এইরূপ উক্তিই রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের উক্তি তদনুগ নয়। সুতরাং মায়াবাদী ভাষ্যানুযায়ী মেধা—শুদ্ধা বুদ্ধির স্বরূপ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—"জ্ঞানী জীবোন্মুক্তি দশা পাইনু করি মানে" বস্তুতঃ "বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনে।" ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের মুখেও আমরা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ কথাটি শুনিতে পাই। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ অসুর বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতিচক্র-শাতনম্। তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ" অর্থাৎ কামক্রোধজনিত বিকারগ্রস্ত দেহাত্মবুদ্ধিতে অভিমানী পুরুষের পক্ষে ভগবানে চিত্তবৃত্তি নিবিষ্ট করা এবং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করাই সংসারচক্র হইতে নিবৃত্তি লাভের একমাত্র উপায়। ইহাই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বা মোক্ষ, ইহাই একান্ত সুখ। বস্তুতঃ জীবনের সর্ব্বকর্ম্মমূলে ভগবানের আত্মভাবটির উপলব্ধিতেই জীবের নিবৃত্তি ঘটে এবং সেই পথেই বুদ্ধির শুদ্ধতা সাধিত হয় এবং এই পথেই গীতোক্ত যোগের প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা নিরাশী-

নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ”—পরমেশ্বরের ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করিতেছি এই বুদ্ধির দ্বারা ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম নিবেদন করিতে অর্জ্জুনের মাধ্যমে বিশ্বমানবের প্রতি গীতার দেবতার আদেশ বা উপদেশ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—“রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়, বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।” গীতার কর্ম্মযোগ এই বৈধী ভক্তি বা সাধন-ভক্তির পথেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ সাধন-ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—‘কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সাধ্য যে কর্ম্মের ফলে জীবের হৃদয়ে স্বরূপধর্ম্ম উদ্দীপিত হয় তাহাকেই সাধনভক্তি বলে। জ্ঞান বলিতে অর্জ্জুন সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যাহৃত করা বুঝিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া কর্ম্মযোগের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন—“ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি” অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিয়া কেহই নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকিলেই যে ভজন-নিষ্ঠা লাভ হয় ইহাও সত্য নহে। পক্ষান্তরে বিহিত কর্ম্মের পন্থা অবলম্বন না করিলে আমাদের চিত্ত স্বভাবতই বিষয়ে আসক্ত হয়। বিষয়াসক্তির ফলে স্মৃতিভ্রংশ এবং তাহার ফলে বুদ্ধিনাশ ঘটিবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। বৈধী কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে ভগবৎ-পরায়ণ সাধক তাঁহার গুণগান শ্রবণমাত্রেই অনায়াসে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ভাগবতে দেখা যায়, ভগবান্ কপিল তাঁহার জননী দেবহূতির নিকট এই সাধন-ভক্তিরই নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন—“মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্র গুণং হি মাম্।” আমাদিগকে এই লক্ষ্যেই উপনীত হইতে হইবে।

কর্ম্মবন্ধনে পড়িয়া আমরা নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছি। এ বন্ধন কাটাইবার উপায় আমাদের নাই। অথচ কর্ম্ম করিয়াও জীবনের অভীষ্ট আমাদের সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ কর্ম্মচক্রে পতিত হইয়া চোখ-

বাঁধা বলদের মত আমাদিগকে ঘুরিতে হইতেছে। গীতায় ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন, কর্ম্মের গতি অত্যন্ত জটিল। সুতরাং কর্ম্ম কি তাহা ভাল করিয়া বোঝা উচিত। অকর্ম্ম কি তাহাও বোঝা দরকার, আর বিকর্ম্ম কি তাহাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলিয়াছেন, কর্ম্ম কি আর অকর্ম্মই বা কি, যাঁহারা জ্ঞানী পুরুষ তাঁহাদেরও এ সম্বন্ধে ভুল ঘটে। এই অবস্থায় অর্জ্জুন যাহাতে অশুভের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হন, এজন্য তাঁহার নিকট ভগবান্ কর্ম্ম-বিজ্ঞান বুঝাইয়া বলিয়াছেন। সত্যই আমাদের নিকট সমস্যাটি অতি দুরূহ। কোন কাজ করা উচিত অর্থাৎ পথ কোনটি, কোনটি উচিত নয় বা কোনটি বিকর্ম্ম—গর্হিত কর্ম্ম তৎসম্বন্ধে ধারণা করা আমাদের পক্ষে কতকটা সম্ভব ; সুতরাং কর্ম্ম কি এবং বিকর্ম্ম কি, নৈতিক দিক হইতে তাহার একটা নিরিখ বাঁধিয়া দেওয়া চলে, কিন্তু অকর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার। অকর্ম্মকে লইয়াই আমাদের জীবনে যত কিছু গোল, কারণ অকর্ম্ম বলিতে আমরা সাধারণতঃ পরের ঘাড়ে চাপিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করাই বুঝিয়া থাকি। এইভাবে নিজেদের আরাম-আয়েসই সে ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে লক্ষ্য হইয়া পড়ে। আমাদের কাজে জাগে নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা, পশুজনোচিত প্রবৃত্তি—এই হিসাবে অকর্ম্ম আমাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে বিকর্ম্মের বীজস্বরূপে কাজ করে। শ্রীভগবান্ সম্ভবতঃ এই জন্যই বিকর্ম্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম এই দুইটির সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা প্রাথমিক প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর, গীতার কর্ম্ম-বিজ্ঞানের ইহা সার কথা। কিন্তু অনাসক্ত যদি হইব তবে কর্ম্ম করিতে যাইব কেন ? বস্তুতঃ কর্ম্মের মূলে আসক্তিই আমাদের অন্তরে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জাগায়। কর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদের প্রবৃত্তি যাহাতে না জাগে অর্থাৎ আমরা অকর্ম্মে প্রণোদিত হই অর্থাৎ আমরা কর্ম্মত্যাগের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হই, ইহাই কি ভগবানের উপদেশের তাৎপর্য্য ? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ এ সম্বন্ধে তিনি

আমাদিগকে সুস্পষ্টভাবেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি' অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের জন্য যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

কর্ম্মত্যাগের জন্য প্রবৃত্তি থাকিবে না, অথচ কর্ম্ম করিতেই হইবে, এমন কর্ম্ম কি ? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তেমন কর্ম্মই বিহিত কর্ম্ম। কার্য্য বা কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাই সম্যকরূপে আচরণ কর ইহাই তাঁহার নির্দেশ। ইহাতেও কিন্তু কর্ম্ম-সমস্যার মীমাংসা হয় না, কারণ এমন অবস্থায় কর্ম্ম-সম্পর্কে আমাদের চিত্তবৃত্তিতে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমরা প্রণোদনা পাই না। পরন্তু শাস্ত্রনির্দ্দেশে যেন কতকটা উপরোধে পড়িয়া অনুমানের উপরই কর্ম্ম করিতে হয় সুতরাং কর্ম্মের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে মনের উজ্জীবন-ধর্ম্ম আমরা অনুভব করি না। আমরা কর্ম্মের মূলে অভীষ্টের ঘনিষ্ঠতার উপলব্ধি পাই না, সুতরাং কর্ম্ম কামনা-বাসনার স্তরের উর্দ্ধে আমাদের চিত্তকে উন্নমিত করিতে পারে না; অথচ যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য থাকে সমুদ্দিষ্ট বা পরোক্ষ তাহা কাম্য—'যদ্ধি কাম্যং সমুদ্দিষ্টং'—শাস্ত্রের এইরূপ নির্দ্দেশ। কর্ম্মবিভাগের বিচারে যদি কর্ম্মের মূলে প্রত্যক্ষভাবে আমরা ঈশ্বরের প্রেরণা অনুভব না করি অর্থাৎ কর্ম্ম পরোক্ষ থাকে তবে কাম্য কর্ম্মের দিকেই আমাদের লক্ষ্য হইবে। গীতার কর্ম্মবিজ্ঞানের মূলে এইখানেই ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আমরা অনুভব করি। ইহার ফলে আমাদের মন অহংকৃত ভাব হইতে মুক্ত হয় এবং আমরা প্রতি কর্ম্মের মূলে ভগবানের প্রভাব পাই। ইহাই গীতোক্ত অকর্ম্মের সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, কর্ম্মের ভিতর যিনি অকর্ম্ম দেখেন এবং অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মকে দেখেন তিনিই যথাযথ কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার অর্জন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অকর্ম্ম বলিতে কর্ম্মহীনতা বা কর্ম্মত্যাগের অবস্থা বুঝায় না—'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ'—কোন অবস্থাতেই আমাদের মন কর্ম্মহীন নয়। ফলতঃ অকর্ম্ম বলিতে গীতায় কর্ম্মে অনাসক্তির ভাবের কথাই বলা হইয়াছে এবং অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম বলিতে কর্ম্মের মূলে ভগবদনুভূতি-প্রণোদিত

আমাদের স্বরূপনিষ্ঠ ভাবের বিস্তার বুঝাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই আমরা কর্ম্ম করি। সেই গণ্ডির বাহিরে কাহারো জন্য কিছু করিবার আছে—আমরা মনে করি না। একমাত্র সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপে শ্রীভগবানের প্রতি আমাদের চিত্তের আসক্তিযুক্ত অবস্থাতেই কর্ম্মে অনাসক্তি জন্মে। অনাসক্তি বস্তুটি মনের আলোচনামাত্র নয়। কর্ম্মফলের আসক্তিকে আমরা শরীরের ধূলা-বালুর মত গা ঝাঁকা দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞেশ্বর যিনি তিনি শ্রীভগবান্। কর্ম্মের মূলে তাঁহাকে উপলব্ধি না করিলে কর্ম্মে অনাসক্তি জন্মে না। অনাসক্তির অবস্থায় আমরা আমাদের কর্ম্মের মূলে ভগবানের বলিষ্ঠ এবং সংপ্রতিষ্ঠ প্রভাবে আত্মপ্রসাদ স্বভাবধর্ম্মে অনুভব করি। ফলতঃ আমি কর্ত্তা এই অভিমান থাকা পর্য্যন্ত কর্ম্মে অনাসক্তি জন্মে না। ভগবদ্ভাবে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইলে আমাদের কর্ম্ম ভগবৎ-কর্ম্মে পরিণত হয় এবং আমাদের পক্ষে দাঁড়ায় নৈষ্কর্ম্ম্যরূপে। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, বৈশ্যের কর্ম্ম বা শূদ্রের কর্ম্ম বলিয়া কর্ম্মের কোন তারতম্য নাই। আমাদের সমস্ত কর্ম্মের মূলে ভগবৎ-সংযোগ আমরা অনুভব করিলেই হইল। বস্তুতঃ আমরা কর্ম্ম করিতেছি না, ভগবানই আমাদের জন্য কর্ম্ম করিতেছেন, এই সত্যটি উপলব্ধি করাই কর্ম্মবন্ধনকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়। কর্ম্মের মূলে ভগবানের প্রত্যক্ষানুভূতিই কর্ম্ম-সংশোধনের বা কর্ম্ম-নির্হারের একমাত্র পথ। কর্ম্মের মূলে ভগবদনুভূতি বলিতে এ ক্ষেত্রে প্রতি কর্ম্মের অঙ্গে অঙ্গে শ্রীভগবানের আত্মময় ভাবে নিজেকে প্রভাবিত করা, সেই তরঙ্গে নিজকে মিলাইয়া দেওয়া বা কর্ম্মের ছন্দ-সম্বন্ধে আমাদের প্রতি শ্রীভগবানের অযাচিত করুণার সর্ব্বতোময় সংবেদনের দ্বন্দ্বহীন উপলব্ধিতে আত্ম-নিবেদনই বুঝায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবের দৃষ্টিতে সে অবস্থায় বিশ্ব-চরাচরে শ্রীভগবানের কর্ম্মময় ভাবটি অভিব্যক্ত হয় এবং আমরা সর্ব্বতোময় ভগবৎ-কৃপার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত কর্ম্মের

মূলে শ্রীভগবানের নিজবোধে ডুবিয়া যাই। এ জগৎ তখন শ্রীভগবানেরই কর্ম্মময় মূর্ত্তিরূপে অনুভূত হয় এবং বিশ্বকর্ম্মের তলে তলে আমাদের জন্য তাঁহার জাগ্রত সংবেদনটি অনুক্ষণ স্পষ্ট এমন কি প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিতে থাকে। আমরা গাছে লতায় পাতায় ভগবানের কর্ম্মের পরিচয় পাই, আমাদের জন্য তাঁহার ইঙ্গিত সর্ব্বত্র অনুভব করি। সর্ব্বসম্বন্ধে তাঁহারই কথা শুনি এবং শ্রবণের সূত্রে সর্ব্বত্র স্ফুরিত হয় তাঁহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি। শোনার ভিতর দিয়াই তো দেখা, স্বরকে আশ্রয় করিলে তবে তো ব্যঞ্জনা বা রূপ। এই দৃষ্টি আমাদের অহঙ্কৃত কর্ম্মের সর্ব্ববিধ অবীর্য্য দগ্ধ করিয়া ফেলে, সর্ব্বত্র আস্বাদ্য হয় তখন শ্রীভগবানের মাধুর্য্য। গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁহাকে আশ্রয়স্বরূপে গ্রহণ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়া সমস্ত কর্ম্মের মূলে তাঁহার আত্মময় এই প্রভাবটি উপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় ভগবদিচ্ছার মধ্যেই আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। কর্ম্মের সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের উপলব্ধিতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকে না। আমরা অংশ, এইরূপে আমরা অংশীস্বরূপে কর্ম্মের মূলে ভগবানকে পাইয়া স্বধর্ম্মের ধারাটি ধরিতে সমর্থ হই এবং ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে আমাদের মুক্তি ঘটে। বস্তুতঃ জীবের প্রয়োজন হইল ভগবানকে লাভ করা। এই উদ্দেশ্যটি যদি কর্ম্মের মূলে থাকে তবে কর্ম্মের বাহ্য আকারটি যেমনই হউক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না; কর্ম্মের সূত্রে ভগবদনুগতি জীবনে সত্য হইলেই জীবের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা কেহই কোন অবস্থাতেই স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করি না। বুদ্ধির কেন্দ্র হইতে কর্ম্মের ছন্দটি সংস্কার-সূত্রে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে আমাদিগকে আসক্তিযুক্ত করে। আমরা কর্ম্মফলে বন্ধন-যুক্ত হই। বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া গুণের ক্রিয়া সুরু হয়। বুদ্ধির একটি ধারা জগতের দিকে বিষয়ভোগে উন্মুখ, অপর প্রান্তটি নিত্য আত্মস্থ এবং নৈষ্কর্ম্ম্যের ভাবে প্রভাবিত। আমরা

কামাসক্তচিত্তে যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তখন বাড়ী, গাড়ী, শাড়ী, চুড়ির প্রয়োজন পূরণে উন্মুখ আমাদের চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধির ঊর্দ্ধাভিমুখী অন্তর্লীন আত্মনিষ্ঠ এবং নিত্য নৈষ্কর্ম্মের ভাবটি উপলব্ধি করিতে পারে না। বিষয়-সংশ্লিষ্ট আমাদের বুদ্ধি বহির্ম্মুখীন বৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়া আমাদের পক্ষে বিমূঢ় অবস্থা সৃষ্টি করে এবং ইহার ফলে কর্ম্মজনিত ক্লেশ আমাদিগকে বহন করিতে হয়। এই খানেই আমাদের অবিদ্যা, অজ্ঞানতা এবং মোহ। বস্তুতঃ কর্ম্মে দোষ থাকে না, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার মূলে আমাদের এই যে কাম-সঙ্কল্প তাহাই দোষের কারণ সৃষ্টি করে। মনকে এই কাম-সঙ্কল্প অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিজনিত সুখের বিভ্রান্তি হইতে যদি আমরা মুক্ত করিতে সমর্থ হই, তবে বুদ্ধির অন্তর্মুখীন গতিতে আত্মার অনুভূতি আমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত হয়। সেই অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের করুণ-রসোদ্দীপ্ত নিত্যভাবটি আমরা কর্ম্মের মূলে সে অবস্থায় প্রমূর্ত্ত দেখিতে পাই। বুদ্ধির স্তরে ভগবৎ-কৃপার এই সংস্পর্শ অন্য কথায় ঊর্দ্ধস্তর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের সহিত তাঁহার সংযোগ এইটি উপলব্ধির উপযোগী চিত্তবৃত্তির উদ্দীপ্তিকেই গীতায় বুদ্ধিযোগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সে অবস্থায় আমাদের অন্তরের সকল দ্বন্দ্ব নিরসিত হয়, মনে ধরে সর্ব্বসম্বন্ধে ছন্দ। আমরা সকলের মধ্যে দেখি ভগবানকে। আমাদের স্বার্থের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া পড়ে। আত্মতত্ত্বের উপলব্ধিতে চিত্তের এই পরিব্যাপ্তিই গীতোক্ত "লোক-সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি"—এই উপদেশের মূলে বীজস্বরূপে রহিয়াছে। ফলতঃ ভগবৎ-কৃপায় দৃষ্টি প্রসারিত না হইলে লোক-সংগ্রহ বা লোক-কল্যাণ প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া স্বার্থই গুপ্তভাবে যুক্ত হইয়া অনর্থ ঘটায়। সুতরাং লোক-সংগ্রহ বলিতে ভগবানের সঙ্গে চিত্তের কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া অপরের উপকারের অভিনয়ে নিজেদের অহঙ্কারের পরিস্ফীতি অনুভব করিবার মানসিক বিকৃতি বা বিলাস বুঝায় না। জনকাদি রাজর্ষিগণ নিশ্চয়ই তেমন প্রবৃত্তিতে কর্ম্ম করেন নাই।

প্রকৃতপক্ষে জনকাদি রাজর্ষিগণ শ্রীভগবানে নিবেদিতাত্ম পুরুষ ছিলেন। কর্ম্মের মূলে ভগবদ্ভাব অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই তাঁহারা সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনাদর্শ সমাজের সংস্থিতি বিধান করিয়াছিল। অসৎ পথ হইতে নিজেদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রেরণা মানুষ তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল, পাইয়াছিল সমষ্টির চেতনা-সূত্রে জীবনের প্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বিশ্বকর্ম্মের উজ্জীবন-মূলে তাঁহার নিজ বীর্য্য সংবেদন-স্বরূপে কি ভাবে কাজ করিতেছে অর্জ্জুনের নিকট তাহা উন্মুক্ত করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ২২শ হইতে ২৪শ শ্লোকে এই তত্ত্বটি বিশ্লেষিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি তিন লোকে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। আমি নিজলাভে পূর্ণ পুরুষ। আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু নাই। তথাপি আমাকে অতন্দ্রিতভাবে কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ নিজভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্বকর্ম্ম নিয়ন্ত্রন করিতেছেন। অন্য কথায় তাঁহার নিজভাবটিকে বীজ-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে কর্ম্মের ছন্দ খেলিতেছে। কোন কর্ম্মই তাঁহাকে ছাড়া নাই। নিদ্রিত শিশুকে মাতা যেরূপ আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ তাঁহার নিজ প্রিয়বস্তু জীবকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অবস্থান করেন। জীবোদ্ধারের তাঁহার এমনই বেদনা। এই বেদনা অতন্দ্রিত, ইহা নিরবচ্ছিন্ন। জীব মায়ামোহবশতঃ তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেও তিনি অন্তর্য্যামিস্বরূপে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। এই থাকাটিও আবার অদ্ভুত রকমের। জীব কর্ম্মফলাত্মক অসৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন। তিনি জীবকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেও করেন না। কেন করেন না—এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নটি উঠে। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, তিনি তদ্রূপ করিলে তাঁহার তেমন কার্য্যে বিধি-নিষেধাত্মক তাঁহার নিজেরই শাস্ত্রবাক্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। 'মায়ামুগ্ধ

জীবের নাই কৃষ্ণে স্বতঃ জ্ঞান, জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ'—শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে। পরবর্ত্তী ৯ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ইহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি সকল ভূতে সমভাবে বিরাজ করি, আমার কেহ প্রিয় ও অপ্রিয় নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে তাহারা স্বভাবতঃ আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও স্বভাবতঃ তাহাদের হৃদয়ে বাস করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্, গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ।" বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তির সমাশ্রয়স্বরূপে যদি ভগবানের সংবেদন-ধর্ম্মের সহিত বিশ্বের সংশ্লেষ না থাকিত, যদি তিনি মায়াবাদী বেদান্তানুযায়ী বিকারের ভয়ে বিশ্বকর্ম্মের সহিত অসংশ্লিষ্ট নির্গুণ বা নিঃশক্তিকই হইতেন, তবে যথেচ্ছমূলক কর্ম্মের প্রভাবে সমাজ-জীবন বিপর্য্যস্ত হইত। তাঁহার মুখে আমরা এ কথাও শুনিয়াছি। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমি যদি কর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকিতাম তবে সঙ্কর সৃষ্টির কারণ হইতাম। সঙ্কর বলিতে এক্ষেত্রে শাস্ত্র-বিরোধী কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীদিগকেই তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রবিরোধী কর্ম্ম জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের বিরোধী। গীতার দেবতা কর্ম্ম-বিজ্ঞানের মূলে জীবের জন্য তাঁহার নিত্য অতন্দ্রিত অর্থাৎ জাগ্রত আত্মভাবটি অর্জ্জুনের মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ জীব কবে অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইবে, তিনি আকুলভাবে সেই সুযোগের অপেক্ষা করিতেছেন। 'অতন্দ্রিত' শব্দটির দ্বারা এই আকুলতার নিরবচ্ছিন্নতা এবং তীব্রতাই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বসুদেবের কুলোচিত ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালনে নিত্য প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, অর্জ্জুনের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহাকে তিনি উৎসাহিত করিয়াছেন, ভগবদুক্তির এইরূপ অর্থটুকু করিলে ভগবৎ-কর্ম্মের মূলীভূত স্বরূপগত নিত্য বীর্য্যের তাৎপর্য্যার্থ ক্ষুণ্ণ করা হয় বলিয়াই আমরা মনে করি। বস্তুতঃ গীতার আদর্শ সার্ব্বভৌম।

গীতার কর্ম্ম-বিজ্ঞানের মূলে জীবের প্রতি শ্রীভগবানের সর্ব্বাতিশায়ী সংবেদন ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই সংবেদনে চিত্তকে সংস্থিত না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফলে সাঙ্কর্য্যের কারণ ঘটে এবং জগতে লোক-সংস্থিতির ব্যাঘাতক গ্লানি উপজাত হয়। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। জীব বলিতে এই শ্লোকে ভগবান্ মানুষকেই বুঝাইয়াছেন, ইহা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু এক্ষেত্রে ভগবানের কর্ম্ম-ধর্ম্মে সর্ব্বভাবে এবং সর্ব্বক্ষেত্রে মানুষের অনুবর্ত্তনের উপযোগী উজ্জীবক সংবেদন রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এইভাবের উপলব্ধির সূত্রে শ্রীভগবানের রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপটিই বীর্য্য সঞ্চার করে। ভগবৎ-প্রীতির একান্ত এবং অত্যন্ত এমন অনুভূতিতে আমরা আমাদের জীবনের মূলীভূত অখণ্ড মাধুর্য্যের স্পর্শটি যেন পাই। সেক্ষেত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিচারটি আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপ্রেক্ষা হইতে অপসৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা এক্ষেত্রে গীতার আদর্শে শ্রীভগবানের অংশস্বরূপে আমাদের স্বভাবনিষ্ঠিত সর্ব্বাত্মভাবটি অনুবর্ত্তনের প্রেরণাই একান্ত এবং জীবন্তভাবে উপলব্ধি করি।

কেহ কেহ নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ভগবৎ-সম্পর্ক বিহীন সমাজ-কল্যাণমূলক কতকগুলি কাজ বুঝাইয়া থাকেন। ইঁহারা অনেকটা জড়সর্ব্বস্ববাদী। ইঁহাদের মানবতার আদর্শের মূলে বিশ্বাত্মবোধের ভাবটি সঞ্জীবন-ধর্ম্মে বিলসিত হয় না। নিরীশ্বর অধ্যাত্মবাদমূলক ইঁহাদের আদর্শ ভোগসর্ব্বস্ব জড়বাদের আশ্রয়ে মানুষকে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া চলিয়াছে। ইঁহাদের প্রেরণায় ঐহিক সুখের অন্ধ-পিপাসায় মানুষ পশুর প্রবৃত্তিকেই নৈতিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। আরণ্য জীবনের কদর্যতাই জীবনে একমাত্র উপভোগ্য বলিয়া মানুষ বুঝিয়া লইতেছে। ইহার ফলে মানবতার নামে আসুরিক দুষ্প্রবৃত্তি বিশ্বের উৎসাদনে আজ উন্মত্ত। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ এরূপ নিরীশ্বর অধ্যাত্মবাদ নিশ্চয়ই নয়, যুক্তিবাদীদের বিচারাত্মক কর্ম্মও নহে। সন্ন্যাসের নামে নির্গুণ ব্রহ্মসাধনের

অভিমানাত্মক কর্ম্মত্যাগও গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শের বিরোধী। প্রত্যুতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম-সাধনায় কর্ম্মত্যাগের মূলে যে অসঙ্গের ভাবটি থাকে তাহা ভোগমূলক। পরব্রহ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূতির ফলে চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ত্তিজনিত ঔদার্য্যময় উদ্দীপ্তি তাহাতে নাই। ব্রহ্মের সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বময়ভাব এ সাধনার মূলে মিলে না। ফলতঃ ব্রহ্মের সঙ্গে এই সাধনার সম্পর্কটি পরোক্ষ এবং তাহা আংশিক, আভাসে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে মাত্র। এই বস্তুকে জ্ঞান বলা চলে না। শাস্ত্রে কুত্রাপি বলাও হয় নাই, গীতায়ও নহে। ফলতঃ শ্রীভগবানে আসক্তিই কর্ম্মে অনাসক্তি সঞ্চার করিতে পারে। গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ২৫তম শ্লোকে ইহা সুস্পষ্ট। উক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, অবিদ্বান ব্যক্তিরা আসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম্ম করেন, বিদ্বান ব্যক্তিগণ অনাসক্ত হইয়া লোকের কল্যাণকল্পে সেইরূপে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য বিদ্বান বা জ্ঞানী বলিতে এখানে ভগবদ্ভক্তকেই বুঝাইতেছে।

কৃষ্ণ অর্থে ত্যাগ— ত্যাগ নয়

গীতায় সন্ন্যাস ও ত্যাগের সম্বন্ধে বার বার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন ইহা আমরা দেখিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ভগবানে যুক্তচিত্ত হইবার ফলে কর্ম্মের মধ্যে নৈষ্কর্ম্ম্যের যে অবস্থাটি উপলব্ধি হয় গীতায় যোগের সেই কৌশলটি নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা সর্ববশাস্ত্রে কহে, কর্ম্ম হইতে কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি কভু নহে।" এস্থলে কর্ম্ম বলিতে অহঙ্কারের ভাব অন্তরে লইয়া কর্ম্ম করা বুঝাইতেছে। কর্ম্ম করিলে তাহার ফলও আছে এবং এই ফলই বন্ধনের কারণ সৃষ্টি করে। কিন্তু কর্ম্মের মূলে ভগবানের ব্যক্ত ভাবটি যদি চিত্তে জাগ্রত হয়, অর্থাৎ তাঁহার রূপ, গুণ এবং লীলায় মন আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার করুণার স্পর্শে মনের উজ্জীবন ঘটে এবং সেই উজ্জীবন-ধর্ম্মটি আমাদের সর্বেবন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে আমরা অহংকৃতভাব হইতে সহজভাবেই মুক্তি লাভ করি এবং এইরূপে অহঙ্কারের নিবৃত্তির ফলে দেহেন্দ্রিয়, মন-প্রাণ সমগ্ররূপে ভগবদ্ভাবে প্রভাবিত হয়। এইরূপ অবস্থায় আমাদের স্বরূপধর্ম্মগত ভগবৎ-সেবার আনন্দ আমরা সর্ববকর্ম্ম সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করি এবং তাহার ফলে কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত হেয় বস্তু হইয়া পড়ে। ত্যাগের জন্য আমাদের স্বযত্নকৃত-প্রয়াস তখন বিলুপ্ত হয়, এবং যোগের অবস্থা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্বব কর্ম্মে শ্রীভগবানে নিবেদিতাত্ম এই ভাবটির উপলব্ধি করিয়া আমাদের স্বরূপধর্ম্মগত ভগবৎ-সেবায় মনের উজ্জীবন রীতিকেই গীতায় ত্যাগ বা সন্ন্যাসের লক্ষ্যস্বরূপে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃতিই কর্ম্ম করে। আমরা প্রকৃতি বা গুণ-সংসর্গের আকর্ষণে পড়ি, এজন্যই কর্ম্ম আমাদের পক্ষে বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু আমাদের চিত্ত শ্রীভগবানে উন্মুখ হইলে প্রকৃতি বা মায়া আমাদের মনে এইরূপ মোহের সৃষ্টি করিতে পারে না। তখন ঈশ্বরই কর্ম্মের কর্ত্তা।

এই সত্যটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। কর্ম্মের কর্ত্তা যখন ঈশ্বর, ফলও ঈশ্বরের। আমরা কর্ম্মের সম্বন্ধে গিয়া সাক্ষাৎভাবে সর্বেবশ্বর এবং সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে তখন ভগবানকে উপলব্ধি করি। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সে অবস্থায় সর্ব্ব সম্বন্ধে ভগবানের আত্মভাবটি আস্বাদনে নিমগ্ন হয়। আমরা শ্রীভগবানের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত হই। যন্ত্র উপাদান মাত্র। যন্ত্রের নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। আমাদের দেহেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এইভাবে শ্রীভগবানের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত হওয়াতে সেগুলির সাহায্যে ক্রিয়ানুষ্ঠানে সক্রিয় ভাবটি ভগবৎ-সেবাকেই আমাদের জীবনে সত্য করিয়া তোলে। এইরূপে গীতার কর্ম্ম ভক্তির সাধক, বাধক নহে। গীতায় ত্যাগ বলিতে শ্রীভগবানের সেবা-সংশ্লিষ্ট এই ঘনিষ্ঠভাব উপদিষ্ট হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই সন্ন্যাস। আমাদের চিত্ত যদি সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে শ্রীভগবানের ব্যক্তভাবটি অনুভব না করে, তবে কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মফল ত্যাগ করা বিচারবুদ্ধির আশ্রয়ে এইরূপ ধারণা নিতান্তই আত্মপ্রবঞ্চনা-রূপ মিথ্যাতে পরিণত হয়। গীতায় এইরূপ মিথ্যাচার বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়াছে। প্রত্যুত আমাদের তথাকথিত ত্যাগ বা সন্ন্যাস অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ মিথ্যাচারের দ্বারা প্রশ্রিত হইয়া থাকে। এইভাবে এদেশে সন্ন্যাস এক রকম পোষাকী ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ইহার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কায়ক্লেশের ভয় কিংবা ভোগতৃষ্ণা পূর্ণ করিবার অভিসন্ধিই লুক্কায়িত থাকে। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভগবানে আস্তিক্য-বুদ্ধি বস্তুটি পর্য্যন্ত থাকে না। ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত অসঙ্গত কাজ করিয়াছেন, সুতরাং সংসারের সম্বন্ধ না ছাড়িতে পারিলে নিষ্কৃতি নাই। ইঁহাদের যুক্তি অনেকটা এইরূপ। ইঁহারা ভগবানের ভুল ধরিতেই বিচার-পরাক্রম এবং তাহাই জ্ঞানের লক্ষণ মনে করেন। ইঁহারা জগৎ হইতে ভগবানকে বিদায় দিতেই ব্যস্ত এবং জগতে তাঁহার মঙ্গল-স্পর্শটি পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের স্থান নাই, ইঁহাদের ইহাই অভিমত। প্রকৃতপক্ষে

ঈশ্বর, ভগবান—ইঁহাদের কাছে শুধু অজ্ঞানী যাহারা তাহাদেরই ভাবুকতা বা কল্পনাবিলাস মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক, বেদজ্ঞানে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেরও অধিক।" বিশ্ব হইতে বিশ্বেশ্বরকে বিদায় দিয়া এইভাবে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে গীতা মানুষকে কোন ক্ষেত্রেই উপদেশ করে নাই। "সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।" ভগবানে চিত্ত নিষ্ঠিত না হইলে সন্ন্যাস শুধু দুঃখেরই কারণ ঘটায়। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—"পৃথক আয়াসে যোগ, দুঃখময় বিষভোগ, সদাসুখ গোবিন্দসেবনে।" "আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন," ইহাই গীতার লক্ষ্য। গীতার দেবতা এক্ষেত্রে অনুমানের স্থান রাখেন নাই। অনির্দ্দেশ্য লক্ষ্যে তাঁহার বচন উপদিষ্ট হয় নাই। গীতায় শাস্ত্রনিষ্ঠা এবং কর্ম্মবিনির্ণয়ে অপরোক্ষ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে সর্ব্বাশ্রয় হইলেন ভগবান; তাঁহার স্বরূপতত্ত্বে চিত্ত যুক্ত না হইলে শুধু কর্ম্মফলে অনাসক্তিরূপ আদর্শবাদের বিচারে বা সম্বন্ধমাত্রে কর্ম্মের বন্ধন অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় ভাবটি অন্তরে ঘনিষ্ঠ না হইলে মর্কট-বৈরাগ্যই সংসার ত্যাগের ফলে সার হয়। এই ভণ্ডামি আমাদের জীবনের বিড়ম্বনা ঘুচাইতে পারে না। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং, যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্"—শ্রীভগবানে সব নিবেদন করিয়া ভোগ, ইহাই গীতার ত্যাগ বা সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। গীতার দেবতা দেশ ও কালের সকল ব্যবধান হইতে মুক্ত শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপতত্ত্ব জীবের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার আত্মমাধুর্য্যের স্পর্শে জীব নিত্য চৈতন্যময় আত্মসত্তায় অধিষ্ঠিত হয়। "সদা সেবি অভিলাষ হৃদয়ে করি বিশ্বাস, সদাকাল হইয়া নির্ভয়।" তাঁহার এই মাধুর্য্যের প্রতি আকর্ষণ জীবের স্বরূপধর্ম্মগত এবং সহজাত। সে মাধুর্য্য জীবের প্রকৃতিতে যজ্ঞধর্ম্মে নিহিত রহিয়াছে। জীবের সহিত সর্ব্বসম্বন্ধে ভগবানের এই আত্মভাবটি ব্যক্ত হইলে অচিৎ বস্তু সম্পর্কিত বা সম্বন্ধজাত

আগন্তুক, অনিত্য সম্বন্ধ হইতে জীব মুক্ত হয় এবং ভগবানের চিচ্ছক্তির দ্বারা চিৎকণ জীব আশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। গুণ-বন্ধন হইতে জীবের এই-ভাবে মুক্তি ঘটে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অস্বীকৃতিতে অশাস্ত্রবিহিত আচরণে দম্ভাহঙ্কারযুক্ত বদ্ধ-জীব আসুরী প্রকৃতিগ্রস্ত হইয়া দুর্গতির মধ্যে আপতিত হয়। অক্ষর-ব্রহ্ম বা অব্যক্তভাবের সাধনায় জীবের এই পরম প্রয়োজন সাধিত হয় না। গীতায় ভগবান্ এই সত্যটি বিশেষ ভাবে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। গীতায় নিরুপাধিক ব্রহ্মের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে সত্য ; কিন্তু গীতায় উপাধিবিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মকেই সর্ব্বভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে অক্ষর অনির্দ্দেশ্য-তত্ত্বের পরিকল্পনা করিয়া তাহাতে চিত্তকে যুক্ত করাই মায়াবাদমূলক মোক্ষ বা কৈবল্য। গীতায় ইহা প্রশ্রয় পায় নাই। পক্ষান্তরে এইরূপ কাল্পনিক মুক্তিবাদের বিরুদ্ধে গীতার দেবতার পাঞ্চজন্য স্পষ্টভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। ক্ষর, অক্ষর উভয় প্রকৃতি লইয়া জীবের সর্ব্বার্থসাধনোপযোগী পূর্ণতায় শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত-প্রস্তাবে গীতায় ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য প্রভৃতি সংজ্ঞা পরব্রহ্ম কৃষ্ণতত্ত্বেই প্রমূর্ত্ত হইয়াছে। শাস্ত্রসিদ্ধান্তেও ইহাই সমর্থিত হয়। চরিতামৃতকার বিষ্ণুপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন :—

“ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম॥
সেই ব্রহ্ম-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন॥
‘আত্মা’ শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥
ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়ি-বৃত্ত্যে নির্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥

রূঢ়িবৃত্তিতে অর্থাৎ মায়াবাদীর বেদান্ত ভাষ্যের বহু প্রচলনসূত্রে গীতার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শব্দার্থের ক্ষেত্রে বহু ভ্রান্তির কারণ সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের কর্ম্মের মূলে ভগবানের সশক্তিক ভাবটি অস্বীকার করিয়া আমরা নিজেদের অহংকারকেই সেখানে বড় করিয়া তুলিতেছি। ফলে আমাদের কর্ম্ম ভগবৎ-প্রভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া বিকর্ম্মের পথে চলিয়াছে। কর্ম্ম প্রকৃত জ্ঞানের পরিপোষক হইতেছে না। কর্ম্মের আশ্রয়ে জ্ঞান ভগবৎভক্তিতে দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে না। আমাদের সাধনা তাই পরোক্ষতার পথ ধরিয়া চলিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতাস্বরূপে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবাকেই অব্যভিচারিণী ভক্তি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গীতার কর্ম্মের লক্ষ্য এই ভক্তি। বস্তুতঃ ধর্ম্মের নামে স্বর্গ, মুক্তি প্রভৃতি ধোঁকায় পড়িয়া আমরা পরোক্ষভাবে কাম-লিঙ্গের উপাসনাই করিতেছি। গীতার দেবতা রসময়, তিনি প্রেমময়। তিনি সর্ব্বশক্তিতে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তাঁহার স্বরূপের সঙ্গে এই পৃথিবীর মানুষকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই যোগের কৌশলটিই গীতার রাজবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। গীতায় ভগবান্ প্রত্যক্ষ—প্রমূর্ত্ত। "চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর"—সব লইয়া কৃষ্ণের আত্মমাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য এবং বৈভব গীতা প্রকট করিতে চাহিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান, যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান"। এই অজ্ঞানতা কাটিলে নিত্য জীবনের প্রতিষ্ঠা। এই নিত্য জীবন বলিতে কর্ম্মহীনতা নয়। ভক্তি থাকিবে অথচ কর্ম্ম থাকিবে না, এমন কথা নিতান্তই অযৌক্তিক। প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের কর্ম্ম তখন অখিলাত্মদেবতা কৃষ্ণের সর্ব্বভাবে সেবায় পরিণত হইবে। "নিজ প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণসেবা বাধে, সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।" শুধু সেবা, সেবাই বড়। এইরূপ কর্ম্মময়—স্বরূপধর্ম্মগত নিত্য সেবাটি পাইয়া ভক্ত চিদানন্দে নিমগ্ন হন। গীতার সাত্ত্বিক কর্ত্তার ইহাই স্বরূপ। সমগ্র কর্ম্মের কর্ত্তাস্বরূপে ঈশ্বরকে দেখা, তাঁহার করুণার সংবেদনে, কর্ম্মে কর্ম্মে তাঁহারই ব্যক্ত-ভাবটির অনুগমন করাতেই নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপধর্ম্মের উজ্জীবন, তাহার তৃপ্তি—তাহার নিবৃত্তি, ত্যাগ বা সন্ন্যাস। সাত্ত্বিক কর্ম্মী

এইভাবে মুক্তসঙ্গ, তিনি অনহংবাদী। কর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আত্ম-ভাবের অনুভূতিতে তিনি ধৈর্য্য এবং উৎসাহসম্পন্ন। যাহা থাকে অদৃষ্টে—এইরূপ নৈরাশ্য তাঁহার কর্ম্মে নাই। বস্তুতঃ কর্ম্মে আসক্তিই এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্যের কারণ সৃষ্টি করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মী কর্ম্মের কেন্দ্রে কেন্দ্রে শ্রীভগবানের নিত্য জাগ্রত ভাবটি প্রত্যক্ষ করেন। এমন সাধকের অন্তরে সকল কর্ম্মের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় আহুতির আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়। জীবনে কাম-প্রয়োজন তাঁহার থাকে না। "কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল, কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল"। গীতার কর্ম্ম-বিজ্ঞানে ভগবান্ এই সত্যেরই সন্ধান অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।" গীতার দেবতা জীবনের পূর্ণতার এমন অমৃতময় রাজ্যে মানুষকে লইয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

১। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

২। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪

৩। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

৪। যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

যজ্ঞেই জীবন

আমরা প্রতিনিয়ত লাভ-লোকসানের হিসাবে চলিয়া থাকি। গীতায় ভগবান্ আমাদের হিসাবে লাভের একটা দিক সুনিশ্চিতভাবে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যজ্ঞের প্রবৃত্তি লইয়া তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যজ্ঞের পথে তোমরা সমৃদ্ধ হও। যজ্ঞ বলিতে এক্ষেত্রে ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদর্থে 'আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম কর'—এই ভগবদুক্তিতে এই অর্থটি সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করার অর্থ নিজের ভোগ্যবস্তু বিশ্বসেবায় উৎসর্গ করা বা সেজন্য ত্যাগই বুঝাইয়াছে। যাহারা নিজের জন্য অন্ন পাক করে, তাহারা পাপান্ন ভোজন করে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, দেবতারা যজ্ঞের ভাবনা লইয়াই ইষ্টভোগসমূহ মানুষকে প্রদান করেন। তাঁহাদের নিকট এইভাবে প্রাপ্তবস্তু যাহারা ভগবানকে দান না করিয়া ভোগ করে, তাহারা তস্কর। ইন্দ্রিয়াসক্ত এমন পাপীর জীবনধারণ বৃথা। কঠিন কথা—আমরা কি তবে বিশ্ব সংসারে শুধু বেগার খাটিতে আসিয়াছি ? তবে কি আমাদের ভোগ করিবার কোন অধিকারই নাই ? গীতার দেবতা বলিতেছেন, ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্নেই জীবের অধিকার। এক্ষেত্রে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ভগবানের সেবা করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই গ্রহণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সত্যটি ভাগবতে সমধিক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মহামুনি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গৃহীর ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কালে বলিয়াছেন, যে পরিমাণ ধনাদি উদরভরণের জন্য প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্যেই জীবের অধিকার রহিয়াছে। তাহার অধিক বস্তুতে যে নিজের স্বত্ব আছে বলিয়া মনে করে, সে তস্কর। সে ব্যক্তি দণ্ডার্হ।

প্রকৃতপ্রস্তাবে নিজের ভোগের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তৎসম্পর্কিত স্বত্বকে অধিকারের মর্য্যাদা দিয়া সেই ভিত্তিতে ধর্ম্মাচরণে প্রকৃত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না। ধর্ম্ম তো স্বভাব-নিষ্ঠিত বস্তু। যজ্ঞ বা সেবা আমাদের

স্বভাবে এমন ভাবেই নিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রত্যুত যজ্ঞের ফলস্বরূপে আপনা হইতেই আমাদের ভোগ-প্রয়োজনের পরিপূর্ত্তি ঘটে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শ্রীভগবানের বিধান এমনভাবেই পরিচালিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে যে কিছু চায়, ভগবৎ-বিধান অনুসারে প্রকৃত ভোগ হইতে সে বঞ্চিত হয়। পরন্তু যে কিছুই চায় না, এখানে যে অকিঞ্চন, ভোগ আপনা হইতেই তাহার পক্ষে লভ্য হইয়া থাকে। এখানে যে ধনী, তাহাকেই জীবনের আস্বাদনে বঞ্চিত হইতে হয়। দশজন তাহারই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নিজের স্বার্থ কি ভাবে সিদ্ধ করিবে, এই অভিসন্ধিতে তাহার সহিত সম্বন্ধ খোঁজে। ইহার ফলে প্রত্যেকে তাহাকে পর করিয়া দেখে। স্বার্থ-মূলক এমন প্রতিবেশের মধ্যে পড়িয়া ধনী ব্যক্তি কোন সময়ে কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে যিনি অকিঞ্চন, নিজের স্বার্থসাধনের জন্য যাঁহার দৃষ্টি নাই, পরার্থসাধনে যাঁহার চিত্তবৃত্তি সতত উন্মুখ, নিজের কোন অধিকারের দাবী তিনি রাখেন না বলিয়া অপরের চিত্তে তাঁহার সম্বন্ধে ঈর্ষাবুদ্ধিও জাগ্রত হয় না এবং স্বার্থমূলক প্রতিবেশে পড়িয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা অপরের নিকট হইতে অনিষ্টাশঙ্কায় আড়ষ্ট জীবনও যাপন করিতে হয় না। এই হিসাবে দেখিতে গেলে ব্যক্তিগত স্বত্ব বা অধিকার আমাদের ব্যক্তি বা সমাজ-জীবন কোনদিক হইতেই অনুকূল নহে, ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয়।

প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যেকে পৃথিবীতে যখন আসিয়াছিলাম, কেহ কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি নাই। পৃথিবীর জল, বায়ু, আলোতে প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। সূর্য্য আলোক বিতরণে ব্যক্তিবিশেষের বিবেচনা করে না। বায়ু ধনীর দিকে তাকাইয়া বহে না। বস্তুতঃ মানুষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থমূলক দৃষ্টিই পরস্পরের মধ্যে অধিকারসূত্রে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এই ব্যবধান যিনি যতটা লুপ্ত করিতে পারেন, যিনি পরকে যতটা আপন করিতে জানেন তিনিই ততটা সুখী। জীবনের এই দিকটা যাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে

না, তিনি সত্যই হতভাগ্য। মানুষের সভ্যতার যেদিন পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিবে, মানুষ সেদিন নিজের অধিকারের সঙ্কীর্ণ প্রতিবেশ হইতে মুক্ত হইবে, সে পরস্পরের সেবার মধ্যে নিজের অধিকারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবে। নিজের ভোগের জন্য কাহারও তখন আর চিন্তা করিবার অবসর থাকিবে না। ইহার ফলে হিংসা-দ্বেষ হইতে জগৎ মুক্ত হইবে এবং মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকার লাভ করিবে। পৃথিবীর ফাঁকা হাওয়ায় মানুষ সেদিন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। নিজেদের চারিদিকে ভোগোপচার বাড়াইয়া অপরকে বঞ্চিত করিতে গিয়া মানুষ যে নিজেই নিজের অনিষ্ট করিতেছে, সেদিন সে ইহা বুঝিবে এবং আত্মঘাতী এই পন্থাকে সে বর্ব্বরোচিত বৃত্তিস্বরূপে উপলব্ধি করিবে, তেমন প্রবৃত্তি তাহার নিকট ঘৃণিত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ বলিতে আমরা নিজেদের ভোগকে বর্জ্জন করিবার ভাব বুঝিয়া থাকি। আমাদের এই ধারণার ফলে আমাদের সমাজ-জীবন স্বার্থের একটা চক্রের ভিতর পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে। ত্যাগই আমাদের পক্ষে যে আত্যন্তিক ভোগ এই সত্যটি আমরা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না। কিন্তু 'কৃষ্ণ অর্থে সেই ত্যাগ, ত্যাগ কভু নয়' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি। ফলতঃ ত্যাগজনিত আত্মতৃপ্তি বা তুষ্টির মধ্যেই আমাদের ভোগ এবং আমাদের জীবনের পরিপুষ্টি সাধিত হইতেছে। কিন্তু সত্যটি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে আজও আমাদের জীবনে অনুভূত হয় নাই। আমরা বুঝি না যে, ত্যাগজনিত এই যে আত্মতুষ্টি ইহাই সবচেয়ে বড় ভোগ এবং এই ভোগের ভাণ্ডার সকলের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে। কর্ম্মে অনাসক্তির মূলে এই পরম ভোগটিই প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে পরার্থে ত্যাগ করিয়া অখিলাত্ম-দেবতার সেবাসূত্রে আমরা নিজেদের আত্মারই তুষ্টি সাধন করিয়া থাকি। আমাদের নিজেদের স্বার্থই তাহাতে রক্ষিত হয়। কিসে আমাদের এমন স্পর্দ্ধা যে আমরা পরের সেবা করিব ? পর বলিতেছি আমরা কাহাকে—কাহাকে আমরা কৃপা করিতে চাহিতেছি ?

তিনিই যে সবভাবে আমাদের আপন, তিনিই যে সকলরূপে নারায়ণ। তিনিই যে ভিখারী হইয়া আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনিই যে আমাদের চাকর, চাকরাণী হইয়া আমাদিগকে বাড়াইতেছেন। তিনিই যে মুচি, মেথর হইয়া আমাদের সেবা করিতেছেন। যাহাদিগের কপালে হরিজনের লেবেল আঁটিয়া নিজেদের আভিজাত্যকে পরিস্ফীত করিয়া আমরা আত্মবঞ্চনা করিতেছি—সে যে তিনিই। প্রাণের টানে পড়িয়া আমাদিগকে মান দিতে ছুটিয়াছেন। আসুন, পরোপকারের স্পর্দ্ধিত মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করি—তাঁহাকে নমস্কার করি, আমাদের নিজেদেরই উপকার হইবে। প্রেমের দেবতাকে আপন করিয়া পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইব। গীতোক্ত অনাসক্তির মূলে এই আত্মসেবা বাস্তব সত্যস্বরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঈশ্বর সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার জন্য ত্যাগ করিয়া ভোগ কর। কাহারো ধনে লোভ করিও না। ঈশোপনিষদের এই সূত্রটি ভাগবতে আমরা অন্য আকারে দেখিতে পাই। ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে "ঈশ" এই শব্দটির পরিবর্ত্তে "আত্মা" এই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। আমাদের কর্ম্ম-সাধনার মূলে সর্ব্বজীবের সুহৃৎস্বরূপে শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বের সমাশ্রয়-তত্ত্বটি পরিস্ফুট করাই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ ভগবানকে ঈশ্বর বলিয়া ভাগবত তৃপ্তি বোধ করেন নাই। ঈশ্বর বলিতে পরা এবং অপরা উভয় প্রকৃতির মূলে ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়াত্মক ক্রিয়াংশে অভিব্যক্ত স্বরূপটি বুঝায়। ভগবান্ বিশ্ববীজ-স্বরূপে সনাতন সর্ব্বাত্মক ভাবটির সমাশ্রয়ে পরমেশ্বর। সৃষ্টি, স্থিতি ক্রিয়াত্মক তাঁহার বিভূতিযোগে তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দে বৃহৎ বস্তু। ব্রহ্ম বস্তুস্বরূপে রূপে রূপে অব্যাকৃত থাকিয়া আত্মতত্ত্বের ব্যক্তপ্রভাবে যিনি সকলকে বাড়ান তিনিই পরব্রহ্ম—তিনিই পরমেশ্বর। পরমেশ্বর-স্বরূপে ভগবানের করুণার কম্পন আমাদের মনের মূলে প্রতিফলিত

হইলে চিত্তবৃত্তির পরিস্ফুর্ত্তিতে পরতত্ত্বে তিনি ধ্যেয় হন। ধ্যানের পরে আসে দান। পরাবরে চরাচরে সর্ব্বতোময় সংবেদনে ভগবৎ-স্বরূপে অনুভূত হয় তাঁহার আকর্ষণ। এই আকর্ষণই আমাদের অন্তরে আমাদের স্বরূপধর্ম্মগত যজ্ঞের প্রবৃত্তিকে দীপ্ত করে। আমরা ভগবানের জন্য আত্মনিবেদনে উন্মুখ হই। যজ্ঞেশ্বরকে পাইয়া তাঁহাকে সব দিয়া আমরা জীবনের পূর্ণতা পাই। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আমাদের স্বভাবধর্ম্মে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদের নিবৃত্তি ঘটে। "কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম, কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম"—স্বয়ং মহাপ্রভুর এই উক্তি। কৃষ্ণতত্ত্বে এইভাবে শাশ্বত মানবধর্ম্ম বিধৃত রহিয়াছে। তিনিই সৎস্বরূপ। চিৎ-তত্ত্বে তাঁহার ব্যক্তভাবের অনুভূতিতে অখণ্ড, অদ্বয়, সচ্চিদেকস্বরূপে তাঁহাকে পাইয়া আমরা আনন্দময় আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করি। আমাদের জীবনের একান্ত লাভের দিকটা তখন উন্মুক্ত হয়। সে অবস্থায় জীবনের কারবারে লোকসানের কোন প্রশ্ন আর থাকে না। দেওয়াতেই তখন পাওয়া—দেওয়া ছাড়া কিছু চাওয়ার নাই। কারণ চাইতে গেলেই আমাদের ক্ষতি, আমাদের নিঃস্বত্বের উপলব্ধি। কার্পণ্য হইতে মুক্ত মানুষের পরম মহত্ত্বের বীর্য্য রহিয়াছে এইখানে এবং এইখানে মানুষ তাহার সনাতন আত্মসত্তার স্বরূপে সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হয় এবং পশুত্বের উর্দ্ধে মানবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা পায়। গীতার অনাসক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে মানব-জীবনে শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় আত্ম-ভাবের সংবেদনে উদ্দীপিত স্বাভাবিক ভক্তিতে পরিস্ফুর্ত্ত, আত্মনিবেদনের সূত্রে এই অনাসক্তি আমাদিগকে সর্ব্ববন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত চিদানন্দের সন্ধান দিয়াছে। মানুষের জীবনের হিসাবের ভুলটি এমন অনাসক্তির প্রভাবে ভাঙ্গিয়া যায় এবং অকিঞ্চন হইয়া মানুষ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। নিজের জন্য কিছু না চাহিয়াও সে সব পায়।

সম্ভবামি যুগে যুগে

পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা অনেকটা নৈতিক উপদেশ মাত্র বলা চলে। আমরা এইবার একটু গভীরভাবে গীতোক্ত কর্ম্মতত্ত্বের গূঢ়তর রহস্যটি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। প্রকৃত-প্রস্তাবে সেবা কর্ম্মেরই ভাষান্তর। আমরা জীবনে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যতকিছু কর্ম্ম করিতেছি, সবই ভগবৎ-সেবাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। বেদের সাধনাঙ্গে যজ্ঞই প্রধান। যজ্ঞার্থের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মনু বলিয়াছেন—"অগ্নৌ দত্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্ট্যা অন্নং ততঃ প্রজাঃ।" আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিতেন—কলিকাতা সহরের মিষ্টান্নের দোকানগুলিতে যাও কি দেখিতে পাইবে? যাহারা সেই সব দোকানে কাজ করে, সকলেই মোটা তাজা। ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন প্রস্তুতের চুল্লীর নিকটে থাকিবার ফলেই তাহারা এমন হৃষ্টপুষ্ট হয়। ঘৃতের ধূম তাহাদের পক্ষে অন্নের কাজ করে। যজ্ঞের মূলে লোক-কল্যাণ প্রবৃত্তি এইভাবে নিহিত থাকে। ঘৃতাহুতিতে বিশ্বাত্মদেবতার তুষ্টি সাধিত হয়। গীতায় যজ্ঞকে সমধিক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। গীতায় উপদিষ্ট কর্ম্ম—বৈধ কর্ম্ম, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-মাত্রই যজ্ঞ অর্থাৎ বিশ্বাত্মদেবতার সেবা। গীতার দেবতা বলিয়াছেন, এই সেবাধর্ম্মেই মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠিত। যিনি যতটা দান করেন, তাঁহার ততটাই জীবনের সংস্থান লাভ হয়। আমাদের সাধারণ জীবনের দিক হইতেও ইহা সত্য। আগে সেই কথাটাই বিবেচনা করিয়াছি। এই সাধারণ জ্ঞানেও আমরা কতটা অধিকার অর্জ্জন করিয়াছি, ইহাও সন্দেহের বিষয়। বস্তুতঃ বিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে সেবাধর্ম্মে উদ্দীপ্তিসূত্রে চিত্তশুদ্ধি না ঘটিলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পিপাসা আমাদের অন্তরে জাগে না। আমরা কর্ম্মে কর্ম্মে প্রতিনিয়ত যজ্ঞ করিয়াই চলিতেছি, নিজ-দিগকেই তিলে তিলে আহুতি দিতেছি—দিতেছি সংসারের কাজে। অথচ সংসারটিও যে ভগবানেরই, আমাদের কোন স্বত্ব বা অধিকার যে সেখানে

নাই, ইহা আমরা বুঝিতেছি না। ইহাই অজ্ঞানতা। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" এ উপলব্ধি আমাদের নাই। গীতার দেবতা এই অজ্ঞানতা হইতে আমাদের চিত্তকে মুক্ত করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন। তিনি জ্ঞানযোগে আমাদের মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে জগৎগুরুরূপে জাগ্রত হইয়াছেন। বস্তুতঃ অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্মের সর্ব্বাবয়বে সেবার ভাবটি অব্যবহিতভাবে আমরা যখন উপলব্ধি করি, তখন কর্ম্মই জ্ঞানের আকারে আমাদিগকে নিরুপাধিক আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং ভগবৎ-শক্তিই আমাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। কর্ম্মের মূলে সেই একই উৎস হইতে সঞ্চারিত হইতেছে বীর্য্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে সেবা না করিতেছে কে? শুধু মানুষ কেন, মনুষ্যেতর জীবগণও নিজদিগকে যজ্ঞ করিয়া দিতেছে এবং সমগ্র বিশ্ব-বিসৃষ্টি তাঁহাদের দত্তাহুতিসূত্রে বিধৃত রহিয়াছে। স্থাবর বৃক্ষাদিও যজ্ঞ করিতেছে। নিজদিগকে বিশ্বাত্ম-দেবতার পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া বিশ্বেশ্বরের মহতী ইচ্ছার পরিপূর্ত্তি-সাধনে তাহারাও প্রবৃত্ত আছে। বিশ্বকর্ম্মের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সর্ব্বাত্ম-দেবতার সংবেদনটি কিরূপ অতন্দ্রিতভাবে কার্য্য করিতেছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে আমরা শ্রীভগবানের মুখে তাহা শ্রুত হইয়াছি। এক্ষেত্রে বাগর্থের প্রতিপত্তি সাধিত না হইলে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটে। কিন্তু কর্ম্মে কর্ম্মে সংবেদনশীল সেই ভগবৎ-সম্বন্ধটি উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? সেই সংবেদন-সংস্পর্শে মনের উজ্জীবনই ধর্ম্ম। মীমাংসা-দর্শন বলেন, 'চোদনালক্ষণোঽর্থঃ ধর্ম্মঃ'। কর্ম্মের মূলে শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় এই প্রচোদন বা প্রণোদনরূপ ধর্ম্মকে ধরিব আমরা কোন শক্তিতে? এমন ধৃতি অর্থাৎ কর্ম্মের মূলে ভগবৎ-প্রসাদের উপলব্ধি-জনিত চিত্তের অচাঞ্চল্য লাভের প্রত্যাশা আমরা করিব কিসের জোরে? গুণ বা বিষয়াসক্ত আমাদের চিত্ত। কর্ম্মের মূলে ভগবৎ-বীর্য্য-সংস্পর্শে নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্ম-চৈতন্যের উজ্জীবন আমরা অনুভব করিতে পারি না। জড় মন অবর বা ইতর প্রসঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়া থাকে। আবার নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বেও সাক্ষাৎ সম্পর্কে ভগবৎ-বীর্য্যের

প্রণোদন আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 'অনুমান-প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে, কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।' নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে কৃপার সম্বন্ধ নাই। কারণ সে-তত্ত্ব নিঃশক্তিক। সুতরাং আমাদের সহজাত যজ্ঞের প্রবৃত্তি সর্ব্বাঙ্গীণভাবে উজ্জীবিত করিবার সামর্থ্য ব্রহ্মতত্ত্বে অনধিগম্য। আমরা পরম সৌভাগ্যবান্। গীতার দেবতা কর্ম্ম-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে পরাবরস্বরূপে সগুণ নির্গুণ, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ বিরুদ্ধধর্ম্মে সমন্বয় সাধনোপযোগী নিজ বীর্য্যের মাধুর্য্যে যোগের গূঢ়তত্ত্বটি এইবার উন্মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 'সাক্ষাৎ সঃ যজ্ঞপুরুষস্তপনীয় বর্ণঃ'—এই ভাগবতী বাণী আমাদের দৃষ্টিতে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। জীব-জগতের বেদনায় কারুণ্যের তাপে তাপে শ্রীভগবান্ তাঁহার বদান্যলীলা উন্মিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার' হেন ভগবানকে আমরা পাইতেছি। প্রত্যুতঃ সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তিনি আমাদের দিকে আগাইয়া না আসিলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় না, সত্যধর্ম্ম দীপ্তিলাভ করে না। ভাগবত বলেন—"ধর্ম্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতং ন বৈ বিদু-র্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।" সাক্ষাৎভাবে ভগবানের কৃপা বা বীর্য্য-প্রণোদিত এই যে ধর্ম্ম ইহার স্বরূপ কি? ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান্ এই ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ" অর্থাৎ যদ্দারা আমার ভক্তিলাভ হয়, তাহাই প্রকৃষ্টভাবে ধর্ম্ম—অন্যবৃত্তি ধর্ম্ম নয়। পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই বেদ। শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিয়াছেন—

'পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥'

(ভাঃ ১১।২০।৪)

অর্থাৎ শ্রেয় বিষয়ে এবং সাধ্য-সাধন বিনির্ণয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই বেদ-স্বরূপ। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের বাণীই দেবলোক এবং মনুষ্যলোকের শ্রেষ্ঠ-

চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণ শিরোমণি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূত্থ বিকল্পয়েৎ
ইত্যস্যা হৃদয়ংলোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন।"

অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য সমূহের দ্বারা কি বিধান করা হইয়াছে, দেবতা-কাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশ পাইয়াছে, জ্ঞানকাণ্ডের নিষেধ এবং উদ্দেশ্যে কোন্ বস্তু বিচার্য্য হইয়াছে, বেদের মর্ম্মগত অভিপ্রায় কি, আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। ভক্তপ্রবর সুদামাকে অভিনন্দন কালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখে ধর্ম্মের আর একটি লক্ষণ আমরা শ্রুত হই। তিনি বলিয়াছেন—"ধর্ম্ম স্তে বৃদ্ধসম্মতঃ" অর্থাৎ সাধু গুরু শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ে ঐক্য করিয়া ধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হয়। ফলতঃ 'বৃদ্ধসম্মত' বলিতে এক্ষেত্রে শাস্ত্রদ্রষ্টা প্রাচীন মুনিঋষিগণ এবং বর্ত্তমান জীবনে গুরুর আনুগত্যানুমোদিত নির্দ্দেশই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের এইরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভগবান্ চিন্ময় বিগ্রহে প্রমূর্ত্ত হন। 'হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে'—কর্ম্মের সূত্রে প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় চিন্ময় তত্ত্বে শ্রীভগবানের এইরূপ ব্যক্তভাবের প্রত্যক্ষতা বা জ্ঞানেই গীতোক্ত যোগের প্রতিষ্ঠা এবং তাহাই জীবের পরমধর্ম্ম স্বরূপে গীতায় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবানুগ্রহে ভগবৎ-মাধুর্য্যের এই চাতুর্য্য বিস্তার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এইরূপে ভগবদাবির্ভাব না ঘটিলে ধর্ম্ম অনুমানের বস্তুই থাকে এবং আমাদের অজ্ঞানতাজনিত ভেদ-জ্ঞান দূর করিবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক সত্যে তাহা উদ্দীপিত হয় না। আচার্য্য শঙ্কর তৎপ্রণীত গীতাভাষ্যে ভগবদাবির্ভাবের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—'স ভগবান্ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্নেব লক্ষ্যতে' অর্থাৎ ভগবান্ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব হইয়াও নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে দেহধারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহার লোকানুগ্রহেরই

পরিচয় পাওয়া যায়। যজ্ঞপুরুষস্বরূপে তাঁহার এমন আবির্ভাব। মহাভারতে ঋষি সনৎ-সুজাত বলিয়াছেন—"এবংরূপঃ স মহাত্মা পাবকং পুরুষো গিরন্ য এনং বেত্তি পুরুষং তস্যেহার্থো ন রিষ্যতি" অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তের উজ্জীবনোপযোগী তাঁহার বচনে অগ্নিময় তাপ লইয়া ভগবান্ আসেন। এমন পুরুষকে যিনি বিদিত হইয়াছেন, তাঁহার এই মর্ত্ত্য-জীবনেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আসুন, আমাদের জন্য বেদনায় গীতার দেবতার অগ্নিময় বচন-সুধা পান করিবার জন্য আমরা অন্তরটি বাড়াইয়া দেই, তবেই মন্ত্রমূর্ত্তি তিনি স্ব-স্বরূপে আমাদের নিকট আবির্ভূত হইবেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার অপরিম্লান আত্ম-মহিমায় আকর্ষণ করিবেন। আমাদের দৃষ্টির অজ্ঞানতা দূরীভূত হইবে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ

অবতারতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জীবের সংযোগ ঘটে। ভাগবতে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রাক্কালে ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি মুনিগণসহ দেবগণ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলেন—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়-উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়া-যোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে।"

অর্থাৎ হে ভগবান্, দেহী জীবগণের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর প্রকট করেন। লোকসকল সেই চিন্ময় বপুকে আশ্রয় করিয়া বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যা এবং সমাধিযুক্তভাবে আপনার অর্চ্চনা করে। কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে ভগবানের মর্ত্ত্যদেহে অবতরণোপযোগী অতুল্য এবং অতিশয় বীর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ভগবান্ যোগের সম্বন্ধে উপদেশ দানপ্রসঙ্গে অবতারতত্ত্বের কথা উত্থাপন করিবামাত্র অর্জ্জুনের মনে পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়।

ভগবান্ বলেন, এই যোগ-তত্ত্ব অব্যয়। আমি ইহা মন্বন্তর প্রভৃতি যুগের প্রথমেই সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলাম। তুমি আমার ভক্ত এবং সখা সেইজন্য পুরাতন এই যোগ আমি অদ্য তোমাকে পুনরায় উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্রীভগবানের এই উক্তিতে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেন, তোমার জন্ম বসুদেবনন্দনস্বরূপে কংস-কারাগারে বহু পরে এবং সূর্য্যের জন্ম বহু পূর্ব্বে ঘটে। সুতরাং এই তুমিই সূর্য্যকে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব বলিয়া মনে করিব? এইস্থলে স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুন কি তাহা জানিতেন না? অর্জ্জুনের নিজের

উক্তি হইতেই আমাদের মনের এই সন্দেহ নিরসিত হয়। তিনি দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং পরম পবিত্র। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের উক্তি হইতে তিনি ইহা অবগত হইয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ তাঁহার গীতাভাষ্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এবং অন্যস্থলেও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অর্জ্জুন, ভীষ্ম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মুখে "অসকৃৎ শ্রুতং" অর্থাৎ বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন। রাজসূয় যজ্ঞ-সভায় এ সম্বন্ধে ভীষ্মের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিপ্রভবাপ্যয়ঃ। কৃষ্ণস্যহি কৃতে ভূতমিদং বিশ্বং চরাচরং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। এই জগৎ-চরাচর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং অর্জ্জুন তত্ত্বগতভাবে কৃষ্ণের ভগবত্তা অবগত ছিলেন। কিন্তু তত্ত্ব খোঁজে নিজর স্বার্থ—স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ নয়। তত্ত্ব চাহে জ্ঞান—সম্বন্ধ চায় আপন। নারায়ণের স্বরূপ সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন এই চতুঃসনের অনধিগত ছিল না। কিন্তু অক্ষরব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনায় তাঁহারা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ভগবৎ-মহিমা শ্রবণের সূত্রে তাঁহারা শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-লীলা আস্বাদনের জন্যই অবশেষে উন্মুখ হন। ভাগবতে দেখি, তাঁহারা গুরুরূপে ব্রহ্মার মুখ হইতে শ্রীভগবানের লীলা-মাধুর্য্যের বীজ মন্ত্রস্বরূপে লাভ করিবার পর "তত্ত্বং বিদামো ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং স্বত্তেন"। তাঁহারা পরমাত্ম-তত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানকে 'স্বত্তেন' আচার্য্য শ্রীধরের ভাষ্যানুসারে 'শ্রীমূর্ত্ত্যা'—অর্থাৎ চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বিগ্রহে প্রত্যক্ষ করিয়া তবে পরি-তৃপ্তি লাভ করেন। ফলতঃ আচার্য্যরূপে শ্রীভগবানের পরম মধুর এই লীলা-রহস্যটি উন্মুক্ত করাই এ ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রশ্নের মূলে উদ্দেশ্য স্বরূপে কাজ করিয়াছে। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন ভগবান্ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব সুতরাং কর্ম্মপরবশ জীব তিনি নহেন। তাঁহার জন্ম, সে বস্তুটি কেমন? তাঁহার এ জন্মগ্রহণ কি মায়ার খেলা—ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা?

তাঁহার দেহটি কি প্রাকৃত গুণাত্মক বিকার ? তাঁহার এমন জন্মগ্রহণের হেতু কি এবং তাঁহার জন্মের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল আছে কি ? অর্জ্জুনের প্রশ্নের মূলে এতগুলি গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই গুলির মীমাংসা না হইলে গীতার মূল উদ্দেশ্যই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ'—কৃষ্ণই যে পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অব্যয় অমৃতের তিনিই যে আধার এবং শাশ্বত ধর্ম্ম তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই যে বিধৃত রহিয়াছে, এই সত্যটি মর্ত্ত্য জীবের পক্ষে অজ্ঞাত রহে। জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্য-সংযোগ রহিয়াছে কিন্তু তিনি কৃপা না করিলে প্রাকৃত গুণাভিভূত জীব সমাত্মসম্বন্ধে তাঁহার অপ্রাকৃত প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে পারে কি ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাতেও আমরা ভক্তাশ্রয়ে শ্রীভগবানের পরম মাধুর্য্যময় এমন নিজবীর্য্য বৈভব প্রকটের রীতির পরিচয় পাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত প্রভুর মিলন সম্পর্কে পরম এই অদ্ভুত ব্যাপারটি ঘটে। সার্ব্বভৌম প্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর স্বরূপ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলেন—'ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জানো মহিমা, ভগবত্তা লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা।' শ্রীমৎ সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ গোপীনাথের এই উক্তিতে আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা প্রশ্ন তোলেন 'ঈশ্বর কহ কি প্রমাণে' ? আচার্য্য উত্তরে বলেন, ঈশ্বরকে তর্ক-যুক্তির পথে যথাযথভাবে অনুভব করা যায় না। পরন্তু 'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে, সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।' অর্জ্জুনের প্রশ্নে এই কৃপার পথটি উন্মুক্ত হইল। ভাগবত বলিয়াছেন—'আত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনুঃ' আত্মতত্ত্ব প্রকাশের জন্য ভগবান্ মানবরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার, চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহ নিরাকার' ? প্রভু আরও বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার, সে বিগ্রহে কহে সত্ত্ব গুণের বিকার"। বস্তুতঃ ভগবানের স্বরূপ-ধর্ম্মাশ্রিত এমন বিকারেই তাঁহার সর্ব্বসম্পর্কে চিদানন্দ-সম্বন্ধের সঞ্চার সামর্থ্য বা বীর্য্য নিহিত

থাকে। বিকারশীল জগতে অবতাররূপে শ্রীভগবানের দেহটি তাঁহার নিত্য চিদাকারের বীজস্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি অনুসারে "পূর্নৈশ্বর্য্য বিগ্রহের ইহাতে নির্দ্ধার। ভক্ত্যে ভগবানে অনুভবে পূর্ণরূপ, একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ।" রূপে রূপে শ্রীভগবানের অনন্ত মাধুর্য্য অবতারকে আশ্রয় করিয়া নিত্যভাবে আস্বাদনে জীবের পরমার্থ সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ভগবানের দিব্য জন্ম কর্ম্মের মাধুর্য্যে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইলে এই মর্ত্ত্যদেহেই জীব অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা লাভের অধিকার পায় "ত্বমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি।" ভাগবতে দেখিতে পাই, কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা প্রসঙ্গে তাঁহার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, পৃথিবীর সকল জীব অবিদ্যা এবং কাম্য কর্ম্মের প্রভাবে অভিভূত রহিয়াছে যাহাতে তাহারা এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধনার পথে তাহাদের স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেজন্য তোমার লীলাটি শ্রবণ এবং স্মরণার্হ করিবার উদ্দেশ্যেই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। বলাবাহুল্য লীলাকে শ্রবণ এবং স্মরণার্হ করিতে হইলে জীবের সহিত তাঁহার সমাত্ম-সম্বন্ধ উদ্দীপন করা আবশ্যক হয়; জীবকে নিজে আসিয়া বরণ করিয়া প্রিয়স্বরূপে জীবের স্মৃতিতে তাঁহার আত্ম-ভাবের বিস্তার সাধন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই আত্মসম্বন্ধই শ্রবণ এবং স্মরণের মূলে মনের উজ্জীবন-ধর্ম্ম সঞ্চার করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্নেহপূর্ব্বক অনুধ্যানকেই ভক্তি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই ভক্তি শ্রবণাদি সাধনাঙ্গ হইতে উপজাত হয়। সুতরাং শ্রীভগবানের নররূপ তাঁহার অংশ স্বরূপ চিৎধর্ম্মী জীবের স্বরূপধর্ম্মের উজ্জীবক চিদানন্দময় এবং তাহা ব্যক্তাব্যক্ত উভয়ভাবে বীজস্বরূপ। মহাপ্রভুর উক্তি এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "সে রূপের এক কণ, ডুবায় সর্ব্ব ভুবন।" কিন্তু "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।" অর্জ্জুন নররূপী নারায়ণের অতুল্য এবং অতিশয় বীর্য্য উপলব্ধির অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজের সম্বন্ধেই সচেতন। ভগবান্ এখানে নর-বপুর অসমোর্দ্ধ আত্ম-মাধুর্য্যের ক্রম-পরাক্রমটি অর্জ্জুনের নিকট উন্মুক্ত

করিলেন। ব্রজ-মাধুরীর আঁচটি তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ধরাইয়া দিলেন এইটুকুই বুঝা যায়। শ্রীভগবানের কৃপাবলে চিদৈশ্বর্য্যময় তাঁহার নরবপুর মাধুর্য্য যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন ভগবৎ-প্রেমে শুধু তিনিই পরিনিষ্ঠিত হইয়াছেন, অন্য কোনভাবে সে বস্তু লাভ করিবার উপায় নাই। শ্রীভগবান্ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে এই সত্যটি সুনিশ্চিত করিয়া বলিয়াছেন—নরদেহধারী আমার রূপ, গুণ, সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা আমাকে ছাড়া কিছুই জানেন না এবং পরম পুরুষস্বরূপে আমার সেবা লাভ করিবার জন্য যাঁহারা আগ্রহান্বিত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহারা তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী সকল শ্রেণীর ভজনশীল পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"জ্ঞানে কর্ম্মে যোগে ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত এই প্রয়োজনতত্ত্বই গীতার্থে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

জ্ঞানের পথে ভক্তির রীতি

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব ভাগবতে বলিয়াছেন—মহারাজ, কৃষ্ণকে সমস্ত প্রাণিগণের আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে। তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল শরীরী-রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই কৃষ্ণের রূপ এবং কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই। কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়াছে। স্বয়ং অর্জ্জুনেরই যখন কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে দেখা গেল, তখন অন্যের কি কথা? দুর্ব্বাসার নিকট ভগবান্ বলিয়াছেন—"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" অর্থাৎ আমি আমার ভক্তজন ব্যতীত আমার নিজেকেও ভালবাসি না। চরিতামৃত বলেন—

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণভক্ত বড় করি মানে।"

জীবের পক্ষে ভগবৎ-তত্ত্ব পরোক্ষ। কিন্তু ভক্ত বা মহতের আশ্রয়ের দ্বারা সে তত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। মহৎ ভগবানেরই স্বরূপ। "স্বরূপবিহনে রূপের উদয় কখনো সম্ভব নয়। অনুগতি বিনা কার্য্যসিদ্ধি কেমনে সাধক কয়?" 'ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান'—ভক্তের অনুগতি অবলম্বন করিলে জীব ভগবানের চিদৈশ্বর্য্যময় রূপ অন্তরে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং তাহার পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড অতি ব্যাপক। বেদে বহুবিধ যজ্ঞের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—"বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।" যজ্ঞের ক্রমটি বা বিহিত কর্ম্মের মৌলিক সূত্রটি আমাদের পক্ষে মিলিবে কোথায়? বস্তুতঃ প্রত্যক্ষভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধের উজ্জীবনোপযোগী সাধন-প্রকরণ বা মন্ত্রবীর্য্য বেদে মিলে না। এজন্য বেদ পরোক্ষবাদমূলক। এক্ষেত্রে উপায়? গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে

ভগবান্ এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, উপায় গুরুপদাশ্রয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরুকৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতাবীজ॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥" গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে পরে আমরা পাইব, ভগবান বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্" অর্থাৎ আমিই চতুর্ব্বেদের প্রতিপাদ্য। আমিই বেদান্তার্থ প্রচারের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক। আমিই বেদার্থবিৎ। তবে তো বেদবিধি মানিয়া চলিলেই ভগবান্ তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহাকে পাওয়া যাইবে ? কিন্তু সে সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা কিছু নাই। ভগবানের কৃপার উপর সব নির্ভর। বেদবিধি প্রতিপালন করিলে কৃপা মিলিবে না কি ? মহাপ্রভুর উক্তিতে সে ক্ষেত্রেও সন্দেহই আমাদের চিত্তে উদ্রিক্ত হয়। "প্রভু কহে ঈশ্বর হন পরম স্বতন্ত্র, ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র।" কথাটা দাঁড়ায় এই যে, ঈশ্বর বেদের অপেক্ষা না করিয়াই চলিতে পারেন। বেদবিহিত কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কৃপা না মিলিতে পারে। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য' ! কেবল ভক্তির দ্বারাই আমাকে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—'ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়, প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বাক্য কয়।' তবে সর্ব্ব বেদের অভিধেয় যে বস্তু অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি তাহা মিলিবে কিসে ? প্রভু বলিতেছেন—"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" তাঁহার মতে সাধুসঙ্গ করিলে তাহার ফলে কৃষ্ণভক্তি মিলিবেই। প্রভু এ সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইল সাধন ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। ইহার তটস্থ লক্ষণ স্বরূপে সাধু-গুরুর আশ্রয়ে উপজয় প্রেমধন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১২শ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব ভগবানকে বলিয়াছেন, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না। আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহারা পরমানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। আপনি বাহিরে গুরুরূপে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিস্বরূপে সৎ-

প্রবৃত্তি উজ্জীবনের দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীভগবানের অশেষবিধ গুণের মধ্যে জীবের প্রতি তাঁহার কারুণ্য গুণই সর্ব্বপ্রধান। ভগবৎ-কারুণ্যের মাধুর্য্যের পরমবীর্য্য আবার গুরুরূপেই সর্ব্বাতিশয়িস্বরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। কারণ ভগবান্ সর্ব্বজীবের অন্তরে অবস্থান করিলেও বাহিরে গুরুর প্রকট-মূর্ত্তিকে আশ্রয় না করিয়া জীবকে তাহার অনাদিকাল-গ্রথিত অবিদ্যাময় কর্ম্মগ্রন্থি হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না। বাহিরে বন্ধন কাটিলে ভিতরেই বৃন্দাবন। বস্তুতঃ গুরুরূপে তাঁহার এই অনুগ্রহকে স্বীকৃতির পথেই অর্থাৎ গুরুর স্বরূপের উপলব্ধিসূত্রেই আমরা ভগবদুপলব্ধির উপযোগী চিত্তবৃত্তির উদ্দীপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হই—নতুবা ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর স্বরূপেও আমাদের পক্ষে নিগ্রহের কারণ স্বরূপেই প্রতীত হইয়া থাকেন। তিনি থাকেন পরোক্ষ। আমাদের পক্ষে তাঁহার অনুগ্রহ মিলে না। ফলতঃ ঈশ্বরের কৃপাতেই অজ্ঞ জীব সৎগুরুরূপে তাঁহাকে লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে। ঈশ্বরের কৃত এই উপকারকে স্মরণ করিয়া সে কৃতার্থতা অনুভব করে। গুরুর কৃত উপকারের স্মৃতি এইরূপে ভগবানের নিত্য স্মৃতি উদ্দীপ্তিতে তাঁহার প্রতি প্রেমভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়।

গুরুরূপী শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিবার পক্ষে গীতায় তিনটি উপায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা। প্রথমেই প্রণিপাত। অহংবুদ্ধিকে নিঃশেষে গুরুর পায়ে লুটাইয়া দেওয়া—তনু, মন, ধন, বাণী, তাঁহাকে সমর্পণ করাই এক্ষেত্রে প্রণিপাত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গুরুর চরণে সর্ব্বভাবে এইরূপে আত্ম-নিবেদন, ইহা সহজে লভ্য নহে। এটি অনুভবের দশা। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদরেণু ভূষণ করিয়া তনু যাহা হৈতে অনুভব হয়। মার্জ্জিত হয় ভজন সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, অবিদ্যা অজ্ঞান পরাজয়।"

বস্তুতঃ গুরুর পায়ে মাথাটি একবার ঠুকিয়া দিতে পারিলেই হইল। কিন্তু দিবে কে? চোখে যে আমাদের ঠুলি দেওয়া থাকে। যেখানে নির্ভর সেইখানে আমাদের নজর; আমাদের নজর সংসারে, আমাদের বাড়ী ঘরে। অপর সকল সম্বন্ধেই আমাদের ছাড়াছাড়ি। অন্য সকলেই আমাদের পর। কিন্তু ক্রম-পারম্পর্য্যে গুরুবীর্য্যের বিস্তার রীতিতে অধম জীবেরও দুর্গতি দূর হয়। গুরুর প্রতি প্রণতির ভাবটি অন্তরে জাগিলে সূর্য্যের উদয়ে কমলদলের মত আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহের উন্মেষ ঘটিতে থাকে। গুরু-কৃপার বীর্য্যে আমাদের মন প্রত্যক্ষভাবে ভগবৎ-মাধুর্যের স্পর্শ পায়। ভগবানকে আমরা আপন করিয়া অনুভব করি। কামনাবাসনায় সতত সন্তাপিত আমাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে একান্তঃ যিনি আপন তাঁহাকে পাইবার জন্য বেদনা মোচড় দিয়া উঠে। আমাদের জিহ্বাকে নাচাইয়া কাঁপাইয়া প্রশ্নের আকারে সেই বেদনা ব্যক্ত চায়। গীতায় ইহাকেই পরিপ্রশ্ন বলা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে মনের হইতে অবচেতন স্তর হইতে আমাদের অন্তরের আঁধার আলো করিয়া বেদনার বাঙ্ময় মূর্ত্তিতে পরিস্ফূর্ত্ত হইতে থাকেন গুরু নিজেই। অন্যকথায় শিষ্যের মনের মূলে গুরুর আত্মভাবের জীবন্ত স্পর্শই এই সব প্রশ্নের বীর্য্য স্বরূপে কার্য্য করে। গুরুরূপে জীবকে আপন করিয়া লইবার জন্য জগৎ-গুরু যিনি তিনি আকুল হইয়া পড়েন। সেই আকুলতার দোল শিষ্যের মনের মূলে গিয়া লাগে, পরিপ্রশ্নের আকারে শিষ্যের মুখ খুলিয়া দেয়। এইরূপে গুরুকৃপায় শিষ্য চিত্ত যতই নিষিক্ত হইতে থাকে ততই গুরুর পায়ে প্রণতিতে শিষ্যের প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় তাহার নিত্য স্বরূপটি বুঝিয়া পায়। 'বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষ পুলকোদ্গম চারু দেহাঃ'—চণ্ডীর স্তুতি-গীতি শিষ্যে সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি গুরু-পদাশ্রয়ের চিন্ময় সংস্পর্শে বিলুপ্ত হইয়া স্বরূপনিষ্ঠ "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" এই ভাবটি তাঁহার চিত্তে বলিষ্ঠ হইয়া ব্যষ্টিচেতনায় পরিব্যাপ্তি পায়। শিষ্য গুরুর চরণে প্রণতিতে বিশ্বাত্মদেবতার চরণে আত্মনিবেদনে জীবন সর্ব্বার্থে সঙ্গতিলাভ করে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরতত্ত্বের এই জ্ঞানে অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত, কূটস্থ-ভাবের কোন প্রশ্নই নাই। অবিতর্কলিঙ্গে ভগবানের এখানে প্রসাদ। "যদা পশ্য পশ্যতি রুক্সবর্ণং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" সে অবস্থায় অনিমেষ দৃষ্টিতে ঋষভ দেবতাকে প্রণতির আকৃতিতে দর্শন—সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে প্রকটভাবে তাঁহাকে পাওয়া। ভগবান্ সর্বৈশ্বর্য্য-বিনির্মুক্ত মাধুর্য্যে তখন আমাদের কাছে নামিয়া আসেন। তাঁহার এই নামিয়া আসাতেই প্রেম—"প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।" এইরূপে গুরুরূপী ভগবানকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার কৃপাশক্তি অনুমান প্রমাণের সংশয়াত্মক স্তরকে উজ্জ্বল করিয়া প্রত্যক্ষতার পরম বলে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৫তম শ্লোকে ভগবান্ এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অর্জ্জুন, এই জ্ঞান লাভ করিলে দেহাত্মবোধ সম্পর্কিত যেরূপ মোহে তুমি অভিভূত হইয়া স্বজনের মমতায় দূর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, তেমন মোহ তোমার পক্ষে আর দেখা দিবে না। তুমি প্রথমে দেব মনুষ্যাদি সকল জীবের শরীরস্থ আমাকে তোমার নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিবে, পরে সর্ব্বভূতকে আমার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবে। "যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি"—আমি নিজে তোমার ভিতরে, পরে বিশ্ববীজে। বস্তুতঃ প্রেমের সংস্পর্শে ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কিছুতেই শরীরকে ভুলিতে পারা যায় না। বিশ্বাত্ম-দেবতার সর্ব্বাত্মক সংবেদনটি গুরুর বিশেষরূপে প্রেমের মাধুর্য্য-বীর্য্যে প্রথমে আমাদিগকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে। অনুগ্রহকে অবলম্বন করিয়া বিগ্রহের প্রকাশ ঘটে। আমাদের হৃদয়ে আমরা চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবানকে পাই। পরে বাহিরে এই প্রাপ্তিজনিত পর্য্যাপ্তি বিস্তৃতি লাভ করে। গুরুর মধুর হাসিটি অধরে মাখাইয়া ভগবান্ আমাদের মনকে স্পর্শ করেন। আত্মদেবতার অখণ্ডৈকরস-মাধুরী আমাদের চিত্তকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে—খুলিয়া যায় সর্বত্র সর্ব্বভূতের উপাধিগত ভেদভাব বিলুপ্ত করিয়া মহাভাবের খেলা, রঙ্গময় দেবতার

অনঙ্গলীলা। ভগবৎকৃপার প্লাবনে আমাদের অনুভূতির দুকূল ভাসিয়া যায়। আমাদের অধ্যাত্মভূমি অর্থাৎ অন্তরে এবং অধিদৈব ভূমি বিশ্বপ্রকৃতিতে সেই প্লাবনে উচ্ছ্বসিত ঊর্ম্মিমালা ছড়াইয়া পড়ে—থাকে না কোন বিকার। কৃপা বিকার মানে না। দেহেন্দ্রিয়, মন-প্রাণ জুড়িয়া ভগবান জাগেন চিদাকারে। হৃদয়ের গভীর হইতে গভীরে—দহরপুরে বাজে তাঁহারই বাঁশরীর সুর, সবই মধুর। বহিঃ-প্রকৃতির ক্ষরভাব হইতে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বভাবের উজ্জীবন-ধর্ম্মে ভগবৎ-কর্ম্ম সুরু হয়। গোপনে তাঁহার আপন কথাটি আমাদের কাছে ব্যক্ত হয়—আমি তোমারই। তাঁহার চাতুরীর এই খেলা আমরা দেখিয়াছি। অর্জ্জুনের নিকট গুরুতত্ত্বকে প্রদ্দীপ্ত করিয়া আত্মভাবের স্বরূপটি তিনি প্রকট করিয়াছেন। বলিয়াছেন, তুমি আমাকে ভুলিয়াছ কিন্তু আমি তোমাকে ভুলি নাই। আমি চতুর্বিবংশতি যুগ পূর্ব্বে সূর্য্যকে অধ্যাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলাম, সেই আমিই আজ তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি। তোমাকে সেই পরমগুহ্যতত্ত্বটি শুনাইতেছি। প্রেমের টানে পড়িয়া আমি এমনই করি। অর্জ্জুনের মাধ্যমে নিত্য মাধুর্য্যে ভগবানের প্রমূর্ত্ত লীলাটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইয়াছে। অন্য পথ নাই। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত', প্রিয়তমস্বরূপে সেই পরমাত্মার উপাসনা করিবে। 'স য আত্মানমেব প্রিয়মুপস্তে ন হতস্য প্রিয়ং প্রমায়ূকং ভবতি' অর্থাৎ প্রিয়জনে ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তাঁহাকে প্রিয়রূপেই পাওয়া যায় এবং প্রাপ্তিও নিত্য। সুতরাং প্রিয়স্বরূপে ব্রহ্মের উপাসনাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম। কারণ যাহা স্বরূপগত নহে, তাহা নিত্য হইতে পারে না। কিন্তু নিজেদের প্রিয়স্বরূপে যাঁহারা ভগবানের ভজনা করেন না, ভগবানকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবার প্রেরণা তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ভগবানের নিকট হইতে দুঃখ-নিবৃত্তি আদায় করাই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে। এইজন্যই সৎগুরু বিচারের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। গুরুতত্ত্বের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে

ভাগবত বলেন—"স বৈ প্রিয়তম আত্মা যতো ন ভয়মন্বপি, ইতি বেদ ষ বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ"—ভগবান্ সকলের প্রিয়তম। তিনি সকলের আত্মা। তাঁহাকে পাইলে কোন ভয় থাকে না। এই তত্ত্ব যিনি অধিগত হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত গুরু এবং এমন গুরুই হরি। গুরুকৃপার প্রত্যক্ষতার পরম বলে ভগবানের আত্মমাধুর্য্য এমনই সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তভাবে খোলে। "তাঁর ঠাই তাঁর লীলা শুনি রাত্রিদিনে"—লীলার এই খোলামেলা ভাবটি গুরুর অনুধ্যানে অন্তরে না জাগিলে আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি কাটে না; সংশয় দূর হয় না। নিবৃত্তি আমরা পাই না। ভগবচ্চরণে প্রণতি আমাদের সত্য হয় না। "মন্নাথো শ্রীজগন্নাথো মৎগুরুঃ শ্রীজগৎগুরুঃ"—গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান আচার্য্যরূপে আত্ম-বীর্য্যের মাধুর্য্যে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতেই আমরা জীবনে পরম সম্বল লাভ করিয়াছি। আছেন আমাদের জন্য তিনি আছেন। অর্জ্জুনের যিনি দেবতা, আমাদেরও তিনিই আত্মদেবতা। ব্যথাটি তাঁহার বুঝিলেই হইল। আমাদের জন্য তিনি বিকারকে স্বীকার করেন, জাগেন বিকারী জীবকে বরণ করিয়া তাঁহার চিদাকারে। পাপী হইতেও যে পাপী, পাপিষ্ঠ যে তাহারও উদ্ধারকারী হইলেন গুরুরূপী শ্রীহরি। "হরের্গুরোশ্চরণাম্ভোজাস্ত্রং জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষং।" গুরুরূপ হরির চরণাম্ভোজে চিত্তকে যুক্ত কর। সেই চরণের অনুধ্যানরূপ অস্ত্রের দ্বারা তুমি আত্মমোহকর কামকে ধ্বংস করতে সমর্থ হইবে। ভাগবতে সনৎকুমার মহারাজ পৃথুকে এই উপদেশ দিয়াছেন।

তত্ত্বদর্শিগণের উপদিষ্ট জ্ঞানের স্বরূপটি হইল মায়াজাল হইতে জীবের মুক্তি এবং এই মুক্তি অর্থে পুরুষ-যোষিৎ আদি স্থাবর জঙ্গমে যিনি রস-স্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন তাঁহারই দর্শন-লাভ। গীতায় শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বটি সুস্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারভাগে ভগবান্ আমাদের মত বদ্ধ জীবকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—সকল পাপী হইতেও যদি তুমি অধিক পাপিষ্ঠ

হও, তথাপি জ্ঞানরূপ-পোতের দ্বারা তুমি দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে। এমন কথা শুনিলে, এমন কি অতি বড় পাপিষ্ঠ যে তাহার পক্ষেও জ্ঞানের পথ মিলে—ইহাই বুঝি না কি ? এমন কথা শুনিলে আমাদের বিস্ময়ের সঞ্চার হইবে ইহা স্বাভাবিক। কারণ জ্ঞান বলিতে আমরা সাধারণতঃ বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি সংসার-ত্যাগ সাধ্য যে সব সাধনাঙ্গ বুঝি, সেগুলি সুদুষ্কর। সুতরাং পাপী যাহারা, এমন কি অতি ঘোর পাপী তাহারাও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, জ্ঞানের নৌকা তাহাদের মিলে কোথায়? ভাগবতে ব্রহ্মমোহন-লীলায় এই রহস্যটি উন্মুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন যাঁহারা গুরুরূপ সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত অধ্যাত্ম বিদ্যারূপ সুনির্ম্মল চক্ষু লাভ করেন, তাঁহারা সকলের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপটি নিজেদের অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি অংশী, জীব তাঁহার অংশ, অংশ জীব অংশীস্বরূপে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সংসাররূপ সাগর অবশ্যই উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

প্রহ্লাদ দৈত্য বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কৃপার স্বরূপ প্রকট করিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"পরম পুরুষে আত্মসমর্পণই নিস্ত্রৈগুণ্যের লক্ষণ।" জ্ঞান বলিতে সেই বস্তুই বুঝায়। নরসখা ভগবান্ নারায়ণ এই জ্ঞানের সম্বন্ধে নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। তোমরা নারদের ন্যায় অধিকারী নহ, সুতরাং তোমরা সেই জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে না, এমন মনে করিও না। ভগবানের একান্ত ভক্ত অকিঞ্চন পুরুষদের চরণ-ধূলিতে যাঁহারা নিজেদের দেহ অভিষিক্ত করেন, যতই পাপী হোন, তাঁহাদের সকলেরই এই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। শুধু উত্তম পুরুষদেরই যে হয়, এমন নিয়ম নাই। মায়াবদ্ধ জীব আমরা। অহং-মমতার মোহ হইতে মুক্তিলাভের জন্য গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান গুরুকৃপারূপ এই জ্ঞানাসি আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। মহাবাহু শুধু অর্জ্জুনই নহেন আমরাও তাঁহার আদেশের মূলীভূত এই আত্মভাবের আগ্নেয়বীর্য্যে চিত্তকে উত্তপ্ত করিয়া গীতার তত্ত্বামৃত আস্বাদনে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাস যোগ

১। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

২। যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

৩। লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

৪। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

যোগের ক্রম

প্রহ্লাদ ভগবান্ নৃসিংহের নিকট মোক্ষ কামনা করেন নাই। তিনি বলেন, প্রায়শঃ মুনিগণ নিজের নিজের মুক্তি-কামনায় নির্জ্জন বনে গমন করেন। তাঁহারা মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন, পরন্তু পরার্থ-নিষ্ঠা তাঁহাদের নাই। দুঃখকষ্টে ম্রিয়মাণ জগতের জীবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। ইহাদের দুঃখ-ক্লেশ দূর করিবার জন্য আর কাহার নিকট প্রার্থনা করিব? আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ইহাদের পরিত্রাতা দেখি না।

ভাগবতে দেখিতে পাই, প্রহ্লাদ আরও বলেন, মৌন-ব্রত, বেদজ্ঞান তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম-ব্যাখ্যা, নির্জ্জনে বাস, জপ এবং সমাধি এইগুলি মোক্ষসাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এইগুলি প্রায়শঃ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের জীবনোপায় হইয়া থাকে। উক্ত সাধনাঙ্গসমূহ যাহাদের অন্তরে দম্ভের সৃষ্টি করে তাহাদের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না।

গীতার পঞ্চম অধ্যায় হইতে সন্ন্যাস এবং যোগ এই দুইয়ের মধ্যে বিচার-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। ১৮শ অধ্যায়ে ত্যাগের স্বরূপ নির্ণয়ের দ্বারা শ্রীভগবান্ এই প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যোগ বলিতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই মতবাদ গীতার কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। সংসার এবং সমাজের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জ্জনে গিয়া সাধনা করাকে সাধারণতঃ সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং জ্ঞানযোগের মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। গীতায় এইরূপ মতবাদের অনুকূল সিদ্ধান্ত মিলে না। পক্ষান্তরে পরমাত্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসের পথকে ভগবান্ ৫ম অধ্যায়ে দুঃখজনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং কর্ম্মফল সমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্মযোগের সাধনার দ্বারাই যে জীব অক্লেশে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে তিনি এই উপদেশ আমাদের প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ কর্ম্মের সন্ন্যাস বা জ্ঞানযোগ

এবং কর্ম্মযোগ প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু। কর্ম্মযোগীকেও কর্ম্মের মূলে ভগবদনুসন্ধানের পথে জ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে হয় এবং সেই পথে জ্ঞানী ও যোগী উভয়বিধ সাধকেরই নিজেদের অকর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উভয়বিধ সাধনার মধ্যে ভগবান কর্ম্মনিষ্ঠ সাধনাকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। যুক্তিও এক্ষেত্রে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। প্রকৃত ভগবন্নিষ্ঠ কর্ম্ম-সাধনাকারীর পক্ষে সুবিধা এই যে জ্ঞানের জন্য তাহাকে আর পৃথক ভাবে দুশ্চর সাধন-ভজন করা প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে মন এবং বুদ্ধি নিষ্ঠিত রাখিলেই জ্ঞান-নিষ্ঠায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। কর্ম্ম-সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সাধিত হওয়ায় কর্ম্মনিষ্ঠ সাধকের সাধন-মার্গ হইতে বিচ্যুতিরও কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু বিষয়াসক্তি হইতে মন-বিনির্ম্মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি জ্ঞানী, আমি সন্ন্যাসী, সাধক যদি এবংবিধ দাম্ভিকতা-পরবশ হন, তবে ভগবানে চিত্ত যুক্ত না হওয়াতে ভোগাসক্তিবশে তাহার পতন ঘটে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহ আত্মনিষ্ঠ অবস্থা লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে উন্মার্গগামী করে সেইরূপ বিষয়াসক্তিতে আকৃষ্ট মন ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করিলে আত্মানাত্ম বিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

গীতায় জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগকে শুধু শ্রেষ্ঠত্বই প্রদান করা হয় নাই, পরন্তু যাঁহারা পরম জ্ঞানী তাঁহাদের পক্ষেও জন-কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহাও সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। গীতোক্ত কর্ম্মযোগসিদ্ধ সন্ন্যাসের ইহাই তাৎপর্য্য। গীতার সন্ন্যাসে বা জ্ঞানযোগে প্রথমে পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি তৎপরে বিশ্বের সর্ব্বত্র সেই তত্ত্বের প্রমূর্ত্তরূপে বিলাসে চিত্তবৃত্তিকে অভিনিবিষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষাবগম নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভের রীতিই উপদিষ্ট হইয়াছে। "প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে" "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"—গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম, বা সর্ব্ব কর্ম্মফল সমর্পণমূলক সন্ন্যাস,

চিত্তের মূলে সর্ব্বতোব্যাপ্ত শ্রীভগবানের আত্মভাবের উপলব্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্তরে যিনি, বাহিরেও জাগিয়া রহিয়াছেন তিনিই। গীতার কর্ম্মমূলে কৃষ্ণ-লীলা 'উপর্য্যধঃ ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম।' ইহার একদিকে বৃন্দাবন, অপর দিকে বিশ্বভুবন। ফলতঃ কৃষ্ণ-প্রেমে চিত্তের উদ্দীপ্তিতে বিশ্বসেবা বা সর্ব্বজীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান এই উপলব্ধিতে জ্ঞান জীবের সেবারূপ কর্ম্মাঙ্গেই পরিপূর্ত্তি লাভ করে। সন্ন্যাসের মূলে চিত্তে ভগবদনুভূতির এই উদ্দীপ্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"—মনই বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্তি মনকে বন্ধনযুক্ত করে এবং এই আসক্তির নিবৃত্তিতে বন্ধনের মোচন ঘটে। মন যে অবস্থায় উন্নীত হইলে বিষয়াসক্তি বিবর্জ্জিত হয় এবং সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্ত নিত্য সত্যকে অনুভূতির উপযোগিত্ব লাভ করে, সে অবস্থা লাভেই গীতোক্ত সন্ন্যাসের সার্থকতা। প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্ত মনের এই উজ্জীবনটি শুধু সাধনাঙ্গের কতকগুলি প্রকরণ অবলম্বনের প্রয়াস-যোগে সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ তেমন প্রয়াসের মূলে অহঙ্কারের ভাবই বিদ্যমান থাকে এবং অহঙ্কারই বিষয়াসক্তির কারণ সৃষ্টি করে। অহঙ্কারের ফলে একদিকে দেহাত্মবুদ্ধি জাগ্রত হয়, অন্যদিকে তাহার গূঢ়গতি জীবকে ঈশ্বরের পারতন্ত্র্য হইতে বঞ্চিত করে। অহঙ্কারী জীব নিজকেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। ইহার ফলে জীব ভগবানের সহিত তাহার নিত্য এবং সত্য সম্বন্ধ হারাইয়া ফেলে। এই উভয় অবস্থাই গীতোক্ত যোগের বিরোধী। ইহারা যোগের পথে চিত্তবৃত্তির উজ্জীবনে সহায়ক নহে; পরন্তু ইহা জীবকে ভগবৎ-সম্পর্ক হইতে বিযুক্তির পথেই লইয়া যায়। ফলে জীব নিজের একান্ত অসহায়ত্ব অনুভব করে এবং তাহার জীবনের এই দৈন্য বা কার্পণ্যকে আশ্রয় করিয়া ভোগৈশ্বর্য্যের প্রসক্তিই ধর্ম্মের নামে তাহাকে অভিভূত করে। ব্রহ্মে আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যোগ। এই যোগ বা আত্মভাবটি উপলব্ধির মূলে ব্রহ্মস্বরূপে অহঙ্কারের প্রভাব হইতে জীবকে মুক্ত করিবার উপযোগী ভগবানের

ব্যক্তভাবটি জীবন্ত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা জীবের জড় মনের উজ্জীবন ঘটা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে শুধু মনের বিকারই চলে, কিন্তু কামাসক্তি হইতে মনকে উন্নীত করিবার উপযোগী ব্রহ্মের বৃংহণত্ব অর্থাৎ জীবের উজ্জীবনোপযোগী তাঁহার কারুণ্য সম্বন্ধে সাক্ষাৎসম্পর্কে আমাদের অনুভূতি জাগে না। আনুকূল্যের গ্রহণ এবং প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন—অধ্যাত্মজীবনের অগ্রগতি সাধনার অন্যতম প্রধান প্রকরণ। সুতরাং সংসারের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জনের প্রশ্ন এক্ষেত্রে স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। শাস্ত্র বলেন, বিষয় এবং বিষ এতদুভয়ের মধ্যে বিষয়ই সমধিক মারাত্মক, কারণ বিষ পান না করিলে কেহ মরে না কিন্তু বিষয়ের চিন্তা বা স্মরণের ফলেই জীবের সর্ব্বনাশ ঘটে। সংসার এই বিষয়াসক্তির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে এবং ভগবানের সহিত জীবের প্রতিকূল অবস্থা সত্য করিয়া তোলে। এ যুক্তির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সংসার হইতে দূরে থাকিলেই যে মনের এই প্রতিকূল অবস্থা দূর হয় এবং 'আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন'এর অবস্থা আমরা লাভ করি, একথাও বলা চলে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় জীবকে এ সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ প্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, কোন কারণে তাঁহাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রভুর শরণাগত হন। প্রভু এ জন্য শ্রীমৎ কাশীমিশ্রের নিকট দুঃখ করিয়া বলেন, "বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন। ইথে ইঁহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন।" কাশী মিশ্রজী ইহাতে বলেন, "সেই শুদ্ধ ভক্ত, তোমা ভজে তোমা লাগি। আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগভাগী। তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ। অচিরাতে মিলে তার তোমার চরণ।" নিম্নোক্তরূপ শ্লোকটি ভাগবতের—ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়া বলেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে

জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্। (ভাঃ ১০।১৪।৮)

কলির জীবের পক্ষে এই পথেই চিত্তবৃত্তির সমুন্নতি সম্ভব। ভগবানের করুণার প্রতি চিত্তের এইরূপ উন্মুখতা উপজাত হইলে বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত আনুকূল্যময় প্রতিবেশ আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। শ্রীলরঘুনাথদাস পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলে প্রভু বলেন, "গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্য না কহিবে, ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।" সাধকের প্রাপ্তিদশায় অর্থাৎ প্রাপ্য বস্তু শ্রীভগবানের চরণে চিত্তের একান্ত অভিনিবেশ উপজাত হইয়াছে এমন অবস্থায় এই উপদেশ। প্রাপ্তিদশাই সন্ন্যাসের অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে শান্তিপুরে প্রভু রঘুনাথকে মর্কটবৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে চিত্তকে যুক্ত রাখিয়া সংসারে থাকিতে উপদেশ করেন। তিনি বলেন, ভগবানে শ্রদ্ধা-বুদ্ধি অন্তরে লইয়া ধৈর্য্য সহকারে চলিলে ক্রমে তাঁহার কৃপায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীভগবানের কৃপার উপর নির্ভরতা অবলম্বন করিলে দেহাত্মবুদ্ধি ক্রমেই কমিয়া আসে। ইহার ফলে দেহ, ধন, জন, গৃহ, বিত্তাদি বিষয়ভোগের পিপাসাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ে উদরপূর্ত্তির প্রবৃত্তি হেয় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলেই দুঃখভোগ করিতে হইতেছে। সেই সব দুঃখভোগের পথে ভগবান তাঁহার কৃপার প্রতি আমাদের চিত্তকে জাগ্রত করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের প্রতি অনুগ্রহই করিতেছেন, ভগবৎ-কৃপার এইরূপ উপলব্ধিতে সংসারের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা জাগে এবং ক্রমে দেহের সুখ-দুঃখের সম্বন্ধে চিত্ত উদাসীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভের উপায়। ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দটি আমরা পাইয়াছি। পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের স্বরূপটি ভগবদুক্তিতে

পরিস্ফুট হইয়াছে। ফলতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় না। পরন্তু যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম এই উপলব্ধিই প্রয়োজন। প্রত্যুতঃ যিনি প্রকৃত যোগী মর্ত্ত্যদেহেই তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—,'এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (শ্বেতাশ্বতর—৪২।১৭)। বিশ্বের প্রতি কর্ম্মে এখানে অর্থাৎ এই মর্ত্ত্যধামেই ভগবানের সর্ব্বাত্মস্বরূপটি উপলব্ধির কথা বলা হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"তৃণে কাষ্ঠে গৃহে বিত্তে দ্রব্যে দেহে স্থিতো হরিঃ"—তুচ্ছ করিবার কি আছে? গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ের ২৬তম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম। অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥" বস্তুতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ আমাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে। যিনি জনক-যাজ্ঞবল্ক্য হইয়া আসিয়া আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, তিনিই মেথর হইয়া আসিয়া আমাদিগকে আদর করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া কাহাকে পূজা করিব, শূদ্র বলিয়া তুচ্ছ করিব কাহাকে? সবই তিনি। "অহঙ্কারী ভক্তিহীন ধরামাঝে সেই দীন"—নিজেদের অজ্ঞানতার জন্য ব্রহ্মকে নিকটে পাইয়াও আমরা পশুজীবনের দৈন্যভার বহন করিতেছি। বিষয়-বাসনা হইতে চিত্তকে নির্লিপ্ত করিবার পক্ষে কোন কোন আচার্য্য জীবাত্মার স্বরূপ চিন্তার উপদেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত-জীব চিৎকণ। এইরূপ আত্ম-স্বরূপের অনুচিন্তাসূত্রে বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করাই সম্ভবতঃ তাঁহাদের উপদেশের তাৎপর্য্য। জীবের স্বরূপগত অক্ষরভাবটির উপর এক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস-যোগের প্রসঙ্গে কূটস্থ বা অক্ষর-ব্রহ্মের এইরূপ নিষ্ক্রিয় বা নিঃশক্তিক ভাবকে প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। পক্ষান্তরে শ্রীভগবান তাঁহার সর্ব্বময় সশক্তিক ব্যক্তিত্বকেই আমাদের সাধ্যতত্ত্বস্বরূপে পরিস্ফুট

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কর্ত্তা এবং দেবতা একমাত্র আমি। আমিই যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। আমি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর। আমি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ। এইভাবে আমাকে জানিয়া সাধক শান্তি লাভ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের কারুণ্য এবং কল্যাণ-গুণের সমাশ্রয়েই জীব শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং তাহাতেই যে যোগ-সংসিদ্ধি ঘটে এই সত্যটি গীতায় অভ্রান্ত ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ কাম্যকর্ম্মের ন্যাসোপযোগী তাঁহার রসময় আনন্দময় সতত কারুণ্যপরায়ণ স্বরূপটিই আমাদের দৃষ্টিতে বিলসিত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানেই গীতোক্ত যোগের প্রতিষ্ঠা। প্রত্যুতঃ এই সম্বন্ধ এড়াইয়া তদুপলব্ধির প্রকরণ-স্বরূপে বহুলায়াস সাধ্য পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কোথায়ও উপদেশ দেন নাই। বস্তুতঃ আত্মা বা প্রিয়স্বরূপে ভগবানের সশক্তিক তত্ত্বটি জীবের প্রকৃতি-নিহিত। তাহা ছাড়িয়া অক্ষরতত্ত্বের সাধনার জন্য তাহাকে উপদেশ করাতে অন্য যাহাই হউক, ভগবানের সৌহার্দ্দ্য-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধটি শুষ্কজ্ঞান এবং বৈরাগ্যমূলক নহে, পরন্তু তাহা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুখকর। 'সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি' এই ভগবদুক্তিতে 'সুহৃৎ' শব্দটি প্রয়োগে এ সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ রাখা হয় নাই।

সকলের সুহৃৎ

ভগবান্ সকলের সুহৃৎ। গীতার ৫ম অধ্যায়ে ভগবানের এই উক্তি আমাদের অন্তরে একান্তভাবে আশার সঞ্চার করে, কারণ এ জগতে সুহৃৎ মিলে কোথায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব হেথা কোথা শান্তির আকার?" সুহৃৎ পাইলে শান্তিও মিলে। ভগবানের উক্তিতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ সম্বন্ধে আশ্বস্তি রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, আমি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ। কিন্তু সুহৃৎ কাহাকে বলে অর্থাৎ সুহৃদের স্বরূপ কি ইহা তো বুঝা প্রয়োজন! প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করিয়া যিনি নিরপেক্ষভাবে অপরের উপকার করেন, আচার্য্য শঙ্কর গীতার এই শ্লোকের ভাষ্যে সুহৃৎপদের সেইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ভাগবতে দেখা যায়, গোপীরা ভগবানের কাছে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাসলীলা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন—হে প্রিয়, জগতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর লোক যে ভজনা করে, তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকে, ভালবাসিলে ভালবাসে। আর এক শ্রেণীর লোক ভাল না বাসিলেও ভালবাসে। আর এক শ্রেণীর লোক তাহাদিগকে কেহ ভালবাসুক বা না বাসুক তাহারা কাহাকেও ভালবাসে না। এই তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে তুমি কিরূপ আমাদিগকে ভাল করিয়া বল। উত্তরে ভগবান্ বলেন, হে সখিগণ, যাহারা পরস্পরকে ভালবাসে অর্থাৎ ভালবাসিলে ভালবাসে তাহাদের ভালবাসার মূলে স্বার্থই রহিয়াছে; তাহাতে সৌহার্দ্দ্য নাই। যাহারা ভাল না বাসিলেও ভালবাসে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সুহৃৎ। আর এক শ্রেণীর লোক এইরূপ যে তাহাদিগকে ভালবাসিলেও তাহারা তাহাকে ভালবাসে না। ইহারা আত্মারাম, আত্মকাম অথবা অকৃতজ্ঞ এবং গুরুদ্রোহী। কিন্তু আমি পূর্ব্বোক্ত কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহি। আমাকে যাহারা ভালবাসে, আমার প্রতি তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমি তাহাদের দৃষ্টি হইতে

গোপন থাকিয়া তাহাদিগকে ভজনা করি। ভগবান্ গোপীদিগকে অনুরোধ করিয়া বলেন, আমি সকলের পরম কারুণিক এবং পরম সুহৃৎ। আশা করি, তোমরা আমার অন্তরের অভিপ্রায়টি উপলব্ধি করিয়া আমার দোষ দর্শন করিবে না।

রাস-পঞ্চাধ্যায়ে দেখা যায়, শ্রীভগবান্ রাস-রস-মাধুর্য্য জমাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই গোপীদের দৃষ্টি হইতে নিজকে অপসারিত করেন। ইহার ফলে তিনি গোপীদের ভজনাই করিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনের ফলে গোপীদের অন্তরে শ্রীভগবানের জন্য অনুরাগ উদ্দীপিত হইয়া উঠে। গোপীগণের অন্তরের উদ্দীপিত সেই অনুরাগে আপ্লুত হইয়া শ্রীভগবান্ গোপীগণের লীলামাধুর্য্য আস্বাদনে উন্মত্ত হন। গোপী-মাধুর্য্য আস্বাদনে শ্রীভগবানের সেই আকৃতিতে গোপীদের অন্তরে ভগবৎ-প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাঁহারা কৃষ্ণে পতিভাবের উপপত্তি-জনিত অভিমানে নিজেদের জীবন-যৌবন তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হন।

গোপীগণ কৃষ্ণ-প্রীতিপরায়ণা। তাঁহারা কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন। কাত্যায়ণী ব্রতে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের অনুরাগ স্বভাবতই ছিল। সুতরাং তাঁহাদের অনুরাগটি উদ্দীপিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্হিত হইবার কি প্রয়োজন ছিল, এই প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে ইহার উত্তর এই যে, কৃষ্ণের ইহাই স্বভাব। ভক্তের ভালবাসা তাঁহার পরম লোভনীয় বস্তু। এ বস্তু আস্বাদনের পিপাসা তাঁহার কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। তিনি অশেষ চাতুর্য্য-প্রয়োগে সেই প্রেম প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাহার মাধুর্য্য পান করিতে চাহেন। রাস-লীলার রসোদ্দীপ্তিতে তাঁহার নিজের এই প্রকৃতিই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

জীব শ্রীভগবানেরই শক্তি। তাঁহার প্রকৃতি। কৃষ্ণ পুরুষোত্তম, জীবও কৃষ্ণকেই চাহে। তিনিও তাঁহার প্রতি জীবের উদ্দীপিত অনুরাগ আস্বাদনে একান্ত ব্যাকুল। জীব অবিদ্যার প্রভাবে অভিভূত।

তাহার জড় জীবনে কৃষ্ণানুরাগানুভূতি উন্মুক্ত নয়। শ্রীভগবানের আত্মমাধুর্য্য আস্বাদনে জীব বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহার প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখীন। কিন্তু সেজন্য ভগবানের কৃপা-দৃষ্টি হইতে জীব বঞ্চিত হয় নাই। জীবকে আপন করিবার জন্য তিনি চিরন্তন বেদনা বহন করিয়া চলিতেছেন। অবিদ্যার প্রভাবে পড়িয়া জীব তাঁহাকে ভজনা করে না, কিন্তু ভগবান্ তাহাকে ভজনা করিতেছেন। ভগবান্ কর্ত্তৃক জীবের এই ভজনাতেই তাঁহাতে যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তৃস্বরূপত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে জীব তাঁহার জন্য যজ্ঞ বা তপস্যা করে না। জীবের জন্য ভগবানের যজ্ঞ এবং তপস্যায় তাপের ভাবটিই ভগবানের জন্য জীবের যজ্ঞ বা তপস্যার প্রবৃত্তির উদ্দীপ্তির মূলে কাজ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানই যজ্ঞের কর্ত্তা এবং তিনিই ভোক্তা। জীবের প্রতি অনুগ্রহের সর্ব্বতোময় স্বাভাবিক সংবেদনটি জীবকে তৎসম্বন্ধে সচেতন করে এবং সেই সংবেদনে স্বরূপধর্ম্মের উদ্দীপ্তিতে জীব তাঁহার সর্ব্বলোক-মহেশ্বর স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। বিশ্ব-প্রকৃতির সর্ব্বত্র ভগবৎ-প্রীতির উজ্জীবন-রীতিতে সর্ব্বলোক-মহেশ্বরস্বরূপে তাঁহার বিভূতি প্রমূর্ত্ত এবং পরিস্ফূর্ত্ত। স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ, লক্ষণ—'যঃ' এবং 'যাবান্' এই দুইয়ের সঙ্গতিতে শ্রীভগবানের প্রেম-মাধুর্য্যের এইখানে পরিপূর্ত্তি তিনি অন্তরে, তিনি বাহিরে, তিনি পরাবরে—চরাচরে।

যজ্ঞ বলুন, তপস্যা বলুন, এই দুইটির মূলেই থাকে তাপ, থাকে আগুনের খেলা। জীবের প্রতি প্রেমে ভগবান্ যজ্ঞমূর্ত্তি, জীব-প্রীতির অগ্নিতে তাঁহার নিত্য আকৃতি তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্মের রীতি। জীবের জন্য শ্রীভগবানের এই তাপ আমাদের মনের মূলে উদ্দীপ্ত হইলে তখন তাঁহার সম্বন্ধে ভাবের উদ্গম ঘটে। সংস্কারজনিত আমাদের হৃদয়ের সর্ব্ববিধ আবরণ তাঁহার সংবেদনে বিদ্রাবিত হয় এবং আমাদের সুহৃৎস্বরূপে তাঁহার খেলাটি হয় সুরু। ভাগবতে সনৎকুমার মহারাজ পৃথুর নিকট জীবের জন্য ভগবানের নিত্য সংবেদনের এই স্বরূপটি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ক্ষেত্রবিৎ জীবকে তপ্ত

করিবার উপযোগী তাপ লইয়া তাহার হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। এই আবির্ভাবে সর্ব্বভাবের প্রভাব। এই অবস্থায় জীব ও ভগবানের মধ্যে সম্বন্ধটি সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্ব ভাবের মূলে তাঁহার প্রীতির রীতি অনুভব করে। পৃথক্ পৃথক্ বহু ভাবের মূলে তাঁহারই অনুভাব বা কৃপার স্পর্শ পায়। যেখানে মন সেখানেই ঘটে তাঁহারই স্ফূরণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম, সর্ববত্র হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ, স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্ত্তি, সর্ববত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বোপাধিকে লয় করিয়া এই স্ফুরণ এবং তৎপ্রভাবিত দর্শনটি ঘটে। সর্ব্বভূতের সুহৃৎ-স্বরূপে তাঁহার সংবেদন তাঁহার দিব্যরূপটি মনের মূলে খুলিয়া দেয়। মনের মূলে অর্থই নয়নের মূলে,—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্কন্দ-সম্বন্ধে সমাত্ম-ছন্দে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের সমূহ আকৃতি নিবৃত্তি লাভ করে, সেই রূপে থাকে এমনই সমঞ্জসা সঙ্গতি। এই সঙ্গতিই মাধুর্য্যের স্বরূপে—"মাধুর্য্যং সর্ব্ব অঙ্গানাং চারু-সন্নিবেশঃ।" সুতরাং নরলীলার চিন্ময় বপুতেই সর্ব্বজীবের অয়ন স্বরূপে সে অবস্থায় সাধকের হৃদয়-শতদলে আত্মমাধুর্য্যে নারায়ণের আবির্ভাব ঘটে। ভক্ত কাম-বীজে মজিয়া নিজ ভাবে বিশ্ববীজস্বরূপ দেবতার অস্তিত্ব সর্ব্বত্র অনুভব করেন। "বহ্নিমধ্যে স্মরেৎ রূপমমৈতৎ ধ্যানমঙ্গলং'। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবে সর্ব্বতোব্যক্ত ভগবৎ-তত্ত্বের স্ফুরণের মূলে বিশেষের মধ্যে অশেষ, সীমার মধ্যে অসীমের সর্ব্বাতিশায়ী সংবেদন, ভক্তকে আত্মভাবে বরণের খেলায় পরম রহস্যরূপে প্রকটিত হয়। একের মধ্যে পৃথক্ ভাবের সম্মিলন-মাধুরীর সেখানে চাতুরী ফুটিয়া উঠে। জীবের মন সর্ব্বভাবে তাঁহার সহিত লগ্ন হয় এবং নিরবচ্ছিন্ন তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্যে স্বরূপধর্ম্মে জীব চৈতন্য লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্দর্শনের অর্থে ব্যাপকতার বিচারটি সাক্ষাৎসম্পর্কে এই অবস্থায় অনুভব হয় না; অনুভবটি থাকে বিন্দুগতভাবে আমাদের মনের মূলে তাঁহার আত্মভাবের সংবেদনে। সেই সংবেদনের ফলে মনোবুদ্ধির লয়ে ভগবৎ-

সত্তার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যে আমাদের অনুভূতিতে সমগ্র সম্ভূতি উদ্দীপ্ত হয়। বিশ্বাত্ম দেবতাকে সর্ব্বাত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া সে অবস্থায় ভেদভাব বিলুপ্ত হয় এবং সকলকে আপন করিয়া পাওয়া যায়। এই আপন করিয়া পাওয়াটি বুদ্ধির কার্য্য নয়—এখানে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-বীর্য্যই কাজ করে। মনের গভীর গহনে শ্রীভগবানের করুণার স্পর্শে দেহাত্ম-বুদ্ধির খণ্ডভাব বিদূরিত হয়। অন্তরের চৈতন্যময় অনুভূতির ধারার সঙ্গে জড় বহিঃপ্রকৃতি শ্রীভগবানের লীলায় অদ্বয় চিন্ময় রসে বিদ্রাবিত, একীভূত হইয়া পরিস্ফূর্ত্তি পায়। অধ্যাত্মে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে আমরা চিৎ-বিভূতিতে পাই, বাহিরে অধিদৈব-স্বরূপে সৃষ্টির মূলে তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিসম্পাতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া তদীয়তাময় ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করে। এই অবস্থায় বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল অনিত্যতার সহিত সংলিপ্ত হইবার উন্মুখতা বা প্রবণতা হইতে আমাদের মন মুক্ত হয়। আমরা শ্রীভগবানের সর্ব্বভূতের সুহৃৎ স্বরূপটির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি। আমরা তাঁহার অযাচিত প্রেমের উপলব্ধিতে দিব্যভাবে উজ্জীবিত হই। তাঁহার অফুরন্ত কৃপার প্রবাহে আমরা ডুবিয়া যাই। সে অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে আমরা তাঁহাকেই পাই। আমাদের জীবন তাঁহার যজ্ঞে এবং তাঁহারই তপস্যায় পরিণত হয়। জীবকে এমনভাবে আপন করিয়া পাইবার ব্যাকুলতাই গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং একান্ত আকুল এবং ব্যাকুল সেইরূপ সংবেদনই চাতুর্য্য বিস্তার করিয়াছে। গীতার উপদেশের অন্তর্লীন শ্রীভগবানের এই আত্মমাধুর্য্যের উন্মেষটি উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে শরণাগতিতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা ঘটে। তিনি সর্ব্বজীবের সুহৃৎ গীতার এই বার্ত্তাটিতে মৃত্যুময় জগতে আমরা অমৃতের পথ পাই।

ধ্যানযোগ

১। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥

২। সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥

৩। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

৪। যোগিনামপি সর্বেবষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

যোগাঙ্গের তরঙ্গ-ভঙ্গী

ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণ পদধ্যান, না শুনিও কথা আন্,
প্রেম বিনু অন্য নাহি চাও।"

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান্ ধ্যেয়স্বরূপে 'ধীমহি' গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য এই তত্ত্বের মূলে প্রেম-ভক্তির গতি এবং রীতিকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। বিষয়ান্তর হইতে চিত্তবৃত্তির এক বিষয়ে নিশ্চলতা উপলব্ধিই ধ্যান-সিদ্ধির লক্ষণ। আমাদের মন সদা সর্ব্বদা চঞ্চল। এই চাঞ্চল্য হইতে মনকে ছাড়াইয়া আনিয়া একটি বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত করাই ধ্যান। ধ্যানের ফলে অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যয়-প্রবাহে মন যুক্ত থাকে। সুতরাং ধ্যানেই যোগের পরিপূর্ত্তি। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, ক্রীড়া এবং সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তা অর্থাৎ মনের প্রকরণস্বরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটির পঞ্চবিধ গুণ - শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সম্বন্ধে সামঞ্জস্য বা দ্বন্দ্বহীন ছন্দোময় অনুভূতিযোগে উদ্দীপ্তিকেই ধ্যান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রূপধ্যান, ক্রীড়াধ্যান এবং সেবাধ্যানের পথে মনের নির্দ্বন্দ্ব ছন্দোময় অবস্থার ভিতর দিয়া কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের দিব্যানন্দের রাজ্যে মনের উজ্জীবন রীতিটি আমাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীর তৎপ্রণীত 'ক্রমসন্দর্ভে' বলিয়াছেন, প্রথমে ভগবানের নাম শ্রবণে অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয়। চিত্তবিষয়াদি মলরহিত হইলে ভগবানের রূপ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। রূপ-শ্রবণের দ্বারা চিত্ত তাঁহার রূপ স্ফুর্ত্তির যোগ্যতা লাভ করে। রূপের উদয় হইলে গুণ শ্রবণের জন্য অন্তরের উদ্দীপ্তি ঘটে। গুণ-শ্রবণে গুণের স্ফুর্ত্তি সাধিত হইলে তাঁহার পরিবারবর্গের বৈশিষ্ট্যের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

এইভাবে নামরূপ ও পরিবারবর্গের স্ফুরণ ঘটিলে লীলার অনুভূতি পরিপূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উপদেশের তাৎপর্য্যে যোগের অপরাপর প্রকরণের নিকৃষ্টতা বিনিশ্চিত হইয়াছে এবং সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবান তাঁহার নরলীলার রূপ, গুণ এবং মাধুর্য্যের রসে সমাহিত চিত্ত সাধককে অন্য সর্ব্বরূপ যোগ-প্রকরণ অবলম্বনকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অপরাপর যোগাঙ্গগুলির অবলম্বনে সাধনা বর্ত্তমান যুগে জীবের পক্ষে সুকঠিন ; অধিকন্তু তদ্দ্বারা জীবের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না। গীতার ভগবদুক্তিতে এজন্য সেগুলি নিরাকৃত হইয়াছে এবং দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া জীব যাহাতে তাহার স্বরূপধর্ম্মের উজ্জীবনোপযোগী ভগবৎ-মাধুর্য্য উপলব্ধির ধারাটি স্বাভাবিকভাবে ধরিতে পারে ভগবান্ তেমন উপদেশই গীতায় দিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম হইতে যোগাঙ্গের প্রকরণ-সমূহকে অবলম্বন করিয়া সাধনার বিস্তার করা হইয়াছে, ইহাই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সেগুলিকে প্রাধান্য প্রদান করা ভগবানের উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে যোগ অর্থটি এক্ষেত্রে সমধিক ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলতঃ শুধু ভগবৎ-লাভের পক্ষেই যোগ আবশ্যক নয় ; প্রত্যুত যোগ ব্যতীত জগতের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে না। সাধারণতঃ বিচার করিলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নামই কর্ম্ম ; সুতরাং কর্ম্ম মাত্রই যোগ। এই হিসাবে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি সাধননিষ্ঠ ব্যক্তিরাও যোগী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-গণেরাও যোগী এবং স্বর্গাদি ভোগৈশ্বর্য্য কামনায় যজ্ঞক্রিয়াদিতে প্রবৃত্ত কর্ম্মীকেও যোগী বলা চলে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাদের অবলম্বিত প্রকরণ-সমূহের লক্ষ্য ভগবানের সহিত যোগ নয়, পক্ষান্তরে বিয়োগ। নিজেদের স্বার্থের দিকেই সাধকদের সে সব ক্ষেত্রে দৃষ্টি থাকে। আমরা যদি এই শ্রেণীর সাধকদিগকে যোগীর অন্তর্ভুক্ত করি তবে উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায়কেই উদ্দেশ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভুল করিব। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে লাভ করা। গীতায় এই লক্ষ্যকে একান্ত এবং

জীবন্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্ম শুধু আদর্শবাদ নহে, তাহা ঈশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রতিপদে যদি আমরা নিজে কিসে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিব, শুধু এই বিচারেই প্রবৃত্ত থাকি, তবে জীবনে ঈশ্বরের স্থান স্বীকৃত হয় না। সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে টানিয়া আনিবার কোন প্রয়োজন থাকে বলিয়াও মনে হয় না। ফলতঃ আমাদের বন্ধন-মোচনের বিচারে এবং তৎ-প্রভাবিত জ্ঞান-বৈরাগ্যের দাপটে ঈশ্বরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি মুটেগিরি করিবার জন্য জগৎকে নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু আমরা বিশ্বব্যাপারে তাঁহাকে সেই পর্য্যায়েই লইয়া ফেলিতেছি। জগৎরূপী জেলখানা যে ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সম্মুখে পাইলে সেই মূর্খতা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য উপদেষ্টার ঔদার্য্য প্রদর্শন করিতে নিশ্চয়ই আমরা কুণ্ঠিত হইতাম না। আমরা জগৎ-ব্যাপারে তাঁহার দোষ ত্রুটি ধরিতেই সর্ব্বদা তৎপর। প্রত্যুত তাঁহার দিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার মত কিছুই আমরা জীবনে অনুভব করি না ঈশ্বরের এই সম্বন্ধ অন্তরে লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমাদের যোগের কথা না বলাই ভাল। তাঁহাকে আমরা ভক্তি না করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার জন্য আমাদের অন্তরে কিছু দয়া হওয়াও তো উচিত। তিনি আমাদের কেহ না হইলেও তাঁহার প্রতি মায়া-মমতা নিশ্চয়ই কাহারও আছে, নহিলে তিনি এতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার জন্য এই বিবেচনাটুকুও আমরা করি না।

ভগবান্ গীতার প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের কথাই প্রধানতঃ বলিয়াছেন এবং সেইপথে পরমাত্ম-তত্ত্বকে উপলব্ধি করাই এ ক্ষেত্রে যোগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই পথে যোগের লক্ষ্য কূটস্থ অক্ষরতত্ত্ব বা জড়ের বন্ধনবিনির্ম্মুক্ত স্বরূপ-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার পথে পরমাত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধিই গীতোক্ত যোগের শেষ কথা নয়, স্পষ্ট ইহাই বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপার প্রভাবটি মনের

মূলে অনুভবের উপযোগী প্রত্যক্ষতার বলে না জাগা পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য চিত্তের আভিমুখ্য উদ্দীপ্ত হয় না। এরূপ অবস্থায় যোগ-সাধনার জন্য যে কোন প্রকরণই আমরা অবলম্বন করি না কেন, সেগুলি তদ্ভাবগত হয় না অর্থাৎ সেগুলির সাহায্যে ভগবানে আমরা যুক্ত হই না। অনেকে যোগাঙ্গের প্রকরণ স্বরূপে প্রাণায়াম-কুম্ভকাদি কৌশলে চিত্তকে স্থির করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ প্রাণপাত তপস্যা বা কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেন কিন্তু তথাপি ভগবান যে কি বস্তু তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। এ সব ক্ষেত্রে তপস্বী হইবার জন্যই ইঁহাদের তপস্যা, সাধু হইবার জন্যই ইঁহাদের বৈরাগ্য বা সংসারত্যাগ। ভগবানকে ইঁহারা চাহেন না। কারণ তাঁহাকে চাহিতে হইলে যে বস্তুটি প্রয়োজন, ভগবানের জন্য সেই আগ্রহ বা উৎকণ্ঠা-বোধই তাঁহাদের অন্তরে জাগ্রত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে কঠোর তপস্যা বা যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধের জন্য তাঁহারা যে সময় অনর্থক ব্যয় করেন, সেই সময়টা আকুলভাবে ভগবানকে ডাকিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের রূপ, গুণ, তাঁহার কারুণ্য-লীলার অনুধ্যানে চিত্তের উদ্দীপ্তিতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রীতির উদ্রেক হয়। তাঁহার জন্য আমাদের মনে উৎকণ্ঠা জাগে। উৎকণ্ঠার ফলে আমাদের মনের মূলে আমরা তাঁহার ভাবময় প্রতিবেশ লাভ করি বা ভগবৎ-তত্ত্বে আমাদের চিত্তের অনুপ্রবেশ ঘটে। যোগ-সাধনের প্রকরণগুলি জীবকে আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী করিয়া তুলিতে সাহায্য করে ইহা সত্য, কিন্তু সেই সব উপায়ে অক্ষরতত্ত্বের উপলব্ধির দ্বারা জীবের বন্ধনমুক্তি ঘটিলেও ভগবৎ-তত্ত্বের পূর্ণত্ব জীব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। "রসো বৈ সঃ" অক্ষর-তত্ত্বের সাধকগণ ভগবানের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না। আনন্দ হইতে জীবগণ প্রাদুর্ভূত, আনন্দে সঞ্জীবিত এবং আনন্দেই জীবের পরিপূর্ত্তি—শ্রুতির এইসব বাণী এই সব সাধকের পক্ষে নিরর্থক হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে

অক্ষর-তত্ত্বের সাধকগণ শ্রীভগবানের অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহাদের দৃষ্টি আত্মজ্ঞানের নামে অক্ষর-তত্ত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বার্থ-প্রয়োজন সাধনের পরিচ্ছিন্ন মুগ্ধতায় আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। অক্ষরতত্ত্ব ব্রহ্মের অংশ, তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ নয়। জীব ক্ষুদ্র হইলেও সে অনন্তের অধিকারী। জীবনের দৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন সত্যকে সে অখণ্ডভাবে আস্বাদন করিতে চায়। এই ভাবে আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার আগ্রহ জীবের স্বরূপধর্ম্মে একান্ত এবং অত্যন্ত। তাহার আত্মসত্তা যাঁহাকে পাইলে নিত্য চৈতন্যময় হইয়া উঠে, জীব চায় রসময় এবং আনন্দময় এমন দেবতার বদান্যে উদ্ভিন্ন লাবণ্যময় সর্ব্বতোময় সংশ্রয়। এইপথে জীবের নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা এবং প্রাণের পরিপূর্ত্তি ঘটে। শ্রীভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৯শ, ৩০শ এবং ৩১শ শ্লোকে এই তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রাণ না দিলে প্রাণ মিলে না এবং প্রাণ না পাইলে শুধু বুদ্ধির কস্‌রতে মৃত্যুর ভয়কে কাটানো সম্ভব নয়। সুতরাং জীবের সাধ্যতত্ত্ব তাহার প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় সর্ব্বাঙ্গীণভাবে আত্মধর্ম্মের উজ্জীবক হওয়া প্রয়োজন। অভীষ্টে প্রাণসম্বন্ধে জাগে ধ্যান। প্রাণধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্যে সাধ্যতত্ত্বটি যজ্ঞবীর্য্যে প্রমূর্ত্ত না হইলে দান-ধর্ম্মে ধ্যানের পরিপূর্ত্তি ঘটে না। সে অবস্থায় মনের অবিচ্ছিন্ন গতিতে চৈতন্যে সংস্থিতি লাভ হয় না। গীতার দেবতা বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"। প্রকৃতপক্ষে কোন ভাবই সৎস্বরূপ তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা অনুভব করি না এবং অসৎ নামে প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু নাই। ফলতঃ দেহে আত্মবুদ্ধির জন্য অসতের সম্বন্ধে আমাদের প্রতীতি জন্মে মাত্র। ভগবৎ-কৃপায় এই ভ্রান্তি বিদূরিত না হইলে সৎ-বস্তুর সন্ধান মিলে না এবং জীবনের নশ্বরত্বের ভয়ে পড়িয়া জীবকে স্বার্থের সেবাতেই সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকিতে হয়। বন্ধন এবং মোক্ষ এই পাকচক্রে পড়িয়াই সে ঘুরিতে থাকে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মনের মূলে শ্রীভগবানের চৈতন্যময় সংশ্রয় লাভ করিতে হইলে তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। ভক্তি ব্যতীত অপরাপর যোগাঙ্গের আশ্রয়ে জীবের পুরুষার্থ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভগবান্ একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন দেখিতে পাই। তিনি স্বয়ং সে কথাটি বলেন নাই। অর্জ্জুনের মনে অন্যান্য যোগাঙ্গসমূহের সাধনার পথে সার্থকতালাভে সংশয়ের উৎপাদন করিয়া সেই সংশয়ের নিরসনকল্পে ভক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভাগবত বলিয়াছেন—"যৎ পরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।" ভগবান্ ভক্তের মুখ দিয়াই নিজের অন্তরকে ব্যক্ত করিতে ভালবাসেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকে দেখিতে পাই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—সর্ব্বত্র সমদর্শনের ভিত্তিতে তুমি যোগের যে প্রক্রিয়া উপদেশ করিয়াছ, মনের চঞ্চলতার জন্য আমার পক্ষে তাহা লাভ কিভাবে সম্ভব হইতে পারে বুঝিতেছি না। মনের নিগ্রহ সাধন বা মনের বশীকরণকে আমি চঞ্চল বায়ুকে নিগ্রহের মতই অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া মনে করি। সত্যই প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়সেবায় নিরত আমরা। আমাদের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিতেছে। আমাদের উপায় কি? আমাদের ব্যথা অন্তরে লইয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। ভগবান্ উত্তরে বলিলেন—মনকে বশীভূত করা কঠিন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা দুর্নিগ্রহ মনকেও বশীভূত করা যায়। বলা বাহুল্য ভগবানের এই উক্তিতে অর্জ্জুন তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, হওয়া সম্ভবও নহে। কারণ অভ্যাস বা বৈরাগ্য এই দুইটি উপায় মাত্র, উপেয় নহে। উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায় লইয়া মাতামাতি করা মূর্খতা মাত্র। কোন উপায়ের সম্বন্ধে আমাদের মনে সচেতন ভাবটি থাকা পর্য্যন্ত উপেয়ে চিত্তের সংস্থিতি ঘটে না। বিশেষতঃ আমরা অভ্যাস করিলেই সব সাধ্য বস্তু লাভ করিতে পারি কি? লম্ফদানকে প্রকরণস্বরূপে অবলম্বন

করিয়া অভ্যাস করিয়া কেহ আকাশে উঠিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে শক্তি অব্যক্তভাবে রহিয়াছে, অভ্যাসের প্রকরণটি তাহার পরিপূর্ত্তিমূলক অভিব্যক্তির পক্ষে উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। জীবের সহিত ভগবানের স্বরূপধর্ম্মে নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'সৎ, চিৎ, আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ'; জীবের লক্ষ্য হইল সচ্চিদানন্দ লাভ। আমরা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়াছি সত্য; কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ের জন্য আমাদের স্বরূপধর্ম্মের অবলুপ্তি ঘটে নাই। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই সচ্চিদানন্দ লাভের আগ্রহ এবং সেই আগ্রহের বিগ্রহস্বরূপ কৃষ্ণকে লাভ করিবার বেদনা লুক্কায়িত আছে। আমাদের স্বরূপধর্ম্মে নিষ্ঠিত এই কৃষ্ণসেবার সংবেদনের উজ্জীবন করাই সাধন-ভজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। "প্রেম্না হরিং ভজেৎ", "তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্"—শ্রুতির ইহাই নির্দ্দেশ। ফলতঃ কৃষ্ণ-সেবার উজ্জীবনের সূত্রেই শ্রুতি-স্মৃতি নির্দ্দেশিত পথে স্বরূপধর্ম্মে আমাদের প্রতিষ্ঠালাভটি অভ্যাস করা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং শম, দম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণার পথে যদি আমাদের চিত্তমূলে স্বরূপধর্ম্মনিষ্ঠিত সেই কৃষ্ণসেবার চিন্ময় আনন্দের সংস্পর্শই আমরা অনুভব না করি, তবে তেমন সাধন-ভজনের কোন মূল্য থাকে না। আমাদের অভ্যাসের পক্ষে তাহা উপযোগীও নয়—বৈরাগ্যলাভের পক্ষেও সেগুলি তেমনই অনুপযোগী। কারণ স্বরূপ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাসূত্রেই আমাদের চিত্তে বৈরাগ্যের বিকাশ হয়। বস্তুতঃ অন্যাপেক্ষার অবস্থা বৈরাগ্যের অনুকূল নয়। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট উপদেশ কালে বলিয়াছেন মদ্গতচিত্ত এবং আমার প্রতি ভক্তিমান্ যোগীদের পক্ষে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য মঙ্গলজনক নহে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যকে সাধনার মুখ্য লক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করিলে অহঙ্কারই প্রশ্রয় পায় এবং প্রতিনিয়ত বিবেক-বৈরাগ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপের ফলে নানাবাদ নিরসনে তর্কের প্রবণতা জন্মে। ইহার ফলে চিত্তবৃত্তি উদ্বেজিত হয়। যোগের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম-সংস্পর্শ অন্তরে অনুভব করা। এই সংস্পর্শ বলিতে

ভগবৎ-কৃপার অনুভূতিতে অন্তরে প্রদ্যোতিত অনাময় চিন্ময়রসের উপচিতিই বুঝিতে হয়। চিত্তবৃত্তির এইরূপ উদ্দীপ্তি প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার সাহায্যে লাভ করা যায় বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ চিত্তবৃত্তি-সমূহ বাহ্যক্রিয়া হইতে উপরত হইবার ফলে নিদ্রার অনুরূপ একটি বিশ্রাম সুখই অনুভূত হয়। তন্ময়তার মত একটা ভাব আসে। কিন্তু ইহা নিতান্তই অপরিচ্ছিন্ন এবং সাময়িক। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধ্যানরূপ যোগাঙ্গের মূলে অহঙ্কৃত সক্রিয়ভাবটি চিত্তে সংলিপ্ত থাকিলে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে ভগবৎ-তত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না। "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" এই নির্দ্দেশে শ্রীভগবান তাঁহার কৃপাতে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট রাখিতেই উপদেশ দিয়াছেন। সর্ব্বতোব্যাপ্ত এমন কৃপার প্রভাব। এই প্রভাবে সাধক সর্ব্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্ত হন। তিনি সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেন। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩১তম শ্লোকে শ্রীভগবান সর্ব্বভূতে তাঁহাকে এইভাবে দর্শন করিয়া ভজনের জন্য উপদেশ করিয়াছেন। 'যেই ভজে সেই বড়'—গীতোক্ত যোগের ইহাই তাৎপর্য্য।

কল্যাণকৃৎ—কে

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহারভাগে শ্রীভগবান্ কর্ম্ম হইতে যোগের ধারাটি অর্জ্জুনকে ধরাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সমস্ত কর্ম্মের মূলে সর্ব্বভূতের সুহৃৎ-স্বরূপে তাঁহার ভাবটি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিলে জ্ঞানের আলোক চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে ইহার পরে আসে যোগ। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈধী কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ভগবদনুভূতির এই আলোক যদি চিত্তকে স্পর্শ না করে তবে দেহাত্মবুদ্ধিজনিত চিত্তবৃত্তির বিক্ষেপ দূর হয় না তবে যোগের পথে চিত্তের জাগরণ ঘটে না। প্রকৃত-পক্ষে ভগবদ্ভক্তিই দেহাত্মবুদ্ধিকে নিরসিত করিয়া চিত্তকে যোগে সংস্থিতি দান করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবৎ-ভাবে চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া দেহাত্মবুদ্ধিজনিত সংক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ১০ম হইতে ১৪শ শ্লোকে কতকগুলি যোগাঙ্গের উপদেশ করিয়াছেন। কঠোর অধ্যবসায় বলে এই পথে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে এবং উপযুক্ত গুরুর উপদেশানুযায়ী সেগুলি অভ্যাস করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি সাধন করিয়াছেন, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির দ্বারা প্রাণ বায়ুকে নিরোধ করিবার কৌশল অধিগত হইয়াছেন, তাঁহারাই এই পথে অগ্রসর হইবার অধিকারী। কিন্তু এক্ষেত্রে অবিসংবাদিত সত্য এই যে, যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কৃপার প্রত্যক্ষ স্পর্শ মনের মূলে উপলব্ধি না হয় কোন উপায়ই কাজে আসে না। আমরা যোগের যত রকম কৌশলই অবলম্বন করি না কেন, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়। যোগাঙ্গসমূহের প্রক্রিয়া প্রতিপালন করিয়াও আমরা অন্তরে আলোক কিছুই পাই না—শুধু ঐগুলির অনুষ্ঠানজনিত অহঙ্কৃত একটি ভাব বড় বলিয়া বুঝিয়া আমরা আত্ম-প্রবঞ্চিত হই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মন, ইন্দ্রিয়সেবার জন্যই উন্মুখ হইয়া থাকে। ফলতঃ আমাদের চিত্তবৃত্তি

অনাসক্ত অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এরূপ অবস্থায় বাহ্য কর্ম্ম-সন্ন্যাস দুঃখেরই কারণ সৃষ্টি করে। 'সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তু-মযোগতঃ' ভগবান্ একথা বলিয়াছেন।

দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মন মুক্ত হইলে জীব তাহার সনাতন স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারে। 'দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা' এই বুদ্ধিই ভেদজ্ঞানের জনক। অহঙ্কারের সঙ্কীর্ণ প্রতিবেশ হইতে মুক্ত হইলে সর্ব্বত্র অভেদ দর্শন ঘটে। আমরা নিজকে তখন বিশ্ববীজে বিস্তারের মধ্যে পাই। মন অসতের সংশ্লেষ হইতে মুক্ত হইয়া সৎ-বস্তুতে নিষ্ঠিত হয়। ভাগবত বলেন, সৎস্বরূপে নিষ্ঠিত হইলে যোগী যে শুধু তাঁহার নিজের মনকেই সৎ বলিয়া জানেন তাহা নহে তাঁহারা জাগতিক সমস্ত বস্তুকেই সৎস্বরূপে উপলব্ধি করেন। গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ যোগ-যুক্তাত্ম সাধকের লক্ষণসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৯শ শ্লোক হইতে ৩২শ শ্লোকে এই সাধকের উত্তরোত্তর উন্নত অবস্থা লাভের ক্রমটি আমরা পাই। ফলতঃ শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার সেই অবস্থাটি আমাদের নিকট খণ্ড প্রতীত হইলেও খণ্ডভাবে নয়—অখণ্ডস্বরূপে। তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণ। সর্ব্বভূতের আত্মা-স্বরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে অখণ্ডভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার উপলব্ধি ঘটে। প্রথমে এই উপলব্ধি জীবের নিজ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বত্র সমাত্মভাব জাগ্রত করে। সাধক সে অবস্থায় নিজের আত্মাকে সর্ব্ব জীবের মধ্যে অবস্থিত এবং সর্ব্ব জীবে অবস্থিত আত্মবস্তুকে নিজের মধ্যে মিলাইয়া আপন করিয়া পান। ইহার পর আসে উপর হইতে কৃপার দান—ব্যাপ্তি-চেতনায় জীবের সংস্থান। অকলঙ্ক পূর্ণকল ভগবৎ-কৃপারূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্নালোকে চিত্তের জাগরণ ঘটে। সব বিকারের মধ্যে কৃপার সঞ্চারে সাধকের অন্তরের অন্ধকার দূর হয়। তিনি বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করেন। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে অখণ্ডৈকরসে তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন হইতে চায়। সর্ব্ববিধ বিকারের ঊর্দ্ধে অদ্বয় সত্যে তাঁহার চিত্ত সংস্থিতি লাভে উন্মুখ হয়। ইহার পরের অবস্থায় সর্ব্বত্র

ব্রহ্মদর্শন। নিজের আত্মা এবং সর্ব্বভূতের আত্মায় এক তিনিই—'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং' গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে ভগবান এই অবস্থার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন। 'ব্রহ্মার্পণং' মন্ত্রের এই অবস্থায় সিদ্ধিলাভ।

গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের উপসংহারে আসিয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির ধারাটি ভগবান অর্জ্জুনকে ধরাইয়া দিলেন—আত্মসংযমের সহজ সূত্রটি প্রকট করিলেন, বলিলেন, আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ হও। আমাকে আপন করিয়া লও। আমার কৃষ্ণলীলার ঔদার্য্য-মাধুর্য্য তুমি উপলব্ধি কর। তুমি কাম জয় করিতে সমর্থ হইবে। তিনি বলিলেন, যে আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করে সে সমস্ত প্রকার সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রত্যুত শ্রীভগবান্ এক্ষেত্রে তপস্বী জ্ঞানী কর্ম্মী আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধাতা যোগী ইঁহাদের সকলকেই সমভাবে নিম্নাধিকারীর পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন এবং ভক্তের মর্য্যাদাকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। 'যোগী ভবার্জ্জুন' বলিতে ভক্তিযোগের পথ অবলম্বনের জন্যই অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার আদেশ। কারণ অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৪০তম শ্লোকে অর্জ্জুনকে তাত বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রিয়ত্বের প্রগাঢ়তাই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং যোগসম্পর্কে অর্জ্জুন যাহাতে ভ্রমে না পতিত হন সেই দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। চিত্তের চঞ্চলতা হেতু জীবের পক্ষে জ্ঞানযোগ বা অক্ষরতত্ত্বের সাধনা দুষ্কর। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলে তবে জ্ঞান লাভ হয়। "জন্মান্তর-সহস্রেষু তপোজ্ঞানং সমাধিভিঃ নরাণাং ক্ষীণ-পাপানাং কৃষ্ণে ভক্তি প্রজায়তে"—বহু সহস্র জন্ম তপস্যা, জ্ঞান-যোগের পথে ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতির দ্বারা পাপ নাশ হইলে তবে জীবের কৃষ্ণভক্তি জন্মে। জীব যাহাতে স্বাভাবিকভাবে এবং সুগম পথে তাহার স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের মাধ্যমে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং শীঘ্র

ফলদাতৃত্ব জগতের নিকট উন্মুক্ত করিলেন। 'সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে আমরা গীতার দেবতার কথাই শুনিলাম—"স মে যুক্ততমো মতঃ"। আচার্য্য শঙ্করের প্রিয়শিষ্য আনন্দগিরি শ্রীভগবানের এই উক্তির সম্বন্ধে আমাদিগকে শুনাইলেন।—সিদ্ধসঙ্কল্প ভগবানের অভিপ্রায়ের কখনও অন্যথা হয় না। বস্তুতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অনন্ত মাধুর্য্য-বীর্য্যের ভাণ্ডারস্বরূপে জীবের উপেয়রূপে নিজেকে একটি অভিনব ভঙ্গীতে প্রকট করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই কৌশলটির রহস্য আমরা একটু ধীরভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। কামাসক্তচিত্ত আমরা। আমাদিগকে আপন করিয়া পাইবার জন্য তাঁহার বেদনাটি আমরা তাহার ফলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারিব। জয় দিব আমরা তাঁহার করুণার। আমাদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার ফন্দিটি এমনি চমৎকার।

এই অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে ভগবানের মুখে আমরা একটি কথা শুনিলাম, কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিলেন—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" অর্থাৎ কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কোন পুরুষেরই দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের জ্ঞানগুরু সক্রেটিসের মুখে এইরূপ কথাই জগৎ শুনিয়াছিল। বিষপানে মৃত্যুবরণ করিবার প্রাক্কালে তিনি বলিয়াছিলেন—No evil can befall on a good man either here or in the other world. গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানের মুখে এইরূপ আশ্বাস আমরা শুনিতে পাইয়াছি। তিনি বলেন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কোন প্রকার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় না এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয় বলিয়া বৈগুণ্য-জনিত প্রত্যবায়ের ভয়ও সে ক্ষেত্রে নাই। এমন কর্ম্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানেও মহাভয় হইতে জীব পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নিষ্কাম কর্ম্মের মূলে থাকা প্রয়োজন। অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। একথাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে

আমরা শুনিয়াছি। ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্তচিত্ত আমরা। আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্ক এবং সচেতন করিতে তিনি বিস্মৃত হইলেন না যে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের অন্তর ভরিয়া না গেলে আমরা তাঁহাকে পাইতে পারি না। আমাদের দুর্গতি থাকিয়াই যায়। অন্য সব যোগের পথে কামসম্বন্ধ রহিয়াছে, রহিয়াছে জন্ম-মৃত্যুর চক্রগত পরিণাম। সে সব ক্ষেত্রেই কালের অপেক্ষা থাকে। সিদ্ধি আমাদের মিলে। কিন্তু মিলে বহু কাল পরে, কত পরে কালের হিসাবে আমরা পাই না। শুধু অনেক অনেক জন্ম পরে সেই সব পথে সিদ্ধি মিলে। ভগবানের মুখে এমন কথাই আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে শুনি। ভরসা কোথায় ? যদি ভরসাই আমরা না পাই, দুর্গতিই আমাদের না ঘুচে, তবে অবস্থাটি আমাদের পক্ষে কল্যাণকৃৎ হয় কিভাবে ? চোখে আমরা দেখি আঁধার—দেখি মরণের উর্ম্মিমালার ভয়াবহ তরঙ্গ-বিস্তার, পাথারের উপর পাথার। যাহারা প্রীতির পথে ভগবানের সাধনা করেন, প্রেমের দেবতার কৃপা-স্পর্শের জন্য যাঁহারা প্রেম-ভক্তির কাঙ্গাল, তাঁহার জন্য অন্তরে যাঁহাদের আগুন জ্বলিয়াছে কালের অপেক্ষায় থাকা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসহ। দেবলোক ব্রহ্মলোক, প্রভৃতি উর্দ্ধলোকের ভোগৈশ্বর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি তাঁহাদের দৃষ্টিতে অতিমাত্র হেয় বিবেচিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহারা তেমন কামোপভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযোগী অবস্থাকে কল্যাণ-কার্য্যের ফলস্বরূপ মনে করিতে পারেন কি ?

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ভগবানের ভজনই কল্যাণলাভের প্রকৃষ্ট পথ। অন্যপথে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে" অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠাবুদ্ধি বা চিত্তের স্থিরতা লাভ করা যায় না, সুতরাং তাহা কল্যাণলাভের পথ নয়। যাঁহারা ভগবানকে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ভজনা করেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে 'কল্যাণকৃৎ' এবং তাঁহারা ইহলোক এবং পরলোক কোন ক্ষেত্রে দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ভগবদ্ভক্তিতে এই সত্যই অন্যবিধ যোগমার্গের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভগবানের দ্বারাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

গীতার কোন কোন ভাষ্যকার যোগভ্রষ্টগণ দুর্গতিগ্রস্ত হন না বলিতে তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হন না এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১২শ হইতে ১৫শ—"সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ" প্রভৃতি সূত্রে জীবের পরলোকে গমন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রণালী 'অনিষ্টকারিণাং চন্দ্রলোকাপ্রাপ্তি নিরসনাধিকরণাদি'রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে বেদবিহিতভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। তাহার ফলে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে নিষ্কাম ভাবটি লাভ হয়। এমনভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীরা দেবযান মার্গের অধিকারী। সকাম ব্যক্তিরা বেদবিহিত শ্রৌত এবং স্মৃতিশাস্ত্রের কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিলেও তাহাদিগকে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে পতিত হইতে হয়। ইহারা দেবযান গতির অধিকারী না হইয়া, দক্ষিণমার্গে গতিপ্রাপ্ত হয়। জীবের আরও একটি অবস্থা আছে। অনিষ্টকারী অর্থাৎ বেদবিহিত কোন কর্ম্মই যাহারা করে না এবং ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু-সংগ্রহের জন্যই জীবনে যত্নপর থাকে তাহারা দেবযান এবং পিতৃযান পথে যাইবার অযোগ্য। এইসব জীব বিবেক-বিচার-বিহীন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে কৃতকর্ম্মসকল দ্বারা পশুজন্ম হইতে স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—ইহারা "অসকৃদাবর্ত্তী" বা পুনঃপুনঃ জন্মমরণশীল। এই সব ক্ষুদ্র প্রাণিগণ মশক, ডাঁশ প্রভৃতি রূপে জন্মে ও মরে। দেবযান বা পিতৃযান উভয় পথের কোনটিতেই যায় না। ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর জীব—"জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়স্থানং—ইতি শ্রুতিঃ।" যোগভ্রষ্টদিগকে এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে না অর্থাৎ তাঁহারা দেবযান এবং পিতৃযান মার্গে গতি লাভ করিতে পারিবেন, কেবলমাত্র এই আশ্বাসটুকু দিয়াই কি ভগবান তাহাদিগকে কল্যাণকৃৎ বলিয়াছেন? কিন্তু আমরা ভাষ্যকারগণের সেইরূপ ব্যাখ্যার সহিত শাস্ত্রের সঙ্গতি দেখিতে পাই না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

'ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ॥
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ।
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥৫॥' (কেন ২।৫)

—যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে এই মনুষ্যজন্মে প্রাপ্ত না হইয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হন, তাহার মহতী বিনষ্টি ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাকে জীবনে সর্ব্বপ্রকার ব্যর্থতাই বরণ করিয়া লইতে হয়। এমন কি দেহান্তে তাহাকে পুনর্জ্জন্মে নীচ যোনিতেও জন্ম নিতে হয়। এই মনুষ্য জন্মেই যাঁহারা সর্ব্বভূতে সেই সনাতন সত্যস্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেন তাঁহারাই অমৃতত্ত্ব লাভে কৃতকৃতার্থ হন। অতএব শ্রুতি যাহাকে মহতী বিনষ্টি বলিয়াছেন—তাহাই কি আমরা "কল্যাণকর" বলিয়া মনে করিব এবং ভগবানের উক্তির তাৎপর্য্য সেইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে ? এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে গেলে তাহা ভগবদ্‌বাক্যেরই বিরোধী হইবে না কি ? গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভগবদুক্তি – "ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্" (২।৫৪) এবং সেই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক—"কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী" (২।৭০)। "ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের কামনায় যাহাদের চিত্তবৃত্তি বিক্ষিপ্ত হয়"—তাহারা ভগবানে মন নিবিষ্ট করিতে পারে না; সর্ব্বপ্রকার কামনা যাহাতে প্রবেশ করিলেও যিনি উদ্বেলিত হন না—তিনিই শান্তিলাভ করেন। কামভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ শান্তিলাভে সমর্থ হন না ইত্যাদি গীতা যে শ্রুতি বিরোধী নহে, তাহা তো সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। "সর্ব্বোপনিষদগাবো" গীতা সম্বন্ধে এই বাক্য অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

ভাগবতে দেখা যায় ভগবান্ নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে প্রেয় বা ভোগসুখদ বর প্রদানে উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ বলেন—"যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাং স্ত্বং বরদর্ষভ, কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরং" অর্থাৎ যদি নিতান্তই আমাকে আমার অভিলষিত বর প্রদান করেন তবে আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি, যেন আমার

হৃদয়মধ্যে কামাঙ্কুর উৎপন্ন না হয়। হে প্রভো, কাম উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ, তেজ স্মৃতি এবং সত্য সব নষ্ট হইয়া যায়। স্বভাবত কামে আসক্ত আমাকে এইরূপ বর দ্বারা প্রলুব্ধ করিবেন না—"তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতাঃ"। আমি কামসঙ্গে ভীত নির্ব্বিণ্ণচিত্ত এবং মুক্তিকামী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ভগবান্ আমাদের সঙ্কট কি বুঝিতেছেন। অর্জ্জুনও তাঁহাকে তাহা নিবেদন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং এতৎসম্বন্ধীয় ভগবদুক্তি সেই দিক হইতেই বিচার করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে রুদ্রাদিত্যাদি সাধনপর যোগিগণের পক্ষেই যোগভ্রষ্ট হইবার প্রশ্ন দেখা দেয়। আচার্য্য শঙ্করও ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৭তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় সেইরূপ অর্থই করিয়াছেন। দেবতান্তর সেবা-পরিত্যক্ত শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত যোগীর ভয়ের কোন কারণ নাই তিনিও ইহাই বলেন। ভগবদুক্তিতেও তাহাই সমর্থিত হয়। ভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ের ২২তম শ্লোকে বলিয়াছেন, অন্য দেবতার উপাসকগণ সেই সেই দেবতার নিকট হইতে আমার দ্বারাই কাম্যবস্তু লাভ করে। সুতরাং যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের ঊর্দ্ধলোকে গমন এবং ধনীদের গৃহে জন্মলাভ প্রভৃতি অধিকারভোগ কামাসক্তিজনিত অন্য দেবতার উপাসনার ফলেই ঘটিয়া থাকে, বুঝিতে হয়। ইঁহারা অনিষ্টকারী না হইতে পারেন, কিন্তু ইঁহারা যে কল্যাণকৃৎ ইহা বুঝিব কি ভাবে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন, না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ।" প্রভুর উক্তি—"কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে, কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে।" ফলতঃ তাঁহার ভজনপরায়ণ সাধকগণ সকল যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কল্যাণের এই সুনিশ্চিত পথ নির্দ্দেশ করাই গীতার দেবতার উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে সেই সাধকগণ সর্ব্বাংশে কল্যাণকৃৎ। তাঁহাদের দ্বারাই বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হয়। ভাগবতে শ্রীকরভাজন

ঋষির উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধূনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"

অর্থাৎ দেবতান্তর ভজনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণ ভজনপরায়ণ প্রিয় ভক্তের দৈবাৎ কোন পাপ উপস্থিত হইলে হৃদয়স্থ ভগবান্ সেই পাপকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠাই গীতার অভিপ্রায়। ভগবান্ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১তম শ্লোক হইতে ৪৫শ শ্লোকে যোগভ্রষ্টদের স্বর্গলোকপ্রাপ্তি, সদাচারশীল এবং ধনৈশ্বর্য্যবানের গৃহে জন্ম অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যোগীপুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণ প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সবই সকাম এবং অনেক জন্ম সাধন-সাপেক্ষ; সুতরাং জন্ম-কর্ম্ম-বন্ধনজনিত সংক্লেশকারক এই পথ। এইরূপ পথে চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয় বা তৎপ্রতি কোনরূপ অনুরাগের ভাব জাগে এমন উপদেশ, আর্ত্তজনের প্রতি বিশেষভাবে তাঁহার একান্ত প্রিয় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইতে পারে না। কারণ এগুলি প্রেয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রেয় নহে। অর্জ্জুন তাঁহার নিকট শ্রেয়প্রার্থী হইয়াছেন, প্রপন্ন হইয়াছেন সেজন্য—"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে"। বিশেষভাবে স্বর্গাদি ফলজনক এবং ভোগ ও ঐশ্বর্যলাভের উপযোগী জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদ কর্ম্মের প্রশংসাকারীদিগকে ভগবান নিজেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৩শ, ৪৪শ শ্লোকে অবিপশ্চিৎ বা অবিবেকী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। প্রত্যুত শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বের অনুভূতিতে সর্ব্ব-ভাবে চিত্তবৃত্তির উদ্দীপ্তি-জনিত ঐকান্তিক, এবং আত্যন্তিকভাবে তাঁহার অনুগতিতেই ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্" —ভক্তি-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় ভগবানকে

পাওয়া যায় না ; যুক্ত অবস্থা লাভ হয় না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তৎ প্রণীত ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, 'সকাম-নিষ্কাময়োর্দ্বয়োরপি কর্ম্মণো নিন্দা ভগবৎ-বৈমুখ্যাবিশেষাৎ', অর্থাৎ ভগবৎ-বৈমুখ্য থাকিলে সকাম এবং নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মই সাধকের পক্ষে নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভক্তিযোগকেই গীতোক্ত সাধনায় প্রকৃত যোগের মর্য্যাদা দান করিয়া শ্রীভগবান্ অন্যবিধ যোগের অপকৃষ্টতা, অনুপযোগিতা, তদনুষ্ঠানে সাধন-সঙ্কট এবং তৎ-সম্পর্কিত শঙ্কার সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ হইতে বিভ্রষ্ট, বিমূঢ় ও নিরাশ্রয় যোগী সংচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় কি বিনষ্ট হইয়া থাকেন—ইহাই ছিল অর্জ্জুনের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মূলীভূত কারণ শঙ্কার বা সন্দেহের যাহাতে নিরসন ঘটে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপসংহার শ্লোকে সেই সত্যটি ভগবান অর্জ্জুনের নিকট বিনিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যোগিনামপি সর্বেবষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখেও আমরা শুনিলাম—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নাহি বল॥"

(চৈঃ চঃ, মধ্যঃ ২২অঃ)

জীবের সঙ্গে যোগ

"সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি"—ইহাই গীতার প্রথম ষট্‌কের সার কথা। আমাদের পক্ষে বড়ই আশা, বড়ই ভরসার এ কথা। প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত উপদেশের অপূর্ব্বত্ব এবং চমৎকারিত্ব এমন আশ্বাসে। গীতার অধ্যায়গুলি সাধনার স্তর-পরম্পরাসূত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে। গীতোক্ত উপদেশগুলি অনুধাবন করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এটি সুস্পষ্টভাবেই আমাদের চোখে পড়ে যে পারম্পর্য্যের এই বিন্যাসচাতুর্য্যে গীতার দেবতা "অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়" —অলঙ্কার শাস্ত্রের এই রীতি কোন ক্ষেত্রেই অতিক্রম করেন নাই। অনুবাদ কি, বিধেয়ই বা বলিব কাহাকে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী ইহা বুঝাইয়া বলিয়াছেন।

"বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত,
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ,
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সংবাদ"।

গীতার দেবতা নিজেই বিধেয় অর্থাৎ তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্বের অনুবাদ-স্বরূপে সম্মুখে হাজির রহিয়াছেন। এমন প্রত্যক্ষ সত্যের উপরই গীতার ভিত্তি। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জ্জুনকে যুযুধান আত্মীয়-স্বজনগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া স্বজনের নিধনাশঙ্কায় তিনি অর্জ্জুনের চিত্তে আর্ত্ত-ভাব উদ্দীপ্ত করেন। এই সূত্রে আত্মার সনাতনত্বের বিশ্লেষণ-মূলে গীতোক্ত উপদেশের বিন্যাস এবং বিস্তার সুরু হয়। আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের এই রীতিটি তিনি নৈর্ব্যক্তিক রাখেন নাই অর্থাৎ "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ", সর্বসম্বন্ধবিহীন এইরূপ জীবাত্মার স্বরূপটি তিনি অর্জ্জুনের নিকট উন্মুক্ত করেন নাই। জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনার মূলে—

"ভগবান সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় কয়,
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়"।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত জীবের সাধ্যতত্ত্বের অনুবাদস্বরূপে তিনি নিজে প্রমূর্ত্ত থাকিয়া উপদেশ করিয়াছেন। তিনি নিজেকে দূরে রাখেন নাই। নিজেকে জড়াইয়া লইয়াছেন। অর্জ্জুনকে তিনি নিজের সমাত্ম-সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি, তুমি এবং রাজগণ পূর্ব্বে ছিলেন না এরূপ নহে, পরেও যে থাকিবেন না, ইহাও নয়। আমরা সকলেই এখন যেমন আছি, তেমনই পরেও থাকিব।' এইরূপে যজ্ঞেশ্বরস্বরূপে কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞানল তিনিই যে প্রজ্বলিত করিয়াছেন ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। অর্জ্জুনের প্রতি সতত ক্রিয়মান তাঁহার সংবেদনটি তিনি তাঁহাকে ধরাইয়া দিলেন। অর্জ্জুনের ভিতর যজ্ঞেশ্বর-স্বরূপে অবস্থান করিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, ইহা বুঝাইয়া দিলেন। কামবীজস্বরূপে তিনি যে অর্জ্জুনকে নিজবীর্য্যে ধারণ এবং পোষণ করিতেছেন ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, নিজে যিনি সর্ব্বসাধনার বিধেয়স্বরূপ—অনুবাদরূপে তিনি স্বয়ং নরবপু ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আজ উপস্থিত। এই প্রত্যক্ষতার পরম বীর্য্যটি অর্জ্জুনের অন্তরে গূঢ়ভাবে আগে উপ্ত হইল। পরে প্রশ্নোত্তরের পারম্পর্য্যসূত্রে মধুসূদনের মুখ-মারুতে গীতাধর্ম্ম উদ্গীত হইতে থাকিল। সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ঘাঁটি এই পাকা করিবার পথে কোন ত্রুটি রাখা হইল না। কারণ সম্বন্ধটি পাকা না হইলে যে খটখটি থাকিয়া যায়। সর্ব্বোপনিষদের সার গীতোক্ত সত্যের প্রতিষ্ঠা করাই চলে না। বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বাত্মদেবতার সংযোগসূত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে। সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বন্ধনের শঙ্কার সৃষ্টি হয়। কর্ম্মে বন্ধনের বিভীষিকা জাগে। বিশ্ব-কর্ম্মে বিশ্বেশ্বরকে আমরা পাই না। একান্ত অসহায়ত্ব আমাদের জীবনকে অভিভূত করে। গীতার দেবতার সর্ব্বতোময় সংবেদনে অর্জ্জুনের মনের মূলে শ্রীভগবানের আত্মসম্বন্ধের ছন্দোময় রূপটি খুলিয়া গেল। কর্ম্মের মূলে যজ্ঞেশ্বর দেবতা তাঁহার মাধুর্য্যের বীর্য্য উন্মুক্ত করিলেন যজ্ঞপুরুষ স্বয়ং। "সাক্ষাৎ সঃ যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ"—বর্ণ বা বাক্‌ভঙ্গীর তাপ ছড়াইয়া সাক্ষাতে অর্জ্জুনকে আত্মভাবে সংস্থিত করিলেন। তিনি

বলিলেন, প্রজাপতি সৃষ্টির প্রারম্ভেই জীবগণের চিত্তে শ্রীভগবানের সহিত তাহাদের স্বরূপ ধর্ম্মগত সনাতন সংবেদনটি যজ্ঞবীর্য্যে উপ্ত করিয়াছেন। কর্ম্ম অর্থই যজ্ঞ এবং যজ্ঞ অর্থই যজ্ঞেশ্বর যিনি বিশ্বাত্মদেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন। যজ্ঞে বিশ্বাত্মদেবতার সহিত সংযোগসূত্রে জীবের সনাতন জীবনের প্রতিষ্ঠা। প্রেমরাজ্যের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা, ডিক্টেটরী সেখানে অচল। ভগবান্ চাহেন জীবকে এবং জীব চাহে ভগবানকে। এই পরস্পরের চাওয়াটি যথার্থ হয় যজ্ঞে। ভগবান্ জীবের জন্য যজ্ঞ করিতেছেন, জীবকেও সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া শুনাইলেন, হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, কারণ আমার কোন বস্তু অপ্রাপ্য নাই, তথাপি আমাকে অবিরত কর্ম্ম করিতে হইতেছে। আমি কর্ম্ম না করিলে লোকসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তোমাদিগকেও এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইতেছে। যজ্ঞের প্রবৃত্তি তোমাদের মধ্যে সনাতন এবং সেই প্রবৃত্তি আমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এইভাবে জীবের সহিত আমার নিত্য সম্বন্ধ। তোমার সমস্ত কর্ম্মে আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানল উদ্দীপ্ত হইলে আমার প্রতি তোমার প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। আমার বিশ্বকর্ম্মে তুমি আমার লীলাসঙ্গী হইবে। এইরূপে তুমি আমার ভজনযোগ্য পরাভক্তির অধিকারী হইবে। ভগবান বলিলেন, এইরূপ আমার যে ভক্ত, সে আত্মধ্যানপরায়ণ তপস্বীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর অপেক্ষাও সে শ্রেষ্ঠ এবং পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কর্ম্মীর অপেক্ষাও সে শ্রেষ্ঠ। গীতার দেবতা অর্জ্জুনের নিকট প্রথম ষট্‌কে এই সম্বন্ধতত্ত্ব প্রকট করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের ভাষায়—তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন—"আমিই সম্বন্ধতত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান, আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম"। ভক্তিযোগের সুরু হইল এইভাবে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতার নির্দ্দেশের মধ্যে কোন ঘোর প্যাঁচ নাই। গীতার দেবতা নিজে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উপদেশ দিয়াই খালাস হন নাই। তিনি নিজে আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দিয়াছেন।

আমাদের জন্য সতত সংবেদনময় তাঁহার সক্রিয়স্বরূপ তিনি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানের সাধনায়, কর্ম্ম এবং যোগের উপদেশে সর্ব্বত্র ভগবৎ-কৃপার সর্ব্বাত্মক সংশ্লেষটি সমগ্র গীতার্থে উন্মেষিত হইয়াছে। গীতার দেবতার উপদেশের অন্তর্নিহিত আমাদের সহিত তাঁহার নিত্য প্রত্যক্ষ সম্পর্কের এই ভাবটি উপলব্ধি না করিলে গীতাভাষ্যে বিকৃতি ঘটিবে ইহা স্বাভাবিক। "ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ। স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন" —ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় গাতার সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

গীতার মায়াবাদী ভাষ্যকারগণ জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্মের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শুধু জড়ের বন্ধন হইতে মুক্তিকেই লক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং জ্ঞান বলিতে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' ইহাই তাঁহাদের পক্ষে প্রতিপাদ্য হইয়াছে। গীতার কর্ম্ম যজ্ঞমূলক। ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। বস্তুতঃ ভগবৎ-বোধশূন্য মাত্র বিচারের দ্বারা কর্ম্মে অসঙ্গত্বের ভাব দর্শন করিলে আমরা কর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারি না। কারণ কর্ম্ম করিতে গেলে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। আমি কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্ম ভগবানকে অর্পণ করিলাম, একথার কোন অর্থ হয় না। কারণ কর্ম্ম করিয়াছি আমি, সুতরাং ফলভোগ আমাকেই করিতে হইবে। প্রত্যুত ভগবৎ-কর্ত্তৃত্ব দর্শন-যুক্ত যে অসঙ্গ-বোধ তাহাই কর্ম্মফলের ভোগকে নিরস্ত করিতে পারে। শ্রীভগবান্ এজন্য কর্ম্ম-সন্ন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্যটি উন্মুক্ত করিতে গিয়া কর্ম্মযোগের অবতারণা করিয়াছেন। সন্ন্যাসে অহঙ্কারের ভাবটি সর্ব্বদা সজাগ থাকে, কিন্তু ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীভগবানে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হওয়াতে অহঙ্কৃত ভাব আপনা হইতে বিলুপ্ত হয়। ফলতঃ গীতা কোন ক্ষেত্রেই কর্ম্ম ত্যাগের জন্য স্বযত্নকৃত প্রয়াস সমর্থন করে নাই; বিশ্ব-জীবনের সহিত বিরোধের ভাব আমাদের চিত্তে জাগায় নাই। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি", "সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং"— ইহাই গীতার কথা। সমস্ত কর্ম্মের মূলে এমন ব্রহ্মোপলব্ধি মায়াবাদ-

সম্মত নয়। বিশ্বকর্ম্মের মূলে শ্রীভগবানের সংবেদন রহিয়াছে, ইহাই বেদান্তসম্মত সত্য; কিন্তু বেদান্তসম্মত এই সিদ্ধান্ত মায়াবাদিগণের অন্তরকে স্পর্শ করে না। সর্ব্বগত ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি পূর্ণ নহে। তাঁহাদের লক্ষ্য স্ব-বিমুক্তি অর্থাৎ স্বার্থ। ভগবানের বেদনায় তাঁহাদের চিত্ত আর্দ্র হইবার নয়। বিশ্বের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার মত তাঁহারা কিছু পান না। মায়াবাদী অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কেহ কেহ এই কথা বলিয়া থাকেন যে ভগবানের স্বরূপ আমাদের মন এবং আমাদের বুদ্ধির অগোচর। ভগবৎ-প্রাপ্তির অবস্থা ভাষায় অব্যক্ত, সে যে কেমন পাওয়া এবং কি পাওয়া ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শুধু 'আমি'—'আমিই সেই' এই ভাষাতেই সে অবস্থা কিছুটা ব্যক্ত করা সম্ভব। ভগবৎ-সম্বন্ধে একাত্মতার পরম নিগূঢ় ভাবের এমন অব্যক্ততা বা আমাদের ভাষায় অভিব্যক্ত করিবার সামর্থ্যের অভাবের এমন যুক্তি আমরাও বুঝিতে পারি। কিন্তু সেইরূপ একাত্মভাবে বিশ্বের সহিত সর্ব্বভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধ ছন্দোময়, আনন্দময় হইয়া উঠিবে এবং অনাত্মসৃষ্টি কোথাও থাকিবে না ইহাই শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্ স আত্মা"—(ছান্দোগ্য) আমাদের অন্তরস্থ আত্মাই সর্ব্বভূতস্থ আত্মা—প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত এই সত্যের উপর প্রকৃত অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

এক্ষেত্রে অধিকার ভেদের কথা উঠে। মনোধর্ম এবং প্রাণধর্মের বিচার উপস্থিত হয়। মন জ্ঞানমুখী, প্রাণ ভক্তিপরবৃত্তিযুক্ত এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু মন এবং প্রাণের সংযোগ ব্যতীত চোখ আমাদের খোলে কি? যোগ বলিতে আমরা যে বস্তু বুঝি, তাহার সত্যকার সম্ভোগ হয় কি? বস্তুতঃ মন বা বুদ্ধির প্রাখর্য্যের যুক্তিতে প্রাণকে যাঁহারা গৌণ করিতে চাহেন, হৃদয়কে তুচ্ছ করিয়া বুদ্ধিই যাঁহাদের কাছে বড় তাঁহাদের অনুভূতিতে জড়ত্বের চেতনা থাকেই এবং যোগ তাঁহাদের পক্ষে উদ্যোগ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। চোখের জল দৃষ্টিকে অন্ধ করে, এমন যুক্তি ভুল। পক্ষান্তরে সে জল মন

এবং বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিয়া আমাদের দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়াই তোলে। প্রাণের সঙ্গে মনের যেখানে মিলন, সেখানেই প্রজ্ঞার জাগরণ ঘটে। আমাদের স্মৃতি স্বরূপধর্ম্মে উদ্দীপিত হইবার সুযোগ সেখানেই পায়। এইভাবে জীবনের মূলে আমরা সর্বভাবে সঙ্গতি, পরিপূর্ত্তি বা পূর্ণের অনুভূতি লাভ করি। সৃষ্টির রহস্য এই অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। মনের উপর প্রাণের নিরাবরণ কম্পনের প্রতিফলনেই অপাবৃত সত্য আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। নতুবা সৃষ্টিতে শুধু অনিষ্টই অনুভূত হয়। সৃষ্টিকে উৎসাদন করাই ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য—আমরা ইহাই সত্য বলিয়া বুঝিয়া লই। আমি কর্ম না করিলে সৃষ্টির ধ্বংসের কারণ ঘটে। এজন্য আমাকে সদাসর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইতেছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ২৩শ এবং ২৪শ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ এ কথা বলিয়াছেন—মায়াবাদমূলক যুক্তির জোরে আমরা এই ভগবদুক্তির সর্ব্বভাবে বিরুদ্ধতা করিতেই তৎপর হইয়া পড়ি। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাণই মনের বল: প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই মনের খেলা। মন খোলে মেলে প্রাণেরই দোলে। প্রাণের নির্ভর মনের উপর। প্রাণই মনের ঘর। প্রাণের টান না থাকিলে মনের স্থান কোথায়? মনের ধর্ম্ম আকর্ষণ, প্রাণের ধর্ম্ম—দান, বরণ, আলিঙ্গন। প্রাণের স্পর্শ না পাইলে মন শুধু এদিকে ওদিকেই চলে এবং ছুটাছুটি তাহার মিটে না। এই সঙ্কট অতিক্রম করিবার জন্য করুণাপরায়ণ ভগবান্ তাঁহার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইতে গীতায় আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মের মূলে প্রাণময় জাগ্রত ভগবানের সন্ধান গীতায় মিলিয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে তাঁহার কৃপাই আমাদের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনীয়। ফলতঃ আমরা প্রাণহীন এজন্য আমরা আমাদের জীবনের মূলে ভগবানের সর্ব্বতোময় দানের স্পর্শ অনুভব করি না। আমাদের জীবন ইহার ফলে হয় দৈন্যময়। এই দৈন্যভার অন্তরে লইয়া আমরা আমাদের বুদ্ধি-বিচারের যতই অহঙ্কার

করি না কেন, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যান-ধারণা সকল পথেই আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে এবং ইন্দ্রিয়সুখের পাকচক্রে পড়িয়া সংসার-বন্ধন আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

গীতার দেবতা আমাদিগকে আপন করিয়া লইবার জন্য তাঁহার বদান্যলীলায় প্রজ্ঞানঘন লাবণ্য বিস্তার করিয়াছেন। অত্যদ্ভুতক্রম-পরাক্রমশীল গীতার সেই শিক্ষা—সে শিক্ষার শক্তি সর্ব্বাতিশায়ী এবং সর্ব্বজয়ী। "অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শোন উতরোল, লহ প্রেম হৃদয়ে ধরিয়া"—এইটুকুরই যাহা অপেক্ষা। গীতার দেবতার করুণায় আমাদের অন্তর গলিয়া গেলে আমাদের সম্মুখেই তাঁহাকে আমরা পাইব। তিনি আমাদের দিকে বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। গীতার সাধনাঙ্গে আমাদের প্রতি তাঁহার এই অন্তরঙ্গ ভাবটি সর্ব্বত্র তরঙ্গিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত কোন ক্ষেত্রেই আমাদের ছাড়াছাড়ি নাই। আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমাদিগকে চাহেন, এমনই তাঁহার আদর। তিনি আমাদের সুহৃৎ "সমপ্রাণঃ সুহৃন্মতঃ" অর্থাৎ তিনি আমাদের সমপ্রাণ। আমাদের সহিত প্রাণধর্ম্মের এমন প্রদ্দীপ্তিতেই তিনি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর। সুখে দুঃখে আমাদের সঙ্গীস্বরূপে আমাদের ঘরে থাকিয়াই চরাচরে তাঁহার বিভূতি বিলসিত। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যকে জড়াইয়া রহিয়াছে। এই মাধুর্য্যই গীতার বীর্য্য।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ আমাদের সকলের সুহৃৎ, এই সত্যটি অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের জীবনের পরম প্রয়োজন সিদ্ধির পথটি আমাদের নিকট প্রশস্ত হইয়া পড়ে। আমাদের যোগ-সংসিদ্ধি লাভের অবস্থাটি আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়। ভগবানের প্রতি স্বভাবতই আমাদের চিত্তে নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি জাগে; 'শমো মন্নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিঃ দম ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ' - এই দুইটি স্বাভাবিকভাবে আমাদের চিত্তে উপজাত হয়। ভগবান্ কপিল জননী দেবহূতির নিকট যোগতত্ত্ব উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আমি যাহাদের আত্মার সদৃশ প্রিয়, পুত্রবৎ, সখা, গুরু,

সুহৃৎ এবং ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজ্য আমার কালচক্র তাহাদের কিছুই করিতে পারেনা। বস্তুত কাল এবং মায়া এই দুইটির আবেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্ত করিতে পারিলে নিত্য সত্যের স্বরূপটি আমাদের অনুভূতিতে পরিস্ফুর্ত্ত হইয়া উঠে। 'স্বে মহিম্নি' ভগবানের আত্মমাধুর্য্যের রাজ্যে আমাদের চিত্ত তখন অনুপ্রবেশ করিবার উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় কামনা-বাসনা জীবকে আর স্পর্শ করিতে পারে না এবং মনুষ্যদেহেই হয় আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন লাভ ঘটে। 'জ্ঞানং অভেদ দর্শনং।' শ্রুতি বলিয়াছেন—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" আচার্য্য শঙ্কর বলেন—"কামাশ্চ সর্ব্বে শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্মনাং ফলানি তত্ত্যাগে চ বিদুষঃ ধ্যাননিষ্ঠস্যানন্তরমিব শান্তিঃ।" এই অবস্থা লাভের উপায়টিও ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেণ পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" বিষ্ণুপুরাণে ভক্তবর প্রহ্লাদের মুখে আমরা এই আত্মানুভূতির প্রকৃতির পরিচয় পাই। তিনি বলিয়াছেন—"বিস্তার সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণো বিশ্বমিদং জগৎ। দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ।" এই সমাত্মের উপলব্ধিতেই যোগের সংসিদ্ধি। অনাত্ম বস্তুর উপাসনা হইতে চিত্ত ঔপনিবৃত্ত হইবার ফলে সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপে পরমাত্মতত্ত্বের উজ্জীবন ঘটে। শাস্ত্রে আছে 'অনাত্মদর্শনেনৈব পরমাত্মানমুপাস্মহে' অর্থাৎ আত্মার অদর্শন দ্বারা আমরা পরমাত্মার উপাসনা করি। সুতরাং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনই পরমাত্মাকে উপাসনার উপায়। জীবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধিতে পরমাত্মার উপলব্ধি। জীবাত্মার উপলব্ধি ব্যষ্টি শরীরে। পরমাত্মা কেবল কূটস্থস্বরূপে আমাদের প্রত্যেকের শরীরেই অবস্থান করেন না, শরীরের বাহিরেও তিনি সর্ব্বত্র আছেন। তিনি সর্ব্বব্যপী। সমদর্শনের সার্থকতা যিনি সর্ব্ব-ভূতের আত্মা তাঁহার দর্শনে। এমন দর্শনের মূলে প্রিয়স্বরূপে আত্মতত্ত্বের উজ্জীবন-ধর্ম্মই কাজ করে। ভগবান্ আত্মা। তিনি সকলের প্রিয়। তাঁহাকে প্রিয়ভাবে উপাসনা করিলে তিনিও আমাদিগকে প্রিয়স্বরূপে

পাইতে চাহেন 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি'—প্রীতির সম্বন্ধে পারস্পরিক এই রীতি। ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন—"মর্য্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ।" যিনি সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া নিজে কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কপিলরূপী ভগবান্ বলিয়াছেন সেইরূপ সমদর্শী পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আর তিনি কাহাকেও দেখিতে পান না। গীতার প্রথম ষট্‌কের উপসংহারে ভগবান্ তাঁহার সহিত জীবের এমন আত্মসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আমাদের স্বরূপটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। ভগবানের দিকে আমাদের দৃষ্টি গেল, সকলের যিনি সুহৃৎ কেমন তাঁহার রূপ? 'স্বরূপ বিহনে রূপের উদয় কখনো সম্ভব নয়।' ফলতঃ আমাদের স্বরূপের উপলব্ধিসূত্রে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বুঝিলে তবে তাঁহার রূপটি আমাদের দৃষ্টিতে খোলে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বস্তুটি আমাদের মিলিল। এইবার শ্রীভগবানের রূপ, রস এবং মাধুর্য্যের রাজ্যে অনু-প্রবেশের আমাদের অধিকার আমরা লাভ করিব। তাহার ফলে তাঁহার আকর্ষণে আমরা পড়িব। আমরা 'মদ্গতেনান্তরাত্মনা' হইব। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কৃপায় শুনিয়াছি, 'পরমাত্মার আত্মা কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস'; কেমন সে কৃষ্ণ বুঝিব এবং তাঁহার রূপে রসে আমরা মজিব।। ভক্তি-যোগের পথে এই ভাবে শ্রীভগবানের সমগ্র স্বরূপের উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিবে।

দ্বিতীয় ঘটক

জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ

১। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
মযি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

২। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

৩। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

৪। সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

সপ্তম অধ্যায়

কৃষ্ণ পরতত্ত্ব

ভাগবত বলেন, "স বৈ প্রিয়তমো আত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।" শ্রীভগবান্ সকলের আত্মা। তাঁহাকে লাভ করিলে সর্ব্বভয় দূরীভূত হয়। ভগবানের এইরূপ স্বরূপত্ব উপলব্ধির পথেই জীবের পরম পুরুষার্থ বা জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে যিনি এমন শক্তিসম্পন্ন 'যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্ত্বা'। সুতরাং যিনি যেভাবে ভজন-সাধন করিবেন তিনিই ভগবৎ-কৃপা লাভ করিবেন, কারণ সব পথই ভগবানের পথ। এইরূপ ধারণায় জীবের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। গীতার দেবতা বহু মতবাদের এই বিভ্রম হইতে আমাদের চিত্তকে মুক্ত করিয়াছেন এবং সাধ্যের স্বরূপটি তিনি সুনিশ্চিত করিয়াছেন। গীতার মতে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী এই চার প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানকে ভজনা করেন। ইহাদের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার প্রতি একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন জ্ঞানীকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বহুজন্মের সাধন-বলে শেষজন্মে সাধক সমুদয় জীব-জগৎ বাসুদেব এইরূপ জানিয়া প্রপন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করেন। এইরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্ল্লভ। সকল দেবতাই শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতিরূপে সাধকের স্ব স্ব অধিকারোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, সর্ব্বোপনিষদসার গীতা শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক পক্ষে গীতোক্ত এই সিদ্ধান্তের দ্বারা অন্য দেবতাকে হেয় করা হয় নাই, কারণ অন্য দেবতাকে হেয় করিলে ভগবানেরই বিভিন্ন স্বরূপকে হেয় করা হয়। "ঈশ্বরে ভেদ করিলে হয় সর্ব্বনাশ।" বস্তুতঃ গীতায় সর্ব্বদৈবততত্ত্বস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই পরম সাধ্যতত্ত্বে প্রমূর্ত্ত করিয়া বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সাধন করা হইয়াছে। "একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার
কৃপাতে করিল নামের অনেক প্রচার।"

ভগবান্ কর্ত্তৃরূপে তাঁহার অনন্ত নাম লোকের বিভিন্ন রুচি অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, "তত্র অখিলনামেব ভগবন্নাম্নাৎ কারণ্যান্যভবন্" এক কৃষ্ণ হইতেই ভগবৎ-সম্বন্ধে নাম-সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহার সকল নামই একার্থবোধক। সুতরাং সকল ভগবৎ-মন্ত্রের সাধনাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। তথাপি গুরু প্রদত্ত 'নিজ' এবং 'প্রিয়' নামযুক্ত মন্ত্রের সাধনার দ্বারাই শীঘ্র জীবের স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎ-মন্ত্র সর্ব্ব ক্ষেত্রেই সমান শক্তিসম্পন্ন। তথাপি উপাসকের ক্ষুদ্র ফল প্রাপ্তি কেন ঘটে, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মন্ত্রের এইরূপ ফলটি ঔপাধিক অর্থাৎ মন্ত্রসাধকের রুচি পরিতৃপ্তি করিবার জন্যই ঘটিয়া থাকে। মথুরায় কংসের রঙ্গভূমিতে এক শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন রসের বিষয়রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। এইরূপ মন্ত্রোপাসকের রুচি অনুসারেই শ্রীভগবান্ বিশেষ ফল দান করেন। এইভাবে মন্ত্রের স্বাভাবিক ফল হইতে উপাসক বঞ্চিত হয়। কামাসক্ত জীব মন্ত্র-সাধনায় নিজের প্রবৃত্তির বশে আগন্তুক হিসাবে আগমাপায়ী অর্থাৎ অনিত্য এবং অসত্য ক্ষুদ্র ফল প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ সদ্‌গুরুর আশ্রয়ই এই দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তিনিই শিষ্যের চিত্তকে কামনা-বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবানের নিত্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। নানা দেবতার উপাসকগণ অভীষ্টসেবায় প্রবৃত্ত অবস্থায় যদি কোন পরম ভাগবত মহতের কৃপা লাভ করেন, তবেই তাঁহাদের শ্রীভগবানে চিত্তের অহৈতুকী ভক্তির উদ্রেক ঘটা সম্ভব হইয়া থাকে। তাঁহারা সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করেন। গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রে চিত্তবৃত্তি অভিনিবিষ্ট হইলে তাঁহার আত্মভাবের সংবেদনে উজ্জীবিত মন্ত্রশক্তিযোগে শ্রীভগবানের নিজ

সম্বন্ধটি জীব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের মনন-সূত্রে বা অনুধ্যানে তাদৃশ সাধক ভগবানকে প্রিয় করিয়া পায়। মন্ত্রার্থের এই প্রিয়ত্বের অনুভূতি তাঁহাকে সংসার হইতে মুক্তি দান করে। বস্তুতঃ বিশেষ মন্ত্রের আশ্রয়ে প্রিয়ত্বানুভূতির উদ্দীপ্তি সূত্রে ভগবানের সকল নামেই সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত মহিমায় অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বে তাঁহার গুণ এবং লীলা জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে পরিপূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরতত্ত্বে এই অভেদ-দর্শনেই গীতোক্ত জ্ঞানযোগের প্রতিষ্ঠা—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি —ধনঞ্জয়", "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে," "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ" "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ" "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্" "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গীতায় জীবের জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার সতত সংবেদনশীল কর্ম্মময় সর্ব্বোত্তম সাধ্যস্বরূপটি প্রকট করিয়াছেন। সর্ব্বাবতারের অবতারীস্বরূপে তাঁহার কারুণ্য-মাধুর্য্যটি জীবের চিত্তবৃত্তিতে গ্রাহ্য পরমবীর্য্যে তিনি উন্মুক্ত করিয়াছেন। গীতায় বলা হইয়াছে, যাঁহারা বিভিন্ন অভিলাষ লইয়া বিভিন্ন অধিকার-বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা করেন, সেই সকল দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিস্বরূপে উপলব্ধি না করিলে তাঁহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করিয়া থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর তৎকৃত গীতা-ভাষ্যে বলেন, অন্য দেবতার উপাসকগণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করেন। কৃষ্ণই যজ্ঞের একমাত্র প্রভু, তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা। তাঁহারা যথাযথ তাঁহার এই স্বরূপটি অবগত নহে এজন্যই অজ্ঞতাপূর্ব্বক বিভিন্ন দেবতার পূজা করিয়া যজ্ঞের ফল লাভ হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু তাঁহার পূজক বৈষ্ণবগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। দেবতা পূজকগণের আয়াস সমান হইলেও তাঁহারা অজ্ঞতাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরায়ণ না হওয়াতে ক্ষুদ্র ফল লাভ করেন।

শ্রীধরস্বামীপাদ তাঁহার গীতাভাষ্যে বলেন, যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত

অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করেন ইহা সত্য ; কারণ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-কারণ-কারণ। তিনি স্বয়ং ভগবান এবং সকলের চরমগতি, এজন্য সকল উপাসনা শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু অন্য দেবতার উপাসকগণ মোক্ষপ্রাপকবিধি ব্যতীত ভজনা করেন, এজন্য তাঁহাদিগকে সংসারে গমনাগমন করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, অক্রূর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিকালে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, আপনি সর্ব্বদেবময়, যাঁহারা অন্য দেবতার ভক্ত তাঁহারা নিজ নিজ উপাস্য দেবতাতে আপনা ভিন্ন অন্যরূপে, 'ইনিই ঈশ্বর', এইরূপ ভেদবুদ্ধিতে ভজনা করেন। তথাপি তাঁহারা সকলেই আপনারই উপাসনা করেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কেহ বলেন, আমরা শিবের পূজা করি, কেহ বলেন, আমি সূর্য্যের পূজা করি, কেহ বলেন, আমরা দেবীর পূজক। সুতরাং অন্যান্য দেবতাতেই তাঁহাদের মতি থাকে। তাঁহারা সর্ব্বস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করেন না। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ানুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যকার শ্রীমৎ-শুকদেব তাঁহার 'সিদ্ধান্ত প্রদীপে' বলিয়াছেন—"যদ্যপ্যন্যধিয় ইতি বুদ্ধিমাত্রভেদো, ন বস্তুভেদ ইতি যদুক্তং তদ্‌যুক্তমেব" এবং বস্তু-স্বীকারে "উপাস্যোপাসক-বুদ্ধিভেদাসম্ভবাৎ" অর্থাৎ এই শ্রেণীর অন্য দেবোপাসকদের ভেদবুদ্ধিবশতঃ মূলবস্তুস্বরূপ সর্ব্বাশ্রয় ভগবৎ-তত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ সে সব ক্ষেত্রে উপাসকদের অর্চ্চনা শ্রীভগবানেই গিয়া পৌঁছে। অর্চ্চনাসমূহ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অর্চ্চনাকারীগণ পরম তত্ত্ব-স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হন না ব্যাপার এইরূপ। এজন্য অন্য দেবতার অর্চ্চনা অবৈধ এবং তাহার ফল অন্তবৎ বা বিনাশধর্ম্ম-সম্পন্ন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেবতার মন্ত্রলিঙ্গের অনুধ্যানের পথে পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সর্ব্বতোময় আত্মভাবটি অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্যে চিত্তে উদ্ভিন্ন হইতে পারে না সুতরাং সে উপায়ে

জীবের পরমার্থও সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ অপরিচ্ছিন্ন এই আত্মতত্ত্বে প্রমূর্ত্ত কৃষ্ণলীলার উপলব্ধিই গীতোক্ত যোগের বৈজ্ঞানিক ধারা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"জন্ম হইতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়,
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়।"

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পুনঃ পুনঃ 'অহং' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা মানব-মনের অধিগম্য তাঁহার জীবানুগ্রহ-তৎপর শ্রীবিগ্রহের মাধুর্য্যের প্রতিই জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে তাঁহাকে মধুরানন্দপূরদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মাধুর্য্যসূত্রে তাঁহার আত্মসম্বন্ধের উপলব্ধিতে চিত্তবৃত্তির পরিস্ফূর্ত্তিই জ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তিতেই জ্ঞানের সার্থকতা—যোগে পরিসমাপ্তি। প্রত্যুত মায়াবাদীগণ জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহেন তাহাতে ভগবৎ-কৃপার অস্বীকৃতিতে পৃথক্ আয়াসের অহঙ্কৃত মূঢ়তাই নিহিত থাকে। এই পথে যোগ সার্থকতা লাভ করে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ এমন সাধনার মূলীভূত মূঢ়তা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বিষয় গ্রহণে অসমর্থ আতুর ব্যক্তি বা বিষয়ভোগে পরাঙ্মুখ কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শজ ভোগ হইতে নিবৃত্ত হন বটে, কিন্তু বিষয়াসক্তি বা বিষয়-বাসনাজ রস তাঁহাদের মনের মূলে রহিয়াই যায়। বস্তুতঃ বিষয়-সম্পর্কিত রসের এই আকর্ষণটি একমাত্র পরতত্ত্বের উপলব্ধিতেই নিবৃত্ত হইতে পারে। এক্ষেত্রে রসময় প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব এবং তাহার স্বীকৃতিতেই যে জীবের সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে এই সত্যটি প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরতত্ত্বের স্বরূপটি আমরা অষ্টম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে স্পষ্টভাবে পাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'হে পার্থ, সকল ভূত পরমেশ্বরের বিরাট দেহে অবস্থিত। সর্ব্বভূতের অন্তর এবং বাহিরে তিনিই রহিয়াছেন। তাঁহার এই সর্ব্বাত্মময় স্বরূপের দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে।' মায়াবাদীরা পরতত্ত্বের এই স্বরূপকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের

মতে জগৎ মিথ্যা। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মতের খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন—
"সর্ব্বযজ্ঞময় মোর অঙ্গ এ পবিত্র, অজ, ভব, বিধি গায় যাঁহার মহত্ত্ব, পুণ্য-পবিত্রতা পায় যাঁহার পরশে তারে মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে?" প্রকৃতপক্ষে মায়া থাকিলে তো কায়া! মায়াবাদীসিদ্ধান্ত বিষ্ণু-মায়াকে বাদ দিতে গিয়া নিজেদের কায়ার মায়াতে অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। মায়াবাদীগণের দৃষ্টি শুধু জড় বস্তুতেই পড়ে—সব ইট, কাঠ, পাথর। বিশ্বে বিশ্বাত্ম-দেবতার প্রভাব তাঁহারা স্বীকার করেন না। বিশ্বের সম্বন্ধ-সূত্রে তাঁহার সংবেদন উপলব্ধির উপযোগী হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মকে তাঁহারা নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চান। গীতায় এইরূপ স্বার্থকেন্দ্রিক একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত কোন ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হয় নাই। পরন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চিদৈশ্বর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বীর্য্যে সচ্চিদানন্দময় মায়া-মনুজবিগ্রহস্বরূপে পরতত্ত্বের পরম মাধুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহাই গীতোক্ত যোগের বিজ্ঞান। প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতোক্ত-তত্ত্বের সবিজ্ঞান জ্ঞানের পরম রহস্যটি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ কৃষ্ণ-সম্বন্ধের উপলব্ধিতে নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এমনই মহিমা যে তাঁহার আশ্রয় লইলেই সর্ব্বাবস্থায় জীবের প্রেম-ভক্তি মিলে কিন্তু দুষ্কৃতকারিগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করে না। তাহারা তাঁহাকে জন্ম-মরণ-শীল মানুষ বলিয়া মনে করে। তাঁহার পরম প্রেম তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহারা কেহ মূঢ়, কেহ কেহ নরাধম, কেহ বা মায়াহত, কেহ কেহ অসুর-প্রকৃতিযুক্ত। যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং শুধু জড় সুখ-ভোগে প্রবৃত্ত থাকে তাহারা মূঢ়। যাহারা শাস্ত্রাদি অধিগত হইয়াও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয় না তাহারা নরাধম। যাহারা তাঁহার কৃপা বা শক্তিকে মায়া বলিয়া অবিশ্বাস্য বুঝে বা বুঝায় তাহারা মায়াহত এবং যাহারা তাঁহার প্রতি হিংসাবুদ্ধিবিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার কারুণ্যাদি গুণকে দোষ বলিয়া দেখে তাহারা অসুর। সাধারণভাবে শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে যাঁহারা কর্ম্মজড় এবং বিষয়াসক্ত, শ্রীকৃষ্ণও

ইন্দ্রাদিবৎ কর্ম্মাধীন এমন যাহাদের ধারণা তাহারা মূঢ়। বিপ্রাদিকূলে জন্মবশতঃ নরোত্তম জন্ম লাভ করিয়াও যাহারা অসৎকার্য্যে আসক্ত হয় তাহারা নরাধম। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—কিঞ্চিৎকাল ভক্তিসাধনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া যাঁহারা সেই পথ ত্যাগ করেন, তাঁহারা নরাধম। যাহারা রামকৃষ্ণাদি অবতারকে মানুষমাত্র মনে করে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে তাহারা মায়াহৃতজ্ঞান।

আসুর-ভাবাশ্রিত জীবগণের সম্বন্ধে শ্রীপাদ বলদেব বলেন, যাঁহারা মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষবাদানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সংবিদাংশ মাত্র স্বীকার করে, তাহারা আসুর-ভাবাশ্রিত। অসুরগণ যেমন নিখিল আনন্দের আকর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করে, আসুর-ভাবাশ্রিত লোকগণও শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দাত্মক বিগ্রহ শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও সেইরূপ নানা কুযুক্তির দ্বারা তাহার খণ্ডন করে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদও অনুরূপ সিদ্ধান্ত পোষণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মুখে উক্ত হইয়াছে—

"কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে
সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তি।
তাঁর মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি।"

শুধু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারিভাবে তাঁহাকে ভজনা করিবার সৌভাগ্যের অধিকারী হন। এই সুকৃতি দুর্ল্লভ। গীতার দেবতা বলিয়াছেন—"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—

"আর্ত্ত অর্থার্থী দুই কামী ভিতরে গণি
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি,
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্
তত্তৎকামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধভক্তিমান্।

সাধুসঙ্গে কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি পায়।"

সুকৃতিসম্পন্ন চতুর্ব্বিধ সাধকগণের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার প্রতি নিত্যযুক্ত এবং তৎভক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।" শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত তাঁহার প্রতি ভক্তিতে একনিষ্ঠ জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।" জ্ঞানীদের নিকট তিনি অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীরাও তাঁহার প্রিয়। আমরা চরিতামৃতে দেখিতে পাই—"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে।" এই উক্তিটি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে প্রীতির পথে ভগবদুপাসনার এই ক্রমের পরাক্রমটি পরাভক্তির পরিপূর্ত্তিতে আমরা এইভাবে মিলাইয়া পাই—

"ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে এক জন মুক্ত
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ ভক্ত।"

অক্ষরব্রহ্ম যোগ

১। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয় ।। ৫ ।।

২। তস্মাৎ সর্বেবষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিমামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ।। ৭ ।।

৩। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ।।। ১ ।।

৪। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ।। ২২ ।।

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যুকালে স্মরণ

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমভাগে শ্রীভগবানের একটি উক্তি আমাদের মনে পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই বিস্ময় যুক্তিবুদ্ধির কসরৎ খাটাইয়া আমরা আজও কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। "যেয়ম্ প্রেতে বিচিকীৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতিচৈকে"— নচিকেতা যমের নিকট এই যে প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন, মানুষ অদ্যাপি তাহার সমাধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। 'বল্ তো ভাই কি হয় মলে?' এই প্রশ্ন মানুষের মনে চিরন্তন। গীতায় শ্রীভগবান্ এক কথায় এই সনাতন প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মৃত্যুকালে যে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করে সে আমাকে লাভ করে; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমরা সংসারাসক্ত বদ্ধ জীব। মরণের সময় ভগবানকে স্মরণ করিলেই আমাদের জন্মজন্মান্তরগত অবিদ্যাময় কর্ম্মসংস্কারের সম্যক্ নিরসন হইবে এবং আমরা শ্রীভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হইব ইহা কি সত্য? ঋষি-মুনিগণ যুগ-যুগ সাধনা করিয়া যাঁহাকে ধ্যানে, যোগে, যজ্ঞের দ্বারা লাভ করিতে পারেন নাই, মরণের সময় একবার তাঁহাকে স্মরণ করিলেই আমরা তাঁহারই সহিত সচ্চিদানন্দময় নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত হইব, ইহা আমাদের ধারণাতেই আসে না। শ্রীভগবান্ এই যোগের বৈজ্ঞানিক ধারাটি গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষ দুইটি শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যাঁহারা জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধনা করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মকে, সকলের আত্মাস্বরূপ তাঁহাকে এবং তাঁহার অখিল কর্ম্মের স্বরূপকে অধিগত হন। এইরূপ যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত বিদ্যমান আমার উপাসনা করেন, আমাতে যুক্তচিত্ত তাঁহারা মৃত্যুকালেও আমাকে

প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। অর্জ্জুন বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এজন্য তিনি অধিভূত কি, অধিদৈব কাহাকে বলে, অধিযজ্ঞ যিনি তিনি কেমন এবং জীবের এই দেহে তিনি কি ভাবে অবস্থান করেন অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেই তাহা জানিতে চাহেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রশ্নটি করিবার সময় অর্জ্জুন ভগবানকে পুরুষোত্তম বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পুরুষোত্তম স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্ তাঁহার এই স্বরূপতত্ত্বটি পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে পরিস্ফুট করিবেন। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে ভগবানের সহিত তাঁহার নিত্যসম্বন্ধটি প্রকট হইয়া পড়িল এবং বোঝা গেল শ্রীভগবানের জীবোদ্ধারণের ইচ্ছাতেই অর্জ্জুনের মোহের অভিনয়। ভগবানের উত্তর সুরু হইল সপ্তম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোককে অবলম্বন করিয়া। উক্ত শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন, যাহারা জরা-মরণ হইতে বিমুক্ত হইতে চাহেন—তাহাদের ব্রহ্ম, আত্মা এবং ভগবান্ এই তিন রূপে আমাকে জানিতে হইবে। আমাকে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞরূপে উপলব্ধি করিলে মৃত্যুকালে আমাকে পাওয়া যাইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।' অর্জ্জুনের প্রশ্নে এই তিনটি জ্ঞাতব্য রহিয়াছে। উপদিষ্ট সেই যে ব্রহ্ম 'তৎব্রহ্ম' তিনি কিরূপ, সর্ব্বভূতে আত্ম-স্বরূপের 'কৃৎস্নমধ্যাত্মং' ভাবটি তাঁহার কেমন, তাঁহার 'অখিল কর্ম্ম'ই বা কি? ভগবান্ উত্তরে বলিলেন, পরম অক্ষর যিনি তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই ভোক্তা। জীবাত্মা অক্ষরতত্ত্ব কিন্তু তিনি পরম অক্ষর। ক্ষর জড়া প্রকৃতি এবং চিৎকণ অক্ষর জীবাত্মা—উভয়ের তিনি প্রিয়। তিনিই আত্মা। এই হিসাবে ক্ষরাক্ষর প্রকৃতি তাঁহার ভোগ্য। 'পুরুষ যোষিৎ-আদি স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বচিত্তাকর্ষক' তিনি। এই প্রিয়ত্ব তাঁর স্বভাব বা অধ্যাত্মভাব। ক্ষরাক্ষর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রেরণায় তাঁহার প্রিয়ত্বের সম্বন্ধের ছন্দোময় লীলাতেই বিলসিত। এক তিনিই বহুভাবে নিজেকে বিভক্ত করিয়া বা ছড়াইয়া দিয়া স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

ভূতভাবোদ্ভবকর এই যে বিসর্গ বা তাঁহার আত্মদান ইহাই তাঁহার অখিলাত্মক কর্ম্ম। ভূতকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার যে ভাব তাহাই অধিভূত ক্ষর ভাব। অধিদৈব স্বরূপে তিনিই প্রেরয়িতা বা পুরুষ। প্রতি দেহে অবস্থিত তিনিই সকলের সর্ব্ব যজ্ঞ গ্রহণ করিতেছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ভাবে চিত্ত যুক্ত রাখিতে হইলে, পরম অক্ষর-স্বরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তিনি সকলের আত্মা। তাঁহার ইহাই স্বভাব বা স্বরূপনিষ্ঠত ধর্ম্ম এইটিও বুঝিতে হইবে। তিনি বিকাইয়া দিতেছেন নিজেকে জীবের কাছে। তিনি জীবকে কোলে-বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বিশ্বকর্ম্মের সর্ব্বছন্দে আপন করিয়া লইতে চাহিতেছেন। তাঁহার এই ত্রিবৃৎ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শ্রীভগবানের এই উত্তরে অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্নে পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধনের তাৎপর্য্যটি আমরা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিলাম। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণ করিবার বৈজ্ঞানিক ক্রমটি বুঝাইয়া বলেন। পরিশেষে অষ্টম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে সহজ অথচ সর্ব্বোত্তম পথটি দেখাইবার জন্য তাঁহাকে অনন্যাভক্তির উপদেশ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীব জীবিতকালে সর্ব্বদা যে ভাবকে জীবনের আশ্রয়স্বরূপে গ্রহণ করে, সব সময় তাহার মন সেই ভাবে বিজড়িত থাকে এবং মৃত্যুকালে সেই ভাবটিই তাহার অন্তরে বিশেষ ভাবে উদিত হয়। মৃত্যুর সময় আমাদের দেহ, মন এবং প্রাণের উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না এবং এই সময় আমরা ইচ্ছা করিয়া বা চেষ্টার দ্বারা কোন বিশেষ ভাবের প্রভাবকে মন হইতে অপসৃত করিয়া অপর ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের অবস্থা এক্ষেত্রে শক্তিহীন, আমরা অবশ। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে জীবের মৃত্যুকালীন এই অবশ অবস্থার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, তুমি মনে করিও না যে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তুমি সুযোগমত আমাকে স্মরণ করিয়া উদ্ধার পাইবে। ব্যাপার মোটেই তেমন

সহজ নয়। যদি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিতে চাও তবে সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং আমার উপর মনটি রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও; কর্ম্মের ফল আমাকে অর্পণ কর। ক্ষর ভাবের উপরই তোমার জীবনের নির্ভর। জীব-জগৎ জুড়িয়া এই ভাব। এই ভাবটিও আমাতেই বিধৃত রহিয়াছে। আমার এইটি অধিভূত ভাব। তোমার যত কিছু শক্তি তাহার নিয়ামকস্বরূপে আমিই তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। এইটি আমার অধিদৈব ভাব। ক্ষর এবং অক্ষর এই উভয়কে যুক্ত করিয়া আমিই তোমার দেহে যজ্ঞেশ্বর বা অধিযজ্ঞস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। তুমি যে জন্য কর্ম্ম করিতেছ প্রয়োজনস্বরূপে তাহার মূলে আমিই রহিয়াছি। কর্ম্মের দ্বারা যে ভোগটি তুমি করিতেছ তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া অধিযজ্ঞস্বরূপে আমি তাহা ভোগ করিতেছি এবং অক্ষর স্বরূপে অবস্থান করিয়া তোমার যজ্ঞের ফলের অনুযায়ী তোমার ভবিষ্যৎ গতি আমিই নিয়ন্ত্রণ করিতেছি। দেহাত্মাভিমানী জীব দেহকেই মনে করে সে নিজে এজন্য ভূতপ্রকৃতিই তাহার আশ্রয়। জীব নিয়ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছে। কর্ম্মের ভিতর দিয়া সে প্রতিনিয়ত আত্মদান করিতেছে। কর্ম্মই তাহার এই যজ্ঞ। হৃদয় এই যজ্ঞভূমি। এই যজ্ঞের ফলে জীবের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। পলে পলে তাহার ভবিষ্যৎ গঠিত হইতেছে। যিনি এই শক্তির নিয়ামক তিনিই অধিদৈব। অধিভূত বা বিনাশশীল সুখ-ভোগাদি অপরা প্রকৃতি বা ক্ষর ভাব হইতে উদ্ভূত পাঞ্চভৌতিক ভোগ্য পদার্থের সম্বন্ধকে জীবনে যাঁহারা একান্ত কাম্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন দেবলোকের ঐশ্বর্য্যাদি তাঁহাদের অভীষ্ট। ব্রহ্মা, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণেরও নিয়ামক ঐশ্বর্য্যময় অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষই অধিভূতে আকৃষ্ট প্রকৃতির জীবগণের মৃত্যুকালে স্মরণীয় হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, অর্থার্থী এই সব ভোগৈশ্বর্য্য-কামিগণ মৃত্যুকালে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সংস্থাপিত করিয়া নিজ অভিলাষানুরূপ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট লোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ক্ষরভাবের উর্দ্ধে অক্ষরপুরুষে আকৃষ্টচিত্ত তাঁহারা শ্রীভগবানের

সহিত সাযুজ্যকামী। ইঁহারা মৃত্যুকালে যোগবলে ইন্দ্রিয় সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া ওঁ এই প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণ-বায়ুকে সহস্রারে স্থাপিত করিয়া কৈবল্য লাভ করেন। ইঁহারা শান্ত ভাবের উপাসক। কিন্তু এতদুভয় মার্গের সাধকগণের কাহারো অভীষ্টই পূর্ণতত্ত্ব নয়। পূর্ণ-তত্ত্ব শ্রীভগবান্ নিজে। তিনি রসস্বরূপ। বস্তুতঃ অধিভূত, অধিযজ্ঞ এবং অধিদৈব এই সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানের পূর্ণতত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার লীলারসবিগ্রহের স্মরণ মনন এবং অনুধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপ্রস্তাবে লীলা-বিগ্রহেই জীবের পক্ষে সর্ব্বভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করিবার বীজটি নিহিত রহিয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে তাঁহার লীলা-বিগ্রহের সমাশ্রয়কেই ভগবান্ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুস্বরূপে তাঁহাকে লাভের বৈজ্ঞানিক পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগবতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন —আপনার মঙ্গলময় নাম এবং রূপের শ্রবণ, গ্রহণ, স্মরণ এবং চিন্তা করিলে আপনার লীলারসে মানুষের চিত্ত আবিষ্টতা লাভ করে। তখন জীব পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের ব্যক্তভাবে এই সাধনা। এই সাধনায় ভগবৎ-প্রীতিরসে জীবের চিত্ত নিষিক্ত হয়। সে চিদানন্দ লাভে অধি-কারী হয়। শ্রীভগবান সমাত্মসম্বন্ধে তাহার জীবনকে জড়াইয়া ফেলেন। আনন্দ রসের সংস্পর্শে মনের উজ্জীবন—ইহাই স্মরণ। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, "আনন্দচিন্ময়-রসাত্মতয়া মনঃসু যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলং স্মরতামুপৈতি।" স্মরণের মূলে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-বীর্য্য কাজ করে। তাঁহার লীলারসে ডুবিয়া ভক্ত তাঁহার হৃদয়ভূমিতে তাঁহাকে অনুভব করেন। অনুভব বলিতে জীবের চিত্তে ভগবানের আত্মমায়া বা জীবকে আপন করিয়া লইবার ভাবটির উন্মুখতার উপলব্ধি বুঝিতে হইবে। ফলতঃ হৃদয়ের বস্তুই আমাদের অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে। ভাগবত বলেন, অনুভবই জীবের আত্মা। আত্মমায়া বা শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তি ব্যতীত জীবের এমন অনুভূতি লাভ হয় না এবং অনু-

ভূতি লাভ ব্যতীত জীবনে সঙ্গতিও মিলে না। জীবের অনুভূতির রাজ্যে অর্থাৎ হৃদয়ে শ্রীভগবানের নিজবীর্য্য জাগ্রত করিতে হইলে ভগবানকে রসধর্ম্মে উদ্দীপিত হইতে হয় অর্থাৎ তাঁহাকে মধুর হইতে হয়। মানুষ হইয়া ভগবান্ হন মধুর। সুতরাং ভগবানের নরলীলাই জীবের অনুভূতির উপযোগী। এই অনুভূতিতে জীবের অর্থসম্বন্ধ লাভ হয় অর্থাৎ জীবনের একান্ত প্রয়োজনটি সে বুঝিয়া পায়। ফলতঃ অনুভূতি যেখানে নাই সেখানে অনুমিতি অর্থাৎ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে থাকে অনুমান কিন্তু অনুমানে প্রাণের ধর্ম্ম জাগে না। রসস্বরূপ শ্রীভগবানের যাঁহারা সাধক তাঁহারা প্রাণধর্ম্মে ভগবানকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভুলিতে পারেন না। মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের দেহত্যাগ ঘটে। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের স্মরণ তাঁহাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন "মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, বিলাস-যুগল স্মৃতি-সার। সাধ্য সাধন এই নাহি আর ইহা বই এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্বসার।" এই সব ভক্তেরা শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের মহিমায় তাঁহার কারুণ্যের বীর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তদ্গতচিত্ত হইয়াছেন। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অন্তরের অন্তস্তল হইতে শ্রীভগবানের আত্ম-সম্বন্ধটি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাদের মনে ফুটিয়া উঠে। এইরূপে ভগবৎ-স্মৃতি তাঁহাদের অন্তরে উদ্দীপিত হয়। ইহার ফলে ভগবানের নামটি তাঁহাদের রসনায় পরিস্ফূর্ত্ত হয়। বস্তুতঃ আমরা জীবনে যাহার বশে পড়ি যাহার সহিত সম্বন্ধে রস পাই রসনাটি আমাদের তাহারই অধিকারে চলিয়া যায়। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলারসে যাঁহার চিত্ত অনু-প্রবিষ্ট হইয়াছে এজন্য মৃত্যুকালে অনুস্মরণের সূত্রে ভগবানের নামটি তাঁহার রসনায় নাচিয়া উঠে। অন্য সময় অপরাধাদি করিবার হেতু ও অবসর থাকে, কিন্তু মৃত্যুকালে তেমন অবসর নাই, সুতরাং একমাত্র সে সময় ভগবানের নাম স্মরণ করিলেই তাহা নিশ্চিত ফলপ্রদ হয়। বস্তুতঃ পূর্ব্বজন্মে বা এই জন্মে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির পথে ভজনের ফলেই মৃত্যুকালে সেই ভজন এইরূপে সামর্থ্য প্রকাশ করে

এবং দেহত্যাগের পরে সাধকের পক্ষে ভগবানের সাক্ষাৎকারও সম্ভব হয়। প্রত্যুত এমন ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান নিজেই আকুল হন এবং মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি নিজেই তেমন ভক্তকে আসিয়া কোলে তুলিয়া লন। শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। নৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে আছে যিনি বেদান্তের সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিয়াও ভগবানের নাম নিরন্তর আবৃত্তি করেন, তাঁহার দেহাবসানকালে ভগবান্ তাঁহাকে তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে নাম কেহ করিতে পারে না। নাম নিজেই সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। নামে যাঁহার কাণটি একবার লাগিয়া গিয়াছে চিত্তের একান্ত অবস্থায় নাম স্বতঃই তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। ভক্ত কতকটা অবশ অবস্থাতেই নামের বশে গিয়া পড়েন। শ্রুতিসূত্রে অনুস্মৃতির উদ্দীপনে বাক্-বিসর্গের এই রীতি শ্রীভগবানের ব্যক্ত ভাবটিকে আশ্রয় করিয়াই পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে। এজন্য শ্রীভগবান্ এইরূপ সাধকের সম্পর্কেই শুধু স্মরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্মরণের মূলে তাঁহার কৃপাই বীর্য্যস্বরূপে কাজ করে। কেহ কেহ ভগবৎ-কৃপার এই মাধুর্য্যের আস্বাদনকে পরোক্ষ করিতে চাহেন বুঝা যায়। ইহারা যোগের কসরতের মোহজালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা বলেন, সাধারণ জীব মৃত্যুকালে শক্তিহীন হইয়া পড়ে কিন্তু যোগীরা সেরূপ শক্তিহীন হন না। সুতরাং তাঁহারা যোগবল-প্রয়োগে মোক্ষলাভে উদ্যুক্ত হন। যোগবলের এই মাহাত্ম্য যতই থাকুক, এক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, যোগী-দের পক্ষে স্বযত্নকৃত এই প্রয়াস। এই প্রয়াস মৃত্যুকালে জীবকে রক্ষা করিতে পারে শাস্ত্রে ইহা স্বীকৃত হয় না। শ্রীধর স্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বলিয়াছেন—পঞ্চতপা হইয়া তপস্যাই করুন, ভৃগুপাতের দ্বারা দেহত্যাগই করুন, তীর্থসমূহ পর্য্যটনই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের যাজনই করুন, তর্ক-বিতর্কের দ্বারা পরমতাদি যতই খণ্ডন করুন, একমাত্র হরিনাম ব্যতীত মৃত্যুর কবল হইতে কেহই উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের নিত্যস্মরণকারী যাঁহারা

তাঁহাদের পক্ষে কোন চিন্তার কারণ নাই। যোগবল তাঁহাদের না থাকাতে তাঁহাদের ক্ষতির কোন কারণ ঘটে না। ভগবৎ-কৃপাই তাঁহাদের উপর প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য করে। প্রত্যুত বহুলায়াস-সাধ্য যোগবলের বিনিময়ে তাঁহারা স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের প্রীতির রীতিতে উজ্জীবিত হন। মৃত্যুকালে নামী নিজেই আসিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। কাহার পক্ষে প্রাপ্য বস্তুটি বড় হইল—যোগ-সাধকের না স্মরণ-পরায়ণ যিনি তাঁহার? ফলতঃ ভগবৎ-কৃপাকে সাক্ষাৎসম্পর্কে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে কত কঠিন অনির্দ্দেশ্য কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্মবাদীদের মৃত্যুকালে যোগধারণা অবলম্বনের জন্য দেহসম্পর্কিত চেতনা এবং তৎ-সম্বন্ধে গীতোক্ত ভগবদুক্তিই তাহার প্রমাণ। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

গীতার দেবতা আমাদের ন্যায় অধম জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ। তিনি সকলের আত্মাস্বরূপ। তাঁহার অব্যক্ত অক্ষর বা নির্গুণ স্বরূপের সাধনার পথ বর্জ্জন করিবার জন্য আমাদের প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্যটি ইহা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ক্লেশকর পথ অবলম্বন করি, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার কাম্য নহে। তিনি আমাদের প্রিয়—আমরা তাঁহাকে প্রিয় স্বরূপে বুঝিব, প্রিয় বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিব, আমাদের সহিত এই আত্মসম্বন্ধ উপভোগের জন্যই তিনি উন্মুখ। সমগ্র গীতায় তিনি তাঁহার আত্মভাবের মাধুর্য্য সম্বন্ধে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়াছেন। তাঁহাকে কত সহজে পাওয়া যায় এবং তিনি আমাদের কত কাছে এইটিই তিনি অন্তরের একান্ত আকুলতা দিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন। আমরা যদি তাঁহার এমন কৃপাকে অস্বীকার করি এবং তাঁহার এই প্রিয় সম্বন্ধকে প্রত্যাখ্যান করি তবে বুঝিতে হইবে আমরা বড়ই হতভাগ্য। শুধু তাহাই নয়, আমরা হৃদয়হীন, আমরা পাষণ্ড।

ভগবান্ সুলভ

জীবের পক্ষে ভগবান্ সুলভ অর্থাৎ জীব আনায়াসেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে। আমাদের পক্ষে কথাটা বিশ্বাস করিয়া উঠা কঠিন। কারণ বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে এমন উক্তি পাওয়া যায় না। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী যাঁহারা ঋষি তাঁহাদের মুখেও আমরা ইহার বিপরীত কথাই শুনিতে পাই। ভগবান আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের চিন্তার অতীত তত্ত্ব। তাঁহারা বলেন, যাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন বলিয়া মনে করেন তাঁহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাঁহাদের হয় নাই। স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখেও আমরা এমন কথা শুনিয়াছি। তিনিও বলিয়াছেন, আমি দেবগণ, মহর্ষিগণ—ইঁহাদেরও আদি, সুতরাং দেবগণ কিংবা মহর্ষিগণ ইঁহারা কেহই আমার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বহু জন্ম সাধনার পর মানুষ জ্ঞানবান্ হইয়া আমার প্রতি প্রপন্ন হয়। বাসুদেবই সব, তাঁহাদের এমন উপলব্ধি ঘটে। এইরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ। তাঁহার মুখে আমরা শুনিয়াছি, সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভের জন্য প্রযত্নপর হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ ভগবৎ-তত্ত্ব অধিগত হইতে সমর্থ হন। এমন তিনি—দেবগণ, মহর্ষিগণ ইঁহাদের পক্ষেও তিনি দুর্লভ। অথচ গীতার অষ্টম অধ্যায়ে অধ্যাত্ম-সাধনার দুরূহ তত্ত্ব-কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ হইতে একথা বাহির হইয়া গেল যে তিনি সুলভ। চৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই মহাপ্রভুর পরম পার্ষদ নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গীতার ভগবদুক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া প্রভুর বন্দনা করিয়াছেন। প্রভু অষ্ট প্রহরিয়া ভাবে আবিষ্ট। শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভুকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—

"এই সত্য করিয়াছ আপন বদনে
যে জন তোমার করে চরণ স্মরণে
কীটতুল্য হয় যদি তারে নাহি ছাড়।

এহো বল নাহি মোর স্মরণবিহীন
স্মরণ করিলে মাত্র রাখো তুমি দীন।"

ব্যাপার কি, আমাদের অন্তরে সত্যই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। যিনি অসীম, অনন্ত যাঁহার স্বরূপ যোগেশ্বরগণের পক্ষে অবিচিন্ত্য যাঁহার বিভূতি কাহার ভাবে কোন প্রভাবে পড়িয়া তাঁহার এই ভাবান্তর সংসাধিত হইল ? সেই ভাবের স্বরূপটি কিরূপ, কেমন তাঁহার বীর্য্য, তাঁহার মাধুর্য্যই বা কি প্রকার ?

আমাদের অন্তরে এমন সব প্রশ্ন উদিত হয়। ভাগবতে প্রহ্লাদের মুখ হইতে এই প্রশ্নের সমাধানটি আমরা সরল এবং সহজ ভাবে পাই। অসুর বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ।"

অর্থাৎ অচ্যুতকে প্রীতি করা বহু আয়াস সাধ্য ব্যাপার নয় কারণ তিনি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ এবং সর্ব্বত্র তিনিই স্বমাধুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। প্রহ্লাদের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ সকলের আত্মা, তিনি সকলের প্রিয় এবং সর্ব্বভূতের ভিতরে তিনি প্রিয়ভাবটি লইয়া জাগ্রত রহিয়াছেন, এমন যিনি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন কোথায় ? তাঁহাকে একটু ভালবাসিলেই পাওয়া যায়। জীবের প্রীতি লাভের জন্য তাঁহার এই আকূতির পরিচয়ই আমরা গীতার উক্তির ভিতরে পাই। বদ্ধ জীব আমরা, আমরা যদি তাঁহাকে অন্তর দিয়া ভালবাসি তবেই তিনি কৃতার্থ হইয়া যান। তাঁহার সৌলভ্যের সম্পর্কে পতিত তাপিত আমরা আমাদের জন্য তাঁহার সংবেদনের তীব্রতা অন্তরে লইয়া তিনি আমাদের নিকট আসিয়া দাঁড়ান। আমাদিগকে আপন করিয়া পাইবার উৎকণ্ঠা লইয়া তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন।

আমরা কি জবাব দিব ? আমাদের নিকট হইতে তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটিবে কি ? আমরা কি করিলে তাঁহার প্রীতি লাভ হয়, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন. অনন্যচেতা হইয়া যে আমাকে বারংবার স্মরণ করে সে নিত্য-যুক্তযোগী। আমি তাহার পক্ষে সুলভ। ভগবদুক্তির তাৎপর্য্যটি উপলব্ধি করিতে হইলে অনন্যচিত্ততা বলিতে কি বুঝায় ইহা অনুধাবন করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তদিতর সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ সমগ্র অন্তরের ভালবাসা দিয়া ভগবানকে স্মরণ করিবার কথাই এখানে বলা হইয়াছে। ভগবানকেই শুধু চাই। অন্য কিছু এমন কি নিজের সুখের জন্য মোক্ষও কামনা করি না। এই ভাবটি অন্তরে লইয়া যদি ভগবৎ-সম্বন্ধে আমাদের স্মৃতি উদ্দীপ্ত হয় তবে তেমন স্মরণের পথে ভগবৎ-প্রীতি আমাদের অন্তরে উছলিয়া উঠে এবং শ্রীভগবানের রূপ, গুণ আমাদের চিত্তকে তৎসম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট করে। স্মৃতির এমন সম্বন্ধসূত্রে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য হৃদয়ে উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হইয়া আমাদের সমগ্র অনুভূতি উজ্জ্বল করিয়া তোলে। এইরূপে শ্রীভগবানের প্রীতি-প্রণোদিত আত্মসংবেদনের প্রগাঢ়তার পথে সাধক নিত্যযুক্ত অবস্থা লাভ করেন।

জড়ধর্ম্মী আমাদের মনের পক্ষে স্বভাবতঃ শ্রীভগবানের সম্বন্ধে সংবেদন বা অনুভূতি লাভ হয় না—এইটি হয় কিসে, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। অনন্যচেতা হইয়া বারংবার ভগবানকে স্মরণ করিলে তিনি সুলভ হন শ্রীভগবানের উক্তি হইতে এ আশ্বস্তি তো মিলিল। কিন্তু প্রকৃত সমস্যার সমাধান ইহাতেও হয় না। 'কৃষ্ণ ভুলি জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ' আমাদের চিত্তবৃত্তিতে ভগবৎ-প্রীতির উদ্গম ঘটিবে কিরূপে, অব্যভি-চারিণী রীতিতে সেই প্রীতিই বা পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিবে কেমন করিয়া ? শ্রীভগবানের স্মরণে উন্মুখতা জাগ্রত হইবার পক্ষে প্রয়োজন যে অনুভূতির আমাদের জীবনে আমরা সে বস্তু উপলব্ধি করিতে পারি না। আমাদের মন অপরা প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত। এই অবস্থায় ভগবৎ-

প্রেম আমাদের পক্ষে পরোক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের বিষয়ই থাকিয়া যায়। দেহাত্মবুদ্ধিতে আমরা আচ্ছন্ন। অসদাশ্রিত আমাদের মনের এই অনাত্ম-ভূমিতে শ্রীভগবানের আত্মভাবটি আমাদের নিজবোধ সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠতায় অভিব্যক্ত হয় না। সুতরাং আমাদের অন্তরে তাহা প্রত্যক্ষতার পরম বল-সঞ্চারে সামর্থ্যশক্তি লাভ করে না অর্থাৎ হৃদয়ের ধর্ম্মে জাগে না। শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী এক্ষেত্রে উপায় আছে একটি। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাই হৃদয়ের সম্বন্ধে ভগবৎ-ভাবে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। চিৎঘন সেই সংবেদন হৃদয়ে জাগিলে আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধি এবং আমাদের দেহকেও তাহা প্রভাবিত করে। তাঁহার মাধুর্য্য-বীর্য্য আমাদের অহঙ্কারকে এলাইয়া দেয়। কৃপার প্রত্যক্ষ এমন সংবেদন-সূত্রেই শ্রীভগবানের প্রেম আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে এবং অতীন্দ্রিয় প্রভাবে চিত্তবৃত্তিকে উদ্দীপিত করিবার উপযোগিতা পায়। প্রকৃতপক্ষে জীব এ জগতে অত্যন্তই নিরাশ্রয়। সে আপনার মনে করিয়া যাহার কাছে ছুটিয়া যায় আশ্রয় তাহার কোথাও মিলে না। সর্ব্বত্র পরস্পরের মনের অবস্থা সম্বন্ধে ভয় থাকে, থাকে অপ্রত্যয়। কখন কি হয় এই ভাব। ভক্তের বচনের সংবেদনসূত্রে জীবের মনের মূলে অসংশয়িত একটি আশ্রয় উন্মুক্ত হইয়া উঠে। সেই স্বরের অন্তর্নিহিত আত্মভাবের নিগূঢ় প্রভাবে সে পরম নির্ভরতা উপলব্ধি করে। নির্ভরতার সেই সূত্রে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব দিব্যরস অন্তরের উৎসমূল হইতে উৎসারিত হইয়া জীবের দেহে, মনে, প্রাণে ছড়াইয়া পড়ে। ফলতঃ ভগবানের গুণ, তাঁহার লীলার চিন্তন এবং ভক্ত-সঙ্গজনিত আনন্দের চিন্ময় প্রভাব নামে এবং মন্ত্রের সংযোগসূত্রে অভিন্নতায় জীবের চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া তাহার স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করিতে থাকে। শ্রীভগবান্ স্মরণার্হ মাধুর্য্যে জীবের অন্তরে ব্যক্ত হন। ভাগবতে ভগবান্ সনৎকুমার মহারাজ পৃথুর নিকট এই সত্যটি সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেহাত্মবুদ্ধিরূপ পাপ উচ্চাধিকারীর পক্ষেও মোহ-উৎপাদক।

সাধন ভজনের দ্বারা ইহাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ফলতঃ শ্রীহরির কৃপাও এ ক্ষেত্রে জীবের উজ্জীবনে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে কার্য্যকরী হয় না। সে কৃপা তো জীবের প্রতি রহিয়াছেই তথাপি জীবকে অবিদ্যার প্রভাবে সংসারে সংক্লেশ ভোগ করিতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরুরূপ হরির কৃপাই জীবের উদ্ধারে এক্ষেত্রে পৌরুষস্বরূপে কাজ করে। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, মহতের মুখচ্যুত শ্রীভগবানের চরণ-কমলের সুধাকণাবাহী অনিলের স্পর্শ ভগবৎ-বিস্মৃতিতে অভিভূত জীবের স্মৃতিকে উজ্জীবিত করে এবং এই ভাবে জীব কুযোগ হইতে উদ্ধার পায়। এমন কৃপার জীবন্ত স্পর্শ পাইলে জীবের পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় এবং ভগবানের কাছেও আর কিছুই তাহার পক্ষে প্রার্থনায় থাকে না। পক্ষান্তরে ভগবান্‌ও তখন নিজলাভপূর্ণ। তাঁহার নিজ বস্তু হইল তাঁহার ভক্ত জীব। জীব যদি তাঁহার সেবায় উন্মুখ হয় তাহার কাছে তখন আর কিছুই তিনি চাহেন না; পরন্তু জীবের কর্ম্ম-ধর্ম্ম বিচারে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া তিনি ভক্তাধীন ভাবে জীবকে আসিয়া বরণ করেন। এই ভাবে শ্রীভগবানের জীবকে বরণই স্মরণের মূলে বীর্য্যস্বরূপে কাজ করে এবং স্মরণের ফলে তিনি সুলভ হন। জীবের কর্ম্মের বিচার ছাড়িয়া সে ক্ষেত্রে ভগবান বদান্য-মহিমায় জীবকে আপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। প্রকৃত পক্ষে গুরুতত্ত্বের অন্তর্ম্মুখীন অনুভূতিই প্রজ্ঞা। স্মরণের সূত্রে ভগবানকে সুলভে লাভ করিবার পক্ষে ভগবদুক্তির ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হইবার পথে জীবের পক্ষে ইহাই পরম বিজ্ঞান। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই, শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবান্ নৃসিংহদেবের নিকট ভগবৎ-প্রাপ্তির পক্ষে সুলভ এই স্মরণই প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী
> ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।"

অবিবেকিগণের চিত্ত বিষয়ে অবিচলিত ভাবে নিষ্ঠিত থাকে। তোমার স্মরণের মহিমায় আমার হৃদয়ে তোমার জন্য তেমন প্রীতি নিত্য জাগ্রত থাকুক। যাঁহারা শ্রীভগবানের স্মরণপরায়ণ এমন ভক্ত, তাঁহারাই সাধু-যোগী। তাঁহারা সাধিভূত, সাধিযজ্ঞ এবং সাধিদৈব এই সর্ব্বভাবে তাঁহাকে ভজনের অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীঅক্রূরের উক্তি এ সম্বন্ধে স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

'ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরং
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ।'

(ভাঃ ১০।৪৪।৪)।

স্মরণের ক্রম

স্মরণের পাঁচটি স্তর শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি এবং সমাধি। স্মরণে মনের সংযম নিতান্তই আবশ্যক। নামে আমাদের মনের সাক্ষাৎ-সম্পর্কে উজ্জীবনোপযোগী এমন শক্তি নিহিত আছে। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"স্বয়ং নারায়ণো দেবঃ স্বনাম্নি জগতাং গুরুঃ। আত্মনোঽভ্যধিকাং শক্তিং স্থাপয়ামাস সুব্রতাঃ" (স্বর্গখণ্ড—২৪ অঃ)। শ্রীসূত বলিলেন, হে সুব্রত ঋষিগণ, জগতের গুরু স্বয়ং নারায়ণ নিজ নামে স্ব-স্বরূপ হইতেও অধিক শক্তি স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরতত্ত্ব জাগতিক বস্তুর নাম আমাদের মনোবৃত্তির গ্রাহ্য নয়। শব্দ-প্রমাণগ্রাহ্য বেদাদি শাস্ত্রসম্মত তৎবিষয়ক অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ শব্দসঙ্কেতই নাম।

প্রকৃতপ্রস্তাবে যাঁহার রূপ আছে, তাঁহারই নাম আছে। যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার নামও নাই। 'অশ্বডিম্ব' 'আকাশ কুসুম' প্রভৃতি শব্দে রূপ ব্যতীতও নামের অস্তিত্ব শ্রুত হয়। এগুলি অন্য বস্তুর রূপের অনুকরণে কল্পিত বা অলীক নাম।

মায়াবাদীগণের মতে পরতত্ত্বের নিত্য রূপ নাই; পরতত্ত্ব নির্বিবশেষ এবং নিরাকার। এই রূপ নির্বিবশেষ এবং নিরাকার-তত্ত্বে নামের কল্পনা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। সেই রূপ নাম কল্পনার ফলে উপজাত বলিয়া অনিত্য হইবে এবং পরব্রহ্ম তত্ত্বের তাহা বাচক হইবে না। কেহ যদি সেই রূপ নামে বা শব্দে ভগবানের সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তবে তাহার ধারণানুযায়ী ফলই লাভ হইবে। তিনি পারমার্থিক ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।

নির্বিবশেষ নামাদিতেই এইরূপ কল্পনার সংস্রব আসিয়া পড়ে। বিষ্ণুপুরাণের দুইটি শ্লোকে এই বিষয়টি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ভগবৎ-সন্দর্ভে এই শ্লোকদ্বয়ের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

"ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদি-কল্পনাঃ।
তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ!
ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো যতঃ।
ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুনামভিরীড্যসে।"

অর্থাৎ সকল দৃষ্টবস্তুরই নাম ব্যতীত তাহাদের ব্যবহারিক বোধ হয় না। এই কারণে কল্পনাময় নাম এবং তন্নিরূপিত অর্থসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিখিল প্রমাণের অগোচর বেদাত্মক নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণাদি নামসমূহের আশ্রয় স্বতঃসিদ্ধ ভগবানকে মুনিগণ ও বেদসমূহ বন্দনা করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ জীব স্পষ্টীকৃত করিয়া বলিয়াছেন, "যত এবং ততঃ সাঙ্কেত্যাদিনা ভাবিতৈরপি ভবদ্বৎসর্ব্বপুরুষার্থপ্রদৈঃ তত্তদবিশেষ-প্রতিপাদকৈঃ কৃষ্ণাদি-নামভিরেব ত্বমীড্যসে, নিত্যসিদ্ধ-শ্রুতিপুরাণাদিভিঃ শ্লাঘ্যসে, ন তু নির্ব্বিশেষতা-প্রতিপাদকৈঃ, নতরাং কল্পনাময়ৈরিত্যর্থঃ" অর্থাৎ ভগবানের নাম, রূপ, অবতারাদি কল্পিত নহে। ভগবানের স্বরূপসিদ্ধ নিত্যশক্তির সেগুলি বিলাসস্বরূপ এবং ভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই সব নাম সর্ব্বপুরুষার্থ দানে সমর্থ। কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু প্রভৃতি সবিশেষতত্ত্বের প্রতিপাদক নাম সমূহের দ্বারাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবান্ কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন কিন্তু নির্ব্বিশেষ নামাদির দ্বারা নহে। কল্পনাময় নামের দ্বারা যে নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীভগবানের নামসমূহ তাঁহার অবতার, গুণ, রূপ, পরিকর লীলা-বাচক ভেদে বিবিধ। ভাগবতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

'যস্যাবতার-গুণ-কর্ম্ম বিড়ম্বনানি নামানি
যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে।'

অর্থাৎ যাঁহারা রাম, নৃসিংহাদি অবতারসূচক নাম এবং ভক্তবৎসল,

দীনবন্ধু, দামোদর ইত্যাদি গুণসূচক নাম ও গোবিন্দ, গিরিধর, মধুসূদন ইত্যাদি লীলাসূচক নামসমূহ প্রাণত্যাগ কালে যাঁহারা বিবশ হইয়াও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি হইতে সদ্য সদ্য মুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হন, আমি সেই অজ ভগবানের শরণাপন্ন হইলাম।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মন্ত্রের সাধনা নামেরই মাধুর্য্য বীর্য্যে পর্য্যবসিত হয়। সকল সাধনাঙ্গেই ভগবৎ-স্মৃতি চিত্তে পোষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নির্বিবশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদিগকেও ভক্তি-পথের স্মৃতির আশ্রয়ে সবিশেষ ইষ্টতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে হয়। গুরু-কৃপাযুক্ত মন্ত্রে মন সংস্পৃষ্ট হইলে ইষ্টতত্ত্বের ঘনিষ্ঠতা বা সম্বন্ধের সান্দ্র ভাবটি উত্তরোত্তর প্রগাঢ়তা লাভ করে। প্রথমে আসে ভগবৎ-সম্বন্ধে ধারণা। অন্য সব বিষয় হইতে মনকে আকষণ করিয়া ভগবানের ভাবে সংলগ্ন করাকেই ধারণা বলা যায়। ধারণায় চিত্ত নিবিষ্ট হইতে থাকিলে চিন্তার সূত্রে মনের মূলে খোলে রূপ। রূপ রসে চিত্ত নিষিক্ত হইলে অভীষ্টে অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তার ধারা ছুটিতে থাকে। রূপের সংশ্লেষ-সম্পর্কিত অভিনিবেশে মন আবিষ্ট থাকিতে চায়। ইহার পরবর্ত্তী স্তর হইল সমাধি। সমাধিতে ধ্যেয়-তত্ত্বের স্ফুরণ ঘটে। এই অবস্থায় চিত্ত অভীষ্ট-তত্ত্বে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। শান্তভক্তদের পক্ষে ধ্যেয়তত্ত্বের এই স্ফুরণের ভাবটি চিত্তকে পরম নিবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। বিশেষ-তত্ত্বের সাধকদের অন্তরে মন্ত্রের সাধনায় সাধ্যতত্ত্ব পরিস্ফূর্ত্ত হইলে শ্রীভগবানের নিত্য লীলার মাধুর্য্য রাজ্যে তাঁহাদের চিত্ত অনুপ্রবিষ্ট হইতে উন্মুখতা প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের অপেক্ষা নামের শক্তি সমধিক। মন্ত্র বীজ নাম ফল—'সকল নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং' হইল নামের স্বরূপ। নামে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রমূর্ত্ত। স্বরূপশক্তির এই উজ্জীবন রস-সংস্পর্শই লীলার মাধুর্য্যকে সাধকের অন্তরে উদ্দীপ্ত করে। স্মরণের সঙ্গে মাধুর্য্যের এই বীর্য্যটি বিজড়িত থাকিয়া নামে বিক্রীড়িত হয়। সাধকের স্বপ্রয়াসের অপেক্ষা সে ক্ষেত্রে থাকে না। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ১২শ

এবং ১৩শ শ্লোকের ভগবদুক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অক্ষর-ব্রহ্মোপাসক নির্ব্বিশেষবাদী যোগীদের অন্তকালে শ্রীভগবানের স্মরণের ক্রমটি এই শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, ওঁকার এই ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণে তাঁহাকে অনুস্মরণ করিয়া যাঁহারা দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হন। এ ক্ষেত্রে ওঁকার নামস্বরূপে গ্রহণ করিতে হয়; কারণ নামই কীর্ত্তনীয়। 'ব্যাহরণ' শব্দে উচ্চারণ বা কীর্ত্তনই বুঝাইতেছে। কীর্ত্তন বলিতে কথন বা উচ্চারণও বুঝাইয়া থাকে। ঠাকুর হরিদাসের লীলাপ্রসঙ্গে কীর্ত্তন শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী রামচন্দ্র খানের প্রেরিত এক বারবনিতাকে তিনি বলিয়াছিলেন—"ইহা বসি শুন তুমি নাম সঙ্কীর্ত্তন।" ইহাকে আবার কীর্ত্তনও বলা হইয়াছে—"কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল।" (চৈঃ ভাঃ ৩।৩।১২) "গুরুং প্রকাশয়েৎ বিদ্বান্ মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ"—বরং গুরুকে প্রকাশ করিবে, তথাপি মন্ত্র প্রকাশ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। ফলতঃ এক্ষেত্রে ওঁকার বা প্রণব-নির্ব্বিশেষাত্মক মন্ত্রস্বরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। শ্রীভগবান্ 'মামনুস্মর' এই উক্তিতে এতৎসম্বন্ধীয় সমস্ত তর্কের স্বয়ং নিরসন করিয়া দিয়াছেন।

মন্ত্র কেবল মাত্র বর্ণরূপী বা অক্ষরাত্মক। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী-পাদ হরিভক্তি-বিলাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, মন্ত্র সুষুম্না-নাড়ীর রন্ধ্রপথে সমুচ্চারিত হইলে তবেই শক্তি প্রাপ্ত হয়—"পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ সৌষুম্নাধ্ব-ন্যুচ্চারিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি হি।" কিন্তু নামের পক্ষে এ সমস্যা নাই। সুষুম্নার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য নামাশ্রয়ীকে যত্নপর হইতে হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।"

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ"—সব সময়ে আমাকে স্মরণ কর এবং কর্ম্মে নিযুক্ত থাক, এইরূপ উপদেশ প্রদান করিবার

পর যোগের পথে মৃত্যুকালে তাঁহার স্মরণের ক্রমটি ভগবান্ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অক্ষর ব্রহ্মোপাসনার সে পথ অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কিরূপ দুষ্কর, ভগবান সে সম্বন্ধেও আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই। অষ্টম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে তিনি বলিলেন, বেদবিৎ পুরুষেরা যে পদকে অক্ষরবাচক বলিয়া উপদেশ করেন, বীতরাগ সন্ন্যাসীরা যে পদে প্রবিষ্ট হন, যে অক্ষরস্বরূপকে লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, আমি তোমাকে সেই পদটি সংক্ষেপে বলিতেছি। অষ্টম অধ্যায়ের ১২শ এবং ১৩শ শ্লোকে বেদবিৎ পুরুষ, বীতরাগ সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতচারীদের সাধ্যতত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। 'সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে'—বলিবার প্রতিশ্রুতিটি পালিত হইয়াছে ১৪শ শ্লোকে। ভগবান বলিয়াছেন সিদ্ধির উপায়টি—আমাকে স্মরণ কর, ক্ষণে ক্ষণে আমাকে স্মরণ কর। স্মরণের এমনই মহিমা। উপদেশটি প্রকৃতপক্ষে বিশেষাত্মক নামে গিয়াই দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ 'নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার' ভগবানের মুখে এমন উপদেশই আমরা পাইলাম। ইহাকেই বলিব কৃপা। ভক্তবর প্রহ্লাদের মুখে স্মরণের এই মহিমা প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে—

"দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাত-বিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ।"

(বিষ্ণু পুরাণ ১৷১৭৷৪৪)

অক্ষর ব্রহ্মোপাসকগণ যোগ-সাধনায় তাঁহার অনুস্মরণের পথে দেহত্যাগ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হন - তাঁহাকে প্রাপ্ত হন এরূপ কথা ভগবান্ বলেন নাই। এই পরমাগতিই তিনি অষ্টম অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গতি মোক্ষ—"একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।"

অনন্যচিত্ত হইয়া যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ করেন তাঁহাদের কোন গতি লাভ হয়? উপর্য্যুক্ত অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে ভগবানের উক্তি এ

ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে আমি সুলভ অর্থাৎ তাহারা আমাকেই লাভ করেন। মুক্তিপদ বা মোক্ষ যাঁহার পদে তাঁহারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। ক্ষর ব্যক্ত এবং অব্যক্ত অক্ষর উভয় তত্ত্বের অতীত সনাতন পুরুষ যিনি তিনিই পরতত্ত্ব। অষ্টম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শুধু অনন্যাভক্তির পথেই অব্যক্ত এবং ব্যক্ত ভাবের অতীত এই সনাতন ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে লাভ করা যায়। গতির অপেক্ষা এমন ভক্তের নাই। এমন ভক্তের নিকট বেদপাঠে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, তপস্যায়, দান-কর্ম্মে যে সব অন্য ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে সবই নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে। তাঁহারা মোক্ষও কামনা করেন না, তাঁহারা চাহেন ভগবানকে। ভগবান্ দুর্ল্লভ হইলেও প্রীতির পথে তিনি সুলভ হইয়া থাকেন। নিত্যস্মরণে তাঁহার এই প্রীতি জীবের চিত্তে উদ্দীপিত হয়। এজন্য সর্ব্বশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।"

সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে। কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। অন্য সমস্ত বিধি-নিষেধ উল্লিখিত বিধি এবং নিষেধদ্বয়ের কিঙ্কর। সমগ্র তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উত্তর এখানেই মিলে। ভাগবত বলেন—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।"

অর্থাৎ ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিধি ও নিষেধের দ্বারা সকল কালে ও সকল অবস্থায় সিদ্ধিলাভেরযোগ্য উপায়টি শ্রীগুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিবেন। ভাগবত বলেন—

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলোভায় হি স্মৃতঃ।
কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভোজীবেত যাবতা
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।"

(ভাঃ ১।২।৯-১০)

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর ভোগে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ হয় না। কেননা যতকাল জীবিত থাকা যায় ততকালই ভোগ্য বস্তুর ভোগে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি লাভ হয়। এ সমস্তই ক্ষণস্থায়ী। স্বর্গপ্রাপ্তিও ধর্ম্মের ফল নহে। স্বর্গলাভও অনিত্য। ধর্ম্ম তাহাকেই বলিব যাহাতে নিত্য সুখ মিলে, নিত্য বস্তুকে পাওয়া যায়। জগৎ-গুরুস্বরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম অধ্যায়ে তাঁহার নিত্য স্মরণের মাধুর্য্য-বীর্য্যে জীবের পরম জিজ্ঞাসার সমাধান করিলেন

পরতত্ত্বের নিত্যত্ব

মৃত্যুময় এই জগতে আমরা নিতান্তই নগণ্য। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ড চক্র কত বিরাট কি তাহার বিশালত্ব সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই আসে না। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ধূলিকণার মত ক্ষুদ্র পৃথিবীর বুকে আমরা অতি ক্ষুদ্র কীটের মত ক্ষণিকের জীবন অনুভব করিতেছি। কোথায় আমাদের গতি আমাদের কিছুই উপলব্ধি নাই। গীতার দেবতা মৃত্যু-ভীতিময় এমন পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে অমৃতের বাণী শুনাইয়াছেন—"মামুপেত্য পুনর্জন্মদুঃখালয়মশাশ্বতম্ নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।" বোধহয় মহামৃত্যুময় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিকা এজন্য একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। ভীতির পরিপ্রেক্ষাতেই আত্মসম্বন্ধে প্রীতির অনুভূতি প্রগাঢ়তা লাভ করে। মানুষ কত ক্ষুদ্র, সে কত অসহায় এইটি বুঝিতে না পারিলে মানুষ শ্রীভগবানের প্রীতি উপলব্ধি করিতে পারে না। কাল-তরঙ্গের উত্তাল আবর্ত্ত-গতি এবং ভয়াবহ তাহার প্রকৃতি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াই কৈবর্ত্তক-স্বরূপে কেশব জীবের প্রতি তাঁহার করুণার স্বরূপটি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ব্যক্ত করিতে বসিয়াছেন। সেই করুণার স্পর্শে আমাদের মত জীবের ক্ষুদ্রতাকে তিনি বিদূরিত করিতে ব্যগ্র। এইভাবে আমাদের অন্তরের সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা, সকল রকমের দৈন্য হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার বদান্য লীলা সুরু হইয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রতি এমন অযাচিত কারুণ্যে উদ্ভিন্ন তাঁহার লাবণ্য-মাধুরী আমাদের চোখে পড়ে কি ? যদি তাহাই পড়িত তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতেই ব্রজের বাঁশরীর রেশ আমাদের কাণে আসিয়া বাজিত। অসীম অপার দুস্তর কালসিন্ধুর পরপার হইতে নিত্য প্রীতির মধুময় গীতি ভাসিয়া আসিত। কাল-সমুদ্রের পারে বসিয়া আমরা কালিন্দীর সন্ধান পাইতাম। সে গীতে আমরা অমৃতে উজ্জীবিত হইতাম। আমাদের আকাশ-বাতাস সব মধুময় হইয়া যাইত। অষ্টম অধ্যায়ে

ভগবান্ জন্ম মৃত্যুর অতীত এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের উর্দ্ধে জীবের স্বরূপ-তত্ত্বটি উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শুধু আমাদের এই পৃথিবীই নয়, ব্রহ্মলোক হইতে সপ্তলোক অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এ সবই পরিবর্ত্তনশীল। আমাকে যিনি লাভ করিয়াছেন, জন্ম কর্ম্মের বন্ধন হইতে একমাত্র তিনিই মুক্ত হন। মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবতাগণের এক অহোরাত্র। দৈব দ্বাদশ সহস্র বৎসর পরিমাণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে দেবতাদের একযুগ হয়। এইরূপ দৈব সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐরূপ সহস্র যুগে হয় তাঁহার এক রাত্রি। ব্রহ্মার দিবাগমে সমস্ত আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হয় এবং তাঁহার রাত্রি-সমাগমে অব্যক্তে সব প্রলীন হয় অর্থাৎ প্রলয় ঘটে। ভূত সমূহ সৃস্টি এবং প্রলয়ের এই আবর্ত্তে পড়িয়া নিয়ত জন্ম মৃত্যুতে অভিভূত হইতেছে। তবে কি এই চক্র হইতে আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় নাই, কেবল যাতায়াতের উপরই আমাদিগকে থাকিতে হইবে। নিত্য আশ্রয় আমরা কোনদিন পাইব না? ইহার উত্তরে ভগবান্ আমাদিগকে অভয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুই ভাব হইতে পৃথক একজন সনাতন পুরুষ আছেন ভূতগ্রাম প্রলীন হইলেও যিনি লয় প্রাপ্ত হন না। তিনি ক্ষর প্রকৃতির অর্থাৎ ভূতগ্রামের অন্তরে এবং অক্ষরস্বরূপ-ভাবে অন্তরে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সগুণ, নির্গুণ, সকল ভাবের অতীত, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত যুগপৎ তিনি বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়। তিনি অন্তর্য্যামি-স্বরূপে থাকিয়া সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ভিতরে জীবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অব্যক্ত ভূতবীজ ভাবটি অক্ষর এবং বিশ্বে তাঁহার ব্যক্ত ভাবটি ক্ষর। ক্ষর এবং অক্ষর উভয় ভাবের পূর্ণতায় তাঁহার পরভাব। তাঁহার এই পরভাব উপলব্ধি করিলে তাঁহার রসময়-স্বরূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুইটি মিলাইয়াই সমগ্রভাবে তাঁহার আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন। জীব এইভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে অপরা প্রকৃতির অভিভূতি হইতে সে মুক্তি

লাভ করে। পরম ধাম লাভ করিয়া জীবের কাম-পিপাসা তখন মিটিয়া যায়। এই পরমধাম বলিতে প্রকৃতি-বিকৃতির উর্দ্ধে মূলাপ্রকৃতির সংশ্লেষে নিত্যভাবে ব্যক্ত তাঁহার অব্যাকৃত স্বরূপটি বুঝায়। তাঁহার এই স্বরূপটি আশ্রয় করিয়াই তিনি সর্ব্ববিধ বিকারের মধ্যে তাঁহার চিদৈশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছেন। অব্যাকৃত তাঁহার এই বিহার বিশ্বের সকল বিকারকে অমৃতরসে উজ্জীবিত করিতেছে। সর্ব্বভূত তাঁহার অন্তঃস্থ এবং তাঁহার দ্বারা সমস্তই পরিব্যাপ্ত। বস্তুতঃ ভগবৎ-তত্ত্ব-রসের সংস্পর্শে জীব শ্রীভগবানের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সে অবস্থায়ও জীবের কর্ম্ম থাকে। কিন্তু কর্ম্ম হইতে জীব নিষ্কৃতি প্রার্থনা করে না এবং তাহার প্রয়োজনও জীবের পক্ষে থাকে না। প্রত্যুত কর্ম্মই জীবের স্বরূপধর্ম্মগত প্রীতিময় ভগবৎ-সেবায় পরিণত হয়। বিশ্বের সর্ব্বসম্বন্ধে সে অবস্থায় আনন্দ।

কূটস্থ অক্ষর পুরুষস্বরূপে শ্রীভগবান্ সকলের অন্তরেই রহিয়াছেন কিন্তু আমরা আমাদের পরম আশ্রয়তত্ত্ব স্বরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেছি না। সুতরাং তাঁহাকে শুধু অক্ষররূপে বুঝিলেই চলিবে না। অক্ষরতত্ত্ব-স্বরূপে ভগবদুপলব্ধি নিত্যানিত্য বিবেক-বিচার প্রভৃতি জ্ঞানের ব্যাপার। এ পথে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু বুদ্ধি-বিচার-সম্পর্কিত এমন জ্ঞানে মানব-জীবনের সঙ্গতি সাধিত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান পরাভক্তিতে পর্য্যবসিত না হইলে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয় না। 'রসো বৈ সঃ' এ তত্ত্ব বুঝা যায় না। সেই তত্ত্ব উপলব্ধির পথ হইল অনন্যাভক্তি। "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য-স্ত্বনন্যয়া" অষ্টম অধ্যায়ের এইটি উপদিষ্টতত্ত্ব। এইরূপ অনন্যাভক্তির উদয়েই জ্ঞানের সার্থকতা। অনন্যাভক্তিতে শ্রীভগবানের মূর্ত্ত-লীলা পরমাত্ম-তত্ত্ব এ ক্ষেত্রে ভক্তিরসের সংস্পর্শে শ্রীবিগ্রহে জীবন্ত হইয়া আমাদের সহিত প্রীতির সম্বন্ধে ব্যক্ত হন। শ্রীভগবান আমাদের আপন হইয়া দেখা দেন।

ভক্তির পথে শ্রীভগবানকে না পাইলে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তগতি রুদ্ধ

হয় না। গীতায় এই সত্য অভ্রান্ত ভাষায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে দেবযান এবং পিতৃযান উভয় মার্গই গতিমূলক। যেখানে প্রাপ্তি সেখানে গতি কোথায়? অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের পিতৃযান-মার্গে সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। বিষয়-জ্ঞান তাঁহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। যাঁহারা অক্ষরব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা দেবযান-মার্গ-যোগে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কৃষ্ণাগতিতে সংসার বন্ধন ঘটে, শুক্লাগতিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু উভয়ই যান। গতির মূলে অপ্রাপ্তিই কারণ সৃষ্টি করে। শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধসম্বন্ধে মানব-জীবনের প্রেমরূপ পরম প্রয়োজনটি যাঁহার মিলিয়াছে, গতির অনুভূতি তাঁহার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। "কৃষ্ণভক্তি রসনাম সদ্য সদ্য রসধাম"—শ্রীভগবান নিজে আসিয়া ভক্তকে বরণ করেন, সুতরাং যানের সমস্যাই ভগবৎ-প্রীতিতে উদ্দীপিত-চিত্ত স্মরণ-ভূয়িষ্ঠ, নামনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে নাই ভগবান্ দেবযান এবং পিতৃযান এই উভয় মার্গের উল্লেখ করিয়া গীতায় এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই দুই যানের তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগী কখনও মোহ প্রাপ্ত হন না। সুতরাং অর্জ্জুন তুমি সর্ব্ব সময়ে আমাতে যোগযুক্ত হও। যুক্ত হও স্মরণের পথে নিত্য নামাশ্রয়ে, যুক্ত হও অনন্যাভক্তির উদ্দীপ্তিতে। শ্রুতিস্মৃতির সার কথাটি ভগবান্ এইভাবে অর্জ্জুনের মাধ্যমে আমাদিগকে বলিয়া দিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন তাঁহাকে পাইবার পক্ষে সহজ পথটি। পথটি ধরিলে তাঁহার প্রেমের উদয়ে আমাদের জীবন কিভাবে জয়যুক্ত হয় আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে পরিচয় পাইব।

রাজযোগ

১। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ॥
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

২। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ॥
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

৩। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ॥
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

৪। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ॥
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

নবম অধ্যায়

গীতার গোপন কথা

অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তি-নোঽর্জ্জুন'। ব্রহ্মলোক হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়। যে পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে পাওয়া না যাইবে সে পর্য্যন্ত সংসারে গতাগতি চলিবেই। কালচক্রের আবর্ত্তনে জন্ম হইতে জন্মান্তর পরিগ্রহণ ব্যাপারের নিবৃত্তি ঘটিবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মলোকও ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত। ব্রহ্মলোকগামীরাও মুক্ত নহেন। সে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলে প্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং ব্রহ্মা নিজেও অমুক্ত জীব। কিন্তু ভগবানের লীলাবিগ্রহের রসমাধুর্য্যে যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ক্রমমুক্তির দেবযানাদি পথে তাহাদিগকে যাইতে হয় না। তাঁহারা এই জন্মেই সাধনায় পূর্ণত্ব লাভ করিয়া ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অষ্টম অধ্যায়ের ১৫শ এবং ১৬শ শ্লোকে শ্রীভগবানের মুখে আমরা একথাও শুনিয়াছি। নবম অধ্যায়ে তাঁহার কৃপার মাধুর্য্যের চাতুর্য্যটি তিনি সমধিক পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহাকে পাইলে যে পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি ঘটে—এই কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সত্যটিও সুস্পষ্ট করিয়াছেন যে, তাঁহার অপ্রাপ্তিতে জীবকে মৃত্যুময় সংসার-বন্ধনের ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার শ্রুতিপ্রতিপাদিত এই যে স্বরূপ তাহা নির্ব্বিশেষ নহে, পরন্তু সবিশেষ এবং শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত সবিশেষ ভগবৎ-তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিগ্রহে প্রকটিত। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ১।৮)।

যিনি ক্ষর এবং অক্ষর, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত চিৎকণ অক্ষর প্রকৃতি বিশিষ্ট

জীব এবং ক্ষর ভূত-প্রকৃতি সকলকে ভরণ এবং পোষণ করিতেছেন—তাঁহার পরম প্রেম মাধুর্য্যে জীবের পুরুষার্থ লাভ ঘটে। ভাগবতে দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ মুচুকন্দের প্রতি উপদেশকালে বলেন—

"যুঞ্জানানামভক্তানাম্
প্রাণায়ামাদিভির্ম্মনঃ
অক্ষীণবাসনং রাজন্
দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্।"

অর্থাৎ যাঁহারা আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত না হইয়া প্রাণায়ামাদির দ্বারা মোক্ষলাভের চেষ্টা করেন, তাহাদের মন কামনা-বাসনা হইতে মুক্ত হয় না। দেখা যায়, তাহারা পুনরায় সংসারবন্ধনে পতিত হন। শ্রুতি বলেন—পরাবিদ্যার ফলেই এমন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—'পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'—(মুণ্ডক শ্রুতি—১।১।৫)। 'অধিগম্যতে' শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—প্রাপ্যতে।

শ্রুতির পরাবিদ্যাই ভক্তি। শ্রীভগবানকে কিরূপে সুলভে পাওয়া যাইতে পারে অষ্টম অধ্যায়ে ভগবানের নিকট হইতে সেই নির্দ্দেশ মিলিয়াছে। মিলিয়াছে অতি সহজ উপায়টি। পরাবিদ্যার প্রকৃতি এই অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। আমাদের এই জড় মায়ার স্তরেই শ্রীভগবানের আত্মভাবের সম্বন্ধটি স্মরণের মাহাত্ম্যে আমাদের চিত্তে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। স্মরণের এমনই মহিমা। কিন্তু নির্বিশেষ বস্তু স্মরণের দ্বারা তৎসম্পর্কিত কল্পনায় সর্ব্বভাবে আমাদের চিত্ত উদ্দীপ্তি লাভ করে না। বস্তুতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মপরাবিদ্যার পথে বিজিজ্ঞাস্যও নহেন। সে পথে অনন্যাভক্তির অধিকারী হওয়া যায় না। কোন অনির্দ্দিষ্ট বস্তুতে ভক্তি আসে না। আনুমানিক বস্তুতে অহৈতুকী প্রীতির উদ্গম হওয়াও সম্ভব নহে। নবম অধ্যায়ে এই সঙ্কটের সমাধান সাধিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে রাজবিদ্যা এবং রাজগুহ্য তত্ত্বটি আমাদের দৃষ্টিতে

উন্মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গীতোক্ত ধর্ম্মের বীজ এখানে আমরা পাইব। গুহ্যতম পরমতত্ত্বের সঙ্কেতটি এখানে আমাদের চিত্ত-ফলকে ঝলক খেলিবে। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগের এইটিই সার কথা—শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণনাম স্মরণের পথে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে কৃষ্ণবীর্য্যের সংস্পর্শে আমাদের স্বরূপধর্ম্মের উজ্জীবনোপযোগী ভজন-নৈপুণ্যের রীতিটি আমরা অধিগত হইব। সর্ব্বোপনিষদের সিদ্ধান্ত আমাদের দৃষ্টিতে জীবন্ত হইয়া উঠিবে। বস্তুতঃ ভগবানের স্মরণের মূলে তাঁহার বীর্য্যের সংস্পর্শ থাকে অর্থাৎ আমাদিগকে বশীভূত করিবার মত প্রত্যক্ষতা বা রূপ, গুণ, রসের উজ্জীবন বীজ-স্বরূপে কাজ করে। নতুবা ভগবানের স্মরণ হয় না। ভাগবতে দেখা যায়, উদ্ধবের নিকট নন্দমহারাজ বলিয়াছেন—"স্মরতাং কৃষ্ণ-বীর্য্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্, হসিতং ভাষিতঞ্চাঙ্গ সর্ব্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ।" কৃষ্ণনাম স্মরণ করিলেই তাঁহার রূপ, গুণ, লীলারস-সংস্পর্শে জীবের চিত্ত উজ্জীবিত হইয়া উঠে। কৃষ্ণভজন—প্রত্যক্ষাবগম সত্যে এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত—"প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং এবং সুসুখং" অর্থাৎ সাসঙ্গ সে ভজন—সে ভজন সুখকর, শুষ্ক নিরস নয়। পরব্রহ্ম কৃষ্ণ—'সর্ব্বরসঃ সর্ব্বগন্ধঃ' (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪)—রসময় তাঁহার দেহের গঠন, তাঁহার তনু চিদানন্দময়। প্রকৃতপক্ষে 'সাসঙ্গ' বা স্মারসিকী-প্রীতিতে চিত্ত নিষিক্ত না হইলে ভজনে ভক্তির পরিস্ফূর্ত্তি ঘটে না। কৃষ্ণভজনে রস আছে। শুধু তাহাই নহে, রসের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির পথেই সে সাধনের গতি। সে সাধন 'কর্ত্তুমব্যয়ং'। এই সাধন ছাড়া যায় না। মুক্তির পরও সাধন চলে—'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ' মুক্তজীবের পক্ষেও তিনি উপাস্য থাকেন। 'আপ্রায়ণাৎ তত্রৈব হি'—মোক্ষলাভের পরও তাঁহাকে চাই। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য এমনই মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের। এমনই আকর্ষণ তাঁহার সাধনের।

জীবের সহিত সর্ব্বভাবে প্রীতির এই সম্বন্ধটি উজ্জীবিত করিবার জন্যই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় প্রকাশ। তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার

বিলাস। ভাগবতে কুন্তী-স্তোত্রে এই পরম সত্যটি উক্ত হইয়াছে। কুন্তীদেবী বলিয়াছেন—বিশ্বে জীবনিচয় অবিদ্যার প্রভাবে অভিভূত হইয়া কাম্যকর্ম্মে আসক্ত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছিল। তাহাদের প্রতি কারুণ্যবশে তোমার নামটি শ্রবণ এবং স্মরণার্থ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-রূপে তোমার আবির্ভাব। প্রকৃতপক্ষে 'নাম আর তনু ভিন্ন নয়'। স্মরণের ফলে নামের উদ্ভাবন, 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়' এবং 'প্রেমের দৃষ্টিতে হয় স্বরূপ প্রকাশ' মিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি।

সপ্তম অধ্যায়েই ভগবান্ বলিয়াছেন দুষ্কৃতিপরায়ণ মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান এবং অসুর-ভাবাশ্রিত ব্যক্তিরা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে না। নবম অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। আসিয়াছে একটু অন্যভাবে। ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার প্রণিহিত ভক্তিযোগে যাহাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারে না এবং মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে তাহাদিগকে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয়। অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ নিজে যেন পূরাপূরি ধরা দিতে চাহেন নাই। 'যোগ-মায়া-সমাবৃত' থাকার কথা এজন্যই উক্ত অধ্যায়ে উত্থাপন করিতে হইয়াছে। 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং' এই ধরণের উক্তির দ্বারা তিনি সে ক্ষেত্রে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের আবরণটি একেবারে ফেলিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে যেন সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। কিন্তু এ পথে তাঁহাকে খোলা প্রাণে আমরা কেমন ভাবে ভক্তি করিব—বা ভালবাসিব? এক্ষেত্রেও কুন্তীদেবীর ভাগবতী স্তুতি আমাদের পক্ষে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন, তুমি মায়া-যবনিকার দ্বারা আচ্ছন্ন থাক। তুমি অজ, তুমি অধোক্ষজ। অব্যয় তোমার মহিমা। মূঢ় ব্যক্তিরা তোমাকে প্রত্যক্ষ করিবে কি ভাবে? যাঁহারা পরমহংস, যাঁহারা অমলাত্মা তাঁহারাই কি তোমার দর্শন লাভ করিতে পারেন? ভক্তিযোগ-বিধানার্থ তুমি জীবের কাছে আগাইয়া না আসিলে আমাদের উপায় কি? নবম অধ্যায়ে

ভগবান্ এই উদ্দেশ্যেই আগাইয়া আসিয়াছেন। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ'—এই সত্যটি তিনি আমাদের দৃষ্টিতে অসংশয়িত ভাবে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার দিকে তাকাইলেই জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

মর্য্যাদা-পুরুষ—পুরুষোত্তম এই শ্রীকৃষ্ণ। করুণাময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ। নবম অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহার অযাচিত করুণার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার'—আমাদিগকে আপন করিয়া পাইবার জন্য আমাদের উপলব্ধির ঔপয়িক বা উপচার লইয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। সৌলভ্যে, সৌকুমার্য্যে এবং মাধুর্য্যে সর্ব্বভাবে আমরা যাহাতে তাঁহাকে আপন করিয়া পাই, এমনই তাঁহার শ্রীবিগ্রহ। কিন্তু তবুও কি আমাদের চিত্ত গলে ?

না গলে না। ভগবান্ বলিয়াছেন, 'আমি মানুষ . হইয়া আসিয়াছি এজন্য মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে।' প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য স্বীকার করিবার পূর্ব্বে প্রভুর কৃষ্ণচৈতন্য নামটি পুরাপুরি উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। তিনি বহু কষ্টে নামের প্রথমাংশ বর্জ্জন করিয়া 'চৈতন্য' নামটুকু উচ্চারণ করেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র এজন্য মহাপ্রভুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। "প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি। অতএব তাঁর মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুই ত সমান। নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ—অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।" লীলাবিগ্রহ স্বীকার না করিবার ফলেই নামের স্ফুরণ এ ক্ষেত্রে ঘটে না। নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শুধু ইঁহাদের পক্ষেই তাঁহাকে প্রাপ্তির অনধিকারিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার লীলাকে স্বীকার করে না, তাঁহারাই অসুর। ইঁহাদের সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ের ভগবদুক্তিটির

সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? অসুর প্রকৃতি কাহারা? ১১শ এবং ১২শ শ্লোকে মূঢ়, নরাধম, মায়াহৃত-জ্ঞান এবং অসুর এই চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীবিগ্রহের প্রতি অবজ্ঞাকারী শুধু আসুরভাবাশ্রিত ব্যক্তিদের দুর্ভাগ্যের দিকেই আলোচ্য অধ্যায়ে বিশেষরূপে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।"

আমার নিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মায়াতীত পরমভাব যাহারা জানে না সেই সমস্ত বুদ্ধিহীন লোকগণ আমি অব্যক্ত বা প্রপঞ্চাতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ছিলাম, এখন মায়িক আকারে বসুদেব-গৃহে আবির্ভূত হইয়াছি এইরূপ মনে করে। এ ক্ষেত্রে ভগবদুক্তির 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থটি উক্তরূপে গ্রহণ করিতে হয়। অব্যক্ত অর্থাৎ যে বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় না তাহাই অব্যক্ত। শ্রীভগবান্ এইরূপ অব্যক্ত ছিলেন এখন তিনি আমাদের প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এই অর্থ এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করিলে ভগবদুক্তির সম্যক্ সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। কারণ শ্রীভগবান আমাদের চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত নহেন, ইহা তো সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তিনি যাহাকে কৃপা করিয়া দর্শন দান করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। এ সত্য শ্রুতিসম্মত—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" স্মৃতিরও অনুরূপ সিদ্ধান্ত—"তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্"। সুতরাং তিনি লোকলোচনের গোচরীভূত নহেন, যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন, তাঁহাদের উক্তি বুদ্ধিহীন বা অবুদ্ধিজনিত হইতে পারে না। পরন্তু তাঁহাদের উক্তির যাথার্থ্যই স্বীকার করিতে হয়।

অব্যক্ত শব্দের আরও একটি অর্থ হইতেছে প্রধান বা প্রকৃতি বা মায়া। প্রধান বা প্রকৃতি জড় বস্তু। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে এইরূপ জড়বস্তু মনে করেন, ভগবদুক্তিতে তাঁহাদিগকে অবুদ্ধি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অব্যক্ত শব্দের অপর অর্থ হইতে

পারে, নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্ম। নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম লোকলোচনের গোচরীভূত নহেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই কুহকবৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে আমাদের দৃষ্টিতে মায়ার প্রভাবে প্রতীত হইতেছেন, এইরূপ যাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাহারাও অবুদ্ধি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নিঃশক্তিক সুতরাং নিজেকে কৃষ্ণরূপে ব্যক্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ অপ্রাকৃত, তিনি নিত্য। তাঁহার লীলাও নিত্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ। তিনি অব্যক্ত বা নিরাকার। তাঁহার সবিশেষ বা সাকার মূর্ত্তি অনিত্য। তাঁহাকে বিশেষ হইতে হইলে বিকারগ্রস্ত হইতে হয়, হইতে হয় পরিণাম-ধর্ম্মী, হইতে হয় জড়াশ্রিত। মায়াবাদমূলক এইরূপ সিদ্ধান্ত। ইহা স্বীকার করিতে হইলে ব্রজধামে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলা চলে না। তিনি নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য একটি মিথ্যার কুহক-জাল বিস্তার করিয়াছেন— তাঁহার শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভাব, অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার উপদেশ, সবই এই রূপ অবাস্তব, মিথ্যাশ্রিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত শুধু শ্রুতি-স্মৃতি বিরোধী নহে, পরন্তু মানুষের যুক্তি বুদ্ধির পক্ষেও ইহার মূলে সঙ্গতি সাধন করা কঠিন হইয়া পড়ে। যদি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উপদেশ দান ইন্দ্রজালবৎ ক্ষণিক মায়াময় ব্যাপারই হয় তবে আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিলেন একথা বলা যায় কি করিয়া? আচার্য্য শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণলীলাকে মায়াময় বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভাবে জীবের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কৃপাময় শ্রীভগবানের আন্তরিকতা-হীনতাই আমাদিগকে আহত করে। আচার্য্য শঙ্কর বলেন— 'প্রকৃতিং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং'। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বলিতে সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিন গুণকে বুঝায়। সুতরাং তাহা

জড়া বা অনাত্মভূতা। শ্রীপাদ মধুসূদন এই প্রকৃতি বা মায়ার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—মায়ানাম্নী প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দেহবানের ন্যায় হন। এই শক্তি বা মায়া অঘটন-ঘটনপটিয়সী। সরস্বতীপাদের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে মায়ানাম্নী প্রকৃতির এই পরিণাম বিশেষরূপে অভিহিতা শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা হইতে পারে না। কারণ প্রকৃতি জড় বা কর্ত্তৃত্ব-শক্তিহীন। আচার্য্য শঙ্করের মতানুবর্ত্তিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে এইরূপ বহু মতভেদ পরিলক্ষিত হয় এবং শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার না করাই এইরূপ মতভেদের কারণ। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি স্বশক্তি-লেশাবৃতভূতবর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ॥" ৬।৮৪॥

অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক বাসুদেব স্বীয় শক্তির কণামাত্র দ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া বর্ত্তমান। তিনি আপন ইচ্ছায় স্বীয় অভিমত অনুযায়ী বহু দেহ গ্রহণ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। মায়া বলিতে ভগবানের স্বশক্তি বা ইচ্ছাই এক্ষেত্রে বলা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপা-প্রভাবেই নিজেকে পূর্ণস্বরূপে প্রকট করিয়াছেন। সেই শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব এবং চিন্ময়ত্বকে যাঁহারা শ্রুতিস্মৃতিবিরোধী যুক্তিজাল বিস্তারের দ্বারা খণ্ডিত করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

"চিদানন্দ তেঁহো—তাঁর স্থান পরিবার
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।"

প্রকৃতপক্ষে গীতার নবম অধ্যায়ে কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে সর্ববিধ মাধুর্য্য লইয়া আমাদের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন—আমি সর্ব্বভূতের পক্ষেই সমান, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। কিন্তু

যাহারা আমাকে অনন্যাভক্তি সহকারে ভজনা করে, তাহারা আমাকে লইয়াই থাকে এবং আমিও তাহাদের মধ্যেই থাকি। একান্ত ভক্তের জন্য তিনি এমনই আকুল। সকলের আত্মা, এই হিসাবে সকলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সমান; তাহা হইলেও একান্ত ভক্তের ক্ষেত্রে বৈষম্যটি তাঁহারও ঘটিয়া যায়। তিনি বিষম স্বভাব হইয়া পড়েন 'ভক্তপ্রিয়স্ত্বমসি কল্পতরুস্বভাবঃ' ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তিনি কল্পতরু হইয়া পড়েন। ভগবান্ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—'মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তধর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে'—জীব সর্ব্বভাবে আমাতে আত্মনিবেদন করিলে সে আমার 'বিচিকীর্ষিত' হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বিচিকীর্ষিত শব্দটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"বিচিকীর্ষিতো বিশিষ্টং কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি"—অর্থাৎ কর্ম্মী, যোগী বা জ্ঞানীদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাহা করেন, শরণাগত ভক্তের জন্য তাহা অপেক্ষাও বিলক্ষণ বা অতি উত্তম কিছু করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। ভগবান্ ভক্তির বশ—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"। "ভক্তানাং বিনোদার্থায় করোমি বিবিধাঃ ক্রীড়াঃ"—গীতার নবম অধ্যায়ে ভক্ত-ভক্তিমান্ এমন ভগবানকেই আমরা পাইয়াছি। মায়াময় যবনিকার সকল আবরণ অসংশয়িতভাবে উন্মোচন করিয়া আমাদিগকে বরণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি আমাদের কাছে ধরা দিয়াছেন। গীতার অমৃতধারায় উচ্ছ্বসিত ভগবৎ-প্রীতির প্রবাহ-স্পর্শে জগৎ ধন্য হইয়াছে।

ভক্তের জন্য ভগবানের দায়

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার পর্য্যুপাসনাপরায়ণ, তেমন উপাসকগণের যোগক্ষেম তিনিই নিজে বহন করেন। অপ্রাপ্ত আবশ্যকীয় বস্তুর প্রাপ্তিকে যোগ বলা হয় এবং সেই সকল বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নাম ক্ষেম। 'যোগক্ষেম' কথাটি কঠোপনিষদে পরিদৃষ্ট হয় 'প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাৎ বৃণীতে' অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যোগক্ষেম-স্বরূপে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাভিলাষে প্রেয় বা আপাতরমণীয় কাম্যসমূহকে গ্রহণ করে। কিন্তু কোন বস্তু পাইলেই সমস্যা মিটে না, তাহা আবার রক্ষিত হওয়া চাই। ভগবান্ যদি এই ভারটি নিজেই গ্রহণ করেন তবে আর আমাদের চিন্তা করিবার কিছুই থাকে না। কারণ যোগ এবং ক্ষেম লইয়াই তো আমাদের জীবনের যত কিছু সমস্যা। আমরা যাহা পাই নাই তাহা পাইবার জন্য আমাদের প্রাণে অপূরণীয় পিপাসা। আবার যাহা পাইয়াছি তাহাও রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদের পুঁজি কখন আমরা হারাই এই শঙ্কায় প্রাণ আমাদের সর্ব্বদা আইঢাই করে। ভগবান্ আমাদের যোগক্ষেমের ভার অর্থাৎ আমাদের ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সকল প্রয়োজন পূর্ণ করিবার দায়িত্ব নিজেই সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাঁহার এই স্বীকৃতি সর্ত্তাধীন : সকলের জন্য নহে। ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে শুধু অনন্যচেতা ভক্তেরই যোগক্ষেমের ভার নিজের উপর লইতে তিনি প্রস্তুত, অপর কাহারো নয়। এইরূপ অনন্যচেতা ভক্তকেও আবার পর্য্যুপাসনা-পরায়ণ হইতে হইবে। সুতরাং ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। পর্য্যুপাসনা বলিতে কি বুঝায় আগে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং পরে "বহাম্যহম্" অর্থাৎ ভগবানের যোগক্ষেম বহন ব্যাপারটি কেমন ইহাও বুঝিতে হইবে। উপাসনা আমরা করি কিন্তু সে উপাসনা সংসারের : নিজেদের কামনা বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের উপাসনা। এই অবস্থায় দেহ-ব্যতিরিক্ত

নিত্য সত্যের সম্বন্ধে আমাদের কোন অনুভূতি ঘটে না। মনের এই অবস্থায় ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজনে আমাদের প্রচেষ্টাকে আমরা উপাসনা বলি না বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপাসনা তাহাকে বলা চলে। উপ অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম সান্নিধ্যে কোন বস্তুই আমাদের কিন্তু জীবনে মিলে না। কিছু ক্ষণের জন্য আমরা অভীষ্টর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার আশায় ছুটিয়া যাই কিন্তু কোন কিছুই ঘেঁসিয়া মিশিয়া প্রাণ ভরিয়া পাই না। উপ অর্থাৎ নিকটে বসিব এমন আসন কোথাও আমাদের জন্য এখানে নাই। কবি বলিয়াছেন—"রমণী ধরিলে ক্রোড়ে সব বুক নাহি জোড়ে।" একমাত্র ভগবানই আমাদের আত্মার আত্মা। "কান্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যং"—ভাগবতে পিঙ্গলার এই বাণীর মূলীভূত সত্যটি আমরা বুঝি না, এই জন্যই আমাদের জীবনের যত গ্লানি। ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি উপদেশ কালে ভগবান বলিয়াছেন—নৃদেহ লাভ করা সুদুর্ল্লভ, মনুষ্য জন্ম পাইয়া যিনি গুরুকৃপা লাভ করিয়াছেন, সংসার-চক্র অতিক্রম করিয়া নিত্য সত্যে সংস্থিতি লাভ করা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য ভগবতী গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, গার্গি, অক্ষরস্বরূপ শ্রীভগবানকে উপলব্ধি না করিয়া যাহাকে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় সে বড় দুর্ভাগা। এই বিষয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই। গুরু-কৃপার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ স্বয়ং আগ্রহান্বিত হন। গুরুরূপী ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিজ মাধুর্য্য আস্বাদনের প্রয়োজনে ভগবান জীবের আনুকূল্য করিতে উন্মুখ হইয়া থাকেন। ভক্ত শ্রীভগবানের নিজতত্ত্ব। সে অবস্থায় জীব অনাদিবহির্ম্মুখতাবশতঃ ভগবানের প্রাতিকূল্যপ্রবণ হইলেও তাহার সেই প্রতিকূলতা ভগবানের দৃষ্টিতে পড়ে না। জীব যেমন হোক্, তাহার চিন্তার রাজ্যে ভগবান অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবানকে আশ্রয় করিলেও জীব তাহার চিন্তার ক্ষেত্রে ভগবানের সর্ব্বতোময় প্রভাব উপলব্ধি করে না; কারণ সে ক্ষেত্র দেবমায়ায় পরিচ্ছিন্ন থাকে। প্রকৃতপক্ষে গুরু-কৃপায় চিত্ত নিষিক্ত

হইলে জীবের জড় মনের এই স্তরে পরাবরস্বরূপে সর্ব্বভাবে নির্ভরযোগ্য ভগবৎ-তত্ত্বের অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্য উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। সকলভাবে ভগবান জীবের চিত্তে ব্যক্ত হন। সুতরাং গুরুকৃপাশ্রিত সাধনাটিই ভগবানের পর্য্যুপাসনা অর্থাৎ তেমন সাধনাতেই ভগবানের সর্ব্বতোময় আত্মভাবে জীবের সাধনা পরিপূর্ত্তি লাভ করে এবং জীব নিত্য অভিযুক্ত অবস্থায় ভগবানের ঘনিষ্ঠতা পায়।

পর্য্যুপাসনা বলিতে কি বুঝায় সে বস্তু এতদ্বারা আমাদের উপলব্ধিতে আসিল। কিন্তু বহনটি কেমন? ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে অনন্যচেতা ভক্তের কখন কি প্রয়োজন ভগবান নিজে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং সেগুলি মিটাইবার দায় তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। তেমন সাধকের চিত্ত সব সময় শ্রীভগবানে অভিনিবিষ্ট থাকার ফলে শারীরিক বা পরিবারিক প্রয়োজন পূর্ণ করিবার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। ইহার ফলে তাঁহাদের প্রত্যবায় ঘটা সম্ভব। তদ্ব্যতীত তাঁহার জীবন ধারণ করাও কঠিন হইয়া পড়িতে পারে। ইঁহাদের দিকে ভগবানের নিজেরই দৃষ্টি থাকে। তিনি তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা নিজেই দেখেন। প্রকৃতপক্ষে তেমন সাধকদের যোগক্ষেম বহন করিয়া ভগবান্ যেন নিজেই কৃতার্থ হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-লীলায় "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই ভগবদুক্তির যাথার্থ্য বিনিশ্চিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রভুর শ্রীমুখে এতৎসম্পর্কিত উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীবাস ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাহার পরিবারের জীবিকার সংস্থান ঘটিবে কিনা এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্দেহ প্রকাশ করেন।

"এইমাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন
হুঙ্কার করিয়া উঠে শ্রীশচীনন্দন।
প্রভু বলে—'কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস
তোমার কি অন্ন-দুঃখে হৈব উপবাস।

যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে।
আপনেও গীতাতে যে বলিয়াছোঁ মুই
তাহা কি শ্রীবাস সব পাসরিলি তুই ?
যে জন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়া
তারে ভক্ষ্য দেঙ মুই মাথায় বহিয়া।
যে মোরে চিন্তয়ে—নাহি যায় কারো দ্বারে
আপনে আসিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি মিলে তারে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে 'বহাম্যহম্' প্রতিশ্রুতির অর্থটি পাওয়া গেল। পর্য্যুপাসনা কি বস্তু প্রভু শ্রীবাসের মাধ্যমে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে
তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে।
মোর সুদর্শন-চক্র রাখে মোর দাস
মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ।
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ
তাহারেও করোঁ মুই পোষণ পালন।
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়
অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ়।"

এক্ষেত্রে 'সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়' বলিতে গুরুপদাশ্রিত ভক্তই নির্দ্দেশিত হইয়াছেন এবং প্রভু তেমন ভক্তেরই যোগক্ষেম বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন বুঝিতে হইবে। গীতার ভগবৎ-কর্ম্মের প্রসঙ্গ যেখানেই অবতারণা করা হইয়াছে, শ্রীভগবানের অসঙ্গ এবং অনাসক্ত বা নির্লিপ্ত ভাবটির উপরই সে ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তিনি ভূতভৃৎ হইয়াও 'ন চ ভূতস্থঃ'। ভগবান বলিয়াছেন, ত্রিলোকে তাঁহার পক্ষে কোন কর্ত্তব্য নাই। তাঁহার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি তিনি অনলসভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছেন, কারণ তিনি যদি

তাহা না করেন, তবে মানবগণ তাঁহারই অবলম্বিত পথের অনুবর্ত্তন করিবে। ইহার ফলে লোকস্থিতিকর কর্ম্মের অভাবে লোক সকল উৎসন্ন যাইবে। এ-সব ক্ষেত্রেই শ্রীভগবানের উক্তিতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য-মর্য্যাদার ভাবটি পরিস্ফুট রহিয়াছে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে তাঁহার লোককল্যাণমূলক আত্মস্বরূপ সমধিক প্রকট এবং এই মর্য্যাদা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে মাত্র। নবম অধ্যায়ের এই শ্লোকটি এই হিসাবে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বস্তুতঃ 'বহাম্যহম্' এই ভগবদুক্তিতে এ ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের পারতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। 'অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ' ভাগবতে দেখিতে পাই ঋষি দুর্ব্বাসার নিকট ভগবান এই কথা বলিয়া তাহার প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীভগবানের ভক্ত-পারবশ্যের এমন মাধুর্য্য বীর্য্য এ ক্ষেত্রে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে ভগবানের নিজের কিছুই চাহিবার নাই কিন্তু একটি জিনিষ তিনি চাহেন, তিনি চাহেন প্রেম। প্রেমের তিনি ভিখারী। প্রেমের জন্য তাঁহাকে ভক্তের কাছে যাইতে হয়। তিনি ভক্তপ্রিয়। তিনি ভক্তাধীন। জীবের প্রতি করুণা শ্রীভগবানের স্বরূপধর্ম্ম। ভক্ত জীবের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করেন এজন্য ভক্ত তাঁহারও উপকারক। এই উপকারের জন্য শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকেন এবং ভক্তের জন্য কিছু করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। গীতায় এই শ্লোকের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের ভক্তপারবশ্য এবং সেই সূত্রে জীবের সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরের করুণার অনিরুদ্ধ উৎসটি উন্মুক্ত হইয়াছে। আচার্য্যের আনুগত্য অবলম্বন করিলে জীব অযাচিতভাবে তাহার কৃপা কেমন করিয়া পায় শ্রীভগবানের মুখে তাঁহার মুক্ত প্রাণের এমন উক্তিতে মর্ত্ত্য জগতে আমরা পরম অমৃতের স্পর্শ লাভ করিয়াছি। "শৃন্বন্ গৃন্বন্ সংস্মারয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপানি চ মঙ্গলানি তে, ক্রিয়াসু যস্ত্বচরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে" ভাগবতের এই উক্তি অনুসারে

শ্রীভগবানের চিন্তা এবং শরণাগতির পথে তাঁহাকে উপাসনার আশ্রয়-স্বরূপে ভক্ত বা গুরুই উপদিষ্ট হইয়াছেন। কারণ ভগবানের নাম শুনাইবার এবং নামের ভাবটি মনে লাগাইয়া নামের উচ্চারণ-সম্বন্ধে চিত্তের উজ্জীবন-সূত্রে তাঁহার স্মরণ এবং নামের অর্থকে আমাদের অন্তরে চিন্তার যোগ্য করিবার অধিকার শুধু ভক্ত বা গুরুরই রহিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা এইভাবে সদ্‌গুরুতে প্রপন্ন হইয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদের ভার গ্রহণ করেন, এই সত্যই গীতার ভগবদুক্তিতে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ তাহার পর জাগে চিন্তা, কারণ চিন্তা শুধু মনের ক্রিয়ায় নিবদ্ধ থাকে না, তাহা দেহের সম্বন্ধে জড়িত ব্যাপার। গুরুকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সাধনা জীবনে সত্য হয় এবং গুরুর আত্মভাবোদ্দীপ্ত আচরণে তাঁহার দেহের অনুধ্যানের আবিষ্টচিত্ততায় ভগবদুপাসনা আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে পর্য্যুপাসনায় সার্থকতা লাভ করে। এই অবস্থায় অনন্যচেতা সকল সাধকের নিজের সম্বন্ধে চিন্তার গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন সাধকের দেহরক্ষার চিন্তাটি চিন্তামণি যিনি, তাঁহারই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে। এইরূপ গুরুকে আশ্রয় করিয়া ভগবান জীবকে তাঁহার নিজ বীর্য্য-মাধুর্য্যে বরণ করেন। গুরুকৃপানিষ্ঠ সাধকের দেহরক্ষার প্রয়োজন তিনিই পূরণ করেন। বস্তুত যে দেহকে অবলম্বন করিয়া তিনি গুরুনিষ্ঠ সাধককে এইভাবে পালন এবং পোষণ করেন, সে দেহটিও তাঁহার চিন্ময় এবং সাধারণ নরদেহ নয়। ভাগবতে দ্বারকাবাসীদের ভগবৎ-বন্দনাতেও এই একই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন, "ভবায় ন স্তং ভব বিশ্বভাবন, ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা ত্বং সদ্‌গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম।" বিশ্বভাবন, তুমি নিজে আমাদিগকে ভব-বন্ধন হইতে মোচন কর। তুমিই আমাদের মাতা, তুমিই সুহৃৎ, তুমিই পিতা। তুমি সদ্‌গুরুরূপে প্রকটিত হও, তবেই তোমার অনুবৃত্তির পথে আমাদের জীবন সার্থকতা লাভ করিবে।

শ্রীভগবান্ এমনই ভক্তাধীন। ভক্তরূপী গুরুর একান্তভাবে আনুগত্য অবলম্বন করিলে তাঁহার কৃপায় এমনই অঘটন ঘটে এবং আজও ঘটিতেছে। "ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়"—ভক্তের জন্য তিনি ঘাড়ে করিয়া মোট বহন করেন, ইহা একান্ত সত্য। সাধু-মহাজনগণের জীবনী হইতে এমন অসংখ্য প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। ভক্তমাল গ্রন্থে অর্জ্জুন মিশ্রের কথা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবানের আগ্রহ এমনই অতন্দ্রিত রহিয়াছে। গুরু ভগবানেরই ব্যক্তভাব। গুরুরূপে আসিয়া আমাদের জন্য অন্তরের আকুল বেদনা তিনি ব্যক্ত করিতেছেন। এসব দেখিয়াও আমাদের মন তাঁহার জন্য গলে না। আমরা এমনই হৃদয়হীন। গীতায় তাঁহার শ্রীমুখে উচ্চারিত অভয়বাণী দুর্গত জীবনের ক্রূরতার এই গ্লানি-ভার হইতে কবে আমাদিগকে মুক্ত করিবে; কবে আমরা তাঁহার দিকে তাকাইব?

ভগবানের ক্ষুধা

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করে, আমাতে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিবেদনকারী পুরুষের সেই সব ভক্তিসহকারে উপহৃত দ্রব্য আমি আহার করি। ভগবানের এমনই ক্ষুধা! আমার ক্ষুধা, তোমার ক্ষুধা সাময়িক, অন্ততঃ তাহার একটা সীমা বাঁধিয়া দেওয়া চলে, কিন্তু ভগবানের ক্ষুধা যে কেমন বিশ্বগ্রাসী এবং চিরন্তন তাঁহার এই উক্তি হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কোন্ বস্তু আহার্য্য, কোনটি আহার্য্য নহে, এই বিচার করিয়া আহার করিয়া থাকি ; কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় ভগবানের তেমন বিচারও বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভক্তের সম্পর্কে তাঁহার বুভুক্ষা তাঁহাকে এমনই কাণ্ডজ্ঞানহীন করিয়া ফেলে। ভক্তের প্রদত্ত ফল, জল সম্বন্ধে তো কথাই নাই, ভক্তের দেওয়া পুষ্প, পত্রটি পর্য্যন্ত তিনি আগ্রহাতিশয্যে উদরস্থ করেন। শাস্ত্রে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ভগবানের অন্ন অর্থাৎ তাঁহার আত্মভোগেচ্ছাই বিশ্বরূপে প্রকটিত হইয়াছে। মহাজনগণ বলেন ঈশ্বর পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি সমস্ত যুগপৎ ভক্ষণকারী। ভগবানের এই ভক্ষণ বলিতে তিনি আমাদের আত্মসম্বন্ধ আস্বাদনে নিত্য উন্মুখ ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ক্ষুধিত ব্যক্তির পক্ষে ভোজন যেমন তাহার প্রাণধারক, সেইরূপ জীবের রক্ষণ এবং পরিপোষণ ভগবানের স্বরূপ-ধর্ম্ম। এটি না করিলে তিনি বাঁচেন না এবং যিনি আত্মমাধুর্য্য আস্বাদনের এই কার্য্যে তাঁহার পোষকতা করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ওঠেন। "বুভুক্ষিত কিং ন করোতি পাপং"। ক্ষুধার তাড়নায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান থাকে কাহার ? সে ক্ষুধাও আবার যেমন তেমন ক্ষুধা নয়—বিশ্বগ্রাসী বৈশ্বানর! ভগবানের এমন ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যিনি আগাইয়া আসেন, এমন যিনি তাঁহার উপকারী, তিনি যাহা কিছু দেন, ভগবান্ তাহাই আগ্রহাতিশয্যে গলাধঃকরণ করেন। সত্যই তো, সকলেই

আমরা নিজেদের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য অহোরাত্র তৎপর রহিয়াছি। বেচারা ভগবানের দিকে তাকায় কে ?

বিশ্বগ্রাসী ভগবানের ক্ষুধা। "যাবৎ ক্ষুধস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতি নন্থ ভক্ষ্যপেয়ে"—ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার কাছে ভক্তের প্রদত্ত সবই সুধা। এক দল তুলসী এবং এক গণ্ডূষ জল পাইলেই দয়ার ঠাকুর সন্তুষ্ট—"অল্প সেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ", স্বয়ং নারদ ঋষির এই উক্তি। ভগবানের প্রধান গুণ হইল এই যে, তিনি পরম কৃতজ্ঞ। উক্ত দুইটি বস্তু পাইলেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন। ভক্ত-ভগবানে ক্রয়-বিক্রয়ের এমন কারবারের কথা আমাদের পক্ষে একান্তই যে অপরিজ্ঞাত, ইহা কেমন করিয়া বলিব ? অদ্বৈতাচার্য্যের কাছে তিনি নিজকে এই কারবারেই তো বিকাইয়া দিয়াছিলেন। "জল-তুলসী সম কিছু ঘরে নাহি ধন, তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।" যুগে যুগে শ্রীভগবানের অবতরণের জন্য দেবগণ ক্ষীরোদ-সাগরে গিয়া দরবার করিয়াছেন। কিন্তু গৌর-লীলায় পরম একটি অঘটন ঘটিয়া গেল। স্বয়ং মহাবিষ্ণু এবার ভগবানের কাছে প্রার্থনাপরায়ণ হইলেন। মর্ত্ত্যভূমিতে আসিয়া তিনি নিজে ভক্ত হইয়া জল-তুলসী নিবেদন করিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। সেই হুঙ্কারে অপরা প্রকৃতির অভিভূতির স্তরেও জীবের অন্তর-তলে ভগবৎ-ভক্তির গাঢ় এবং গভীর সংবেদন সঞ্চারিত হইল। 'ভক্তিরেনং নয়তি' অদ্বৈত প্রভুর আহ্বানে ভগবানকে বিশ্বজীবের জন্য আকুল আগ্রহে আত্মভাবের মহিমাকে ব্যক্ত করিয়া পৃথিবীতে আসিতে হইল।

গীতোক্ত ভগবদ্ভক্তির রহস্য গৌরলীলার পরম মাধুর্য্যের তাৎপর্য্যে নিহিত রহিয়াছে। গীতার নবম অধ্যায়ের ষড়বিংশতিতম শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তিটি বিশ্লেষণ করিলে উহার কয়েকটি শব্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অর্পণ করিলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট ; কিন্তু সেই সব বস্তু ভক্তির সহিত প্রদত্ত হওয়া প্রয়োজন

এবং ভক্তিরসে বিদ্রাবিত অন্তরের উদ্দীপনায় উপহৃত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভক্তি এই বস্তুটি মিলে কোথায়? উত্তর এই যে, যিনি প্রযতাত্মা তিনিই উক্ত ভক্তি লাভ করিতে পারেন। ভক্তি বাজারে ক্রয় করিবার বস্তু নয়। ভক্তি ভগবানেরই স্বরূপ-শক্তিতে নিহিত এবং সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহার আশ্রয় হইতেই ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হয়। ফলতঃ ভগবানের মাধুর্য্য যাহাকে প্রকৃষ্টরূপে আকর্ষণ করে তিনিই ভক্তিলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। "প্র" অর্থাৎ সর্ব্বাতিশায়ী সেই আকর্ষণ তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে শ্রীভগবানে যত বা তদ্গত করে। এই ভাবে সাধকের দেহ, মন, প্রাণ শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভাবে ঘনিষ্ঠতা পায়। ভগবৎ-ভক্তির উচ্ছল প্রবাহে তাহার হৃদয়গ্রন্থি বিদারিত হয়। ভক্তির সর্ব্ববিপ্লাবী এমন পাবনীধারা সাধকের হৃদয় ছাপাইয়া উদ্বেলিত হয় এবং সেই তরঙ্গের বিভঙ্গী তাঁহার প্রতি অঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। থাকে শুধু মন, দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মুক্ত মন—শুদ্ধ মন। মন এই ভাবে শুদ্ধতা লাভ করিবার ফলে শুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত ভক্ত-চিত্তের সংযোগ ঘটে। মনের গভীর গহনে অনুভূত হয় কম্পন। সেই কম্পনে কম্পনে আত্ম-সংবেদন। সেই সংবেদনে জড়াইয়া মন যেন নিজকে হারাইয়া ফেলিতে চায়। মনের মূলে সন্ধান মিলে সুর—মধুর মধুর। সেই সুরে শ্রীবিগ্রহের নামটি ফুটিয়া উঠিতেছে উপলব্ধি হয়। কম্পনে কম্পনে নামের শ্রবণ—"সশবদ ঘন ঘন বহই সমীরণ"। "মনস্পর্শঃ-স্মিতেক্ষণং"—শ্রবণপথে স্বর বা নামের কম্পনটী রঙ্গময় বিভঙ্গীর সান্দ্র-সংস্পর্শে সাধককে আত্মলীন করিতে উদ্যত—অপরিসীম আগ্রহে। এ কি গ্রাস! দেহ, মন, প্রাণেন্দ্রিয় মন্থন করিয়া মন্ত্রমূর্ত্তিতে প্রেমের দেবতার প্রকাশ; ভক্তের দেহ লইয়া তাঁহার বিলাসের আকৃতির রীতিতে প্রচণ্ড উদ্দাম এবং পরম উল্লাস। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অচিন্ত্য, উন্মদ ভগবৎ-প্রেমের এমন উচ্ছল রসে ভক্তের সমগ্র পরিবেশটি হয় চিন্ময়। ভক্তপ্রদত্ত পূজার উপচারও

চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানের শ্রীঅঙ্গ-সেবার দিব্যরসে সাধককে উজ্জীবিত করে। তাঁহার প্রদত্ত উপচার সে অবস্থায় আত্মময় হইয়া যায় এবং দ্রব্যের সহিত তিনিও আত্মরসে একীভূত শ্রীভগবানের সেবার উপচার হইয়া পড়েন। ভগবৎ-প্রেমের এমন প্লাবনে তিনি নিজেকেই দান করেন; ভক্তের অনুভূতিতে ভগবানের সর্ব্বতোময় প্রেমের মাধুরী খুলিয়া যায়। ভক্তিরসে বিদ্রাবিত ভক্তচিত্তের আবেগোদ্দীপ্ত উপচার এই ভাবে শ্রীভগবানে উপহৃত হইয়া ভক্তবাৎসল্য আস্বাদনে ভগবানকে আকুল করিয়া তোলে। ভক্ত অব্যবহিতভাবে তাঁহার প্রতি অঙ্গ দিয়া ভগবৎ-সেবার রস আস্বাদন করেন। শ্রীভগবানের রূপে, গুণে এমনভাবে আকৃষ্টচিত্ত যিনি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্তুতি—নতির পথে তাঁহার পক্ষেই ভগবৎ-বিগ্রহ সেবার পরিপূর্ত্তি সম্ভব হইয়া থাকে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎ-বিগ্রহ সেবা অল্পাধিকারীর সাধন-ক্রম নয়, পরন্তু তাহাতে ভগবৎ-প্রেমের ক্রম-বিক্রম পরাকাষ্ঠা লাভ করে এবং জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাই পরম প্রয়োজন। শ্রীল সনাতনের প্রতি উপদেশ-সূত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবের প্রতি এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার, উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার"। প্রভুর উপদেশে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাধু-গুরুর কৃপা না হইলে শাস্ত্রযুক্তিতে শ্রদ্ধা দৃঢ়তা লাভ করে না। শ্রদ্ধা দৃঢ়তা লাভ না করিলে বিগ্রহে ভগবৎ-বুদ্ধি জাগ্রত হয় না। প্রভু এজন্য সাধু-গুরুর মুখে ভগবানের নাম শ্রবণকে এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়াছেন।

প্রত্যুত গুরুমুখোচ্চারিত নাম শ্রবণে প্রত্যক্ষানুভূতির পরমরসে বিগ্রহানুভূতি সার্থকতা লাভ করে। শাস্ত্রে ইহাকেই আনুশ্রবিক কর্ম্ম বলা হইয়াছে। ভাগবতে সনৎকুমার মহারাজ পৃথুর কাছে তত্ত্বটি ব্যক্ত করিয়াছেন। "গুরুমুখী নাদং গুরুমুখী বেদং"। নানকের মুখেও এ সংবাদ আমরা পাই। বেদ-বিহিত কর্ম্মের ইহাই তাৎপর্য্য। নামে

রতি সূত্রে গুরুভক্তি যাহার চিত্তে উদ্রিক্ত হয় নাই, বিগ্রহ-সেবায় তিনি অধিকারী নহেন। ভক্তে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা জাতিবুদ্ধি এবং বিগ্রহের উপাদানের বিচারে প্রবৃত্তি থাকিতে ভগবানের কৃপা মিলে না। প্রকৃতপক্ষে, এই দুই একই অসহ্য ভগবদপরাধের এপিঠ ওপিঠ। সত্য এই যে, অনুগ্রহকে অবলম্বন করিয়া জাগেন বিগ্রহ। ভক্ত শ্রীভগবানের অনুগ্রহ মূর্ত্তি। ভক্তমুখে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণের ফলে আমাদের চিত্তবৃত্তি ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, ক্রমে আমাদের অন্তর হইতে তাঁহাদের মর্ত্ত্যবোধগত উপাদান বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। ভক্ত বা শ্রীগুরুর সম্বন্ধে মর্ত্ত্যবুদ্ধি উপগত হইলে মূর্ত্তিতে চিদৈশ্চর্য্য-পরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহের স্ফুরণ ঘটে। "দেবানাং গুণ-লিঙ্গানাং আনুশ্রবিক কর্ম্মনাং"—আনুশ্রবিক কর্ম্মের ফলে সাধক দিব্য গুণলিঙ্গ লাভ করেন। তাঁহার অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। তাঁহার দৃষ্টিতে শ্রীভগবানের দিব্য-মাধুর্য্য উন্মুক্ত হয়। এইভাবে অনুগ্রহ এবং বিগ্রহ দুই-ই প্রত্যক্ষাবগম সত্য এবং একত্বে চিন্ময় লীলায় প্রমূর্ত্ত হইয়া থাকে।

ভাগবতে দেখিতে পাই, ভগবান কপিল তাঁহার জননী দেবহুতির নিকট বলিয়াছেন, সাধকের চিত্ত ভগবানের গুণ শ্রবণে অভিনিবিষ্ট হইলে তিনি শ্রীবিগ্রহে শ্রীভগবানের রুচির রূপ দর্শন করেন। তাঁহার সঙ্গে সাধকের বাক্যালাপেও মনের সাধ মিটে। "ভগবামের নাম, বিগ্রহ-স্বরূপ, তিনে ভেদ নাহি তিনে চিদানন্দ রূপ।" ফলতঃ নামটি আমাদের কাছে মধুর হইলে ভগবান আর দূরে থাকিতে পারেন না। তিনি উপদেষ্টা আচার্য্যরূপে আমাদের কাছে ধরা দেন। অনুগ্রহকে অবলম্বন করিয়া বিগ্রহের প্রকাশ ঘটে। গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির বিলুপ্তির বীর্য্য-সংস্পর্শে ভগবৎ-বিগ্রহের মাধুর্য্য-লীলা চাতুর্য্যে প্রকটিত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুগ্রহ এবং বিগ্রহ দুই-ই প্রেমের মূর্ত্তি—নামাশ্রয়ে অদ্বয় চিন্ময়রসে ঘটে লীলার স্ফুর্ত্তি। 'কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার'। নামরসে ডুবিয়া যিনি নিজেকে রূপ দিতে পারিয়াছেন তিনিই সৎগুরু। গুরুর দিকে তাকালেই নাম এবং নামের ছন্দে সমাত্মসম্বন্ধে

জাগেন নামী। যেখানে নাম সেখানেই ভগবান। কারণ তাহার ক্ষুধার অন্ন প্রেমবস্তুটি তিনি সেখানে পান। অন্ন পাইলেই তিনি দাতার কাছে আত্মদানে আকুল হইয়া পড়েন, উপাদানের সকল বিচার লয় করিয়া যিনি সর্ব্বকারণকারণ, বিশ্বের যিনি নিমিত্ত-তত্ত্ব, আপন মাধুরীতে তিনি সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠেন। ভগবৎ-বিগ্রহ সেবায় যিনি এই প্রকামতত্ত্বের খেলা উপলব্ধি করিয়াছেন, সৎগুরুর আশ্রয়ে ভগবানের ক্ষুধার তাৎপর্য্য যিনি বুঝিয়াছেন এবং সেই ক্ষুধা মিটাইতে প্রযত্নপর হইয়াছেন, ক্ষুধাতুর ভগবানের মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্যে যিনি মজিয়াছেন, তিনিই ধন্য।

অগতির গতি

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, অত্যন্ত যে দুরাচারী সেও তাঁহাকে পায়। বড়ই ভরসার কথা। কারণ অশেষরূপে আমরা অসৎবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়িয়া আছি। আমরা অসৎ, আমরা অসদাশ্রিত। আমরা সদাচার-সম্পন্ন হইব এবং তেমনভাবে সাধন ভজন করিব, এমন ভাগ্য আমাদের নাই। শ্রীভগবানের মুখে আমরা এমন আশ্বাস পাইয়াছি যে, আমাদের ন্যায় দুরাচারী সমাজের সকলের পক্ষে বর্জ্জনীয় হইলেও তিনি আমাদিগকে বর্জ্জন করেন না। পাপীর জন্যও শ্রীভগবান্ তাঁহার বুকে নিরন্তর বেদনা বহন করেন। জীব তাঁহাকে কামনা করুক বা না করুক, ভগবান্ তাঁহাকে আপন করিয়া পাইবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত। বস্তুতঃ তৎপ্রতি জীবের বৈমুখ্য বা আভিমুখ্যের বিচারের অপেক্ষা এক্ষেত্রে নাই। তাঁহার দৃষ্টি সব সময়ই জীবের দিকে আছে। অনাদিকাল হইতে জীব ভগবৎ-ব্যতিরিক্ত বিষয়ে আসক্ত বা ভগবৎ-বিমুখ। এই অবস্থাতেও জীব যদি একবার ভগবানের দিকে তাকায় তবেই তিনি নিজেকে কতই যেন কৃতকৃত্য মনে করেন এবং তিনি ছুটিয়া আসিয়া জীবকে কোলে তুলিয়া লন। জীবের সহিত শ্রীভগবানের নিত্য এই সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধ-সূত্রেই তিনি প্রেমময়, দয়াময়; তিনি অধমতারণ পতিতপাবন। নহিলে ভগবৎ-তত্ত্বের মাধুর্য্য, ঔদার্য্য এবং সর্ব্বাতিশায়ী বীর্য্য সম্বন্ধে বেদোক্ত সকল সংজ্ঞা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। "কৃপা বিনা ঈশ্বর-তত্ত্ব কেহ নাহি জানে"—এই সব শাস্ত্রোক্তি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে একটি, তাহা এই যে, জীবের জন্য শ্রীভগবানের করুণা যদি এমনই অনপেক্ষ, অকুণ্ঠ এবং অযাচিত, তবে আবার এত রকম সর্ত্ত কেন? গীতার দেবতা এক্ষেত্রেও একটি সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কৃপা পাইতে হইলে জীবকে অনন্যভাক্ হইতে হইবে। সে যদি অনন্যভাক্ হইতে পারে অর্থাৎ অনন্যানুরক্ত হইয়া

তাঁহাকে ভজনা করিতে পারে, তবে তাহার দুরাচারতা ভগবৎ-প্রেম লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে না। অন্তরে এইরূপ অনন্যানুরক্তি লইয়া যিনি ভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহাকে সাধু বলিয়াই সম্মান করিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে, ভগবৎ-প্রাপ্তির পক্ষে সর্ব্বপ্রযত্ন তাঁহার জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীভগবানে কাহারা এইরূপ অনন্যভাক্? কাহারা তাঁহার অনন্যানুরক্ত এমন সৌভাগ্যবান্ ভক্ত?

বাস্তবিকপক্ষে জীব যদি একান্তভাবে ভগবানকে চায়, তবে সেই মুহূর্ত্তেই সে পায়। Newman-এর ভাষায় বলা যায়—"One step is enough for me."—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" কারণ ভগবৎ-প্রেম জীবের পক্ষে স্বভাবনিষ্ঠ সত্য বস্তু, আগন্তুক পদার্থ নয়। সুতরাং—"হৈলে তাঁহার যোগ, না হয় কভু বিয়োগ।" জীবের অন্তরে ভগবানের জন্য বেদনা সত্য হইয়া উঠিলে শ্রীভগবানের আত্মভাবে সে প্রভাবিত হয়; ভগবৎ-সেবা তাহার জীবনে সমগ্রভাবে সত্য হইয়া উঠে। তাহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তাহার দেহেন্দ্রিয়-সম্পর্কিত সকল প্রচেষ্টা ভগবৎ-ভাবে ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। সে যে দিকে তাকায়, ভগবানকেই দেখে, সকল ভাবে সে ভগবানকেই পায়। দুরাচার যে, ভগবৎ-মাধুর্য্য আস্বাদনে তাহারও রহিয়াছে এমন অধিকার।

সে কথাই বা কেন? ভগবৎ-প্রেমের মাধুর্য্য, তাহার প্রাচুর্য্য এবং বীর্য্য-সংস্পর্শ লাভের বিশেষ অধিকার দুরাচার যে তাহারই রহিয়াছে, ইহাও বলা চলে। কারণ তাহারই অন্তরে জাগিয়া উঠে ভগবানের জন্য হাহাকার। সকলে তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছে, এজন্য সে যে একান্ত অসহায়। তাহার মর্ম্মমূল মন্থন করিয়া উঠে ভগবানের জন্য বেদনা। সে যে দিকে তাকায় কাহাকেও আপনার করিয়া পায় না। সে সর্ব্বত্র লাভ করে লাঞ্ছনা, সকলে করে তাহাকে তাড়না, এজন্য নিখিলাত্ম দেবতার অভিমুখে যে তাহার সমগ্র চেতনা স্বভাবতই ছুটিয়া যায়। সকলের যিনি আপন তাঁহার জন্য তাহার বুকে ব্যথার আগুন

জ্বলিয়া উঠে। তাহার মন-প্রাণ তাঁহার জন্য কাঁদে। তাহার দুষ্কৃতির ভার কে লইবে? নিজের দুরাচারতা এবং দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে তাহার এই চেতনায় সে অন্তরের মূলে প্রাণের দেবতাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে। সাধনার হিসাব করিয়া নয়, তপস্যার বিচারে নয়, নিজের পাপের ভারে ক্লিষ্ট হইয়া সে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া এই সত্যের সান্নিধ্য সম্বন্ধে অনুভূতি পায়। প্রেমের ঠাকুর নিজে আসিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লন। আমরা শাস্ত্র পাঠে জানি, 'সাধুদের হিত আর দুষ্টের সংহার'—এজন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু এই সাধু কাহারা? কি তাঁহাদের লক্ষণ? নিজেদের দুরাচারতা যাঁহারা মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন—ভগবানের জন্য বেদনা যাঁহাদের মর্ম্মমূল মন্থন করিয়াছে, নিজেদের পাতকের দুর্ব্বহ গ্লানিভার বহন করিতে করিতে যাঁহারা নিজেদের অসহায়ত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং ভগবানের জন্য কাঁদিয়াছেন, ভগবান্ বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নিজে আসিয়া তাঁহাদের চোখের জল মুছাইয়াছেন এবং তাঁহারাই যে সাধু এই সত্য আত্মলীলায় প্রমূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। গীতায় ভগবদুক্তিতে জীবের সম্বন্ধে ভগবানের এই অচল ভাবটি প্রকটিত এবং সেই সূত্রে শাশ্বত মানবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে জীবের দুরাচারতার উপলব্ধিই তাহার অন্তরে শ্রীভগবানের কৃপার সংবেদন সম্বন্ধে তাঁহাকে সচেতন করিয়া তোলে এবং এই সংবেদনের সূত্রে তাহার মনের মূলে জাগ্রত আকৃতিতে অনন্যানুরক্তির পথটি উন্মুক্ত হয়। এই অবস্থা জীবের অন্তরে ভগবৎ-স্বীকৃতিকে একান্ত করিয়া তোলে। জীব তাহার দুরাচারতার অনুভূতির প্রতিবেশে বিশ্বাত্ম-দেবতাকে পতিতপাবনস্বরূপে আপন করিয়া পায়। অবস্থার চাপে পড়িয়া সে হয় শ্রীভগবানের প্রতি অনন্যভাক্; সে লাভ করে ভগবানে অনন্যানুরক্তি। জীবের পক্ষে ইহাই জ্ঞানদশা। এই দশায় জীবের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হইলে

ভগবৎ-কৃপার স্পর্শে জীব সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সর্ব্বেশ্বরস্বরূপে ভগবানকে অনুভব করে। তখন সে সদাচার এবং কদাচার উভয় অবস্থার ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে জীবের নিজের আর কিছু করিবার থাকে না, বস্তুতঃ তাহার জন্য যত কিছু ভগবানই করেন। ভগবৎ-কৃপার এই ব্যক্ত ভাবটির সহিত যিনি যুক্ত হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভক্ত। এ পথে প্রধান অন্তরায় হইল অহঙ্কার। জীবের অন্তর হইতে অহঙ্কার-জনিত দুরাচারতা বা দৌরাত্ম্য নিরাকৃত হইলেই শ্রীভগবানের নিত্য আনুগত্যে জীবের স্বরূপধর্ম্ম স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে। জীব আকুল ভাবে ডাকিলেই ভগবানকে পায়। ভগবান্ তো দূরে নহেন, তিনি তো জীবকে কোলে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াই আছেন। সুতরাং দুরাচার আমরা যে যেমনই হই না, ভয় কি? দুরাচারের জন্যও ভগবানের প্রেমের ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে। জগন্নাথের দ্বার কাহারও নিকট রুদ্ধ নয়। ভগবানকে স্বীকার করিলেই পাপী তাপী সকলেরই নিস্তার ঘটে। পরম ভাগবতগণ ভগবানের এই পতিতপাবন লীলারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নিজেদের দুরাচারতার গ্লানিভারে বিপন্ন হইয়া যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই তাঁহারা বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কুম্ভীপাক-নরকবাসী হইয়াও যিনি ভগবানের নাম করেন, তিনি সকলের পূজ্য। কোনপ্রকার সদ্বৃত্তিরহিত চণ্ডালও ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হইলে সকলের বন্দনীয় হন। প্রত্যুত অধর্ম্মের সংস্কার ত্যাগ করা বরং সহজ, কিন্তু আমি ধার্ম্মিক, অমুক পাষণ্ড এই অহঙ্কার হইতে মনকে মুক্ত করা অত্যন্তই কঠিন। এইরূপ দুরাচারতা ত্যাগ করিয়া সদাচারের পথ ধরা বরং সহজ, কিন্তু অমুকে দুরাচার, সে চণ্ডাল, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সদাচারসম্পন্ন—এই সংস্কার দূর করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ধর্ম্ম এবং সদাচারের নামে এই সব কুসংস্কার কাজ করে এবং উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত সাধকদিগকে পর্য্যন্ত অধঃপতিত করে। এ সম্বন্ধে আড়্বার কুলাচার্য্য

শ্রীকুরুকাধিনাথের একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, স্বর্ণময় পাত্রমধ্যে রক্ষিত পবিত্র তীর্থ-সলিলে বিন্দুমাত্র মদিরা মিশ্রিত হইলে যেমন তাহা দূষিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানে অনন্যভক্তিরূপ পরিশুদ্ধ বস্তু অহঙ্কার-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। পুণ্য-শ্লোক মহাভাগবত লোকাচারীস্বামী বলিয়াছেন, পতির সন্তোষের জন্যই স্ত্রীর পতিসেবায় নিজ দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য, ইহাই ধর্ম্মপত্নীর যথার্থস্বরূপ—সেই স্বামীর সেবা যদি স্ত্রীর নিজ উপভোগের জন্য হইয়া পড়ে তবে পাতিব্রত্য হইতে স্ত্রী বিচ্যুতা হন। তিনি নিন্দিতা হন। এইরূপ ভগবানের সেবা জীবের স্বরূপধর্ম্ম; সে যদি নিজের প্রয়োজনটি বড় করিয়া দেখে এবং ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধনকে গৌণ করে, তবে ভর্ত্তৃ-সংশ্লেষের পরে প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর নিকট অর্থের দাবী করাতে দুষ্টা স্ত্রীর ন্যায়ই তাহার সাধন-ভজন দুষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা সাধন-ভজনের নামে অনেক ক্ষেত্রেই ভগবানকে চাহি না, নিজেদের মান, যশ, প্রতিষ্ঠা এইগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে। ফলতঃ আমরা সদাচারের নামে অপরে আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অহঙ্কার-গর্ভ এই পরিস্ফীতি অন্তরে অন্তরে আস্বাদন করিয়া জঘন্য হিংসাবৃত্তিই চরিতার্থ করিয়া থাকি। ইহা আমাদের পশুত্বে অভিভূত জড় মনেরই পরিচায়ক, মানবতা-বিরোধী আমাদের এমন ভাব; আমাদের এই স্বার্থভীরু ক্রূরতা আমাদের চিত্তের এমন সংকীর্ণতা এবং নীচতা ভগবৎ-বিরোধী তো বটেই। ফলতঃ ভগবানই আমার একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার কৃপা ভিন্ন আমার আর কোন গতি নাই, চিত্তবৃত্তির এমন উদ্দীপ্তিতেই ভগবানকে পাওয়া যায়। ভগবৎ-সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া নিজদেহে আমাদের প্রীতি রহিয়াছে, ইহা কামেরই রীতি। সদাচারের নৈতিক যুক্তি উপস্থিত করিয়া আমরা এমন পাপপ্রবৃত্তিকে এড়াইতে চাই। আমাদের এমন সদাচারের বড়াইয়ের কোন মূল্যই এখানে নাই।

"অনিন্দক হৈয়া যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে।"

এই মহাজন-বাণীকে যাঁহার জীবনে সত্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ভগবৎ-প্রেম লাভ তাঁহার পক্ষে খুব কঠিন নয়। কিন্তু পরনিন্দা, পরদোষ-দর্শন এবং পরশ্রীকাতরতা আমাদের চিত্তবৃত্তিকে এমনই আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে যে আমরা সদাচারের দোহাই দিয়া এই সব দুষ্প্রবৃত্তির দাসত্বে পড়িয়া রহিয়াছি।

নীচকুলে জন্মাদিজনিত দুরাচারতার সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কিন্তু অহঙ্কারজনিত আভিজাত্যমূলক দৌরাত্ম্যের প্রভাবে মহদনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা ততটা নাই। অন্ততঃ এই দিক হইতে তাঁহারা নিরাপদ, সুতরাং উচ্চকুলজাত ব্যক্তিদের চেয়ে তাঁহারা ভাগ্যবান্। মহাভারতে আছে, চিন্তাদেবী তাঁহার স্বামী শ্রীবৎসের সঙ্গ-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিতা হইয়া সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন। সতীর সাধনার বলে সূর্য্যদেব আকৃষ্ট হন এবং চিন্তাদেবীকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। দেবী সূর্য্যদেবের নিকট হইতে কুষ্ঠরোগ বরস্বরূপে কামনা করিয়া লন। তিনি বলেন, যতদিন পর্য্যন্ত আমার স্বামীকে আমি প্রাপ্ত না হই, এই রোগটি দিয়া কামাসক্ত লোকের দৃষ্টি হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য তীব্র সংবেদন যাঁহারা লাভ করিয়াছেন,—তাঁহারা এইভাবে অহঙ্কার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নীচকুলে জন্মলাভের নিমিত্ত অন্তরে ব্যাকুলতা অনুভব করেন এবং আর্ত্তভাবে শ্রীভগবানের নিকট সেইরূপ জন্ম এবং বৃত্তি কামনা করেন। ইহার ফলে নিজের স্বরূপধর্ম্মে উজ্জীবন লাভের পথ তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত হয়। বাস্তবিকপক্ষে উৎকৃষ্ট কুলে জাত এইরূপ আভিজাত্যের অহঙ্কারজনিত স্বরূপ নাশের সম্ভাবনার জন্য ব্রাহ্মণাদি জন্মকে অনুভবশীল সাধকগণ অপকৃষ্ট বলিয়াই মনে করেন। এই শরীর যতদিন থাকিবে, না জানি কখন অহঙ্কার অন্তরে জাগিয়া অনর্থ ঘটাইবে, স্বরূপজ্ঞ পুরুষগণ এজন্য মহাভয় প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পুণ্যশীল ব্যক্তিরা ভগবানকে লাভ করেন কিনা ইহা সংশয়ের বিষয়, কিন্তু দুরাচারতাজনিত তাপ যাঁহার অন্তরকে জ্বালাইয়া

তুলিয়াছে, তিনি শ্রীভগবানের প্রেমলাভ যে করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার বুকভরা বেদনা ভগবানকে বিচলিত করে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁহার ক্রন্দনে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার আনুকূল্য-বিধানে আগাইয়া আসেন। গুরুরূপে কৃষ্ণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এমন সাধকের দুরাচারতা ভগবানকে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে অলঙ্কারস্বরূপে পরিণত হয়। এমন ভক্তের মালিণ্য ভগবানকে বদান্য করিয়া তোলে। তাঁহাকে সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষী মাধুর্য্যে মণ্ডিত করে। শ্রীল রূপগোস্বামী মহারাজ তৎ-প্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এমন ভক্তের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক চিহ্ন থাকিলেও তাহাতে তাহার অন্ধকার আলো করিবার শক্তি লঘুতা প্রাপ্ত হয় না, পক্ষান্তরে সেই কলঙ্ক কবিগণের দৃষ্টিতে পূর্ণচন্দ্রের অলঙ্কারস্বরূপেই পরিগণিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের দিকে যাঁহারা চিত্তের আভিমুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আচরণে যদি দুরাচারতাও দেখা যায়, ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে সেগুলি অলঙ্কারস্বরূপে তাঁহাদের জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলে।

বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ এমন ভক্তদিগকে অসদাচারজনিত মালিণ্য হইতে মুক্ত করেন। ভক্তকে এইরূপ আত্মভাবে আস্বাদন করিবার জন্য ভগবানের স্বরূপধর্ম্মে লালসা রহিয়াছে। ভক্তকে তাঁহার ইচ্ছার কাছেই আত্মসমর্পণ করিতে হয়; অসদাচারজনিত মালিণ্য দূর করিবার জন্য তাঁহার নিজের সযত্নকৃত কোন প্রয়াস থাকে না। সে ক্ষেত্রে জীবের তেমন চেষ্টা থাকে তাহা ভগবানের সন্তোষের কারণ ঘটে না। কারণ, ভগবানের নিজভাবে জীবকে উপভোগ করিবার পক্ষে তাহা বিরোধী হইয়া পড়ে। জীবের তেমন প্রচেষ্টা শ্রীভগবানকে তাঁহার স্বরূপধর্ম্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে স্পর্দ্ধিত হয়। গীতায়—"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি" এই উক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ ভক্ত-মাধুর্য্য আস্বাদনে তাঁহার এই লালসাই উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং জীবের সহিত তাঁহার স্বরূপ-

ধর্ম্মনিষ্ঠিত সনাতন সম্বন্ধ সর্ব্বজনের উপলব্ধির পক্ষে উপযোগীভাবে ছন্দোময় রূপ দিয়াছেন জীবকে আপন করিয়া পাইয়া সর্ব্বতো-ভাবে স্বরূপগত স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীভগবানের আকুল আগ্রহই ভক্তমহিমা কীর্ত্তনের উল্লসিত ছন্দে ভগবদুক্তির ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। অপরিমিত এই স্নেহ, এইরূপ অযাচিত করুণা, বিশ্বগ্রাসী প্রেমের এমন বেদনা উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি আমাদের নাই। ইহা অনুভব করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির স্ফূর্ত্তি আমরা পাই নাই। কিন্তু ইহা চিন্তা করিতে গেলে পাষাণ-হৃদয়ও যে গলিয়া যায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীভগবানের করুণার মাধুর্য্য-সংস্পর্শে জীবের অন্তর হইতে যুগ যুগান্তরের অবিদ্যা দূরীভূত হয়। কালের প্রভাব তাহার পক্ষে আর থাকে না। অবিদ্যা দূর হওয়ার অর্থই সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-সংস্কার দূর হওয়া—এই সংস্কারগুলি দূর হইলে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে প্রেমের দেবতার মধুময় সুর জীবের অন্তরে বাজিয়া উঠে। তিনি নিজে আসিয়া জীবকে অভয় দান করেন, ডাকিয়া বলেন, 'আমি আছি', 'আছি তোমার জন্য, ভয় কি?' বাস্তবিকপক্ষে ক্ষিপ্রতার পথে দুরাচার জীবের পক্ষে ভগবদনুভূতি লাভের মূলে এক্ষেত্রে জীবকে আপন করিবার জন্য শ্রীভগবানের ব্যগ্রতাই সূচিত হইতেছে। জীবকে লাভ করিবার জন্য ভগবান্ এ ক্ষেত্রে বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না। কাল লয় হইলে দেশও লয় হয়, অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান নিরাকৃত হইয়া সর্ব্বভাবে ভগবৎ-সেবার অনুকূল শুদ্ধ সত্ত্বভূমিতে চিত্তের সংস্থিতি জীবের পক্ষে উন্মুক্ত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে কাল এবং দেশ সত্যের দুইটি দিক—একটি অন্তর্ম্মুখী অপরটি বহির্ম্মুখী। শ্রীভগবানের প্রেমসঙ্গত আনুগত্য লাভ করিলে কালের প্রতীতি থাকে না। সে অবস্থায় দেশসম্পর্কিত পরিচ্ছিন্নবোধের ধারণাও অব্যবহিত আত্মভাবের উদ্দীপ্তিতে বিলুপ্ত হয়। আমাদের নিজেদের দুরাচারতার স্বীকৃতিসূত্রে শ্রীভগবানের শরণাগতির মজা এইখানে। এই পথে সর্ব্বতোময় আত্মসম্বন্ধে তাঁহার সেবানন্দে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য

বা স্বরূপধর্ম্মের পরিপূর্ত্তি ঘটে। এইভাবে জীব চিরন্তন শান্তি লাভ করে। শ্রীভগবানের সর্ব্বাতিশায়ী এই উদার বীর্য্য সম্বন্ধে জীব অসঙ্গতি উপলব্ধি করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

ভক্তের প্রেমোন্মাদনায় ভগবান্ উত্তেজিত। তিনি কুরুক্ষেত্রের বায়ুমণ্ডল কম্পিত করিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—অর্জ্জুন, তুমি ঘোষণা করিয়া দাও যে, আমার ভক্ত দুরাচারী হইলেও কখনও নষ্ট হয় না। বলো, বলো, ঢাকঢোল পিটাইয়া সকলের কাছে বলো, শুনাইয়া দাও সকলকে যে আমার ভক্তের বিনাশ নাই। সে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের উর্দ্ধে আমার আশ্রয়ে নিত্য শান্তি লাভ করে।

ভগবান্ নিজে ঘোষণা করিলেন না কেন? অর্জ্জুনের মুখে তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিশ্বকে শুনাইবার জন্য তিনি কেন প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভগবান্ ভক্তাধীন, ভক্তের কাছে অস্বতন্ত্র। নিজের কথা রাখিবার জন্য তিনি কাহারো কাছে দায়ী নহেন। কিন্তু ভক্তের বাক্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হয়। প্রহ্লাদের মুখের কথার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য—"সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্য-ভাষিতং"—তাঁহাকে স্ফটিকের স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া হিরণ্য-কশিপুকে উদ্ধার করিবার জন্য বাহির হইতে হইয়াছিল। সুদুরাচারী তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ভক্তের বাক্যকে প্রতিভূস্বরূপে ন্যস্ত রাখিতেছেন। "ভক্ত মোরে বাঁধিয়াছে হৃদয়-মন্দিরে।"

পাপীর প্রতি অভয়

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, ভুবন-পাবন ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্তিশীল রাজর্ষি ক্ষত্রিয়গণের আর কি কথা! তাঁহারা তো আমাকে লাভ করিবেনই, এমন কি যাহারা নিকৃষ্টজন্মা এবং সেইরূপ জন্মজনিত কলুষস্বভাব, যাহারা স্ত্রী, যাহারা বৈশ্য, যাহারা শূদ্র অর্থাৎ স্বভাবত জ্ঞানবিহীন আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিলে তাহারাও পরাগতি লাভ করে। এই সূত্রে "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্". জীবের প্রতি শ্রীভগবানের এই নির্দেশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

পবিত্র-চরিত্র ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষিগণের মাহাত্ম্য সাধারণ জীবের পক্ষে উপলব্ধির অতীত বস্তু। ক্ষুদ্র পিপীলিকার পক্ষে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের পরিমাপ করা সহজ নয়। বস্তুতঃ পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষিগণের কথা উচ্চারণ করাও আমাদের মত পাপ-পরায়ণ সাধারণ জীবের মুখে শোভা পায় না; তাঁহারা পুণ্যশ্লোক। তাঁহাদের স্মরণেও জগৎ পবিত্র হয়। যাঁহারা নিকৃষ্টজন্মা, যাহারা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র—তাহাদের অধিকার বিচার করিবার শক্তিই বা কয়জনের আছে? আমরা নিজের নিজের পাপভারে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং পিষ্ট, এমন অবস্থায় অপরের বিচার করিবার অবসর আমাদের কোথায়? প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি সকলের চেয়ে অধম এবং অপর সকলেই আমার চেয়ে উত্তম এই বিচারই সত্য। এমন অধমের জন্য ভগবানের কৃপাদৃষ্টি কি নাই? যদি থাকে সে ভগবান কেমন এবং তাঁহার সেই কৃপালাভের উপায়ই বা কি?

অন্তরের একান্ত বেদনা লইয়া গীতার ভগবদুক্তির সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে একটি বাণীই আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠে—আমাকে ভজনা কর। এ জগৎ অনিত্য, এখানে সুখ নাই ইহা উপলব্ধি কর। উপলব্ধি কর এই সত্যকে যে, ভগবান্ ভিন্ন আর কোন আশ্রয়ই জীবের পক্ষে নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীভগবানের আশ্রয়ে আমরা সব সময়ই রহিয়াছি। মৃত্যুময় এই জগতে তিনি নিত্যস্বরূপে, সত্যস্বরূপে

আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন : নতুবা সতত পরিবর্ত্তনশীল ভূত-প্রকৃতির মূলে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতি আমাদের পক্ষে ঘটিত না। পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষিগণ এই সত্যটি জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা ভূত-প্রকৃতির মূলে সর্ব্বভূতের সুহৃৎস্বরূপে শ্রীভগবানের সংবেদনটি একান্তভাবে অনুভব করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে থাকিয়া যিনি সকলকে ভরণ-পোষণ করিতেছেন—শ্রীভগবানের এই সত্ত্বে তাঁহাদের চিত্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে উপলব্ধি করিয়াছেন অমৃতত্ব। অনিত্যের মধ্যে তাঁহারা নিত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। অসুখের মধ্যে তাঁহারা সুখস্বরূপ দেবতাকে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং জন্মকর্ম্মের বন্ধন তাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন। সকল কর্ম্মের মূলে ভগবৎ-প্রতিষ্ঠা যাঁহাদের অধিগম্য হইয়াছে, ভগবৎ-কর্ম্মের প্রজ্ঞানময়-ধর্ম্মে তাঁহাদের কর্ম্মবাসনা বিলীন হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের কর্ম্ম ব্রহ্ম-যজ্ঞে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা নিবেদিতাত্মা পুরুষ। প্রকৃতপক্ষে ভজন বলিতে ভগবৎ-সেবায় চিত্তের এমন আভিমুখ্যই বুঝায়। ব্রাহ্মণ এবং ভক্তিমান রাজর্ষিগণের জীবনে শ্রীভগবানের এমন একান্ত আভিমুখ্য স্বভাবতঃই সত্য হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা ভজনেও অধিকারী হইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ তাঁহার উক্তিতে ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি বলিতে নিজভক্তি-নিষ্ঠিত নিবেদিতাত্মা পুরুষের গুণগত বৈশিষ্ট্যই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় না বলিয়া রাজর্ষি বলিয়া অভিহিত করিবার মূলে ইহাই তাৎপর্য্য মনে হয় এবং এই তাৎপর্য্যটি পুণ্যশীল এই বিশেষণের দ্বারা ব্রাহ্মণ-সম্পর্কিত ভগবদুক্তির মূলেও সমভাবে রহিয়াছে।

ভজনের পথে পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষিগণ প্রকৃষ্ট গতির অধিকার অর্জ্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান বলিতেছেন, নীচ যোনিজাত যাঁহারা, যাঁহারা ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারাও সেই অধিকার লাভ করেন। ফলতঃ ভজনের জন্য চিত্তবৃত্তি উন্মুখ হইলেই ভগবানের করুণা জীবের অন্তরকে আসিয়া স্পর্শ করে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যে হোক, তাহাতে ক্ষতি নাই। করুণার

তেমন স্পর্শ-প্রভাবে জীবের চিত্তে শ্রীভগবানের স্বরূপটি সমাত্ম-সম্বন্ধে আনন্দের চিন্ময় ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ত্রিতাপের জ্বালায় অভিভূত অস্থির জীব তখন তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ বা পরাগতি লাভ হয়। ফলতঃ জীবের জন্মও কর্ম্মগত সকল অন্তরায় ভগবৎ-কৃপার প্রবাহে ভাসিয়া যায়।

ভজনের জন্য চিত্তবৃত্তির এই উন্মুখতা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীব কোন ক্রমেই লাভ করিতে পারে না। অহঙ্কারের ফলে জীব ভগবানের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহার সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। ইহার ফলে জীব তাহার স্বরূপধর্ম্মগত শ্রীভগবানের ভজনের সংবেদন হইতে বঞ্চিত থাকে। নিজের কর্ম্মের বিচার করিয়া সে জীবনের অধিকার অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হয় এবং ভগবৎ-কর্ম্মের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। জীবের স্বরূপ-বিরোধী এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির ফলে ভগবানের কাজে তাঁহার নিজভাবটি সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ স্বভাবতঃ অবিদ্যাময় এই স্তর অতিক্রম করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপে ভগবানকে তাঁহারা উপলব্ধি করেন। বস্তুতঃ এমন পুণ্যশীল এবং ভগবদ্ভক্তের অন্তরে অহঙ্কার থাকে না, যদি তাহা থাকে তবে ভগবৎ-ভজনে তাঁহারা অধিকারী হইতে পারেন না। সুতরাং উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পুণ্যপ্রভাবসম্পন্ন হন না এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয় রাজর্ষিত্ব লাভে বঞ্চিত থাকেন। ভগবান্ এজন্য ভজনের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিশেষভাবে তাঁহাকে আশ্রয়ের কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ বিশেষভাবে আশ্রয় বলিতে জীবের নিজকর্ম্মগত দুরাচারতার উপলব্ধি এবং তজ্জনিত অসহায়ত্বের তীব্রতায় শ্রীভগবানে প্রপত্তিই বুঝায়। বলা বাহুল্য এই প্রপত্তি বলিতে ভগবান একজন আছেন মনের এমন ধারণামাত্রই যথেষ্ট নয়। বাস্তবিকপক্ষে মনের সেই ভাবটি আমাদের কর্ম্মে উজ্জীবন এবং সেই উজ্জীবনে আমাদের যাহা কিছু নিজের

বলিতে তাঁহাকেই সমর্পণের জন্য সংবেদন বুঝায়। আমরা আমাদের সব দিকে অন্ধকার না দেখিলে এবং আমাদের জীবনে অসহায়ত্বের উপলব্ধি একান্ত হইয়া না উঠিলে সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানে প্রপত্তির এমন অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগে না। প্রত্যুত উচ্চকুলে জন্মজনিত অভিমান অন্তরে বিদ্যমান থাকিতে শ্রীভগবানে এইরূপ বিশেষভাবে আশ্রয় বা প্রপত্তি লাভ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। নিজের উচ্চকুলে জন্মজনিত অভিমান এবং নিকৃষ্টকুলে জন্মজনিত অসদাচারের বিচারে অপরে হীন এমন মনোভাব পোষণ করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরন্তু এমন দৃষ্টিতে বাহিরের সদাচার এবং তৎসংশ্লিষ্ট শম, দম প্রভৃতি আত্মগুণ সম্বন্ধে সচেতন ভাব ভিতরের অভিমানই বাড়ায়। ইহার ফলে অন্তরে ভেদজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠে এবং অবিদ্যার প্রভাবে আমাদের অধঃপতনের কারণ সৃষ্টি হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ভজনের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইবে, অন্য কথায় সর্ব্বভাবে ভগবানকে আশ্রয় করিবার জন্য চিত্তবৃত্তির উন্মুখতা লাভ হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। অহঙ্কার হইতে উদ্ধার পাইবার মন্ত্রটি আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে পাইয়াছি। সেটি এই—"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য, সৎকুল বিপ্র নহে ভজনেতে যোগ্য।" ব্রহ্মশাপে মৃত্যুভয়গ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে মহর্ষি শুকদেব এই উপদেশই প্রদান করেন; বলেন, মহারাজ, কৃষ্ণভজন করুন। আমাদের চারিদিক মহামৃত্যুতে আচ্ছন্ন, এমন অবস্থায় যাহার চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, যে ইন্দ্রিয়বান্ সে কৃষ্ণ ভজন না করিয়া কি পারে? "ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে" সংসারের ব্যাপার তো এই। নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া কৃষ্ণভজন করাই আমাদের উচিত। কিন্তু ভজন তো করিব, সে ভজনটি কেমন—সে ভজন কেমন করিয়া করিতে হয়? নবম অধ্যায়ের উপসংহারে এ সম্বন্ধে ভগবানের শ্রীমুখ হইতে আমরা চারটি আদেশ পাই। প্রথম আদেশ 'মন্মনা ভব' অর্থাৎ আমাকে

তোমার মনটি দাও। দ্বিতীয় আদেশ 'ভব মদ্ভক্ত' অর্থাৎ আমার ভক্ত হও। তৃতীয় আদেশ—'মৎযাজী ভব' অর্থাৎ সর্ব্বভাবে আমারই যজন-পরায়ণ হও। চতুর্থ আদেশ—'মাং নমস্কুরু'। আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে সর্ব্বভাবে মদ্গতচিত্ত হইয়া মৎপরায়ণ হইলে তুমি আমাকে লাভ করিবে।

ভগবানের চারটি আদেশের মধ্যে একটি ক্রম পারম্পর্য্য রহিয়াছে। গীতার শিক্ষায় সেই ক্রমের অদ্ভুত পরাক্রম বিস্তার সাধিত হইয়াছে। প্রথমে মোহজনিত অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা হইতে নিষ্কৃতিলাভের পরবর্ত্তী ক্রম সাধন-ভক্তি। তৃতীয় ক্রম জ্ঞান বা পরাভক্তিতে 'মৎপরায়ণ' অবস্থা প্রাপ্তি। গীতার বিষাদযোগ হইতে সাধনের ক্রম পারম্পর্য্য বিচার করিয়া নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাঁহার উপদেশের সার তত্ত্বটি এবার গোছাইয়া আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিলেন। বলিলেন, আমার দিকে মনটি দাও; তবেই তোমার প্রতি আমার করুণা তোমাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিবে। আমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তোমার চিত্তবৃত্তি আমার চিন্তায় ঘনিষ্ঠতা লাভে উন্মুখ হইবে, তুমি হইবে আমার ভক্ত। আমার ভক্তি তোমার অন্তরে সংস্থিত হইলে আমার অনুধ্যানের নৈরন্তর্য্যে তোমার সর্ব্ব কর্ম্ম আমারই ভজনে বা সেবায় পরিণত হইবে। তারপরে আসিবে নমস্কার—"নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু" এই ভাবটি অন্তরে সর্ব্বদা মাখাইয়া লইয়া থাকা। শ্রুতি বলেন—

"তন্নম ইত্যুপাসীত।
নমন্তেহস্মৈ কামাঃ—।"

(তৈত্তিরীয়-৩।১০।৪)

তাঁহাকে নমস্কারে জীবের জীবনে সর্ব্বার্থসিদ্ধি ঘটে। ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবের নিকট এই নমস্কারের মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নমস্কার কর উদ্ধব, নমস্কার কর তাঁহাকে। সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন তিনি—'প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভূমাবশ্ব-চণ্ডাল-গো-খরম্'। ভূমিতে

দণ্ডবৎ হইয়া অশ্ব, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ সকলকে প্রণাম কর। 'যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে তাবদেবমুপাসীত'—যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাবটি তোমার উপলব্ধি না হয়, এই ভাবে আমার উপাসনা কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখেও আমরা এই উপাসনার কথাই শুনিয়াছি।

"এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি।"

এমন উপাসনাই তাঁহাকে পাইবার পথ—'অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম'। ভগবান বলিয়াছেন, সর্ব্বযুগে সর্ব্বকল্পে আমাকে পাইবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁহাকে পাইলে সবই পাওয়া হইল। ইহার পরবর্ত্তী স্তর মৎপরায়ণতা। এইটি ঠিক সাধনের অবস্থা নয়। এই অবস্থায় ভগবানের সম্বন্ধে বিশ্লেষের ভাব ভক্তকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। ভগবানের চিন্তা ব্যতীত তাঁহার পক্ষে জীবন ধারণ করা অসম্ভব মনে হয়—"জল বিনা মীন যেন দুঃখ পায় তনুহীন প্রেম বিনা সেই মত ভক্ত।" প্রেমভক্তির এই রীতি ভক্তকে দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। "অত্যন্ত নিগূঢ় এই সাধনার কথা"। রাজবিদ্যা রাজগুহ্য এই তত্ত্বই সাধ্যস্বরূপে নবম অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিভূতি যোগ

১। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ।। ৮ ।।

২। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ।। ২০ ।।

৩। যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ।। ৩৯

৪। যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ।। ৪১ ।

দশম অধ্যায়

বিভূতি ও যোগ

কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান এই সবই পরমার্থতত্ত্ব লাভের পথে প্রকরণ বা উপায় স্বরূপে কাজ করে। কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্ব মানব-মন এবং বুদ্ধির পক্ষে অবিচিন্ত্য। কোন উপায়ের সাহায্যে আমরা সে তত্ত্ব অধিগত হইতে পারি না। ভগবানকে পাইতে হইলে স্বয়ং ভগবানকেই ধরিতে হয়। প্রত্যুত উপেয়স্বরূপে তাঁহাকেই গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভক্তি শ্রীভগবানেরই স্বরূপশক্তি। সুতরাং ভক্তির পথে তাঁহাকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি সম্ভব হয়। শ্রীভগবান্ গীতাতে এই তত্ত্বটি নানাভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা আমি নিজে যে রূপ, আমার সেই স্বরূপ লক্ষণ এবং আমার যত রকমের বিভূতি-যুক্ত হইয়া আমি আছি, আমার সেই সমগ্র এবং অখণ্ড সত্তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের বিভূতি বলিতে তাঁহার নিত্যবিভূতি এবং মায়াবিভূতি এই দুইটি বুঝায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন—

> "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
> পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"
>
> (ছাঃ—৩।১২।৬)।

এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—

> "গোলক-পরব্যোম প্রকৃতির পার
> চিচ্ছক্তি-বিভূতিধামত্রিপাদৈশ্বর্য্য-নাম।
> মায়িক বিভূতি—এক পাদ অভিধান।"

এই নিত্যবিভূতি এবং মায়াবিভূতি দুইটি এক করিয়া বিশ্বের সহিত বিশ্বাত্মদেবতার সংযোগ-সূত্রটি উপলব্ধি করিয়া তবে আমাদের পরম

পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন—

"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ,
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।"

(কঠোপনিষদ্—৬।১৩)।

প্রথমতঃ তিনি আছেন এইরূপে তাঁহাকে বিশ্ব-প্রকৃতিতে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তত্ত্বভাবে অর্থাৎ নির্বিবষয় চিন্মাত্রভাবেও উপলব্ধি করিতে হইবে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভয়ভাবে তিনি জ্ঞাতব্য। পূর্ব্বে সোপাধিকরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে তাহার তত্ত্বভাব অর্থাৎ নিরুপাধিক চিন্ময়মাত্রভাব পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ লঘুভাগবতামৃতে এই উভয় বিভূতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

"ত্রিপাদ্ বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদভূতং হি তৎপদং
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ।"

ত্রিপাদ-বিভূতি মায়াতীত তাঁহার ধাম। মায়াত্মিকা একপাদ বিভূতি এই জগৎ। নিত্যধাম এবং জগতে জীব দুই প্রকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার,
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার।
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ,
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ।
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ
নিত্য-সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।"

(চৈঃ চঃ ২।২২।২)।

প্রকৃতপক্ষে ভগবদুপলব্ধি বলিতে তাঁহাকে মনের সর্ব্বতোময় সংবেদন-ধর্ম্মে অর্থাৎ ধী-শক্তিতে জানা, হৃদয়ে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁহার সর্ব্বাত্মভাবে প্রবিষ্ট হওয়া বুঝায়। তাঁহাকে হৃদয়ের অধিদেবতা বা আমাদের হৃদয়েশ্বররূপে উপলব্ধি হইলে বিশ্ব-চরাচরে

তিনিই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভগবানকে দেখা চোখ কোঁচকাইয়া দেখা নয়—খোলা চোখে তাঁহাকে দেখিতে হয়। জ্ঞান এবং যোগের পথে ভগবানকে দেখা চোখ কোঁচকাইয়া দেখারই মত। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান্ তাঁহার মাধুর্য্য-লীলায় আমাদের অন্তরে জাগ্রত না হইলে তাহার চরণে আমাদের সর্ব্বভাবে আত্ম-নিবেদনটি সংসাধিত হয় না, সুতরাং বিশ্বের ভৌতিক প্রকাশটি আমাদিগকে অখণ্ড-রসামৃতসিন্ধুস্বরূপে ভগবদুপলব্ধিকে ব্যাহত করে। জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিশ্ব জড়ের আবরণে অনুভূত হয় এবং প্রকৃতির এই জড়-প্রতীতি তাহাদিগকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের বস্তুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় না। আমাদের অন্তরের আসনে অধোক্ষজ বা প্রকামতত্ত্বে ভগবান্ প্রমূর্ত্ত হইয়া না উঠিলে বিশ্বতোময় ভগবৎ-প্রেমে আমাদের চিত্ত উদ্ভাবিত হয় না। শ্রীভগবান গীতায় বিভিন্ন সাধন-প্রকরণের বিশ্লেষণ করিয়া অতঃপর ভক্তিযোগের অবতারণা করিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রসাদজ ভক্তির উপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই উপলব্ধি করিতে হইলে সৃষ্টির মূলে প্রকামতত্ত্বে আমাদিগকে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয় এবং বেদ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের প্রভবস্বরূপটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হইবার জন্য শ্রীভগবানের এই স্বেচ্ছাময় স্বরূপটির সংবাদ আমরা বিভিন্ন শ্রুতিতে পাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অবিকারী।"

(চৈঃ চঃ— ।৭।১১৭)।

প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিমতে ভগবান্ জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণও তিনি। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই সমস্ত ভূতবর্গ তাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। "অস্মান্মায়ী সৃজতে

বিশ্বমেতৎ। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং”—(শ্বেতাশ্বতর-৪|৯|১০)। মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। মায়াকে প্রকৃতি জানিবে, মায়াধীশ্বরই মহেশ্বর—পরব্রহ্ম। ব্যাসসূত্র-সম্মত ইহাই পরিণামবাদ। মায়াবাদী সিদ্ধান্তে পরব্রহ্মের জগৎরূপে এই পরিণতি বা পরিণামবাদ স্বীকৃত হয় না। তাঁহাদের মতে জগৎ মিথ্যা এই বিবর্ত্তবাদে প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি-স্মৃতিতে কোথাও ইহা স্বীকৃত হয় নাই। ‘সন্মূলাঃ সোম্যেমা সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ’—ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন, এই সমস্ত প্রজাই সন্মূলক অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সদায়তন সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত এবং সৎপ্রতিষ্ঠ (সৎস্বরূপ ব্রহ্মে লয়শীল)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে—‘সোঽকাময়ত—বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ’—অর্থাৎ তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব। তাহার পর তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। ‘তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।’ অর্থাৎ প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত বস্তু এবং ত্যৎ অমূর্ত্ত বস্তু হইলেন।

‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে’—(তৈত্তিরীয়—৭|১) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ মূর্ত্তরূপে ছিল না, অসৎ অর্থাৎ অনভিব্যক্ত ছিল। সেই অসৎ হইতে সৎ নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি বা ব্রহ্ম নিজকে এই প্রকার করিলেন অর্থাৎ অভিব্যক্ত জগৎরূপে প্রকটিত করিলেন। এজন্য তিনি সুকৃত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রুতিমতে পরব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই। পরাশক্তি বা স্বরূপশক্তির শক্তিমানরূপে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ আর অপরা-শক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি এবং অবিদ্যা মায়াশক্তির শক্তিমানরূপে তিনিই জগতের উপাদান কারণ। জীবশক্তি হইতে জীবের এবং

অবিদ্যা শক্তি হইতে জগতের উদ্ভব। উভয়ের নিমিত্তকারণরূপে ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য অপরিণামী। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তি বলে ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—"ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ?"

যিনি পরব্রহ্ম তিনি আপ্তকাম। যাঁহার কোন প্রয়োজন থাকে বা অভাব থাকে, অভাব পূরণ বা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহাকেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন নাই। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন" তবে তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে দিয়াছেন ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন বা অভাব নাই। বস্তুতঃ অভাব পূরণের জন্য সৃষ্টিও তিনি করেন না। "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" সৃষ্টিকার্য্য তাহার লীলামাত্র। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, প্রয়োজন না থাকিলেও লোক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। পরব্রহ্মও এইরূপে 'স্বেচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণত'। তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মা এবং ঋষিদের ভিতর দিয়া সৃষ্টিরূপে পরিস্ফুট হয়। বিশ্বভুবন তাহার মায়াবিভূতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার দশম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"মহর্ষয় সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজা।"

পুরাকালে সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন এই চারজন এবং পরে ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য এবং বশিষ্ঠ—সপ্তজন মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি এই চতুর্দ্দশ মনু তাঁহারই সঙ্কল্প হইতে জাত হইয়া এবং তাঁহারই শক্তি প্রভাবে তদ্গতচিত্ত হইয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ভগবান্ প্রভবতত্ত্বটি অর্থাৎ জীব এবং জগৎরূপে প্রকটিত হওয়ার বীজস্বরূপ তাঁহার নিজ ভাবটি অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরসস্বরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতিবর্ণিত বিশ্বজগতে নিজের বিভূতি বা যে বিশেষ ভাবটিকে প্রকট করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার এই লীলাটি মহর্ষিরাও জ্ঞাত নহেন। কিন্তু ভগবানকে অখণ্ড আত্মতত্ত্বে উপলব্ধি করিতে হইলে বিশ্বজগৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তিনিই ইহাতে প্রকটিত হইয়াছেন, এগুলি তাহারই শক্তির বিলাস ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিশ্বের সর্ব্বভাবে এইরূপে তাঁহার ভাবে প্রভাবিত হইয়া যাঁহারা সাধনা করেন, তাহারাই পরমপুরুষার্থ লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের অন্তরে জাগে—মহর্ষিগণ যাঁহার প্রভব-ভাবটি অর্থাৎ বিশ্বের বীজস্বরূপে তাঁহার নিজ বীর্য্যের মাধুর্য্য-চাতুর্য্যের বিস্তারের গূঢ় লীলাটি অন্য কথায় বিকারের মধ্যে অব্যাকৃত বিহারের তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সে বস্তু আমাদের অনুভবগম্য হইবে কি উপায়ে? শ্রুতি বলিয়াছেন—"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনম্" (কঠ—৪।১০)। কিন্তু সে সমস্যা নাই। তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে আমাদিগকে বরণ করিতে আজ উদ্যত। 'স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ'—'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা'। পরব্রহ্ম ভগবান্ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। তিনি সবিশেষ। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র-সম্মত নির্ব্বিশেষব্রহ্ম পরতত্ত্বের আংশিক প্রকাশমাত্র। নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অশেষরসের বৈচিত্র্যে বিলসিত নয়। সেটি তাঁহার অসম্যক্ প্রকাশ, পূর্ণস্বরূপ নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অশেষ রস-মাধুর্য্যের নিজবীর্য্যে অর্জ্জুনের নিকট প্রকটিত হইয়াছেন। তিনি সব মিলাইয়া পরমপুরুষস্বরূপে প্রভবতত্ত্বের পূর্ণতায় নিজকে বিলাইয়া দিতে বসিয়াছেন। 'যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে এতদ্বৈ তৎ'—(কঠ ২।১।৩)। যাহার প্রেরণায় জীব রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরস্পরের সংযোগজাত স্পর্শ অনুভব করে, তাঁহার অনুভবে আর

কি অবশিষ্ট থাকে ? শ্রীকৃষ্ণ এমন পূর্ণতত্ত্ব। রসের পথে, প্রীতির পথে, ভক্তির পথে তাঁহাকে সর্ব্বভাবে পাইবার কৌশলটি তিনি আজ জীবের নিকট উন্মুক্ত করিতে আকুল। গীতায় দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ তাহার প্রভবতত্ত্ব ব্যক্ত করিতে গিয়া জীবের কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের অনুভূতিমূলে তাহার অধ্যাত্মবিভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং বহিঃ-প্রকৃতিতে তাহার অধিদৈব বিভূতির কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। এতদুভয় বিভূতির মূলে প্রকামতত্ত্ব-স্বরূপে তাহার নিজ বীজটি অন্তরে উপলব্ধি হইলে জীবের সহিত তাহার যোগসূত্রটি উন্মুক্ত হয় এবং অন্তর ও বাহির উভয় বিভূতিকে ব্যাপ্ত করিয়া তাহার আত্মভাবটি ব্যক্ত হয়। এইরূপে অন্তর এবং বাহিরের উপাধিগত ব্যবধানকে লুপ্ত করিয়া শ্রীভগবানের দিব্যলীলা জীবের দৃষ্টিতে নিত্যতা লাভ করে। সে অবস্থায় সূক্ষ্মের জন্য আর খোঁজ করিতে হয় না। বিশ্ব তাহার স্থূল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধিগম্য মূর্ত্তিতে আমাদের দৃষ্টিতে দেখা দেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ, এই দুই লক্ষণে বস্তু বুঝে মুনিগণ। আকৃতি-প্রকৃতি হয় স্বরূপ লক্ষণ, কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ।" এতদুভয় লক্ষণে মিলাইয়া তাঁহাকে পাওয়াতেই পূর্ণভাবে পাওয়া—জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধি। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ পৃথ্যপ্‌তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥"

(শ্বেতাশ্বতর—৬।২)

সৃষ্টির কর্ত্তৃরূপে ভগবান্ স্বরূপ-লক্ষণযুক্ত তাঁহার যোগমূর্ত্তি। সৃষ্টির প্রবর্ত্তক-স্বরূপে তাঁহার বিভূতি। তিনি স্বরূপতঃ জীবের প্রত্যক্ষীভূত নহেন। সুতরাং তটস্থ লক্ষণ বা বিভূতির আশ্রয়েই আমাদের পক্ষে তিনি চিন্তনীয়। চিন্তাই ভাবকে উদ্দীপিত করে। 'কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোসি ভগবন্ময়া'—অর্জ্জুনের এই প্রার্থনা। বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের বিভূতি রহিয়াছে। কিন্তু কোন্ কোন্

১৪

বিশেষ ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া তাঁহার চিন্তা করিলে আমরা তাঁহার সর্ব্বাত্মক অনুধ্যানটি সহজভাবে অন্তরে অনুভব করিতে পারিব, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রতিবেশের উপর এই অনুধ্যানের উদ্দীপ্তি অনেকটা নির্ভর করে। বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একত্বের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বীজ। গীতা ব্যক্তি এবং জাতির স্বচ্ছন্দ বিকাশের এই ধারাটি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইভাবে ভয়াবহ পরধর্ম্মের পীড়ন হইতে মানবাত্মার নিত্য স্বরূপটিই গীতার উপদেশে উদ্দিষ্ট। বাস্তবিক পক্ষে বিশ্বজগৎ সবই ভগবানের বিভূতি। গীতার দেবতা আমাদের চিত্তের উজ্জাবনোপযোগী যে ক্ষেত্রে যেটি সর্ব্বোত্তম সেই সম্বন্ধেই আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছেন। এইভাবে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণতা হইতে আমাদের চিত্তকে তিনি বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ছন্দে অখণ্ড এবং অব্যয় সচ্চিদানন্দময় সত্তার মাধুর্য্যের রাজ্যে উন্নীত করিয়াছেন। এই পথটি ধরিয়া মহাভারতের বীজে মগ্ন হইয়া আমরা বিশ্বকে নিজ করিয়া পাই। নিজকে বুঝিয়া তবে জগৎকে বুঝিতে হয়। Charity begins at home. ফলতঃ নিজের দেশ এবং নিজের জাতিকে উপেক্ষা করিয়া সমগ্র মানব-জাতির সম্বন্ধে প্রীতি বা মৈত্রীর বুলি বাচালতা মাত্র। এ দেশের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসরূপ ত্রিপ্রস্থানকে আশ্রয় করিয়া বহুধা পরিবর্ত্তন-শীলতার ভিতর এক সুমহান্ সত্য মানব-ধর্ম্মকে বিধৃত রাখিয়াছে। এটি—অপৌরুষেয়। দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপ্ত করিয়া এই বেদরূপী ব্রহ্মের শাসন নিত্য অবাধিত এবং অনধিগত অলৌকিক এই তত্ত্ব। গীতার ভগবৎ-বিভূতির বিশ্লেষণ এই দিক হইতেই যোগের দিকে গিয়াছে।

দশম অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১১শ এই চারটি শ্লোককে চতুঃশ্লোকী গীতা বলা হয়। এই ৪টি শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব উভয় বিভূতিতে বিধৃত যোগের তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ ভগবানের বিভূতির সহিত তাঁহার আত্মসম্বন্ধে যোগের পরিস্ফূর্ত্তি

লাভের পথেই ভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। গীতোক্ত উপদেশের বীজস্বরূপে রহিয়াছে ভগবানের এই নিজ ভাবটি। সুতরাং এই কয়েকটি শ্লোকে গীতার সার কথা চুম্বকের মধ্যে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার প্রভব-স্বরূপটি উপলব্ধি করিয়া ভক্তগণ সর্ব্বভাবে আমাকেই উপলব্ধি করিয়া আমার ভজনা করে। সে অবস্থায় যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবই শ্রীভগবানের লীলাচ্ছন্দে সাধকগণের হৃদয়কে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। তাঁহাদের মনের সর্ব্ব সংস্পর্শে তাঁহারা শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মময় অনুকম্পা অনুভব করেন। বিষয় ছাড়িয়া জীবের মন তখন শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিজের জীবনের রহস্য সমগ্রভাবে জানিবার জন্য জীব তখন আকুলতা অনুভব করে। পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধিতে মন তুষ্ট থাকে না। আমাদের চিত্ত উদার প্রজ্ঞানময় ভূমিতে প্রসারতা লাভে উন্মুখ হয়। শ্রবণ, কীর্ত্তনের পথে এই ব্যাকুলতা ভগবানের সম্বন্ধে অন্তরে ভাব জাগায় ইহাই ভক্তি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শ্রীভগবান্ সাধনের প্রকরণস্বরূপে এক্ষেত্রে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উল্লেখ না করিলেও শ্লোকার্থের প্রতিপত্তিসূত্রে তাঁহার উক্তিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন—"রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম, তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ভাবের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণেনজাতত্বাৎ", ভগবানের গুণ, তাঁহার লীলার মাধুর্য্য শ্রবণে ভক্ত চিত্তে ভাব বা প্রেমের উদ্গম ঘটে। নবম অধ্যায়ে জীবের ভগবানের প্রতি অপরিসীম কারুণ্য গুণ এবং তাঁহার ভক্ত-প্রীতিমূলক উক্তি অর্জ্জুনের শ্রোত্রমূল স্পর্শ করিয়া তাঁহার অন্তরে ভগবৎ-কথা শ্রবণে একান্ত আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে। দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ভগবদুক্তিতে আমরা সে পরিচয় পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমা, সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থ-সীমা।" ভগবৎ-কথা শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা অর্থাৎ তাহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি নিহিত থাকে। এই শক্তি জীবের মনে

কৃষ্ণ-সেবার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করে। অর্জ্জুন ভগবদ্ভক্তির শ্রুতিসূত্রে এই উদ্দীপনার প্রভাবে পড়িয়াছেন। তাঁহার মনে কৃষ্ণ-সেবার লালসা জাগিয়াছে। অর্জ্জুনকে 'প্রীয়মাণায়' এই ভাষায় আদর করিয়া ভগবান তাঁহার অন্তরে সেই জাত-প্রীতির গভীরতাই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, তাঁহার কথা তিনি তাঁহাকে শুনাইবেন। শুনাইতে হইবেই তাঁহাকে। কারণ, "শুনিলেই হয় বড় হিত"—"বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।" পারস্পরিক প্রীতির ইহাই রীতি। প্রীতির গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত অবস্থাই ভাব। প্রকৃতপক্ষে ভাব-সমন্বিত সাধনা বলিতে আমরা কি বুঝিব ? শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী-কৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর টীকায় ভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ভক্তিঃ সৈব নিজাংশ বিশেষে ভাব উচ্যতে স চ কিং কিং স্বরূপস্তত্রাহ কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো যঃ স এবাত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানং তয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ। রুচিভিঃ প্রাপ্ত্যভিলাষ সকর্তৃকানুকূল্যাভিলাষ সৌহার্দ্দ্যাভিলাষৈ-শ্চিত্তার্দ্রতাকৃদিতি। প্রেম্নো প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ যদি বল ভাবের স্বরূপ কি ? তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়জনের আধারে তাঁহার নিত্য সিদ্ধস্বরূপ ছবি। শ্রীভগবানের নাম, গুণ শ্রবণাদি সাধনাঙ্গের রসধর্ম্মাত্মক স্পর্শে মনে রূপের সাড়া মিলে এবং ইহার ফলে ভাবের উদ্রেক হয়। "ভাবাঃ বিভাবজনিতা চিত্তবৃত্তি ঈরিতাঃ"—শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ ভাবকে বিভাব হইতে জাত চিত্তবৃত্তি বলিয়াছেন। তত্ত্ববিদগণের মতে ভগবানের স্বরূপ-শক্তিরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মনের মূলে তাঁহার আনুকূল্যময় প্রতিবেশের উন্মেষে ভাবের ধারা বিচ্ছুরিত হয়। ভাবের মূল কোথায় খুঁজিতে গেলে পাওয়া যাইবে শব্দকে। ফলতঃ শব্দ ব্যতীত কোন ভাব হয় না। শব্দ হইতেই ভাবের উৎপত্তি। শব্দ নীরবে মনকে স্পর্শ করিয়া রসধর্ম্মে মনকে আর্দ্র করে এবং সংস্কার হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া রূপকে জাগায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি

সঙ্গীতে ভাবের এই গূঢ় রসধর্ম্মটির আমরা অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। কবি বলিয়াছেন—"তোমার বাণী নয় গো প্রিয়, তোমার বাণী নয়, মাঝে মাঝে তোমার যেন পরশখানি রয়।" ভক্তের মনের উপর ভগবানের হাসিমাখা চাহনির স্পর্শ আসিয়া পড়ে। মন এই অবস্থায় মূর্ত্তিমান্। বিভাব বলিতে মনের উপর এমন রূপেরই খেলা বুঝায়। ইহাকে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ প্রেমের প্রথম ছবি বলিয়াছেন।

ইহার পর ভাবের গাঢ়তা লাভে প্রেমের রাজ্যে চিত্তের অনুপ্রবেশ ঘটে। ভক্তের মনটি প্রেমের দেবতা চুরি করিতে সুরু করেন। তিনিই প্রাণস্বরূপে তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া জাগেন। ভক্তের মন এবং তাঁহার বুদ্ধির সংস্কারাত্মিকা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধভূমিতে উঠিয়া আত্মাকে আশ্রয় করে। এই অবস্থায় অতীন্দ্রিয় রাজ্যে সাধকের প্রবেশ ঘটে। শব্দ-ব্রহ্মস্বরূপে যিনি মনের মূলে সূক্ষ্মভাবে ছিলেন, তাঁহার প্রেম প্রত্যক্ষ-প্রভাবে সাধকের চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করে। ভক্তের মনকে মন্থন করিয়া প্রিয় দেবতার স্বীয় স্বরূপটি অগ্নিময় বাক্‌রূপে যজ্ঞধর্ম্মকে দীপ্ত করিয়া তোলে। তিনি ভগবন্ময় হইয়া যান— "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্"। এমন ভক্তের মন ভগবানের লীলা-মাধুর্য্যের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় সম্বন্ধে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তিনি স্ব-স্বরূপে শ্রীভগবানের সেবারসে নিমগ্ন হন এবং তাঁহার বচনের ভিতর দিয়া ভগবানের প্রতি প্রীতির ভাবটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এইভাবে ভক্ত নিজে সরিয়া গিয়া বিশ্ববীজস্বরূপ দেবতার জীবোদ্ধার-লীলাকে তাঁহার বচনে সক্রিয় বা জীবন্ত করিয়া তোলেন। তাঁহার সঙ্গ-সম্পর্কে গিয়া জীব বিশ্বাত্মদেবতার সংবেদনময় স্পর্শ পাইয়া তুষ্টি, পুষ্টি এবং ভগবৎ-প্রবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। 'আকাশাৎ ঘোষবান্ প্রাণঃ'—ভক্তের চিত্ত আকাশতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বাড়ী, ঘর কিংবা আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতিবেশ হইতে কথা বলেন না। উন্মুক্ত উদার তাঁহার চিত্তাকাশে ভগবৎ-কৃপার চিৎশক্তির বিলাসে প্রাণের কম্পনে প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে। বিশ্ববীজে মগ্ন হইয়া প্রাণ-সমুদ্রে নিঃশেষে নিজেকে

বিলাইয়া বিশ্বদেবতার চরণে তাঁহার তর্পণ চলিতে থাকে। তাঁহার প্রতিবেশে প্রাণের খোলামেলা প্রভাব সুরু হয়। তাঁহার সংস্পর্শে সকলে ভগবৎ-প্রেমে প্রভাবিত হয়। এমন সাধকের সমগ্র জীবনটি সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে পরিণত হইয়া থাকে। "বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ"—বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন, বাক্ই অগ্নি। ভগবৎ-সম্বন্ধে উদ্দীপিত বচনে তাঁহার অগ্নিময় বেদনায় ভক্ত নিজকে আহুতি দান করেন। তাঁহাদের দত্তাহুতি জগতে শ্রীভগবানের নিজবীর্য্যকে দীপ্ত করিয়া তোলে। গীতার নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ 'মহাত্মা' বলিয়া ইঁহাদেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহাদের মনোবৃত্তি দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে পরিচ্ছিন্ন হয় না, তাঁহারাই মহাত্মা। ভগবান্ উক্ত অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলিয়াছেন, মহাত্মাগণ সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন করেন। যত্নের সহিত তাঁহারা আমারই ভজন করেন। আমাকে লাভ করিতেই হইবে তাঁহারা এজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহারা আমাকে প্রণাম করেন। সর্ব্বদা আমার কথা তাঁহারা চিন্তা করেন এবং এইরূপে নিত্যভাবে যুক্ত থাকিয়া তাঁহারা আমার উপাসনা করেন। ভগবান্ কপিল তাঁহার জননী দেবহূতির নিকট শ্রীভগবানে প্রীতিপরায়ণ এমন ভক্তের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"নৈকাত্মতাং যে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ
মৎ পাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি।"

(ভাঃ ৩।২৫।২৮)।

জননি, যাঁহারা আমার চরণসেবায় রত, তাঁহারা আমার প্রীত্যর্থে কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন। তাঁহারা আমার প্রেম-মাধুর্য্যই আস্বাদন করেন। তাঁহারা কখনো সাযুজ্য-মুক্তি কামনা করেন না। প্রকৃতপ্রস্তাবে অব্যভিচারিণী ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাঙ্গের এই উদ্দীপ্তি সাধিত হয়। উর্জ্জিতা এমন ভক্তি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবানকে আকর্ষণ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমৎসনাতনের নিকট উপদেশ করিতে গিয়া সাধন-

ভক্তির ফলে ভাব এবং ভাব কিরূপে প্রেমে বিগাঢ়তা লাভ করে তাহার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন
অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়।
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যাঙ্কুর।
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম।"

প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ সর্ব্বাশ্রয়—সাধুসঙ্গ এবং শাস্ত্র-নিষ্ঠার ফলে জীবের অন্তরে এই বোধ জাগ্রত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনের পথে রজস্তমো-রূপ অবিদ্যার নিরসন ঘটে এবং সত্ত্বের বিবৃদ্ধি সাধিত হয়। ক্রমে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে উপজাত এই সুখ-সম্পর্কে চিত্তে ভক্তির অঙ্গ সাধনে আসক্তি জন্মে। এই আসক্তি গাঢ় হইলে সাধকের সত্ত্ব-প্রভাবিত চিত্তবৃত্তির উপর চিচ্ছক্তির বিলাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধে প্রীতি বা ভাব জীবের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভাবের গাঢ়তা লাভে জীবের চিত্তে প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই জীব অন্তরে এমন রতি-বুদ্ধি লাভ করে, তাহার চিত্তে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখতা জাগে।

'বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়,
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়।'

কিন্তু শুধু বুদ্ধি দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। জাত-রতি ভক্তের এমন আত্মভাবকে আস্বাদন করিবার জন্য নিজেকেও তাঁহার কাছে বিকাইয়া দেন।

ভগবৎ-সম্বন্ধে সমীহিত এমন ভক্তের চিত্ত জুড়িয়া জাগে ভগবানের ব্যক্ত ভাব। নিখিলাত্ম-দেবতার রমণ-লীলায় তাঁহার দিব্য গুণলিঙ্গের

উদ্ভব ঘটে। এই চিৎঘন রস-সংস্পর্শ বা ভাব আমাদের জীবনে প্রভব-স্বরূপে বিশ্বের সর্ব্বস্তরে বিশ্বাত্ম-দেবতার প্রেম-লীলাকে উন্মুক্ত করে। ভাগবত বলেন, শ্রীভগবানে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইলে ভক্ত কাল এবং মায়াকে অতিক্রম করেন। কাল এবং মায়াকে অতিক্রম করার অর্থ ই দেহটি ভগবানকে দান করা : কারণ দেহের অভিমানই কালকে জাগ্রত রাখে এবং কালের অনুভূতিতেই দেশ এবং দেহাত্মবুদ্ধিজনিত বিড়ম্বনার কারণ সৃষ্টি হয়। ভগবৎ-ভাবে দেশ এবং কালের বিলয় ঘটিলে ভক্ত নিত্য-লীলার মাধুর্য্য-বীর্য্যে সমাবিস্ট হইয়া অন্তরতলে আত্মদেবতার সহিত ভাবের বিগাঢ়তা অনুভব করেন। শ্রীভগবানকে প্রীতির পথে ভজনই তাঁহার জীবনে নিত্য এবং সত্য হয়। এইরূপ ভজনানন্দী ভক্তের বুদ্ধির বহির্বিষয়মুখীন সংস্কারাত্মিকা ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় এবং বুদ্ধির উচ্চস্তর হইতে অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বের ভাব তাঁহার জীবনে বিক্রীড়িত হইতে থাকে। এই বস্তুটি ভগবানের হ্লাদিনী এবং সন্ধিনী—এই দুই স্বরূপশক্তি হইতে সঞ্জাত। শ্রীভগবানের আত্ম-মাধুর্য্যের আকর্ষণে তাঁহার চরণে ঘেঁসিয়া মিশিয়া নিজেকে সেখানে বিকাইয়া দেওয়া ছাড়া ভক্তের অন্য গতি থাকে না। বুদ্ধিযোগের এই অবস্থা। ইহার পর ভক্তের জীবনে ভগবানের সর্ব্বতোময় আত্মভাব প্রকটিত হয়। ভাগবত বলিয়াছেন, যিনি ভগবানের নামের সম্পর্কে তাঁহার প্রেমরসে নিমগ্ন হন, তিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে ভগবানের চরণ প্রণয়-রশনায় বন্ধন করিয়াছেন। ভগবান তেমন নিজ-জনের হৃদয় হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারেন না। বস্তুতঃ তাঁহার সম্বন্ধে আত্মভাবযুক্ত এমন ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে একটি সঙ্কট আসিয়া দেখা দেয়। ভক্তকে অনুগ্রহ করিতে হইলে ভগবানকে ছোট হইতে হয়। তিনি নিজে ছোট হইতে চান কিন্তু নিজেকে গোটাই দেখেন। এরূপ অবস্থায় ছোট হইবার জন্য তাঁহার কেবল ছুটাছুটি সুরু হয়। যতই এমনভাবে ছুটাছুটি ততই ভক্তের আস্বাদনে তাঁহার প্রেমের

লীলার পারিপাট্য প্রকটিত হয়। ভগবান এমন ভক্তের হৃদয়-শতদলে ভৃঙ্গের মত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভক্ত-প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনে প্রমত্ত হন। জীব এমন ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে ছন্দোময় আনন্দময় ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, এমন সাধকদের অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমি আত্মবীর্য্যের ভাস্বর আলোকে তাহাদের অজ্ঞানতা দূর করি অর্থাৎ তাহাদিগকে আপনার করিয়া লই। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্যযুক্ত এমন ভক্তের প্রতি অনুকম্পায় বিশ্বই অনুকম্পিত হয়। কারণ এমন ভক্ত বিশ্বের বেদনাকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার জীবন বিশ্বহিতে প্রণোদিত। ভক্তের মুখে উদ্দাম নামের কীর্ত্তনে বিশ্বজগৎ আপ্যায়িত হয়। অধিদৈবে প্রজা সহ প্রজাপতিবৃন্দ শ্রীভগবানের বিভূতিস্বরূপে সৃষ্টির মূলে থাকিয়া জীবের গত্যাগতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ভিতরে অধ্যাত্মে শ্রীভগবানের বিভূতিতে জীবের চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সাধক তৎকালে এতদুভয় বিভূতির সম্মিলিত বিজ্ঞানময় ভূমিতে যোগবীর্য্যে অধিরূঢ় হন। অধিদৈব বিভূতির বহিরার্থমূলক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নিজের স্বভাবধর্ম্মে নিষ্ঠিত ভগবৎ-ভাবটি তখন ব্যাপ্তভাবে উপলব্ধি করেন। অন্য কথায় শ্রীভগবানের আত্মভাব তখন অধ্যাত্মভূমির উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া বাহিরে অধিদৈব ভূমি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্তি লাভ করিয়া সাধকের চিত্তকে সংস্থিতি দেয়। তিনি সে অবস্থায় যোগের তত্ত্বটি অসংমূঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হৃদয়ের সর্ব্বসম্বন্ধে তাঁহার অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বভাবে তিনি ভগবানের সহিত যুক্ত হন। সেই ভূমি হইতে তাঁহার আর বিচ্যুতি ঘটে না। 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।' (শ্বেতাশ্বতর—৩৯)। এক অদ্বিতীয় সত্য বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেই পরম পুরুষের বিভূতিতে নিখিল বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত। দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অন্তর-বাহির পরিব্যাপ্ত তাঁহার অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব এই উভয় বিভূতির মূলে এই যোগ-সূত্রটি

উপলব্ধির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন এবং ইহাই বলিলেন যে, ভক্তের প্রীতিকে অবলম্বন করিয়া 'অন্তর্ব্বহি-স্তনুভৃতাং ব্যসনং বিধূন্বন্' আচার্য্য-রূপে তিনি তাঁহার চৈত্য বপুটি প্রকাশ করেন। এমন ভগবান পূর্ণ এবং তাঁহার এই ভক্ত-ভক্তিমান স্বরূপটি সকল জীবের অজ্ঞানতা দূরীভূত করিতে সামর্থ্যশক্তি সম্পন্ন। ভক্তের বাঙ্ময় তনুকে আশ্রয় করিয়া তিনি অদ্বয় চিন্ময় লীলায় প্রকটিত হন। মহাভারতের সনৎ-সুজাত ঋষি বলিয়াছেন, ভগবৎ-প্রীতির আগ্নেয় বীর্য্য-প্রণোদিত বাণী যাঁহার মুখ হইতে উদ্গীরিত হয়, এমন মহাত্মার সঙ্গলাভ করিলে এই মর্ত্ত্য জগতেই অমৃতরসে অভিষিক্ত হওয়া জীবের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে।

গীতার এইটিই সার কথা। শ্রীভগবানের অনুকম্পা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। প্রত্যুত তাঁহার হার্দ্দ্য সংবেদনময় আত্ম-মাধুর্য্যের স্পর্শ যিনি অন্তরে লাভ না করিয়াছেন তাঁহার সাধন-ভজন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সাধনাভিনিবেশজ কৃপার অপেক্ষা প্রসাদজ কৃপার শক্তি সমধিক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ,
যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ।"

প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবদ্ভক্তি-বর্জ্জিত যে জ্ঞান, যে জ্ঞানে জগৎ মিথ্যা এই অভিমানে অহংগ্রহোপাসনার ঔদ্ধত্য মিশ্রিত থাকে, যে জ্ঞানজনিত নির্ব্বিবেক মূঢ়তা বিশ্ব হইতে বিশ্বেশ্বরকে বহিষ্কৃত করে, তাহাকে যোগ বলা যায় না—তাহা বিয়োগেরই পথ। অন্তরে ভগবৎ-ভাবের উপলব্ধিতে তদ্গত হইয়া বিশ্বের প্রতিটি স্থূল প্রকাশ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের অনুভূতিতে ব্যাপ্ত এবং দীপ্তরূপে অন্তরে অনুভব করিয়া সাধককে শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতে হয়। ভগবদুপলব্ধির এই বৈজ্ঞানিক রীতিটি উন্মুক্ত করাই দশম অধ্যায়ে বিভূতি-যোগের তাৎপর্য্য।

সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ

'ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব',—যাবতীয় সৃষ্টি যে ভগবান হইতে উৎপন্ন এবং বিশ্বের তিনি বীজ-স্বরূপে থাকিয়া বিশ্ব-চরাচর তাঁহার নিজ ভাবের দ্বারাই বিধৃত হইতেছে। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান তাঁহার নিত্যবিভূতি এবং মায়াবিভূতি অর্জ্জুনের নিকট উপদেশ করিতে গিয়া এই সত্যটি ব্যক্ত করিয়াছেন। সৃষ্টির সহিত ভগবানের এই সম্বন্ধটি বুঝাইতে গিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন—"এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়, সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অবিচিন্ত্য হয়।" এই অবিচিন্ত্য ভাবটি কেমন? সে সম্বন্ধে চরিতামৃত ভগবদুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "আমি জগতে বসি, জগৎ আমাতে, না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।" ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রাণিগণের নানাবিধ ভাব আমা হইতেই ঘটিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীভগবানই সকলের নিয়ামক। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে জগতে বৈষম্যের মূলেও তিনিই রহিয়াছেন। তিনি কাহাকেও ধনী করিতেছেন, কাহাকেও নির্ধন করিতেছেন, কাহাকেও করিতেছেন জ্ঞানী, কাহাকেও মূর্খ। এতদ্দ্বারা ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রতিপন্ন হয়। বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ ভগবৎ-পক্ষপাতিত্বের এই ভ্রান্তির নিরসনের জন্য বলিয়াছেন, স্বভাব-প্রাপ্তির তারতম্য জীবের কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে জীবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। জীব চিৎ-স্বরূপ ভগবানের অংশ, ভগবান পরম স্বতন্ত্র পুরুষ, সুতরাং তাঁহার অংশ-স্বরূপে জীবেরও স্বাতন্ত্র্য থাকিবে। কিন্তু এই অংশের স্বাতন্ত্র্য অংশীর আনুগত্যরূপ পারতন্ত্র্যেই সত্য হইয়া থাকে। 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' ইহা বিস্মৃত হইয়া সে অংশীর আনুগত্যরূপ স্বরূপধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় এবং অবিদ্যারূপ বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া বিড়ম্বনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু জীব এইরূপ বিভ্রান্ত হইলেও অংশীর সম্বন্ধ হইতে অংশস্বরূপে সে বঞ্চিত হয় না। প্রলয়ে জীব অব্যক্ত অবস্থায় বিলীন হয় অর্থাৎ তাহার

কর্ম্মের কোনরূপ চেতনা বা কর্ম্ম সাধনের যোগ্যতা থাকে না। এই অবস্থাতেও ভগবান্ জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ থাকেন। সৃষ্টিকালে জীব যাহাতে তাঁহার সহিত আত্মসম্বন্ধ অনুভব করিয়া স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তিনি তদুপযোগী দেহেন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়া অন্তর্য্যামী স্বরূপে তাহার আত্মারূপে অবস্থান করেন। তিনি জীবকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কৃপা করেন না কেন— কেন তাহার কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, এইখানেই জীবের সহিত ভগবৎ-সম্বন্ধের রহস্য। ভগবান চাহেন যে জীব তাঁহাকে সর্ব্বাত্মভাবে আপন করিয়া আস্বাদন করে, জীবেরও প্রেমের পথে ভগবানের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ পুরাপুরি আস্বাদন করিতে হইলে বিশ্লেষের সূত্রেই সংশ্লেষের উদ্দীপন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভগবানের দিকে জীবের দৃষ্টি থাকে না। সে অহঙ্কারের মধ্যে পড়ে, তখন তাহার জন্মে জড়ত্ব। পক্ষান্তরে ভগবানের দিকে আভিমুখ্য ঘটিলে সে স্বরূপধর্ম্মে ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। উর্দ্ধলোক হইতে সৃষ্টিতে ভগবৎ-বীর্য্যসঞ্চারিত সর্ব্বাত্মানুস্নপনোপযোগী এই সংবেদন এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক চাতুর্য্যের রীতিটি গীতার দশম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে গূঢ়ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকটির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পক্ষে কিছু গৌণ মনে হইলেও গীতোক্ত ভগবদ্ভক্তির তাৎপর্য্য আস্বাদনে আমাদের পক্ষে সহায়ক হইবে এবং পরাভক্তিই যে গীতোক্ত উপদেশের লক্ষ্য আমরা ইহা বুঝিব। সেই সঙ্গে সে ভক্তির স্বরূপটিও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। উক্ত শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, সপ্ত মহর্ষিগণ, পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিচতুষ্টয় এবং মনুগণ মদ্গতচিত্ত এবং আমার মনঃসঙ্কল্পজাত। এই সংসারে তাঁহাদেরই সন্তান-সন্ততির বিস্তার ঘটিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, নিখিল সৃষ্টির মূলে বল ও পৌরুষ লইয়া ভগবান্ ক্ষর এবং অক্ষর উভয় ব্যাপ্ত করিয়া পূর্ণতম স্বরূপে প্রমূর্ত্ত। স্রষ্টারূপে ব্রহ্মা তাঁহারই বাঙ্ময় ঐশ্বর্য্যে এবং পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইয়াই সৃষ্টি করেন। শ্রীভগবানের "ইচ্ছা, জ্ঞান

ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন। তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন", চরিতামৃতের ইহাই সিদ্ধান্ত। ভগবৎ-বীর্য্যে সমাহিত-চিত্ত প্রজাপতির অসঙ্গ ভাবটি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবৎ-ইচ্ছাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার স্মৃতিকে উদ্দীপিত করে। "পূর্ব্ব চত্বারঃ মহর্ষয়ঃ" সনক, সনন্দ, সনৎ-কুমার ও সনাতন এই চারিজন ব্রহ্মার চিত্তমূলে ভগবৎ-বীর্য্যপ্রণোদিত এই অসঙ্গভাব হইতে উদ্ভূত। ভাগবতে দেখা যায়, পূর্ব্বকৃত সৃষ্টির সহিত পাপ পুণ্যের সংস্রব বিজড়িত দেখিয়া ব্রহ্মা নিজের অপরিপূর্ত্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার ভগবৎ-ধ্যানযোগের প্রভাব হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার সৃষ্ট হইলেন। ইহারা সকলেই নিষ্ক্রিয় এবং ঊর্দ্ধরেতা। ব্রহ্মা ইহাদিগকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিলে ঋষি-চতুষ্টয় তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর সপ্ত মহর্ষি এবং মনু-গণকে প্রজাপতি মানস-পুত্র স্বরূপে সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজা সৃষ্ট হইল। আচার্য্য শঙ্কর তৎকৃত গীতাভাষ্যে দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের "পূর্ব্বে মহর্ষয়ঃ সপ্ত" এই ভাবে অন্বয় করিয়াছেন। সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমার এই চারিজন ঋষি নিষ্ক্রিয়। ইহারা ঊর্দ্ধরেতা, সুতরাং ইঁহারা প্রজাসৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট হন নাই, তাঁহার ইহাই সিদ্ধান্ত। আচার্য্য শঙ্কর ভাগবতকে ভিত্তি স্বরূপে গ্রহণ করিয়াই এইরূপ অন্বয় করিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত তিনি সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে চতুঃসনের ন্যায় সপ্তর্ষিগণও ব্রহ্মার মানস ব্যাপার। তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইলেও ব্রহ্মার হৃদয়ে জাগ্রত ভগবদিচ্ছার দ্বারাই প্রভাবিত। তাঁহারা প্রজ্ঞানতত্ত্ব। সৃষ্টির সহিত তাঁহারা গুণ-সংশ্লিষ্ট নহেন। শ্রুতি বলেন—

"তদ্বেদ গুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ।" (শ্বেতাশ্বতর—৫।৬)

বেদ-গুহ্য অর্থাৎ বেদের দুর্ব্বোধ্য-বিদ্যা উপনিষৎসমূহে নিহিত অর্থাৎ কথিত। বরেণ্য সেই ব্রহ্মযোনি ভগবানকে ব্রহ্মা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদেবগণ এবং ঋষিগণ তাঁহার তত্ত্ব অধিগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথিবী প্রভৃতির সর্ব্বলোকের কারণস্বরূপে তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিভূতিতে তন্ময়তা লাভ করিয়া অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

চতুঃসনের সহিত সপ্তর্ষিগণের পার্থক্য এই যে, চতুঃসন সাক্ষাৎ-সম্পর্কে শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার। শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি সঙ্কর্ষণ, চতুঃসনে তাঁহারই আবেশ। সঙ্কর্ষণ মায়াতীত পুরুষ, সুতরাং তিনি জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহার আবেশাবতারগণও মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন, "যদ্যপি অসংখ্য এই চিৎশক্তি বিলাস, সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় হয় তাহার প্রকাশ", "মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।" সঙ্কর্ষণের শক্ত্যাবেশাবতার স্বরূপেই চতুঃসন অপ্রাকৃত সৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে সপ্তর্ষি এবং মনুগণ সৃষ্টিকার্য্যে সঙ্কর্ষণের ইচ্ছায় সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডগণের সহিত সংশ্লিষ্ট। বস্তুতঃ সঙ্কর্ষণের বা ভগবানের ক্রিয়াশক্তির প্রভাব প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—মায়াতীত এবং মায়িক উভয় সৃষ্টির মূলেই রহিয়াছে। সুতরাং চতুঃসন্ শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার হওয়াতে প্রাকৃত শক্তির সঙ্গেও তাঁহারা যুক্ত রহিয়াছেন—রহিয়াছেন আবেশে, অন্যকথায় নিত্যমুক্ত জীবরূপে আবিষ্টভাবে। "মুক্তা অপি দেহং কৃত্বা ভগবন্তং বাসুদেবং ভজন্তে"। তাঁহারা মুক্ত হইয়াও ভগবান্ বাসুদেবের সেবা করিতেছেন। তাঁহারা প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে শ্রীভগবানের ইচ্ছা, জ্ঞান, এবং ক্রিয়া-পরিপূর্ত্ত অপ্রাকৃত চিৎ-শক্তির বিলাসটি নিত্যভাবে অনুস্যূত বা অনুপ্রবিষ্ট রাখিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধকগণ শ্রীভগবানের পূর্ণ ক্রিয়াশক্তি মূল সঙ্কর্ষণের শক্ত্যাবেশাবতার-স্বরূপে চতুঃসনের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে গিয়া বলিয়াছেন "সনকাদি ভাগবত শুনে তাঁর মুখে"। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, চতুঃসন

সঙ্কর্ষণের বাত্ময় মাধুর্য্যে আবিষ্ট অবস্থায় সৃষ্টিকার্য্যে অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া তদিচ্ছায় নিত্য অবিকারী তত্ত্বস্বরূপে কাজ করিতেছেন। তাঁহারা গুরুতত্ত্ব—"কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।" চরিতামৃতের উক্তি—'সনকাদ্যে জ্ঞান-শক্তি।' সুতরাং শ্রীভগবানের ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া এই তিন শক্তির সংযোগে প্রপঞ্চ-রচনার রাজ্যে চতুঃসন জীবহৃদয়ে শ্রীভগবানের অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রণোদনকারী। জীবের সহিত শ্রীভগবানের বীজগত নিজভাবের সম্বন্ধ উজ্জীবিত করিয়া তাঁহারা 'সবাকার উপদেষ্টা'। আচার্য্যরূপে তাঁহাদের এই প্রভাব। এই প্রভাব পরাভক্তির পথে। তাঁহাদের কৃপায় অবিদ্যা এবং অজ্ঞানতা হইতে জীব মুক্ত হইলে সে ভগবৎ-মাধুর্য্য উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জ্জন করে। কিন্তু অক্ষরতত্ত্বাশ্রিত চতুঃসনের আংশিক রূপটি দেখিলেই জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। ক্ষর এবং অক্ষর শ্রীভগবানের উভয়তত্ত্বে ব্যাপ্ত অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যে মগ্ন সঙ্কর্ষণের শক্ত্যাবেশাবতার-স্বরূপে তাঁহার অখণ্ড স্বরূপটিও উপলব্ধিও করা প্রয়োজন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।" জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির এই ক্রম। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সহিত সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় রামানন্দ গীতোক্ত এই শ্লোকটি উত্থাপন করেন। শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবার পরও কেহ কেহ শ্রীভগবানের পরাভক্তি লাভে অধিকারী হইতে পারেন। উক্ত শ্লোকে পরাভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ব্রহ্ম-সাযুজ্যে সে বস্তু মিলে না। "ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তির তাঁহা নাহি গতি বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি।" (চৈঃ চঃ) শ্রীভগবানের জন্য লালসা চিত্তে জাগ্রত না হইলে ভক্তি লাভ হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের একপাদ মায়িক বিভূতির সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন ব্রহ্মা। 'চিরলোক-পাল শব্দে তাঁহার গণন।' মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এই সবলোক লইয়া তাঁহার কাজ। চতুঃসন একপাদ মায়িক বিভূতির রাজ্য জনলোক-বাসী। কিন্তু শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতারস্বরূপে তাঁহারা

প্রাকৃত রাজ্যে অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তির উজ্জীবক। ভাগবতে দেখা যায়, নারায়ণ ঋষি স্বয়ং জনলোকবাসী সনক সনন্দাদি চতুঃসনের উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা নারায়ণাশ্রমে সমাগত ঋষিদিগকে উপদেশ করেন। জনলোক ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত। ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি মহর্লোক হইতে প্রাকৃত স্তরে বিস্তার লাভ করে। ব্রহ্মলোকের উপর "চিচ্ছক্তি বিভূতিধাম, ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম"। "ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের বাক্যঅগোচর।" অনন্ত স্বরূপের ধামরূপে নিজের চিচ্ছক্তিতে কৃষ্ণ এখানে নিত্য বিরাজমান। চরিতামৃত বলেন, "চিচ্ছক্তিসম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম, সেই স্বরাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম। অতএব বেদে কহে শ্রীভগবান্।" ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামাদের চিচ্ছক্তির বিলাসের এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে না। মহতের কৃপা থাকিলে সাযুজ্য-প্রাপ্ত বা ব্রহ্মভূতগণের চিত্তে সেই কৃপা-প্রভাবে পরাভক্তি উদ্রিক্ত হয় এবং সাযুজ্য-কামনা তুচ্ছ হইয়া পড়ে। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, এবং লীলা-মাধুর্য্যের আকর্ষণে তাঁহারা বিভিন্ন পুরুষার্থস্বরূপে ভগবানের সেবালাভে অধিকারী হন।

"মুক্তি হয় পঞ্চ প্রকার
সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য আর
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।" (চৈঃ চঃ)

চতুঃসনের অখণ্ড স্বরূপটি গুরুতত্ত্বে এই কৃষ্ণসেবার সঙ্গতিতে পরিপূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। ইহা ঘটিয়াছে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-বীর্য্যের সর্ব্বময় আনুগত্যে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-মাধুর্য্য "সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে"। চৈতন্যচরিতামৃতের উক্তিতে চতুঃসনের এই স্বরূপের পরিচয়ই আমরা পাই। ভাগবতেও কুমারগণের সেই স্বরূপেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।" "আত্মারাম

মুনিগণের পর্য্যন্ত হরে মন ঐছে অনন্ত ভগবানের গুণগণ।" আত্মারাম মুনিগণ বলিতে চতুঃসনকেই বুঝিতে হইবে। 'আত্মরামাস্তু সনক-সনন্দনমুখা মতাঃ'—(ভঃ রঃ সিঃ ৩।১।৫)। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর মতে চতুঃসন্ 'শুদ্ধজ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ প্রচারার্থমবাতরৎ' (লঘু ভাগবতামৃত) অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান বা পরাভক্তির প্রচারের জন্য ইহারা প্রতি ব্রাহ্মকল্প হইতে মহাপ্রলয় পর্যান্ত বিদ্যমান থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিতত্ত্বে চতুঃসনের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। ভগবানের ধ্যান-পূতচিত্তে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহারা বৈকৃত সৃষ্টি. ব্রহ্মার ধ্যানের ফলে ভগবানই তাঁহাদিগকে আবির্ভাবিত করিয়াছেন এজন্য তাঁহাদিগকে প্রাকৃত সৃষ্টিও বলা যায় সুতরাং তাঁহারা উভয়াত্মক।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

"স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মষয়ো দেবতাশ্চ
তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি।"

(শ্বেতাশ্বতর—৪।১৫)।

কল্পারম্ভকালে পরব্রহ্ম জগৎ-রক্ষকস্বরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামিস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মর্ষি এবং দেবগণ ঐ সময় তাঁহার সহিত যুক্ত অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত অবস্থায় অবস্থান করেন. তাঁহার এই বিভূতিসহ তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়। আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতির এই শ্লোকের ব্রহ্মর্ষি বলিতে সনকাদি ঋষিগণ এবং দেবগণ বলিতে ব্রহ্মাদি বুঝাইয়াছেন এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, চতুঃসন জীবের প্রতি নিত্য অনুকম্পা-পরায়ণ। তাঁহারা শ্রীভগবানেরই অনুগ্রহমূর্ত্তি এবং পরব্রহ্মের জগৎরূপে ব্যক্তভাবের মূলে অবিকৃত তাঁহার আত্মস্বরূপের সহিতই তাঁহারা যুক্ত বা তৎসেবা-সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতে 'আত্মারাম' প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায়

শ্রীভগবানের মূল-ক্রিয়াশক্তি সঙ্কর্ষণের আনুগত্যে ক্ষরের অতীত "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" পুরুষোত্তম-স্বরূপ শ্রীভগবানের পরম-মাধুর্য্যে নিমগ্ন চতুঃসনের অখণ্ড নিত্যস্বরূপটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। অক্ষরতত্ত্ব বা ব্রহ্মানন্দ ভগবৎ-মাধুর্য্যের নিকট তুচ্ছ বস্তু। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের পরাভক্তিলাভেই জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। গীতোক্ত "ব্রহ্মভূতঃ" শ্লোকার্থের পরিপূর্ত্তি সেই পরাভক্তিতে ইহা সুস্পষ্ট। মায়াবাদ-সম্মত মোক্ষ অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য। ফলতঃ সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তুস্বরূপ ভগবৎ-মাধুর্য্যে প্রভাবিত তাঁহারা গুরুবীর্য্যে সেই মাধুর্য্যই জীব-জগতে বিতরণ করিতেছেন। কলি-সন্তরণোপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, সনৎকুমার-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় যে, সনৎকুমার শ্রীভগবানের নাম, গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকেই সাধনমার্গ-স্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে দেবর্ষি নারদ ইহাদিগকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

"সদা বৈকুণ্ঠ-নিলয়া হরিকীর্ত্তন-তৎপরাঃ।
লীলামৃতরসোন্মত্তা কথামাত্রৈকজীবিনঃ॥
হরিঃ শরণমেবং হি নিত্যং যেষাং মুখে বচঃ।
অতঃ কাল-সমাদিষ্টাঃ জরাযুষ্মান্ন বাধতে॥"

আপনারা নিত্যই বৈকুণ্ঠবাসী এবং সর্ব্বদা শ্রীহরির নাম, গুণ ও লীলাকীর্ত্তনে তৎপর ও তদীয় লীলারস পানে উন্মত্ত; হরিকথাই আপনাদের আহার ও পানীয় স্থানীয়। "শ্রীহরি শরণম্" এই উক্তি আপনাদের মুখে লাগিয়া রহিয়াছে, সুতরাং কালকৃত-জরা আপনাদিগকে বিকৃত করিতে পারে নাই, অর্থাৎ সুকুমার পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় আপনাদের আকার নিত্য কমনীয়ই রহিয়াছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী ইহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"প্রবর্ত্তনায় লোকেঽস্মিন্ স্বভক্তেরেব সর্ব্বতঃ।
হরির্দেবর্ষিরূপেণ চন্দ্রশুভ্রো বিধেরভূৎ॥

আবির্ভূয়াদি মে ব্রাহ্মে কল্প এব চতুঃসনঃ।
নারদশ্চানুবর্ত্ততে কল্পেষু সকলেষ্বপি ॥"

(লঘু ভাগবতামৃতম্)

অর্থাৎ ইহলোকে স্বীয় ভক্তি-প্রবর্ত্তনের জন্য শ্রীহরি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেবর্ষিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চতুঃসন্ ও নারদ এই উভয় অবতারই আদিম ব্রাহ্মকল্পে আবির্ভূত হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সকল কল্পেই বিদ্যমান থাকেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "দেবর্ষিণাং চ নারদ"—দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলিয়া যাঁহারা সৃষ্টির আত্যন্তিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই, এই কথাই বলিতে হয়। গীতার উদ্দেশ্য ভগবানকে পাওয়া এবং তাঁহার সেবা লাভ করা। তপোযজ্ঞাদির দ্বারা তাহা লভ্য নহে, পরন্তু ভগবৎ-প্রেমের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। একান্ত-ভক্ত মুক্তিপ্রার্থী হন না। তাঁহারা মুক্তিকে ঘৃণার চোখেই দেখেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ,
তুচ্ছ করি মুক্তি দেখে নরকের সম।"

প্রকৃতপক্ষে ভগবানই বিশ্বজগতের প্রভব-তত্ত্ব। ভগবান্ নিজেই একথা বলিয়াছেন—

"পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্-সাম-যজুরেব চ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥"

এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা
শক্তি সঞ্চারিয়া কৃষ্ণ তারে করে কৃপা।

কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ
অগ্নি-শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ।
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত-কারণ
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন।
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ।"

শ্রুতি বলেন—"যতো ইমাণি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ তদ্বিজিজ্ঞাস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তিরীয়-ভৃগুবল্লী)। অর্থাৎ যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া জীবিত থাকে এবং প্রলয় সময়েও যাহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হও। তিনিই ব্রহ্ম।

"জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়
জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয়।"
(শ্রীচৈঃ চঃ—২।৬।১০৭)।

দেহাত্মবুদ্ধি হইতে জীবকে মুক্ত করিয়া সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জীবের সহিত 'যাঁহার বিভূতিদেহ সব চিদাকার' এমন ভগবানের আত্মসম্বন্ধটি উন্মুক্ত করাই দশম অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্' —কৃষ্ণকে অখিলের আত্মাস্বরূপ বলিয়া জানিবে, ভাগবতে শ্রীশুকের এই উপদেশ। জানাইবার এই ভারটি শ্রীকৃষ্ণ নিজেই লইয়াছেন। নহিলে তাঁহাকে জানিবে কে? জীবের সহিত এই সম্বন্ধের সূত্রেই ভগবান আনন্দময় এবং এই সম্বন্ধটি স্বচ্ছন্দ করিয়া তিনি আপন মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। সনৎকুমারাদি নির্ব্বিশেষ-পরায়ণ হইয়াও পরব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অখিল জীবের প্রতি প্রীতির এই রীতিতে আকৃষ্ট হন।

"অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তাঁর বল
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল।

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ
সম্যক্ আস্বাদিতে নারি মনে রহে ক্ষোভ।"

(চৈতন্যচরিতামৃত)।

এই ক্ষোভে তাঁহাদের চিত্তে পরাভক্তির উদ্রেক ঘটে। তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজনে উন্মুখ হন। এই উন্মুখতা বা লালসা রাগানুগা ভক্তিরই লক্ষণ। সনক, সনন্দ, সনৎকুমার এবং সনাতন চতুঃসনের এই স্বরূপতত্ত্ব সমগ্রভাবে উপলব্ধি না হইলে অপরা প্রকৃতির অভিভূতির স্তর হইতে আমাদের চিত্তের অভ্যুত্থান ঘটে না এবং 'প্রেম্না হরিং ভজেৎ' শ্রুতির এই নির্দ্দেশ যথাযথভাবে আমাদের অধিগত হয় না। এ জন্যই আমাদের স্বরূপানুবন্ধী কৃষ্ণ-সেবার সম্বন্ধের উজ্জীবন-মূলে চতুঃসনের লীলা প্রাসঙ্গিক এবং তাহা আস্বাদন করা আমাদের প্রয়োজন। 'বিষয় ছাড়িয়া যবে শুদ্ধ হবে মন তব হাম হেরব সো শ্রীবৃন্দাবন'—ভাবের সাধন সেই খানে। অর্জ্জুন এই অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। কৃষ্ণগুণ-শ্রবণের ফলে তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জাগ্রত হইয়াছে। চরিতামৃত বলেন—'অনুরাগের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ দরশন'। একাদশ অধ্যায়ে ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার এই লালসার চরিতার্থতা সাধিত হইয়াছে—হইয়াছে বিশ্বরূপ দর্শনে, হইয়াছে আমাদের সর্ব্বজীবের প্রয়োজনে এবং এই প্রয়োজনের মূলে রহিয়াছে ভগবানের নিজের প্রয়োজন।

বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ

১। মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

২। ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

৩। তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

৪। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

ভগবান্ স্বয়ং বিশ্বরূপ, তিনি পরব্রহ্মতত্ত্ব। বিশ্বাত্মদেবতাকে মনের মূলে উপলব্ধি করিলে সমগ্র বিশ্বকে জীব বিশ্বাত্ম-দেবতারই দেহরূপে উপলব্ধি করে। বিশ্ব বা জগতের কতকখানি আমরা অবশ্য সকলেই দেখি কিন্তু তাহা যে একই পরমদেবতার শরীর তাহা দেখিতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-কৃপার সংবেদন সাক্ষাৎ-সম্পর্কে মনের মূলে লাভ না করিলে শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মময় এই রূপটি দর্শন করিবার জন্য আমাদের চেতনার ভূমিতে বেদনা জাগ্রত হয় না। জৈব সংস্কারে আমাদের মন প্রভাবিত হইয়া চলে। আমাদের কোনরূপ প্রয়াসে আমরা বিশ্বমূর্ত্তিস্বরূপে শ্রীভগবানের চিৎ-বিলাস উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা শরীরকে দেখি কিন্তু শরীরীকে সমগ্র শক্তি সমন্বিত অখণ্ডরূপে দর্শন করি না। ভগবৎ-কৃপার স্পর্শানুভূতির চেতনায় চিত্তের মল দূরীভূত হইলে ভগবানের নিরবচ্ছিন্ন সংবেদন-সূত্রটির সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটে। সেই অবস্থায় দেহাত্মবুদ্ধি আমরা বিস্মৃত হই। আমরা ভুলিয়া যাই আমাদের চারিদিককার ভৌতিক জগতের অবস্থিতিকে। কালের অনুভূতি সেক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়, লুপ্ত হয় সেই সঙ্গে দেশেরও অনুভূতি। অলৌকিক আলোকে প্লাবিত আনন্দের রাজ্যে আমাদের অভ্যুত্থান ঘটে। বস্তুতঃ সে অবস্থায় আমাদের এই চর্ম্মচক্ষু আর থাকে না। আমরা দিব্যচক্ষু লাভ করি এবং সে চক্ষু আমাদের এই চক্ষু নয়, সে চক্ষু স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতেই লাভ করিতে হয়। অর্জ্জুন শ্রীভগবানের আত্মবিভূতিময় বিশ্বরূপ শ্রীভগবানের কৃপা-লব্ধ এমন দিব্য-চক্ষুযোগেই দর্শন করিয়াছিলেন। "যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্যঃ।"

বিশ্বাত্মস্বরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটি দর্শন কিন্তু নূতন নয়। মা যশোদা দুই দুইবার এই রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাও ব্রজধামে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে পান। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দেখা যায়,

নারদ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া একাগ্রমনা, সমাহিত-চিত্ত এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীভগবানের স্তব-স্তুতি করিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য বলবতী ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। তিনি নারদকে বলেন, আমার দর্শন-লালসায় মহর্ষিগণ এই স্থানে আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা আমার দর্শন পান না। ঐকান্তিক শ্রেষ্ঠ ভক্ত ব্যতীত অপর কেহই আমার দর্শন পায় না। ভগবান্ পাণ্ডব-গণের দৌত্য স্বীকারপূর্ব্বক কুরুরাজ-সভায় গমন করিলে দুর্য্যোধনও তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অদ্বৈত প্রভুও বিশ্বরূপ দেখিতে পান। চৈতন্যভাগবতের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণিত আছে। "অদ্বৈত বলয়ে প্রভু তুমি অর্জ্জুনেরে যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় ধরে"—তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ হয়। তিনি দেখেন বিশ্বরূপ। সে রূপ কেমন ? এই রূপ কি কল্পরূপ ? এ কি কাব্য, না সত্যই দেখা। শাস্ত্রবচন স্বীকার করিলে বৈজ্ঞানিক ভাবে এই দর্শনের বাস্তবতা স্বীকার করিতে হয়। শ্রীভগবানের কৃপায় এ দর্শন মিলে। ভগবৎ-কৃপার সহিত সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সম্বন্ধ সুতরাং মিথ্যাভূতা মায়ার সহিত এ দর্শনের সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কিন্তু এই দেখাটি কেমন ? প্রথমেই মা যশোদার দর্শনটির কথা ভাবুন। তিনি একদিন পুত্রকে স্তন্যপান করাইতে গিয়া শিশুর জৃম্ভণকালে তাঁহার বদন-বিবরে আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পান। এই অভূতপূর্ব্ব দর্শনে তাঁহার অঙ্গে বেপথুর সঞ্চার হয়। পরে মৃৎ-ভক্ষণলীলাতেও এমন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে। যশোদা পুত্রের মুখ-বিবরে বিচিত্র বিশ্ব এবং সেই বিশ্বের একপার্শ্বে নিজের সহিত ব্রজধামের অবস্থান দেখিতে পান। ইহার পর ব্রহ্মমোহন লীলা। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে সম্মোহিত করিতে গিয়া নিজেই তাঁহার মায়ায় বিমোহিত হইয়া পড়েন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিতে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে তিনি এইরূপ দর্শন করেন।

মা-যশোদা কিংবা ব্রহ্মার বিশ্বরূপ দর্শন, নারদের দর্শন কিংবা অদ্বৈত প্রভুর বিশ্বরূপ দর্শন এবং অর্জ্জুনের দর্শন কিন্তু এক বস্তু নয়। দুর্যোধনের দর্শন তো নহেই। যশোমতীর বিশ্বরূপ-দর্শনে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইলেও সে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে কবলিত ছিল। বিশ্বরূপ-দর্শনে নন্দরাণীরও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠে, কিন্তু সেই যে ভীতি তাহা তাঁহার দেহাত্ম-সম্পর্কিত নয়। গোপালেরই পাছে অমঙ্গল ঘটে এই ভয়ে তাঁহার সম্প্রসারিত দৃষ্টির মূলটি জুড়িয়াছিলেন তাঁহার পুত্ররূপী গোপাল। ব্রহ্মার বিশ্বরূপ-দর্শনের মূলে শ্রীভগবানের যে বিভূতি ব্যক্ত হয়, তাহার উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্যস্বরূপে ছিল ব্রজের রাখাল নন্দদুলালেরই প্রেম-মাধুর্য্যের বীর্য্য। মা যশোদার দর্শন, ব্রহ্মার দর্শন, নারদের দর্শন, অদ্বৈত প্রভুর দর্শন এবং অর্জ্জুনের দর্শনের মূলে কৃপা-শক্তির মাধুর্য্য আছে কিন্তু সেই মাধুর্য্য সম পর্য্যায়ভুক্ত নয়। বিশ্বরূপ-দর্শনে অদ্বৈত প্রভুর চিত্তের ভাবটি শ্রীল বৃন্দাবন দাস. পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"সে রূপ দেখিতে অন্য কারো শক্তি নাই
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য-গোঁসাই।
প্রেম-সুখে অদ্বৈত কাঁদেন অনুরাগে
দন্তে তৃণ ধরি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে।"

মা যশোদা এবং ব্রহ্মার বিশ্বরূপ দর্শনেরও সঙ্গে নিত্যলীলার ভাবটি ওতঃ-প্রোতভাবে বিজড়িত। কাল এবং মায়ার উর্দ্ধে প্রকৃতি বিকৃতিকে অপ্রাকৃত রসধর্ম্মে উজ্জীবিত করিয়া সর্ব্ব বিকৃতিকে অবিকৃত আত্মভাবে উজ্জ্বল করিবার খেলা সেই দর্শনে ছিল, সেখানে ছিল প্রভব-তত্ত্বের মূলে রমণাত্মক ভাবেরই প্রভাব। বিশ্বরূপ-দর্শনে দুর্য্যোধনের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। চৈতন্যভাগবত বলেন—

"বিশ্বরূপ কৃষ্ণের দেখিল দুর্য্যোধন,
না পাইল সেহ ভক্তিহীনের কারণ,
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।"

শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া নিজের পক্ষে আনয়নের উদ্দেশ্যে কুটিল-মতি দুর্য্যোধন পথিপার্শ্বস্থ প্রতি গৃহে নানাবিধ উপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজারাধনার অভিনয় করেন। ভগবান্ ভাবগ্রাহী। তিনি সে সমস্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। পূজার সম্ভার যেন দেখিতে না হয়, এজন্য তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। স্তবাদি যাহাতে শুনিতে না হয়, এজন্য তিনি কর্ণে অঙ্গুলি দিয়াছিলেন। ভগবান্ এবং তাঁহার ভক্তগণ অকুটিল অজ্ঞানীকেও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকে ও তাঁহারা কৃপা করেন না। শ্রীপাদ জীব ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৪ অনুচ্ছেদে এই মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনটি কোন পর্য্যায়ে পড়ে, ইহাই বিবেচ্য। কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত। তাঁহার বৈভবও অপার। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি—এই তিন শক্তি প্রধান—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল ক্রিয়া চ।" ক্রিয়াশক্তি আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চে ভগবানের অবতরণ ঘটে। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের মূলে বিশ্ব-প্রপঞ্চের এই জৈব স্তরে শ্রীভগবানের ক্রিয়া-শক্তির রীতি এবং প্রকৃতিটি বিশেষভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। সর্ব্বতোব্যাপ্ত এই বিলাস অনাদি, মধ্য ও অনন্ত বীর্য্যময়, ইহা অলৌকিক। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক এই রূপে ভূলোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক যুগপৎভাবে দীপ্ত করিয়া শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশ। বহুত্বকে একত্বে উদ্ভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্মালার মেখলায় এই দিব্য বিভূতির দীপ্তি এবং দ্যুতিতে অর্জ্জুনের চিত্তেও ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। জৈব ক্ষর প্রকৃতির প্রতিবেশে শ্রীভগবানের যোগৈশ্বর্য্যময় এমন বিভূতির বীর্য্য দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব এবং তাহার বুদ্ধির পক্ষে অসঙ্গত এবং অননুভবনীয়। জীব নিজের ক্ষুদ্র জীবনের সীমাবদ্ধ চেতনার মধ্যে সর্ব্বাত্মময় এমন ব্যাপ্তিশীল বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে বিচলিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ক্ষর-প্রকৃতির সঙ্গেই এক্ষেত্রে ভগবৎ-শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। শ্রীভগবানের

জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি সেই ক্ষর-প্রকৃতির ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম-সূত্রে আভাসিত। বল বা বশ করিবার শক্তি এক্ষেত্রে সমধিক প্রকট। প্রকৃতপক্ষে গুণ-সর্গে আভাসিত এই ভাবটি অধিদৈব। ইহার ফলে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মূলীভূত অনুভূতি জড়ধর্ম্মে আশ্রিত আমাদের মনকে উচ্চকিত করে। এমন বিরাট এবং বিশাল পরিপ্রেক্ষায় আমরা নিজদিগকে হারাইয়া ফেলি। এই অনুভূতি এত বিরাট যে মানুষের ক্ষুদ্র সত্তা তাহা ধারণা করিতে পারে না। আমাদের অহঙ্কারের দীপ অনন্ত আকাশের তীব্র বায়ুর তাড়নে কম্পিত হয় এবং নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতে চায়। নিজেরা আমরা কত ক্ষুদ্র তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবানের উক্তি আমাদের শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হয়, আমি সনাতন কাল—লোক-সংহারে আমি নিযুক্ত। এই রণক্ষেত্রে সকলকে সংহার করিবার জন্য আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। কথা শুনিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তবে কি মৃত্যুই আমাদের চরম পরিণতি ? আমাদের অস্থি-মাংস চর্ব্বণ করিয়া গ্রাস করাই কি ভগবানের কাজ ! তবে শ্রীভগবান্ জীবাত্মা স্বরূপতঃ অপরিণামী, সনাতন—এই যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার কি কোন মূল্য নাই ? ইহার পরমুহূর্ত্তেই ক্ষর-প্রকৃতির এই আধারে অধিযজ্ঞ পুরুষ বা অক্ষর-স্বরূপ যিনি তাঁহার আশ্বাসবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়। অর্জ্জুন তোমার ভয় কি ? তোমার সঙ্গে আমি আছি। কেহ থাকিবে না, অথচ তুমি থাকিবে, তোমার সঙ্গে থাকিব আমি। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যাইবে, আমি তোমাকে তোমার নিত্য অবিনাশী আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করিব। আমি তোমার সব হইয়া আছি। আর কেহ তোমার নাই, এই সত্যটি উপলব্ধি কর তবেই তুমি অবিনাশী তোমার স্বরূপটি বুঝিয়া পাইবে, বহুভাবের ভেদ-বুদ্ধির মধ্যে পড়িয়া তুমি মরণের বিভীষিকায় বিচলিত হইবে না। আমি পূর্ব্বেই তোমার শত্রুকুলকে নিহত করিয়াছি। তুমি আমার কর্ম্মে নিমিত্ত-মাত্র হও। তুমি সামান্য নহ, তুমি আমার লীলা-সহচর। আমার

মহতী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমি তোমার দিকে তাকাইয়া আছি। আমার বিশ্বতোব্যাপ্ত ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তিতে তোমার নিজের স্বরূপ উপলব্ধির বীজটি নিহিত রহিয়াছে, রহিয়াছে তোমার অবিনাশী আত্মস্বরূপে আমার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছার অভেদ সম্বন্ধে আমার নিত্য লীলার যোগ। অর্জ্জুন এত বড় কথা শুনিলেন। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া অখিল জীবকে শ্রীভগবান্ সনাতন এমন আশ্রয়টি ধরাইয়া দিলেন। প্রথমে ক্ষর প্রকৃতিতে অর্জ্জুনের দৃষ্টি পতিত হয়, সৃষ্টির দিকে তাঁহার দৃষ্টি যায়। পরে সাধিদৈব হইতে শ্রীভগবান্ সাধিযজ্ঞ স্বরূপের প্রভাবে তাহার নিত্য সান্নিধ্য সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে সচেতন করিয়া দিলেন। অর্জ্জুন অবিদ্যার মৃত্যুময় অধিভূত অভিভূতির রাজ্যে লাভ করিলেন শ্রীভগবানের কৃপায় সনাতন সত্যে মনের উজ্জীবন। শ্রীভগবান্ এই সত্যটি মর্ত্ত্য জীবের নিকট প্রকট করিলেন যে, জীবত্ব মৃত্যুশীল, মৃত্যুমূলে রহিয়াছে তাঁহার স্ব-স্বামিত্বেরই অভিমান। কিন্তু জীবের আত্মা অমর। ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়-স্বরূপ। জীব তাঁহার আশ্রিত। জীবের সহিত শ্রীভগবানের সেব্য-সেবক এই সম্বন্ধটি সনাতন। জীব এই সম্বন্ধ বিস্মৃত হইলে মৃত্যুময় মহাভীতির রাজ্যে গিয়া পড়ে। প্রত্যুত পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ বিশ্বকে সর্ব্বদা ধারণ এবং পোষণ করিয়া রহিয়াছেন। জীব তাঁহার এই সর্ব্বাশ্রয়ত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া বিশ্ব-জগতে মহতী বিনষ্টি সৃষ্টি করিয়া লয়। বিশ্বজীবের প্রতি শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বের প্রগাঢ় সংশ্লেষণ বা প্রেমের রীতিকে সে দেখে গ্রসন, সে দেখে মৃত্যু। তাঁহার প্রীতি কালের রীতি ধরিয়া খণ্ড প্রতিবেশের বহুত্বের বিপর্য্যয়ে জীবকে বিভ্রান্ত করে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধটিই পরিস্ফূর্ত্ত করিলেন। পরিবর্ত্তনশীল ক্ষর প্রকৃতি হইতে কূটস্থ অক্ষর এবং অপরিবর্ত্তনীয় অব্যাকৃত পরমাত্ম-তত্ত্বকে জীবের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া তিনি পরিশেষে সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ বিশ্বময় তাঁহার আত্মলীলাটির দিকে আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। বিশ্বরূপের এই ত্রিভঙ্গিম রূপটি,

ব্যক্তাব্যক্তে উদ্দীপিত এই ব্যঞ্জনাটি অভিনব। সত্যই অর্জ্জুন যে রূপটি দেখিলেন, তাহার তুলনা নাই এবং তিনি ব্যতীত শ্রীভগবানের এমন রূপ আর কেহ দেখেও নাই। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের মূলে তিনটি ধারায় শ্রীভগবান্ তাঁহার বৃহৎ ভাবটি বা তাঁহার ব্রহ্মত্ব, তাঁহার কূটস্থ পরমাত্ম-তত্ত্বে জীবের হৃদয়ে নিত্যসংস্থ স্বরূপ এবং ভগবত্তা বা চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলা-মাধুর্য্য ব্যক্ত করিলেন। আমাদের জৈব পুরুষকারের দৌড় কতটা গীতার বিশ্ব-রূপের সর্ব্বতোব্যাপ্ত বিরাট পরিপ্রেক্ষায় আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষর এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে সংযোগ লাভ করিবার কৌশলটিও তাঁহার আত্মমাধুর্য্যে আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইল। আমরা বুঝিলাম আমরা অনন্তের অধিকারী আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিলাম যে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমরা ভগবানকে লাভ করিতে পারি।

গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনে স্থূল বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর বিশ্বাশ্রয়স্বরূপে ভগবৎ-তত্ত্বটির অভিব্যক্তি ধরা পড়িয়া যায়। ক্ষর প্রকৃতির জড় অনুভূতির মূলে অক্ষর বা পরমাত্ম-স্বরূপে শ্রীভগবানের অবস্থিতি আমরা এক্ষেত্রে অভ্রান্ত ভাবে উপলব্ধি করি। কিন্তু একটি ব্যাপার এই যে জড় প্রকৃতির পরপারে ভগবানের পরাবর আমাদের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় চিন্ময় স্বরূপটি যেন এখানে সমুদ্দিষ্টস্বরূপে থাকিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের অবতার-লীলার যোগৈশ্বর্য্য এখানে সমধিক প্রকট। জীবের সহিত ভগবানের নিত্য-স্বরূপধর্ম্মগত আত্মসম্বন্ধের ছন্দোময় রূপটি এখানে কৃপার সংবেদন-চাতুর্য্যের মাধুর্য্যে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু প্রচ্ছন্ন ভাবই সে বস্তু উদ্ভিন্ন বা প্রকাশে উন্মুখ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, শুধু অনন্যাভক্তির দ্বারাই বিশ্বরূপের সমগ্র স্বরূপটি উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে। এই উপলব্ধির অর্থটিও তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন। তাঁহাকে জানিতে হইবে, দেখিতে হইবে, পরে তাঁহারই অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে। প্রথমে

ভগবান্ আছেন সর্ব্ব সম্পর্কে আমাদের মনের ক্রিয়ায় এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে হইবে। পরে সেই উপলব্ধিতে হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অনুরাগ অন্তরে জাগ্রত করিতে হইবে। এই অনুরাগ যতই আমাদের দেহ, মন এবং প্রায় ইষ্টস্বরূপে ভগবানের ঘনিষ্ঠতাকে নিবিড় করিয়া তুলিবে, ততই তাঁহার বিশ্বতোময় নিজবোধটি আমাদের সর্ব্ব-সম্বন্ধে ছন্দ ধরিয়া উঠিবে। সে অবস্থায় চির-সুন্দর যিনি তাঁহার সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব যুক্ত হইয়া যাইবে। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বে খুলিবে প্রমূর্ত্ত লীলা। মূর্ত্তরূপে তখন জাগিবেন 'রসময় দেহের গঠন তনু চিদানন্দময়' যিনি, তিনি। ভগবান্ বলিয়াছেন, তুমি আমাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। ইহার ফলে আমার আত্ম-স্বরূপটি তোমার চিত্তে উদ্দীপ্ত হইবে। সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে তুমি আমার যুক্ত ভাবটি উপলব্ধি করিবে। এইরূপে ভক্তি লাভ করিলে সর্ব্বকর্ম্মে তোমার অনাসক্তি আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে তোমার কর্ম্মের মূলে আমার খেলাই সাড়া দিবে। তুমি সর্ব্বভূতে বিরোধ-বুদ্ধি বিবর্জ্জিত হইবে। তুমি উপলব্ধি করিবে সর্ব্বত্র আমার কর্ত্তৃত্ব। সেই কর্ত্তৃত্বে বন্ধন নাই, নাই পীড়ন, আছে সর্ব্বতোময় আত্মভাবের উজ্জীবন। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে প্রত্যক্ষতার পরম বলে সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপে রসময় আনন্দময় দেবতার সহিত মানবের নিত্য সম্বন্ধের এমনই উদ্বোধন ঘটিয়াছে। বিশ্বরূপ-দর্শনের অন্তরালে যিনি রুদ্র, সেই দেবতার দক্ষিণ মুখ আমরা দেখিয়াছি এবং আমাদিগকে আপন করিবার আগ্রহে সে মুখের উন্মুখতাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইটিই অর্জ্জুনের দর্শনের বিশেষত্ব।

অর্জ্জুন কি দেখিলেন

বিশ্বরূপদর্শন গীতার সমগ্র তাৎপর্য্যকে পরম এবং অদ্ভুত রস-গাম্ভীর্য্যের উদার বীর্য্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বরূপে গীতোক্ত উপদেশের প্রজ্ঞানঘন প্রপূর্ত্তি, বিশ্বমানবের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা বা তাহাদের বিজিজ্ঞাস্য সাধ্যস্বরূপের পরিপূর্ণ রূপ। অর্জ্জুন যে বস্তু দেখিলেন, তিনি কিন্তু স্বয়ং তাহা আমাদিগকে দেখাইতেছেন না। তিনি যাহা দেখিতেছেন, তিনি তাহা বলিয়া যাইতেছেন। আমরা শুনিতেছি সঞ্জয়ের মুখে। প্রেমের ইহাই হয়ত একটি বিশেষ ধারা। যিনি আমাদের প্রিয়, তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাহার কথা না শুনিয়া অন্যের মুখে আমাদের প্রতি তাহার প্রিয়ত্বের পরিচয় পাইলে আত্মসম্বন্ধ আমাদের অন্তরে সমধিক ছন্দোময় হইয়া উঠে। প্রিয়ত্বের প্রতিবেশটিতে আমরা পরস্পরকে আপন করিয়া পাইয়া নিজধর্ম্মে অন্তরে একান্ত প্রশান্তি উপলব্ধি করি। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের দূত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমাচার জ্ঞাপনের জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন। সঞ্জয় বলিতেছেন—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নিজেও তিনি দ্রষ্টা নহেন। তাঁহার উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি ব্যাসদেবের প্রসাদে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সংবাদের পরম গুহ্য তত্ত্বটি তিনি শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রবণ শ্রুতির ক্রিয়ার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই। শ্রবণ এবং দর্শন এখানে এক হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখেই সঞ্জয় কৃষ্ণ-কথা শুনিয়াছেন। প্রসাদের শক্তি এমনই। প্রসাদের রস-সংস্পর্শে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অভীষ্টে প্রত্যক্ এবং সম্যক্‌ভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া পরমজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, প্রাপ্তিটি সুনির্ম্মলা হয়। শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রসাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসাদের সংস্পর্শে হৃদয় নির্ম্মল হয়। তাহার প্রভাবে সর্ব্বদুঃখের বিনাশ ঘটে। সর্ব্বদুঃখের বিনাশ

বলিতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ বুঝায়। শোক ও মোহ প্রভৃতি মানসিক উদ্বেগ ও ব্যাধিজনিত শারীরিক দুঃখ আধ্যাত্মিক, সর্প-বৃশ্চিকাদি দংশনজনিত দুঃখ আধিভৌতিক এবং ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, অগ্নি ইত্যাদিজনিত দুঃখ আধিদৈবিক। চিত্ত এইভাবে প্রসন্নতা লাভ করিলে বুদ্ধি অভীষ্টে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। প্রসাদ দুই প্রকার—কৃষ্ণের প্রসাদ এবং কৃষ্ণ-ভক্তের প্রসাদ। কৃষ্ণের প্রসাদ কাহার পক্ষে লভ্য হইবে জানা যায় না। অর্জ্জুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সখা। তিনি তাঁহার প্রতি প্রপন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ-লাভে অধিকারী। কিন্তু আমাদের উপায়? আমাদের অবলম্বন কৃষ্ণ-ভক্তের প্রসাদ। মহাভারত "নারায়ণ-কথা"। অমিততেজা ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে সে কথা শুনিতে হয়। ভক্তের প্রসাদে যিনি অনধিকারী তিনিও শ্রীভগবানের চরণে রতি-ভক্তি লাভ করেন। স্কন্দ পুরাণে শ্রীল নারদের প্রসাদে একজন ব্যাধ কিরূপে পরমবৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হয় তাহা বর্ণিত আছে। "দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি। নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি।" (চৈতন্যচরিতামৃত)। পর্ব্বত মুনি নারদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলেন—'হে দেবর্ষি, আপনি ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় অতি নীচ জাতি ব্যাধও সদ্যই অচ্যুতের পদারবিন্দে রতি লাভ করিয়াছে।' প্রথমে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের প্রসাদ, পরে সেই প্রসাদ ব্যাসদেবের প্রসাদ-রসে মিশ্রিত হইয়া পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে। তারপর সেই রস আবার ব্যাসদেবের উপাশ্রিত সঞ্জয়ের শ্রুতিপথে শব্দব্রহ্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর মাধুর্য্য-বীর্য্যে উপবৃংহিত হয় এবং আমাদের ন্যায় অনধিকারীর অন্তরকেও শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে রতিরসোল্লাসে উচ্চকিত করিতে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। প্রসাদের সূত্রে সম্বন্ধের ক্রমের এমনই পরাক্রম। নিম্নাভিমুখে ক্রম-বর্দ্ধমান-গতিতে তাহা বিস্তার লাভ করে। আশ্রয়ের প্রসাদের চেয়ে

উপাশ্রয়ের প্রসাদের শক্তি এই হিসাবে সমধিক। ভাগবত বলেন,

"কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কশা,
আভীর-শুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।"

উপাশ্রয়ের আশ্রয়ে যিনি বিষ্ণু তিনি পরম প্রভবিষ্ণুতায় প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠেন। পরোক্ষতার মূলে প্রত্যক্ষতার পরমবল সে ক্ষেত্রে অখণ্ড রসধর্ম্মে আমাদের অন্তর উজ্জ্বল করিয়া তোলে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।'

(শ্বেতাশ্বতর—৩।১২)

সঞ্জয়ের মুখে প্রসাদের এই প্রজ্ঞানময় পরিবর্দ্ধনশীল সামর্থ্যসূত্রে অর্জ্জুনের সঙ্গে শ্রীভগবানকে আমরা বর্ত্তমান প্রতিবেশের মধ্যে পাই। ভক্তমুখে ভগবানের কৃপায় এমন সুনির্ম্মলা শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলা প্রাপ্তিটি আমাদের ঘটিতেছে। এই সম্পর্কে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গীতাধ্যায়ী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বসিয়া গীতাপাঠ করিতেন। পাঠ তাঁহার অশুদ্ধ হইত। এজন্য লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণের তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া গীতা পড়িতেন। পাঠকালে তাঁহার অঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হইত। ইহা মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গীতা পাঠকালে তিনি কিসে এত সুখ পান প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণ অনুনয়ের সহিত বলিলেন, প্রভু, আমি মূর্খ, হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান আমার নাই। আমি গুরুর আজ্ঞা পালন করি, শুদ্ধাশুদ্ধ মানি না। গীতা পাঠকালে দেখিতে পাই শ্যামল-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে অশ্বরজ্জু এবং তোত্র-করে উপবিষ্ট আছেন। তিনি অর্জ্জুনকে হিত উপদেশ করিতেছেন। ইহা

দেখিয়া আমার মনে আনন্দের আবেশ হয়। যতক্ষণ গীতা পড়ি এই আনন্দে আবিষ্ট থাকি, পাঠ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া প্রভুর পরম উল্লাস। তিনি বলিলেন, ঠাকুর, আপনার পাঠই সার্থক। গীতাপাঠে আপনিই প্রকৃত অধিকার লাভ করিয়াছেন। গীতাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ গুরু-আজ্ঞায় প্রদীপ্ত প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন্। 'গুর্ব্বর্কলব্ধ-উপনিষৎ'-স্বরূপ চক্ষুতে শ্রীভগবানের লীলাটি বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষায় তাঁহার দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইয়াছে। বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ—'বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়'। মহাভারত পঞ্চম বেদ। সঞ্জয় ব্যাসের প্রসাদে দীপ্তনেত্র লইয়া কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন হইতে আসিয়াছেন। তিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দৃষ্টি দান করিয়াছেন। আমরা মায়ামোহান্ধ জীব—কৃষ্ণভক্ত-প্রসাদজ দৃষ্টিতে আমরাও কৃষ্ণার্জ্জুনকে বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষার মধ্যে পাই। অতীত, অনাগত সব উজ্জ্বল করিয়া প্রসাদের ক্রম-পরাক্রমে পরিবর্ত্তনধর্ম্মী কালের বুকে অপরিচ্ছিন্ন দ্যুতিক্রমে নিত্য সত্য আমাদের দৃষ্টিতে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। অর্জ্জুনের নিজের দৃষ্টি সীমায়িত। অর্জ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দিয়াছেন মহাযোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীহরি। জীব নিজে চেষ্টা করিয়া এই দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ নিজেই সে কথা বলিয়াছেন—"ন চ মাং শক্যসে দ্রষ্টুং অনেনৈব স্বচক্ষুষা।" সঞ্জয়ের কৃপায় অর্জ্জুনের অপেক্ষাও আমরা সমধিক সৌভাগ্যের অধিকারী।

অর্জ্জুন কি দেখিলেন? শুনিবার আগে শ্রোতব্য বিষয়টির কিঞ্চিৎ বিচারের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। রস না পাইলে কে শুনিতে বসে? অর্জ্জুনের মুখে আমরা যে বিষয়টি শুনিব তাহাতে রস আছে। তিনি ভগবানের যে রূপটি দেখিয়াছেন তাহা অদ্ভুত-রস হইতে উদ্ভূত। এই রস শ্রীভগবানের আত্মোচিত বিভবাদিযোগে বা তাঁহার স্বকৃপায় পরিস্ফূর্ত্ত লোকাতীত রূপ-মাধুর্য্যের বীর্য্য-প্রভাবে ভক্তগণের চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করে। সেই বিস্ময় অননুভূত-পূর্ব্ব আস্বাদনীয়তায় আমাদের চিত্তে চমৎকৃতি জাগায়। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী

বিস্ময়রতি দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—সাক্ষাৎ এবং অনুমিত। বিশ্বরূপ-দর্শনে উপজাত বিস্ময়ে অনুমানের স্থান নাই—সব সাক্ষাৎ। চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ এবং মুখে কীর্ত্তন সাক্ষাৎ-বিস্ময়-রতির এই গুলি স্থায়ী ভাব। সাক্ষাৎ-বিস্ময়রতির সব গুলি লক্ষণ আমরা বিশ্বরূপ দর্শনে পাই। বিস্ময়ের মূলে ভয়ের ভাবটি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ভয়ও প্রিয়ের আশ্লেষণ-সম্বন্ধ হইতেই সঞ্জাত; সুতরাং দ্বন্দ্ব-ধর্ম্মেও সম্বন্ধটি ছন্দোময়। অর্জ্জুন তাঁহার ধ্যেয় শ্রীভগবানের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে চরাচর বিশ্বকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। সে মূর্ত্তির তিনি নিত্য ধ্যান করিতেন। কিন্তু ধ্যেয়তত্ত্বে এই বস্তুটি পূর্ব্বে তিনি পান নাই, এজন্য তাঁহার বিস্ময়। এই বিস্ময়ের মূলে ছিল চিদানন্দ। এই আনন্দের সম্বন্ধে তাহার দেহ এবং মন ছন্দোময় হইল। তিনি পুলকাঞ্চিত-কলেবর এবং কৃতাঞ্জলি হইলেন। জিহ্বা তাঁহার নাচিয়া উঠিল শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে। অর্জ্জুন বলিলেন—'হে দেব, তোমার দেহে আমি সকল দেবতাকে তথা স্থাবর জঙ্গমসহ কমলাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে, দিব্য ঋষিগণ এবং সর্পগণকে দেখিতেছি।' অর্জ্জুন সৃষ্টির মূলকেন্দ্রস্বরূপ ব্রহ্মা হইতে ঋষিগণ, ভূর্লোক, ভূবর্লোক এবং পাতাল-তলবাসী নাগগণের সহিত ভূতবর্গকে শ্রীভগবানের দেহে বিদ্যমান দেখিলেন।

অর্জ্জুনের দৃষ্টি বিস্ফারিত হইল। তিনি দেখিলেন, অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ এবং অনেক নেত্রবিশিষ্ট বিশ্বেশ্বরের অনন্তরূপ। তিনি অনন্তরূপবিশিষ্ট এই দেবতার আদি, মধ্য এবং অন্ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় কে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হয়? একই দেহে অনেক বাহু অনেক মুখ এবং অনেক উদরের সংস্থিতিতে সঙ্গতি সাধিত হয় কি ভাবে? সুতরাং বর্ণনাটি বিশ্বরূপের সঙ্কেত বলিয়া অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে রূপক বা কাব্যের অলঙ্কার মনে করিলে ভুল হইবে। কৃপার এমনই প্রভাব। কৃপার প্রভাবে যিনি বিশ্ববীজ তাঁহার মধ্যে বহুর

ভাবটি অদ্বয়রসে উজ্জীবিত মাধুর্য্যের বীর্য্যে আমাদের অনুভূতিতে উদ্দীপ্তি লাভ করে। বহুভাব আত্মসম্বন্ধে অখণ্ডরূপে নিবিড়তা লাভ করিয়া আস্বাদ্য হইয়া উঠে। খণ্ড ভাব তখন আর খণ্ড থাকে না—অখণ্ডের অনুভূতিসূত্রে তাহা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটায়। আমরাও আমাদের চারিদিকে বহু উদর, বহু মুখ, বহু নেত্র দেখিয়া থাকি। কিন্তু বহুর মধ্যে চিৎঘন সংবেদনে নিজকে ডুবাইয়া একের চিদাকার আমরা প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু অর্জ্জুন তাহাই করিতেছেন। ভগবৎ-প্রসাদে চিত্তবৃত্তি পরিস্ফূর্ত্ত হইলে রজ, তমঃ প্রভৃতি গুণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাম, লোভ প্রভৃতি হইতে উপজাত দ্বন্দ্বমোহ হইতে আমরা মুক্ত হই এবং আমাদের মনের মূলে বিশ্বতোব্যাপ্ত আনন্দের মূল কন্দটির সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঘটে। সেখান হইতে বহুভাবের বিলয়ে একের ভাব খুলিয়া যায়। শ্রীভগবানের পরম মাধুর্য্যের সংস্পর্শে উজ্জীবিত মন পরাবর সকল জুড়িয়া সুন্দরের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে—যাহা অবর বা জড় তাহাতেও বর্জ্জনীয় ভাবটি আর থাকে না। ফলতঃ সেক্ষেত্রে অবর পরতত্ত্বেরই অলঙ্কার-স্বরূপে অনুভূত হয় এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের চিত্তে বিকার জন্মায় না। বহু পরিণত হয় একেরই অনঙ্গ-লীলাদ্যোতক শ্রীঅঙ্গের বিভঙ্গীতে রস-তরঙ্গের রঙ্গময় রূপে। সেই স্তরে আজ অর্জ্জুনের চিত্ত বিধৃত। যাঁহার তিনি অনেক বাহু দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, পরে তিনি তাঁহাকে গদা এবং চক্রধারণকারী রূপে দেখিতে পান। একাদশ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে 'গদিনং চক্রিণঞ্চ' অর্জ্জুনের উক্তি এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট। পরে ৪৬শ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাইব—চতুর্ভুজ তাঁহার ধ্যেয় দেবতাকে তিনি গদা এবং চক্র এই দুইটি উপলক্ষণে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অভিব্যক্ত দেখিতে চাহিয়াছেন। প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, শঙ্খ এবং পদ্ম অর্জ্জুনের কাছে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে কেন? গদা এবং চক্রে দ্বিভুজের লীলাচ্ছন্দে শ্রীভগবান্ তাঁহার চিদৈশ্বর্য্যের উদ্দীপন-মাধুর্য্যে অর্জ্জুনকে আকর্ষণ করিতেছেন

ইহা বুঝিতে হয়। অর্জ্জুনের ধ্যেয় কিরীট-শোভিত শির, চতুর্ভুজ দেবতা দ্বিভুজ লইয়া আজ তাঁহার দৃষ্টিতে জাগিতে চাহিতেছেন। আত্মভাবে পূর্ণ-মাধুর্য্যে ব্যক্ত হইবার জন্যই তাঁহার চাতুরী সুরু হইয়াছে। দ্বিভুজে গদা-চক্রধারী শ্রীহরিতে অর্জ্জুনের মন উদ্দীপিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত সেই রূপে নিমগ্ন হইতে ছুটিয়াছে। সীমার মাঝে ঔদার্য্য এবং মাধুর্য্যময় বীর্য্যে অসীমের চাতুর্য্যের এই বিস্তার। অর্জ্জুন সেই ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে পড়িয়াছেন। তিনি নিজকে হারাইয়া ফেলিবেন কি? চিত্তের এই উন্মুখতায় অর্জ্জুন উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। সেইরূপের ছন্দের সম্বন্ধে মনের মাখামাখি তিনি চাখিতে গেলেন। তাঁহার ধ্যেয় চতুর্ভুজ দেবতার জ্যোতির্ম্ময় তেজোরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যিনি ধ্যেয় ছিলেন, যিনি ছিলেন দূরে, তিনি অর্জ্জুনের নিকট নিজ মাধুর্য্যে ধরা দিতেছেন। অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে তিনি উন্মুক্ত করিতেছেন দ্বিভুজ নরাকার পরব্রহ্ম কৃষ্ণতত্ত্বে তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপ—

"স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপো ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ।"

(বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৮)

দীপ্তানলার্ক-দ্যুতিতে দিব্য বিভূতির চমকের ফাঁকে তাঁহার ধ্যেয়ের পরম স্বরূপটি তাঁহার অন্তরে প্রকটিত হইল—'নরবপু তাঁহার স্বরূপ'। এই যে প্রকাশ ইহার বিলাস-ধর্ম্মটি কেমন? বস্তুতঃ অর্জ্জুনের ধ্যেয় চতুর্ভুজ-দেবতার ভিতর দ্বিভুজ মানুষটিই লুকাইয়াছিলেন, উঁকি দিতেছিলেন অর্জ্জুনের সখারূপে। দিব্যজ্যোতির প্রবাহের অন্তঃস্তলে তাঁহার স্নিগ্ধ কোমল চিন্ময় লীলাটি অপ্রত্যাশিতভাবে অর্জ্জুনের চিত্তে স্ব-মহিমায় উন্মুক্ত হইল। অর্জ্জুন যুগপৎ ভগবানের সান্ত এবং আনন্ত্যরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। দিব্যরসের সংস্পর্শে প্রাকৃত সম্বন্ধ অপ্রাকৃত সত্যে জীবন্ত—সান্তে অনন্তের বীজ নিজ-মাধুর্য্যে প্রদ্দীপ্তি লাভ করিল। ভক্তিবিনম্র অর্জ্জুনের চিত্ত আলোড়িত করিয়া পুলকময় স্পন্দনে দেবতার স্তুতি উদ্গাত হইল।

অর্জ্জুন বলিলেন, তুমি অক্ষর পুরুষ। তুমি পরম ব্রহ্ম। তুমিই একমাত্র বেদিতব্য। তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। অব্যয় তুমি। তুমি শাশ্বতধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। তুমি সনাতন পুরুষ। আমি এইবার জানিলাম, বুঝিলাম তোমার ব্যাপার। তুমি এতদিন আমার হৃদয়-মাঝে লুকাইয়া ছিলে—এ সব কিছু তো জানি নাই।

অর্জ্জুনের এই যে দর্শন, এই দর্শনের মূলে ছিল শ্রবণ। বিশ্বরূপ-দর্শনের লালসা শ্রীভগবানের নিকট ব্যক্ত করিবার কালে তিনি যে আদরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই আহ্বানটি অর্জ্জুনের কানে সুরে সুরে বাজিয়া উঠিতেছিল। আমাদের মনে আছে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'পার্থ' বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া বলেন, তুমি আমার পিতৃস্বসার পুত্র, তুমি আমার আপন। দেখ, আমার অলৌকিক রূপ। আমার বহু অবয়ববিশিষ্ট শত সহস্র প্রকার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর। গুড়াকেশ তুমি। তুমি সর্ব্ববিধ মোহ হইতে মুক্ত। সেই রূপ দেখিবার অধিকার শুধু তোমারই যে আছে। এসো, তুমি আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি। তুমি আমার যোগশক্তি প্রত্যক্ষ কর। বস্তুতঃ প্রিয় বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই বিস্ময়রসের উদ্রেক ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে অপ্রিয় ব্যক্তির সর্ব্বলোকোত্তর ক্রিয়াও বিস্ময়-রসের সৃষ্টির সহায়ক হয় না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের আত্মীয়তা-মাখানো তাঁহার বচনের সহিত অর্জ্জুনের মনের যতক্ষণ মাখামাখি ছিল ততক্ষণই তাঁহার চিত্ত শ্রীহরির বিশ্বরূপের মাধুরী আস্বাদন করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে মাধুরীতে অভিনব চাতুরী প্রকটিত হইল। এতকাল শ্রীভগবানের অক্ষর-ভাবের আশ্রয়ে অর্জ্জুনের চিত্ত সঞ্জীবন-ধর্ম্মে উজ্জীবিত ছিল, ক্রমে সে ভাবটি সরিয়া গেল। প্রকটিত হইল ক্ষরভাবের প্রভাব। শ্রীভগবানের বাঙ্ময়-সংশ্লেষ হইতে অর্জ্জুন বিচ্যুত হইলেন।

ওঁকারের সে ঝঙ্কার তাঁহার মনের মূল জুড়িয়া বাজিতেছিল, তিনি মধুর সেই সুরটি হারাইয়া ফেলিলেন। ভগবানেরই এই খেলা। ক্ষরও অক্ষর দুই জুড়িয়াই তো তাঁহার বিভূতি। দুইটি মিলাইয়া জীব-চৈতন্যে ভগদনুভূতির রীতিটি খোলে। সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষ উভয়ত ভগবানের প্রভাব উপলব্ধি করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। নহিলে সর্ব্বজনীন সত্যের অভিব্যক্তিটি পুরাপুরি ভাবে ঘটে না। এতকাল পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের আত্মমায়ার প্রভাবে অর্জ্জুনের চিত্ত কাল এবং মায়ার ঊর্দ্ধে উন্নীত হইয়াছিল, এখন সেই পরিপ্রেক্ষা হইতে তাঁহার চিত্ত বিচ্যুত হইল। তিনি দেখিলেন বিশ্বরূপধারী দেবতার অনন্তবাহু। দ্বিভুজে গদা এবং চক্রের খেলায় তিনি তাঁহার দৃষ্টিকে সীমায়িত রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সমর্থ হইলেন না। গদা-চক্রের যে খেলা—সে খেলায় কাল এবং মায়ারই লীলা জড়াইয়া মাখাইয়া থাকে। শঙ্খ সেখানে বিশ্বজয়ী মাধুরী ছড়ায় না, পদ্ম আত্মসম্বন্ধ দীপ্ত করিতে পরাঙ্মুখ হয়। তিনি দেখিলেন, ভগবানের শশি-সূর্য্য নেত্র। শুধু আদিত্যের জ্বালা নয়—উগ্রতা নয়, তাহার মূলে রহিয়াছে মাধুর্য্যের বীর্য্যে পরম স্নিগ্ধতায় ঝলমল চন্দ্র-কিরণের লীলা। কিন্তু মাধুর্য্যের সেই সান্দ্র সম্বন্ধটি সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিবার অধিকার অর্জ্জুনের নাই। বহুভাবের কম্পন-ক্রমে একের উজ্জীবক প্রভাব তিনি অনুভব না করিলেন এমন নয়, কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বের মূলে স্থায়ীরূপে সেই ভাবটি তিনি মিলাইয়া মিশাইয়া অন্তরে অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না। অর্জ্জুন দেখিলেন, দ্যু এবং ভূর অন্তরস্থ আকাশ ও সমস্ত দিক্ শ্রীভগবানের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; শুধু এক তিনি। প্রীতির প্রতিবেশ হারাইয়া অর্জ্জুন ধৃতিও হারাইলেন। তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার অবস্থা অতি উৎকট। ভিতরে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে কিন্তু বাহিরে নিজের বিলুপ্তির ভয়। ভগবানের সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত হইলেন। শুধু অর্জ্জুনই নহেন, ত্রিলোক ভীত হইয়া উঠিল। সম্মুখে বুঝি প্রলয়। অর্জ্জুন বুঝিতেছেন তাঁহাকে যিনি তাঁহার আপন,

কিন্তু বুঝিয়াও নিজের বোধে তিনি নিজেকে মানাইয়া লইতে পরিতেছেন না—জমিয়াও জমিয়া উঠিতেছেন না, অর্জ্জুনের চিত্তে ভগবানের আত্মভাবে চিনিয়াও চিনিতেছেন না যিনি আপন তিনি তাঁহাকে। বিস্ময়ের বিপর্য্যয়ে আসিল ভয়। কালাতীত সত্য মহাকালের বহিঃপ্রকাশে অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে বিক্রীড়িত হইল।

অর্জ্জুন বলিলেন, এ কি ভীষণ তোমার মূর্ত্তি। দেবতাবৃন্দ তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। কেহ ভীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে স্তব করিতেছেন। সিদ্ধ মহর্ষিগণ স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিতে করিতে বহু বহু স্তুতি দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন। চারিদিকে উঠিতেছে তোমার নমস্কার ধ্বনি।

অর্জ্জুন দেখিলেন, রুদ্র, আদিত্য, বসু, দেবতা, বিশ্বদেবতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বায়ু, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ সকলেই বিশ্বরূপ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট। অর্জ্জুনের হৃদয়াকাশে লোকপালগণের প্রকাশ, দেবগণ শ্রীভগবানের যোগ-বিভূতিতে বিধৃত। অর্জ্জুন ভগবৎ-বিভূতির অধিদৈব এই প্রকাশে জৈব-সংস্কারে অভিভূত হইলেন। যিনি ইতঃপূর্ব্বে 'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্' শ্রীভগবানের এই স্ব-মহিমায় পুলকিত এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন, তিনি এবার তাঁহার প্রলয়ঙ্কর রূপ-দর্শনে বিপর্য্যস্ত হইলেন।

কালরূপী শ্রীভগবানের মূর্ত্তি অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সৃষ্টির প্রথম ক্রম হইতেই কালের বিক্রম। পরম তাহার প্রতাপ। কালের গতি অভিন্ন, কালের রাজ্যে স্থিতি কোথায়ও নাই—মহাভীতির সেখানে খেলা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত কালের গ্রাসে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। সকলই ছুটিয়া চলিয়াছে কালের জ্বালাময় বহ্নির অভিমুখে। পতঙ্গের মত কালের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকলেই মরিবার জন্য আকুল, বিপুল সেখানে আকর্ষণ; নিজকে নিঃশেষ না করিতে পারিলে বুঝি নিষ্কৃতি নাই। বিশ্ব-জগৎ কালের প্রভাবে প্রতিনিয়ত অপরিহার্য্য এমন ধ্বংসের দিকেই প্রধাবিত হইতেছে।

উপায় অন্য নাই—কালরূপী দেবতা সব টানিয়া গুটাইয়া লইতেছেন। দংষ্ট্রা-করাল বদন মেলিয়া তিনি সকলকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়াছেন। শ্রুতি কি এই দংষ্ট্রাকেই বলিয়াছেন, হিরণ্যদংষ্ট্রা। এমন ভক্ষণের কথাই কি কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং
হিরণ্য-দংষ্ট্রো বভসোঽনসূরিঃ
মহান্তমস্য মহিমানমাহু-
রনদ্যমানো যদনন্নমত্তি।"

(ছান্দোগ্য—৪।৩।৭)

তিনি সর্ব্বদেবতার আত্মা ও স্থাবর-জঙ্গমের উৎপাদয়িতা। তিনি অভগ্নদন্ত ভক্ষক। তিনি মেধাবী। তিনি নিজে ভক্ষিত না হইয়াও অনন্নভূত অপর সকলকে আহার করেন। তাঁহার মহিমা অপ্রমেয়। এ মহিমা অগম্য। অর্জ্জুন আতঙ্কিত।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মহাবাহো, তোমার বহুমুখ, বহুনেত্র, বহুবাহু, উরু এবং পদ, বহু উদর, বহু করাল দশন-পংক্তি। তোমার এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোকসকল ভীত, আমিও ভীত হইয়াছি।

অর্জ্জুন কম্পিত-কলেবর। তিনি বলিলেন, হে দেবতা, তোমার এই করাল-মূর্ত্তি দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে অক্ষম। হে দেবেশ, প্রসন্ন হও। আমার ভয় তুমি দূর কর, দূর কর প্রভু।

অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রকে কালরূপী দেবতার কবলিতরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার অস্তিত্বকে জড়াইয়া কালের গতিকে আশ্রয় করিয়া দেশরূপ স্থিতির যে পরিপ্রেক্ষাটি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুরু হইল মহাকালের খেলা। অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের ভবিষ্যৎ-পরিণতিও বর্ত্তমানের প্রেক্ষায় আসিয়া পড়িল। অর্জ্জুন দেখিলেন যুদ্ধার্থ-সমবেত নৃপতিবৃন্দের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমূহ বিশ্বরূপধারী দেবতার দংষ্ট্রাকরাল

মুখসমূহে দ্রুতবেগে প্রবিষ্ট হইতেছেন। কেহ বা তাঁহার দন্তের আঘাতে বিচূর্ণিত-শির হইয়া তাহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ভয়াবহ সে দৃশ্য, বর্ণনার তাহা অতীত। মৃত্যুর এ কি করাল লীলা।

অর্জ্জুন উপলব্ধি করিলেন কালের গতি অপ্রতিহত। তিনি শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—নদীর প্রবাহ যেমন সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ নরবীরগণ সকলে সর্ব্বত্র স্খলনশীল তোমার মুখগহ্বরসমূহে প্রবেশ করিতেছে।

অর্জ্জুন বলিলেন, যেমন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গসকল দ্রুতবেগে প্রবেশ করে, তেমনই এই লোকসকল তোমার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে। তোমার দংষ্ট্রায় চর্ব্বিত হইতেছে। তুমি সকলকে প্রবল বলে আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুতে বিলয় করিয়া লইতেছ।

অর্জ্জুন বলিলেন—সর্ব্বলোকগ্রাসে হে দেবতা, কি আগ্রহ তোমার! হে বিষ্ণো, তুমি তোমার প্রজ্বলনশীল মুখ বিস্তার করিয়া সমস্ত লোককে তুমি জিহ্বাযোগে অবলেহন করিয়া আস্বাদ করিতেছ, চাটিয়া চাটিয়া চাখিয়া চাখিয়া খাইতেছ। একি তোমার বুভুক্ষা—বিশ্ব-জগৎ তোমার আহার। সমগ্র জগৎ তোমার উগ্র তেজোরাশির দ্বারা প্রদীপ্ত এবং প্রতপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

অর্জ্জুন শ্রীভগবানের বিভূতিতে সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এতক্ষণ নিজ ভাবটি তাঁহার অনুভূতিতে আভাসরূপে একটু ছিল, এবার বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাও হারাইয়া ফেলিলেন। 'তুমি' ছাড়িয়া তিনি 'আপনি' বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করিলেন, বলিলেন—হে দেববর, আপনি প্রসন্ন হউন, আপনাকে নমস্কার করি। উগ্ররূপী আপনি কে আমাকে বলুন, আপনার প্রকৃত স্বরূপটি জানিতে ইচ্ছা হয়। আপনার উদ্দেশ্যটি কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ভক্তানুগ্রহ-তৎপর ভগবান্। অর্জ্জুনের প্রশ্নের তিনি সর্ব্বোত্তম মীমাংসার দিকে আগাইয়া আসিলেন। সকল জিজ্ঞাসার সমাধান হইতে চলিল। তিনি বলিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী কাল।

উৎকট আমার খেলা। বিশ্বকে আমি লয় করি। লোকক্ষয়ে আমি প্রবৃত্ত রহিয়াছি। তবে ভয় করিও না। জীবাত্মা সনাতন। তুমি আমার আপন। আমি যেমন সনাতন, তুমিও তেমনি আমার মতই সনাতন। আমি অংশী, তুমি অংশ। তোমাকে ছাড়া আমি নহি, তুমিও আমাকে ছাড়া নহ। কুরুক্ষেত্রের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত আমিই উপসংহৃত করিব। তোমাকে আমি আমার লীলার সঙ্গীরূপে নিত্য সত্য করিয়া লাভ করিব। অর্জ্জুন আমি তোমাকে পূর্ব্বেই শুনাইয়াছি, জীবাত্মা অনিত্য নয়। অবিনাশী জীবাত্মার সহিত পরমাত্মারূপী আমার স্বরূপগত সম্বন্ধে নিত্যলীলা চলিতেছে। আমাকে আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মার নিত্য ভাবটি ব্যক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা আমি। তুমি কর্ম্মের কর্ত্তা নহ। সুতরাং অপরের হত্যাকারীস্বরূপে তোমার নিজকে মনে করিয়া তোমার যে কর্ত্তৃত্বাভিমান তাহা অসত্য। তুমি কে ? তুমি-আবার কাহাকে হত্যা করিবে ? আমি তোমার শত্রুদিগকে পূর্ব্বেই নিহত করিয়াছি। তুমি আমার কর্ম্মে নিমিত্ত মাত্র হও।

'নিমিত্ত মাত্র হও'—ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতা অর্জ্জুনের সকল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে এই একটি কথায়। এই একটি কথা বলিবার জন্য গীতার দেবতা যুগ যুগ ধরিয়া বুকে ব্যথা বহন করিতেছিলেন। আজ বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ছলে সেই কথাটি সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিবার অবসর তিনি লাভ করিলেন। এই কথাটি শুধু অর্জ্জুনের জন্য নয়—সর্ব্বজীবের জীবন-সমস্যার সমাধানের উপযোগী ইহা অপৌরুষেয় অমোঘ উপদেশ। ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি এই উপদেশ দিবার সময় তাঁহাকে 'সব্যসাচিন্' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন —এক হাতে সংসারের কর্ম্ম কর, অপর হাতে আমাকে স্পর্শ করিয়া থাক। 'নিমিত্ত মাত্র হও'—গীতার এইটিই সর্ব্বোত্তম বাণী। পরাভক্তির রাজ্যে জীবের অনুপ্রবেশের শুদ্ধাগতি বা কেবলারীতি এই বাণীর বীর্য্য-সংবেদনে পরবর্ত্তী অধ্যায়নিচয়ে পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

অর্জ্জুনের স্তব

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়া দিলেন; বলিলেন, তুমিও নিত্য, আমিও নিত্য। আমার সহিত যোগযুক্ত হইলে তুমি তোমার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিবে। তোমার সকল কৃত্য মদ্ভাবে প্রভাবিত হইবে। তুমিও থাকিবে, আমিও থাকিব। সুতরাং মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যাও—"ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে" ভগবদুক্তিটির এই এক অর্থ। এই অর্থটি অধ্যাত্মমূলক। ইহা ছাড়া আর একটি অর্থও উক্তিটির সহিত অন্বিত রহিয়াছে। সে অর্থটি এই —অর্জ্জুন, তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষগণের মধ্যে যে যোদ্ধৃগণ অবস্থিত, তাঁহারা কেহই জীবিত থাকিবেন না। কারণ তাঁহারা কাল-স্বরূপ আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছেন। তুমি আমার কর্ম্মে যোগ দিয়া শাশ্বতধর্ম্মে নিজে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমার যশ, খ্যাতি, তোমার পুরস্কার নয়—তোমার গর্ব্ব, তুমি আমার, আমি তোমার। "মোহার গরব তুঁহু বাঢ়ায়লি অব টুটায়ব কে"—উপলব্ধি কর অমানী-মানদ আমার এই স্বরূপ। তুমি ভাগ্যবান্ পুরুষ। দুঃখ করিও না, যুদ্ধ কর।

শ্রীভগবানের বাণী অর্জ্জুনের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। কিন্তু অর্জ্জুনকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভগবদনুজ্ঞা প্রতিপালনে উন্মুখ দেখি না। তিনি আজ্ঞা পালনের দিকেও গেলেন না। তিনি ভগবানকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কেন—কারণটি কি ? অর্জ্জুনের এই স্তবের ভিতরে আমরা তাঁহার অন্তরের প্রতিচ্ছবি পাই। শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ সুস্তবের অন্তর্গূঢ় ভাবটির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, সুস্তবের মূলে শ্রীভগবানের প্রভব-তত্ত্বটি অর্থাৎ তাঁহার নিজ ভাবটি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে অভীষ্টের ঘনিষ্ঠতায় ছন্দোময় হইয়া আত্মনিবেদনে বা প্রণতিতে সাধককে একান্তরূপে উন্মুখ করিয়া তোলে। গোস্বামীপাদ তৎপ্রণীত শ্রীশ্রীগোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থে সুস্তবের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ-ক্রমে দেখাইয়াছেন সেক্ষেত্রে প্রথমতঃ ভক্তের শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে ভগবানের

আবির্ভাব ঘটে। তিনি ভক্তের প্রীতি-সূত্রে তাঁহার হৃদয়ে যেন বাঁধা পড়িয়া যান এবং সৎ-হিতরূপ করুণ-রসে ভক্তকে আপ্যায়িত করিতে অনুপ্রবৃত্ত হন। দুস্তর-জনের ভয়হরণকারী শর্ম্মদ-সুস্ময়ে বা হাসিমাখা শ্রীমুখের মাধুর্য্যে তিনি ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয় আকষণ করেন—'সুস্তব-দৃগ্‌জয়'। অর্জ্জুনের স্তবে আমরা এই লক্ষণগুলির পরিচয় পাই। অর্জ্জুনের স্তবটি সুস্তব। কেন? এই অর্থে যে, এই স্তবের ভিতর দিয়া অর্জ্জুন তাঁহার মনের মূলে সর্ব্বভাবে আত্মনিবেদনের ছন্দটি অনুভব করিয়াছেন। শ্রীভগবানের প্রসাদ তাঁহার মনকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহকে তদ্ভাবে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। বিধিমার্গের স্তর অতিক্রম করিয়া রাগমার্গের উদ্দীপনা তিনি অন্তরে অনুভব করিতেছেন। শ্রীভগবানের নমঃ-নিষ্ঠ একটি ঘনিষ্ঠতা তাঁহার চিত্তকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাবটি তিনি চাপা দিতে পারিতেছেন না। তাঁহার অন্তরের ভাবটি এই, যদি আমাকে নিমিত্তমাত্র হইতেই হয়, তুমিই তাহা করাও। নমস্কৃতির পথে এক্ষেত্রে অনুবৃত্তি বা আদেশ পালন, কর্ম্ম করিয়া ফল অর্পণ নহে। নিজেকে অর্পণ করিয়া পরে কর্ম্মফল নিবেদন। অর্জ্জুন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি তাঁহার আত্মদেবতাকে সেবা-ধর্ম্মে উদ্দীপিত-রূপে পাইতে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তাই 'হৃষীকেশ' এই নামটি স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই অর্জ্জুনের মুখে কীর্ত্তনানন্দে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের পরাভক্তি লাভে তিনি উপযোগিতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নাম, তাঁহার গুণাদির কীর্ত্তনের মহিমার এমন কথাই আমরা ভাগবতে শ্রীমৎ অক্রূরের মুখে শুনিতে পাই—

"যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈর্ব্বাচো
বিমিশ্রা গুণ-কর্ম্ম-জন্মভিঃ
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ।" (ভাঃ ১০।৩৮।১২)

শ্রীভগবানের নিখিল পাপ-বিনাশক সুমঙ্গলদায়ক গুণ-কর্ম্ম-জন্মমূলক কীর্ত্তন জগৎকে উজ্জীবিত, সুন্দর এবং পবিত্র করে।

"সকল জগতে হয় উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম।"
(চৈঃ চঃ)।

আমরা অর্জ্জুনের স্তবে ইহার সঙ্গতি অনুভব করি। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের দ্বারা জগৎ অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বচিত্ত তোমাতে অনুরক্ত হইয়া উঠে। আর রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। সিদ্ধগণ সকলে তোমাকে নমস্কার করেন। "শুনিলে গোবিন্দ রব আপদ পলায় সব সিংহ রবে যেন শিবাগণ।" অর্জ্জুন অন্তরে গোবিন্দকে দেখিতেছেন, তাই তাঁহার মুখে স্ফুরণ—শ্রীনাম-কীর্ত্তন। অর্জ্জুনের চোখে অনুরাগের অঞ্জন লাগিয়াছে। "যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎ-পুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈস্তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্"—এই ভাগবতী বাণী অর্জ্জুনের চিত্তকে সন্তর্পিত করিয়াছে। তাঁহার অন্তরাকাশ উদ্দীপ্ত করিয়া প্রলয়ঙ্কর বিশ্বরূপের আড়ালে চুপে চুপে প্রাণময়-স্পর্শে তাঁহার অন্তর-দেবতা তাঁহার সহিত তাঁহার নিজ-সম্বন্ধ জীবন্ত করিয়া তুলিতেছেন। এমন অবস্থায় কীর্ত্তন না করিয়া উপায় থাকে কাহার? কীর্ত্তন শুনিতে কাণ না বাড়াইয়া দিয়াই বা কে পারে?

আত্মদেবতার এই ব্যক্ত মহিমায় অর্জ্জুন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, তুমি মহাত্মা, সকলকে আপন করিয়া লওয়াই তোমার স্বভাব। এমন তুমি, কেনই বা তোমাকে সকলে নমস্কার করিবে না? তুমি যে ব্রহ্মারও আদি-কর্ত্তা, ব্রহ্মা হইতেও যে তুমি গরীয়ান্। তুমি সর্ব্বদেবতার ঈশ্বর। তুমিই সমস্ত, তুমি সর্ব্বজগতের নিবাস। তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমিই অসৎ। সদসতের অতীত যাহা তাহাও তুমি।

হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, তুমি পুরাণ পুরুষ। তুমি এই বিশ্বের একমাত্র নিধান। তুমিই বেত্তা, তুমিই বেদ্য। তুমিই পরম-ধাম। তোমা দ্বারা এই বিশ্ব সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত।

তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি বরুণ, তুমি শশাঙ্ক। তুমিই প্রজাপতি। তুমি পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা, তুমি হিরণ্যগর্ভ। তোমাকে সহস্র সহস্র প্রণাম। পুনঃ পুনঃ তোমাকে প্রণাম।

নমস্কার, তোমাকে নমস্কার। তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার। তোমাকে সকল দিকে নমস্কার।

"আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা।
পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরং
আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।"
(ছান্দোগ্য— ৭.২৫।২)

শ্রুতির এই বাণী অর্জ্জুনের উক্তিতে সার্থকতা লাভ করিল। অর্জ্জুন বলিলেন, তোমার বীর্য্য অনন্ত, তোমার বিক্রম অপরিমেয়। তুমি সমস্ত সম্যক্‌রূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছ, অতএব তুমিই সব।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মস্বরূপের যত প্রকার ভাব ও লক্ষণ বলিয়াছেন অর্জ্জুন সেগুলি আজ ভগবানের নর-বিগ্রহে মিলাইয়া পাইলেন। সেই রূপটি দেখিয়া তিনি হৃষ্ট। তাঁহার অন্তর জুড়িয়া আনন্দের লহর উঠিতেছে; আর তাঁহার রসনায় ভগবৎ-মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। নমস্কারের পুরস্কার হইল নাম। নমস্কারের ফলে নামের সঞ্চার ঘটে। অর্জ্জুনের রসনা নামের বশে চলিয়া গিয়াছে। তিনি নামের রসে মগ্ন হইয়া নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ভাগবতে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী এইগুলি মানুষের অহঙ্কার বর্দ্ধিত করে। যাঁহারা এইরূপ অহঙ্কৃত তাঁহারা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে পারেন না। অর্জ্জুন এই দিক হইতে নামের মহিমা আজ অন্তরে উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—আমি হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি। কিন্তু ডাকার মত ডাকা আমার হয় নাই। আমি অহঙ্কৃতচিত্তে তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি। 'কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণ-লীলাবৃন্দ, কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ'—অর্জ্জুন বলিতেছেন,

নামে এই সত্যটি তিনি অনুভব করেন নাই। এক্ষেত্রে অর্জ্জুনের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার নামাপরাধ ঘটিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ত�ৃণাদপি সুনীচেন
তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥" [চৈঃ চঃ]

অর্জ্জুন যাঁহাকে নিজের সখা মনে করিতেন, তিনি যে এইরূপ অপ্রমেয় এবং অনন্তরূপ তিনি এতদিন তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন নাই। অর্জ্জুন শুনিয়াছিলেন—'ন ভূত-সংঘ-সংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ', পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহ পাঞ্চভৌতিক নয়—(মহাঃ উদ্যোগপর্ব্ব)। শুনিয়াছিলেন ভীষ্মাদির মুখে একথা। কিন্তু শোনা আর দেখা এক বস্তু নয়। তিনি আজ প্রত্যক্ষ করিলেন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতোব্যাপ্ত অনন্তরূপ। অর্জ্জুনের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। আত্মগ্লানিতে তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইল। স্বয়ং যিনি পরব্রহ্ম অর্জ্জুন তাঁহাকে অমর্য্যাদা করিয়াছেন, সখা বলিয়া তাঁহার প্রতি অশোভন আচরণও তিনি করিয়াছেন। তাঁহাকে তিনি উপহাস করিয়াছেন। অর্জ্জুনের উক্তিতে দুইটি বিষয়

আমরা পাইতেছি। তিনি কখনও একাকী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে কৃষ্ণ-চন্দ্রকে দেখিয়াছেন, কখনো 'তৎ-সমক্ষং' তাঁহাকে দেখিয়াছেন। এখানে একাকী দেখা বলিতে এবং 'তৎ-সমক্ষং' দেখা বলিতে অর্জ্জুন কি বুঝাইয়াছেন ইহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। প্রথমতঃ একান্তে অর্থাৎ যদুবংশজাত এই পরিচ্ছিন্ন বোধ লইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি অপরাধ করিয়াছেন। তৎ-স্বরূপে অর্জ্জুনের নিকট যিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনিও যে পরব্রহ্মতত্ত্ব, অর্জ্জুন তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখন তাঁহাকে তিনি সর্ব্বভাবে সর্ব্বস্বরূপে দেখিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন—আমি অসদাশ্রিত ছিলাম বলিয়া পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিয়াছি এবং বহু ভাবের মধ্যেও তোমার আত্মভাবটি আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এক্ষেত্রে 'তৎ' শব্দের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শ্রীধর স্বামীপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। 'তৎ' শব্দটিও ভগবানেরই নাম। ইহা আমরা পরে সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে পাইব। কিন্তু অজ্ঞগণের অগোচর বলিয়া ঐ নামটি পরোক্ষবাচক হইয়া থাকে। পরব্রহ্মতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে দৃষ্টির এই পরিচ্ছিন্নতা এবং পরোক্ষতাই অর্জ্জুনের লক্ষ্যের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।"

[বৃহঃ—৪।৪।১৫]।

শ্রুতির এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি—

"আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব
নিন্দামাত্রে কৃষ্ণ রুষ্ট—কহে শাস্ত্র সব।
অনিন্দক হৈয়া যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে।" (চৈঃ ভাঃ)

"যিনি জ্যোতির্ম্ময় ও ত্রিকালের ঈশ্বর আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন

করেন, তিনি কাহারও নিন্দা করেন না।" অর্জ্জুন এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, আমি তোমার অবজ্ঞা করিয়াছি, তোমাকে নিন্দা করিয়াছি। আজ বুঝিতেছি তোমার স্বরূপকে—'সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।' সত্যই তো কত অপরাধ হইয়াছে। অর্জ্জুনের স্মৃতিপথে উদিত হইল জীবনের কত কথা। আহারে, বিহারে, শয়নে, আসনে অর্জ্জুন তো কোন দিনই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দান করেন নাই। তাঁহার ঐশ্বর মহিমা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। কেবল নিজের দিকেই তাকাইয়াছেন। তিনিই কর্ত্তা এই অহঙ্কারই অন্তরে পোষণ করিয়াছেন। এই ভাবে একাকী নিজেকে দেখিয়াছেন। দেখেন নাই নিত্য তাঁহার সঙ্গী হইয়া ছিলেন অখিলাত্ম পুরুষ যিনি তিনি তাঁহাকে। আবার নানারূপে শ্রীকৃষ্ণই তো তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। তিনিই যখন সব, তখন তিনি ছাড়া আর কে আছে? অর্জ্জুন সর্ব্ব-স্বরূপ এই দেবতার মহিমা উপলব্ধি করেন নাই। উপাধির বিভ্রান্তিতে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান যিনি তিনি তাঁহাকে করিয়াছেন অবজ্ঞা। তিনি নিজেকেই বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন। নিজের করাকেই বড় মনে করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে তাঁহার জন্য কি করিয়াছেন নিতান্ত হৃদয়হীনভাবে সে বিচার তো কোন দিনই তিনি করেন নাই! কত না অন্যায় হইয়াছে তাঁহার। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে এজন্য গ্লানি অনুভব করিতেছেন এবং বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত তৎপরত্বে নির্ম্মল-ভক্তির রীতি তাঁহার চিত্তে পরিস্ফুর্ত্ত হইয়া তাঁহাকে ভগবানের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণত করিতেছে। তিনি তাঁহার সমগ্র হৃদয়ের দৈন্য ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া বলিতেছেন, ক্ষমা কর প্রভু, ক্ষমা কর।

অর্জ্জুন বলিতেছেন—অপ্রমেয় প্রভাব তুমি। তুমি চরাচর এই বিশ্বের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং তাহা হইতেও তুমি গরীয়ান্। ত্রিলোকের মধ্যে তোমার তুল্য কেহ নাই; আর কেমন করিয়াই বা থাকিবে, এত কৃপা কাহার?

অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে দেব, তোমার কৃপাই ভরসা। সমস্ত শরীর লুটাইয়া দিয়া আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। ঈশ্বর তুমি, তোমার প্রসাদ আমি ভিক্ষা করিতেছি। পুত্রকে যেমন পিতা, সখাকে যেমন সখা, প্রিয়কে যেমন প্রিয়, তদ্রূপ তুমি আমাকে ক্ষমার যোগ্য মনে কর। অর্জ্জুন এবার নিত্য আত্মসম্বন্ধের দাবিটি করিয়া বসিলেন। এইটিই যে বড় দাবী।

ভগবান্ অর্জ্জুনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। অর্জ্জুন পূর্ব্বে যাহা কোন দিন দেখেন নাই ভগবানের সেই বিশ্বরূপ তিনি দেখিয়াছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, সেরূপ দেখিয়া তিনি পরম হর্ষান্বিত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকক্ষয়কারী মহাকালের উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াও পড়িয়াছে। তাঁহার মনে শান্তি নাই। তাঁহার ধ্যেয় শান্ত-সৌম্য শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি আকুলভাবে শ্রীভগবানের নিকট সেই বাসনা ব্যক্ত করিলেন, বলিলেন—"তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।" ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং ব্যাপার এই যে তাহা ছাড়া তিনি আরও কিছু করিলেন। "অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হ'য়ে বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে"—হৃষীকেশ বলিয়া সম্বোধনের মূলে অর্জ্জুনের মনে নিজ-সম্বন্ধের মনন-সূত্রে যে আত্মভাবটি বীর্য্যস্বরূপে নিহিত ছিল, অর্জ্জুনের রথে সারথি-স্বরূপে যে রূপটি লইয়া তিনি আত্মভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন অর্জ্জুনের সম্মুখে তাঁহার সেই প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়রূপের মাধুর্য্য-বীর্য্যে নারায়ণ প্রকট হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহার প্রাণের দেবতাকে নিকটে পাইয়া আশ্বস্তি লাভ করিলেন। বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনের মোহ দূর করিবার সময়কার যে রূপ, এ রূপ সেই রূপ। হৃষীকেশ—তাঁহার স্বরূপ। অর্জ্জুন এই স্বরূপেই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কুরু ও পাণ্ডব উভয়-পক্ষের মধ্যে রথ স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভগবানও হৃষীকেশরূপেই উভয় পক্ষের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়াছিলেন। সঞ্জয়ের

মুখে এই সংবাদটি আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। বস্তুতঃ হৃষীকেশরূপে তাঁহাকে না পাইলে পরাভক্তিতে মাধুর্য্যের রাজ্যে ভক্তের চিত্তের অনুপ্রবেশ ঘটে না। ভগবান্ সর্ব্বভাবে সকল বিকার স্বীকার করিয়া তাঁহার হইয়া রহিয়াছেন এই চিদাকারটিকে তাঁহার দেখা চাই। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার কৃপায় সকলেই তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন; কিন্তু সকলের দর্শন সমান নহে। যোগমায়া যাঁহার নিকট ভগবানের যতটুকু স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনি ততটুকু মাত্র দর্শন করেন। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ'। সুতরাং সাধন-ভজনের দ্বারা আমরা এমনভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। "তাঁহার কৃপাতে হয় দর্শন তাঁহার।" অর্জ্জুন দেখিলেন সেই চিদাকার। তাঁহার কৃপাতেই দেখিলেন। সে কৃপা অর্জ্জুনের প্রার্থনারও অপেক্ষা করিল না। অযাচিত করুণার ধারা অর্জ্জুনকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। চলিল কোথায় আমরা একটু পরেই সে পরিচয় পাইব।

এই নিখিল বিশ্ব-বিসৃষ্টির তিনিই বীজস্বরূপ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের চিত্তে এই সত্য নিষ্ঠিত করিতে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কারণ মানুষ সামান্য নয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিজবীর্য্যে উপলব্ধি করিবার একান্ত বুভুক্ষা মানুষের অন্তরে রহিয়াছে। বিশ্বের বীজস্বরূপ যিনি, যাহা হইতে নিখিল বিশ্বের দৃশ্যাদৃশ্য সকল কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহাকে নিজ করিয়া পাইলে তবে মানুষের সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় এবং পরম প্রয়োজনটি মিলে। মানুষের তখন দিব্য জন্ম লাভ ঘটে। জন্ম-কর্ম্মের বন্ধন তাঁহাদের আর থাকে না।

দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীব নিখিল বিশ্বের বীজকে অন্তরে একান্ত এবং জীবন্তভাবে উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র শ্রীভগবানের আত্মমাধুর্য্যের সংস্পর্শেই জীব দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইতে পারে। শ্রীভগবানের আত্মমাধুর্য্যের এই চাতুর্য্য আবার তাঁহার রূপ, গুণ এবং লালারসে আমাদের চিত্ত নিষিক্ত হইলে তবেই সেখানে পরিস্ফূর্ত্ত হইবার উপযোগী প্রতিবেশ পায়। বচনকে অবলম্বন করিয়া শ্রবণ-সূত্রেই শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলারস সম্ভোগের সংযোগ জীবের পক্ষে ঘটে। একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের উক্তিতে এই সত্যটি স্বীকৃত হইয়াছে! তিনি বলিয়াছেন, আমাকে অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের যে সব পরম গুহ্য বিষয় বর্ণনা করিলেন তাহা শুনিয়া আমার মোহ বিদূরিত হইল। এস্থলে ভগবদুক্তির ভিতর দিয়া অর্জ্জুন তাঁহার মনের মূলে আত্মধর্ম্মের যে উজ্জীবন-রীতিটি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অনুভব করেন, তাহাকেই তিনি পরম গুহ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার ফলে ভগবৎ-তত্ত্ব আস্বাদনে অর্জ্জুনের অন্তরে উৎকণ্ঠা অপ্রতিরুদ্ধবেগে উদ্দীপিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের রূপ-সাগরে তিনি ডুব দিতে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। নির্নিমেষনেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে অর্জ্জুনের লালসা জাগিয়াছে—শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় রূপ, সব জুড়িয়া তাঁহার

আত্মময় প্রভাব আস্বাদন করিতে এখন তাঁহার আগ্রহ। তাঁহার চিত্তের এই উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনে তাঁহাকে একান্তভাবে উন্মুখ করিয়াছে। তিনি ভগবৎ-ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছেন। বলিতেছেন, যদি তুমি মনে কর তোমার বিশ্বরূপ দর্শনের আমি অধিকারী তবেই আমার দর্শন প্রার্থনা পূর্ণ করিও। ভক্ত-চিত্তের এমন আর্ত্তি প্রপন্নার্ত্তিহারী শ্রীহরির চিত্তকে আর্দ্র করিল। তিনি তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ দর্শনের জন্য অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করিলেন। গৌরাঙ্গ-লীলায় সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার কথা এক্ষেত্রে আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। সনাতনের দৈন্যে বিগলিতচিত্ত হইয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন—"সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়"।

ভগবৎ-কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া অর্জ্জুন প্রথমে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কি দেখিলেন, তিনি? দেখিলেন অখণ্ড বিশ্ব শ্রীভগবানের শরীরে সীমায়িত সৌন্দর্য্যে সন্নিবিষ্ট। নিত্য পরিবর্ত্তন-শীলতার মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন শাশ্বত সত্য তাঁহার মনোমূল উদ্দীপ্ত করিয়া ইষ্টতত্ত্বে আপূর্য্যমান এবং অচল-প্রতিষ্ঠ মাধুর্য্যে নবায়মান রসের বিলাসে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। সান্তের মধ্যে অনন্ত, ব্যক্তের ভিতর অব্যক্ত, যুগপৎ মূর্ত্তামূর্ত্তের লীলাচ্ছন্দে অমৃতের উদ্দীপন। অসীম, উদার, অপার, গম্ভীর চরাচরে পরিব্যাপ্ত প্রজ্ঞান-ঘন সত্যের সহিত চিত্তের সংস্পর্শ জনিত উল্লাসের আবর্ত্তে অর্জ্জুন উচ্চকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি নিজকে সর্ব্বভাবে নিমগ্ন করিয়া দিয়া অমৃতময় অখণ্ড সেই রূপের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। ভগবদৈশ্বর্য্যে তিনি সে সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া প্রথমে হর্ষিত হইয়াছিলেন: কিন্তু পরে উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেখিতে পাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অর্জ্জুনের এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন "কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখি অর্জ্জুনের হইল ভয় সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়।" কিন্তু

"কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে।" ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি—বৃন্দাবনে ভগবদৈশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যের অধীন, সুতরাং সেখানে ভগবৎ-প্রীতি নিত্য পরিস্ফূর্ত্ত। কিন্তু অর্জ্জুন বৃন্দাবনের মাধুর্য্য রস-আস্বাদনের অধিকারী হন নাই। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে তিনি সখ্যভাবগত নিজ সম্বন্ধ বিস্মৃত হইলেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য তাঁহার প্রীতির সম্বন্ধ হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিল। কিন্তু সত্যই কি তাহাই? অর্জ্জুনের মুখের কথাতে আমরা কিন্তু তাহা পাই না। অর্জ্জুন অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রতিবেশের মধ্যেও তাঁহার অন্তরের অনুভূতির মধ্যে সান্ত পুরুষোত্তম মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বমূর্ত্তিতে যিনি বিরাজ করিতেছেন, তিনিই তাঁহার সম্মুখে। তিনিই পরম অক্ষর, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তিনিই নিত্য এবং শাশ্বত ধর্ম্মের রক্ষক সনাতন পুরুষ। শ্রীভগবানের এই মূর্ত্তি দেখিয়াই অর্জ্জুন প্রথমে আনন্দ এবং বিস্ময়ে হৃষ্টরোমা হইয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবের সাধ্যতত্ত্ব প্রকট করাই ভগবানের অভিপ্রায়। দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অহং-মমতাবোধ আমাদিগকে শ্রীভগবানের নিত্য সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত রাখিয়াছে। ফলতঃ অহঙ্কারই জীবের যত রকম দুর্গতির কারণ। পার্থ অহঙ্কারের বশেই বলিয়াছিলেন—"গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে" অহঙ্কৃত চিত্তের এই অসীম ঔদ্ধত্য, জীবের স্বরূপধর্ম্ম-বিরোধী এই মনোভাব শ্রীভগবান্ বিচূর্ণ করিলেন। তাঁহার করালমূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুনের অজ্ঞানতা জনিত ভ্রান্তি দূর হইল। "আমি যাহাকে কৃপা করি তাহার অহঙ্কার বিচূর্ণ করিয়া তবে নিবৃত্ত হই", ভাগবতে দৈত্যরাজ বলীকে বন্ধন-দশায় উপনীত করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে এইকথা বলিয়াছিলেন। "নানা অবজ্ঞানে ভক্তে তোষে ভগবান্ কৃষ্ণ যথা হরিলেন ইন্দ্রের গর্ব্ব মান"। (চৈঃ চঃ) পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—"শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্বকথা, অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা।" (চৈঃ ভাঃ) অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-

দর্শনে অদ্ভুত রসের বিলাস-প্রাচুর্য্যে ভগবৎ-কৃপার এমনই বৈচিত্র্যময় পরম মাধুর্য্যের আস্বাদনে আমরা অধিকারী হইয়াছি। দর্পহারী শ্রীহরির এই চাতুরী অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন লীলাকে প্রগাঢ় ধ্যানবীর্য্যে সর্ব্বচিত্তে চমৎকারিত্ব বিস্তার করিয়াছে। প্রত্যুত বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের চিত্তে ভয়ের উদ্রেক হওয়াতেই সমগ্র গীতার সারার্থ আস্বাদন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ বলেন, ভয় বস্তুটি এমনই যে তাহাতে পূর্ব্বাপর বিবেচনার সূত্রটির সংযোগ থাকে। বস্তুতঃ অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনজনিত ভীতিময় প্রতিবেশের আশ্রয়ে শ্রীভগবানের আত্মমাধুর্য্য গীতা-কেন্দ্রে ছন্দায়িত হয় এবং আমাদের অন্তরে বিগাঢ় হইয়া উঠে। প্রেম অনুলোম গতিতেই স্ফূর্ত্তি পায়। বস্তুতঃ গীতার আদিতে অর্জ্জুনের বিষাদ এবং অন্তে শ্রীভগবানের শেষ আদেশ এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে মধ্যভাগে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের অন্তরে উদিত এই ভয় বস্তুটি। ধর্ম্মের নামে অর্জ্জুন ভয়াবহ পরধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ আমরা ধর্ম্মের নামেই সব চেয়ে বড় অধর্ম্ম করি। ভগবান্ সেই সঙ্কট হইতে অর্জ্জুনকে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগতিই পরমধর্ম্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। অর্জ্জুনের ভীতিতে আমাদের জীবনে এতটাই সঙ্গতি মিলিয়াছে। বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের বন্দনা-গীতির ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বেদের নিধান মহা ওঁকার ভারতের আকাশে বাতাসে মধুরে গম্ভীরে আজও ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং অর্জ্জুনের ভয়েই আমাদের জয়। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে ভয়ে পড়িলেন, পড়িলেন দিব্যচক্ষু পাইয়াও। যিনি তাঁহাকে দিব্য দৃষ্টি দান করিয়াছিলেন তাঁহারই এই চাতুরী। প্রকৃতপক্ষে অর্জ্জুনের দৃষ্টি অন্ধতাযুক্ত হয় নাই। তিনি অন্ধতা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। তিনি শ্রীভগবানের কৃপার সঙ্গে অহঙ্কারী আমরা, অভিমানী আমরা, আমাদের চিত্তের সম্বন্ধটি স্থাপন করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের চাতুরীর এই রীতিটি বুঝিতে

পারিলে তবে বিশ্বরূপের বীজভাবটি আমরা আস্বাদনে অধিকারী হই। অর্জ্জুন ভগবানের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি ব্যথিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তিনি উপলব্ধি করিলেন যে লোকত্রয়ও তাঁহার ন্যায় ব্যথিত হইয়াছে। ত্রিজগতের ব্যথা অর্জ্জুনের হৃদয়ে এমনই আলোড়ন সৃষ্টি করিল। সেই ব্যথায় তিনি বিচলিত হইলেন। তিনি চাহিলেন দেববর যিনি তাঁহার বরেণ্য রূপটি দেখিতে। ত্রিজগতের বেদনায় অর্জ্জুন তাঁহার বুকে প্রেমের প্ররোহ-স্বরূপে ভগবানের সম্বন্ধটি নিজভাবের বীজে উপলব্ধি করিয়াছেন। অর্জ্জুন প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছেন। যিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক তিনি লীলাচ্ছন্দে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। অর্জ্জুন তাঁহার ধ্যেয় চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে ভগবানকে তাঁহার নিকট প্রকট হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এই যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকটের প্রয়োজন ইহাও ঘটিল অর্জ্জুনেরই প্রার্থনানুযায়ী। সুতরাং স্বতনুর দ্বারা ভক্তকে বরণকারী শ্রীহরির মূর্ত্তি ইহা নয়। চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শনের ফলে অর্জ্জুনের চিত্তে উদ্গত প্রেমের পিপাসা এখন যে আর মিটে না। প্রেমিক ভক্ত মাধুর্য্যরস-ঘন ভগবানকে চাহেন। কিন্তু চতুর্ভুজ-তত্ত্বের মূলে প্রিয়ত্ববোধের প্রগাঢ়তা নিত্য এবং অপ্রতিহত নহে। ভক্তচিত্তের আগ্রহ এখানে চতুর্ব্বূহের প্রকরণ-সম্পর্কে ব্যাহত। সর্ব্বতোময় যোগ বা সম্ভোগ-সামর্থ্যে ভগবানকে উপলব্ধির উপযোগী সৌলভ্য এবং সৌকুমার্য্য অর্জ্জুনের প্রার্থিত রূপে স্বাভাবিক নয়। দেবভাবের সূত্রে ইহাতে অসাধারণত্ব এবং অলৌকিকত্ব রহিয়াছে সুতরাং রসের আস্বাদন এখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। এমন রূপে আত্মরসের আরোপ আমরা যদি করি সেক্ষেত্রেও সম্বন্ধটি আমাদের পক্ষে অনেকটা আগন্তুক ব্যাপারই হইয়া দাঁড়ায়। মনের উজ্জীবন-সম্বন্ধে সাধ্য-তত্ত্বে সর্ব্বভাবে আত্মনিবেদনোপযোগী আকর্ষণ বা সংবেদনটি নিত্য এবং সত্যরূপে আমরা সেক্ষেত্রে অনুভব করি না, মন্ত্রলিঙ্গে তাহা পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের ছাপটি মনের মূলে আসিয়া পড়ে। ভগবৎ-মাধুর্য্যে আমাদের চিত্তবৃত্তি গোটাভাবে ফুটিয়া উঠে না। বস্তুতঃ

ভগবানের মাধুর্য্যে আমাদের মন সমূহ বা নিষ্ঠিত হইলে তবে হয় ব্যূহভেদ এবং ব্যূহভেদ হইলে তবে ভগবানের চিদৈশ্বর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ দর্শনের আগ্রহ আমাদের অন্তরে জাগে। ফলতঃ ভগবানের মনুষ্য-মূর্ত্তিতেই তাঁহার ভূত-মহেশ্বরত্ব সংন্যস্ত আছে। ভগবান যে অবস্থায় নিজের ঐশ্বর্য্য সংগুপ্ত করিয়া ভক্তের অনুগত-স্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন অর্থাৎ ভক্তকে বরণ করেন তাঁহার সেই অবস্থাতেই ভগবত্তায় পূর্ণতম প্রকাশ—"নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

ভাগবত-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সাধ্যতত্ত্বের মনন-মূলে আমাদের পক্ষে অন্তর্বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। সেই সূত্রে আমরা অন্তরে অনুভব করি স্থায়ীভাব এবং আমাদের হয় একান্ত লাভ। শ্রীভগবানের নরবপুর স্বরূপে ডুবিয়া আমরা আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ইন্দ্রিয় সর্ব্বসম্বন্ধে সাধ্যবস্তুটিকে আমরা হৃদয়ে জীবন্ত করিয়া পাই। "পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ"—দ্বারকা এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ। তিনি অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর নহেন। ভগবানকে অর্জ্জুন সর্ব্বভাবে আপন করিতে পারেন নাই। আত্মানন্দস্বরূপে অখিল বিশ্বে প্রেমের উর্ম্মিমালা বিস্তার করিয়া ভগবান্ চিদাকারে তাঁহার কাছে জাগেন নাই। অর্জ্জুন তাঁহাকে মর্য্যাদা দানের নামে বড় করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে বড় করিতে গেলেই আমরা তাঁহাকে ছোট করিয়া ফেলি। আপনাকে পর করিলে অন্তরে ডর স্বভাবতই জাগে। এইভাবে ভগবৎ-মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে আমাদের অন্তরে অবীর্য্যের সঞ্চার ঘটে। আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। দুর্ব্বল যে সে করুণাবিহীন হইবে, দয়া-মায়া তাহার থাকিবে না ইহাও প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যাপার। সুতরাং 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা', এ সত্য স্বীকার না করিলে আমাদের ভগবদনুভূতি অন্তর্বিজ্ঞানের পথে সঙ্গতি লাভ করে না এবং পরধর্ম্মের প্রভাবে আমাদিগকে পতিত হইতে হয়। বড় বুদ্ধি ফলাইতে গিয়া এই ভাবে আমরা বড় ভুল করি। ভগবান্ আমাদিগকে আপন করিবার জন্য ছোট হইতেই চাহেন, এজন্য

প্রতিনিয়ত তিনি আকুল ও ব্যাকুল। কিন্তু তাঁহাকে আমরা ঠেলিয়া ফেলিবই। তাঁহাকে বড় করিয়া সর্ব্বাত্মস্বরূপ তাঁহার স্বরূপধর্ম্মকে পিষ্ট, ক্লিষ্ট এবং আড়ষ্ট করিয়া তবে আমরা ছাড়িব। নতুবা ভগবানের নিস্তার নাই। কিন্তু মর্ত্ত্য-জগতে শ্রীভগবানের গোটা মাধুরী যে ফুটিয়া উঠিতেছে ছোট হইয়া। তাঁহাকে দেখিবার দৃষ্টি হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। কাঞ্চন ছাড়িয়া আমরা কাচের মূল্য বড় বুঝিয়াছি। প্রেম ছাড়িয়া পাইতেছি কামকে। আমাদের বিচারে জগতের সকলেই হইল তুচ্ছ, কারণ নিজের অধিকার আমাদের চাই যে উচ্চ। কিন্তু কখনো কখনো ভগবান এতই ছোট হইয়া যান যে আমরা অহঙ্কারের বশে তাঁহাকে বাড়াইতে চাহিলেও তাঁহাকে বাড়াইতে পারি না। আমরা তাঁহাকে দেবতা করিতে যতই চেষ্টা করি ততই তিনি মানুষ হইয়া হাসিয়া হাসিয়া আমাদের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়ান। তিনি ছোট হইয়া আমাদের মনের গহনে আমাদের আপন হইয়া ঢুকিয়া পড়েন। ভগবানের কৃপা আমাদের প্রতি এমনই অযাচিত এবং অপরিসীম। অর্জ্জুন স্বপ্রকৃতির অনুযায়ী তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত চলচ্চিত্তের কল্পনায় ধ্যেয়রূপে উপলব্ধি করিতে চাহিলেও ভগবান্ নিজেই আগাইয়া আসিলেন। তাঁহার স্বমাধুর্য্য-বীর্য্যে সর্ব্বসম্বন্ধে সুন্দর মানুষের আনন্দময় মঙ্গলমূর্ত্তিতে তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন। অন্য উপায়ই বা তাঁহার কি আছে? তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেও তিনি তো তাঁহার ধর্ম্ম ছাড়িতে পারেন না। তিনি আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেই চাহেন। প্রাণের দায়ে তাঁহাকে এমনভাবে ধরা দিতেই হয়। বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে তাঁহার সর্ব্বচিত্তাকর্ষণকারী 'হরি, হরি' বোলের এই দোলটিই রহিয়াছে, রহিয়াছে এই চাতুরী। বৃন্দাবনে গোপীদের নিকট তিনি তাঁহার চাতুর্য্যের রীতিটি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—আমি সকলের প্রতি পরম করুণা-পরায়ণ। আমি সকলের পরম সুহৃৎ। আমি আমার প্রতি সাধকের চিত্তবৃত্তিকে ধ্যান-প্রবৃত্তিতে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য

তাঁহারা ভজনা করিলেও আমি তাঁহাদের ভজনা করি না। পরন্তু এই ভাবে ভজনা না করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদেরই আমি ভজনা করি— ভজনা করি পরোক্ষ থাকিয়া। লব্ধ-ধন বিনষ্ট হইলে দরিদ্র ব্যক্তি যেমন সেই ধন-চিন্তায় অন্য সব ভুলিয়া যায়। তাহার কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান থাকে না। আমিও সকলকে তেমনভাবে আপন করিয়া পাইতে চাই। বস্তুতঃ ভগবান্ আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া আমরা তাঁহাকে পাইবার জন্য আমাদের স্বরূপধর্ম্মনিষ্ঠিত বেদনায় আকুল এবং ব্যাকুল হইয়া উঠি—পাগল হইয়া ছুটি, তিনি এইটিই চাহেন। আমরা তাঁহার জন্য এইভাবে ব্যাকুল হইলে তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপে আমাদিগকে তাঁহার আত্মসম্বন্ধ আস্বাদন করান এবং নিজেও আত্মমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হন। তিনি এমনই কামুক। "নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত"।

এমন কথাও উঠিতে পারে যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতেই দেখিতেন। ভগবান্ তাঁহার দর্শনাভ্যস্ত সেই চতুর্ভুজ রূপই দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সুস্পষ্টভাবে মানুষ-রূপ দেখিয়াছেন এমন কথাই বলিলেন। তিনি চতুর্ভুজ-রূপকে মানুষ-রূপ বলিবেন কেন? মানুষকে কি কখনো তিনি দেখেন নাই? ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যে দ্বিভুজ নরাকারেই পাণ্ডবদের গৃহে অবস্থান করিতেন, শাস্ত্রে তো এইরূপ প্রমাণই পাওয়া যায়। মহামুনি নারদ ভাগবতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন— মহারাজ আপনারা ধন্য। লোকপাবনকারী মুনিগণ আপনাদের গৃহে আগমন করেন। স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গূঢ়-মনুষ্যলিঙ্গে আপনাদের গৃহে অবস্থান করেন। "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং" (ভাঃ ১০।১৭।৪৮)। ভাগবতের এই উক্তিতে অর্জ্জুন যে শ্রীভগবানকে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতেই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন এই যুক্তি খণ্ডিত হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ' (১৪।১৭)। যদুবংশে স্বয়ং পরব্রহ্ম নরাকারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অর্জ্জুন

তাঁহার ধ্যেয় চতুর্ভুজ-রূপকে আশ্রয় করিয়াই 'দুর্নিরীক্ষ্য দীপ্তানলার্কদ্যুতি' এবং অপ্রমেয় বিশ্বরূপটি প্রত্যক্ষ করেন। প্রত্যুত ধ্যেয়-স্বরূপের মর্য্যাদাবুদ্ধিসঞ্জাত সংস্কার হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। শ্রীভগবানের নররূপের স্বরূপে ডুবিলে ভয়ে তাঁহার চিত্ত প্রব্যথিত হইত না। তিনি সেই রূপেই মজিয়া যাইতেন. অর্জ্জুনের অবীর্য্য দূর করিবার ছলে নররূপধারী হরি আত্মমাধুর্য্য ব্যক্ত করিবার কৌশল খেলিলেন। স্নেহার্দ্রাকুল শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের চিত্তকে এইভাবে সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া মানুষের সৌম্য-মূর্ত্তিতে অনুকম্পাবশে তাঁহার স্বরূপগত সর্ব্বাতিশায়ী সৌলভ্য এবং সৌকুমার্য্যে তিনি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। অর্জ্জুন চতুর্ভুজ-রূপই দর্শন করিতে চাহিলেন, অথচ ভগবান্ দেখা দিলেন তাঁহার পূর্ণস্বরূপে। কৃপা-শক্তির পারতন্ত্র্যে ভগবানেরও ভুল ঘটিয়া থাকে। তিনি "স্বকং রূপং" অর্থাৎ তাঁহার নিত্য-স্বরূপ নরবপু—মানুষরূপটি অর্জ্জুনকে দেখাইয়া ফেলিলেন। রূপ দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহার স্বরূপধর্ম্মগত উদ্দীপ্তি অনুভব করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার ধ্যেয়তত্ত্বে পাইয়াছিলেন—"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ" কিন্তু ধ্যেয় ছিলেন যিনি, তিনি এখন ধরা দিলেন, নরলীলায় নারায়ণরূপে। অর্জ্জুন পাইলেন মাধুর্য্যময় তাঁহার প্রিয় যিনি তাঁহাকে—যোগৈশ্বর্য্য-মুক্ত এই দর্শন। এ দর্শন অনাবৃত দর্শন, মাধুর্য্যময় এ দর্শন। সাযুজ্যকামীদের ভাগ্যে এ দর্শন লাভ ঘটে না। সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি-কামীরাও এমন দর্শনে অধিকারী নন। অনাবৃত দর্শনের অধিকারী সামীপ্যকামীরাও নহেন, কারণ শান্তভাবে তাঁহাদের সাধনা। তাঁহাদের ধ্যেয় চতুর্ভুজ নারায়ণ-তত্ত্ব। তাঁহাদের ভাব মদীয়তাময় নহে, তদীয়তাময়। ভগবান্ আমার এই জ্ঞান তাঁহাদের নাই। আমি ভগবানের, ভগবান্ আমার অনুগ্রাহক—এই ভাব তাঁহাদের চিত্তে বলবান। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ শান্ত ভক্তগণের সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত। বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম যখন বিশেষরূপে গাঢ়তা লাভ করে, তখন তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না। সেই

প্রেমের সাধকগণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না। ভগবানের প্রিয়ত্ববোধে তাহাদের চিত্ত পরিনিষ্ঠিত থাকে। ভগবান ভক্ত-প্রেমাধীন। ভগবানে যাহাদের প্রিয়ত্ববোধ পরিনিষ্ঠিত বা বিগাঢ় ভগবান্ তাঁহাদেরই বশ্যতা স্বীকার করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। স্বয়ং গৌর-ভগবানের মুখে আমরা এই সত্যের পরিচয় পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—'আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন, সর্ব্বভাবে আমি হই তাহার অধীন' (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—১।৪।১০)। চতুর্ভুজ নারায়ণই অর্জ্জুনের ধ্যেয়। কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্ব ধ্যানাতীত। ধ্যেয়স্বরূপ তিনি অর্জ্জুনের অন্তঃ-সাক্ষাৎ-কারেরই একমাত্র বিষয় বস্তু ছিলেন। কিন্তু ভক্তের প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের স্মৃতিতে শ্রীভগবানের প্রীতির সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি মদীয়তাময় মাধুর্য্য-বীর্য্যে অর্জ্জুনের নিকট প্রকট হইলেন। অর্জ্জুনের অন্তঃ-সাক্ষাৎকার বহিঃ-সাক্ষাৎকারে অন্তর এবং বাহির দুইভাবে পরিপূর্ত্তি লাভ করিল। অন্তঃসাক্ষাৎকার এবং বহিঃসাক্ষাৎকার যুগপৎ নিত্যমাধুর্য্যে সমুজ্জ্বল এমন চিদাকারে ভগবান্ অর্জ্জুনের কাছে ধরা দিলেন। অন্তঃসাক্ষাৎকার চিদানন্দরসে উপচাইয়া উঠিলেই তো বহিঃসাক্ষাৎকার মিলে। এমনভাবে না পাইলে ভগবানকে পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। ভক্ত-পরাধীনত্বে এমন খেলা যদি তিনি না খেলেন, তবে তাঁহাকে জানা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁহার চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদনে জীবের পরম-পুরুষার্থ সাধিত হয় না। বিশ্বরূপ-দর্শনের পরিসমাপ্তিতে ভগবৎ-কৃপার এমনই পর্য্যাপ্তি পরিস্ফূর্ত্ত হইল।

যিনি মহৎ হইতেও মহীয়ান্, অণু হইতে যিনি অণুর মধ্যে আত্ম-মাধুর্য্যে নিহিত রহিয়াছেন, তাঁহার রস-মাধুরী সর্ব্বভাবে সঞ্চারিত এবং লীলায়িত দেখিলে আমাদের পিপাসা মিটে। শ্রুতি এই পরম সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অমাত্র শ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব।

সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ।" তিনি আত্মা তাঁহাকে পাইলে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত—এই ওঁকার-স্বরূপের রূপে ডুবিয়া শিবকে পাওয়া যায়। আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই অদ্বৈত-তত্ত্বে তাঁহার আত্মমাধুর্য্য। আমরা সেই মাধুর্য্যের বীর্য্যে ভগবানকে সমাত্ম-সম্বন্ধের সূত্রে স্বাভাবিক ভাবে পাই। ফলতঃ আমরা মানুষ, আমরা মানুষ ভগবানকেই আমাদের জীবনে নিত্য সত্য এবং জীবন্তভাবে স্ব-স্বরূপে ডুবিয়া পাইতে অধিকারী। তাঁহাকে জানা, দেখা এবং আপন করিয়া পাওয়া আমাদের পক্ষে এই ভাবেই সম্ভব হয়। শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপ প্রকট করিয়া এই তিনটি তত্ত্ব সত্য করিলেন। ত্রিবৃৎ-রূপে তিনি প্রকট হইলেন। তিনি কে —অর্জ্জুনকে তাহা জানাইলেন। দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে আসিয়া এমন জানানোর ধারাটি অর্জ্জুনের অন্তরে জমিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চিত্তে চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবানকে দেখিবার বাসনা জাগিয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে এই দেখানোর ব্যাপারে 'দ্রষ্টুং তত্ত্বটি' সত্য হইয়াছে। ভগবান অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছেন তাঁহার স্বরূপ। অর্জ্জুন দেখিলেন তিনি নরাকৃতি এবং দেখিলেন নরলীল হইলেও তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে, পরিচ্ছিন্নও নয়। তাঁহার দেহ সচ্চিদানন্দময়, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপক এবং অপরিচ্ছিন্ন। তিনি দ্বিভুজ নরাকৃতিতে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার শ্রীবিগ্রহে নিত্য অপরিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম বিরাজমান। অর্জ্জুন প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাই নররূপে আজ পরব্রহ্মকে দেখিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহাকে সর্ব্বরূপে, দেখিলেন অনন্তরূপে, দেখিলেন তাঁহাকে প্রাভবে, দেখিলেন বৈভবে। দেখিলেন তিনি তাঁহাকে প্রকাশে, বিলাসে দেখিলেন তিনি তাঁহাকে। দেখিলেন তিনি তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যে, দেখিলেন মাধুর্য্যে। তিনি দেখিলেন তাঁহাকে তাঁহার পূর্ণস্বরূপে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।

স্বয়ং-রূপ, তদেকাত্ম-রূপ আবেশ নাম
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান।
স্বয়ং-রূপে স্বয়ং-প্রকাশ—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি
যে কালে দ্বিভুজ নাম প্রাভব-প্রকাশ
চতুর্ভুজ হৈলে নাম বৈভব-বিলাস।" (চৈঃ চঃ)

স্বয়ং-রূপে আবির্ভূত পূর্ণব্রহ্ম দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে চতুর্ভুজ এবং দ্বিভুজ একই স্বয়ং-রূপ-প্রকাশের এই দুই রূপে আত্মমাধুর্য্যে বিলাসের প্রকাশ বা পরিস্ফূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া অদ্বয় এবং চিন্ময়রসে আমাদের চিত্তকে উজ্জীবিত করিলেন। ভগবান্ রসস্বরূপ। আনন্দঘন রসও যাহা মাধুর্য্যও তাহাই। পূর্ণব্রহ্ম ভগবৎ-তত্ত্বে ঐশ্বর্য্য অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের অপরিহার্য্যতা সে ক্ষেত্রে গৌণ। বাস্তবিকপক্ষে মাধুর্য্যের পরিপুষ্টি সাধনের জন্যই সময়বিশেষে ঐশ্বর্য্য প্রকট করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিশ্বরূপ-দর্শনে বিভূতিব পরিপ্রেক্ষায় আমরা আমাদের স্বরূপধর্ম্মে যোগের অতীব গূঢ় পরমতত্ত্বটি উপলব্ধি করিলাম। অর্জ্জুন নিজের অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিলেন। আমরা দেখিয়াছি, অর্জ্জুনের এই অপরাধ প্রমাদরূপ নামাপরাধ। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ এই অপরাধের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নাম্নি প্রীতিঃ শ্রদ্ধাভক্তির্ব্বা তয়া রহিতঃ সন্ যঃ অহং-মমতাদিপরমঃ অহন্তা-মমতা চ আদি শব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানং, ন তু নাম-গ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ সোঽপ্যপরাধকৃৎ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধা বা ভক্তিরহিত হইয়া অংহতা, মমতা ও বিষয়ভোগাদিকেই প্রধান করে, সে ব্যক্তিও অপরাধী। অর্জ্জুন বুঝিলেন তিনি অপরাধ করিয়াছেন। অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। ভক্তানুগ্রহ-তৎপর ভগবানের প্রসাদ মিলিল। ইহার পরে আসিয়াছে পাইবার কথা। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥"

তাঁহাকে পাইতে হইবে প্রিয়স্বরূপে। পাইবার উপায়টি কি ? 'মৎকর্ম্মকৃৎ' তাঁহার জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কি ভাবে করিতে হইবে ? তাঁহাকে পরম অর্থাৎ তাঁহাতেই সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। দেহেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সব সমর্পণ করিয়া তাঁহার ভক্ত হইতে হইবে। ভক্ত হইয়া সঙ্গবিবর্জ্জিত অর্থাৎ আসক্তিশূন্য হইতে হইবে। 'নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু'—তাঁহাকেই সর্ব্বভূতে আপন করিয়া দেখিতে হইবে। "স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ"-ভাগবতে প্রজাপতি দক্ষ হংসগুহ্য স্তবে বলিয়াছেন, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত বস্তুর যে যে নাম ও রূপসমূহ সকলই সেই ভগবানের। তিনিই সর্ব্বনামা, তিনিই বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ-দর্শনের ব্যঞ্জনায় ভগবান্ তাঁহাকে পাইবার এই ধারাটিই ব্যক্ত করিলেন। অর্জ্জুনের স্তবে সেই সত্য আমাদের চিত্তে উদ্দীপ্ত হইল। প্রীতির পথে ভগবদ্ভজনের প্রজ্ঞানময় রীতিটি আমরা উপলব্ধি করিলাম। প্রকৃতপক্ষে একাদশ অধ্যায়ে আমাদের সাধ্যতত্ত্বের সবখানি জুড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন ভক্তের যিনি ভগবান্ তিনি। আমাদের জীবনে অমৃতের উদ্বোধন ঘটিল—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" নানারূপে যিনি এক তাঁহাকে আপন করিয়া পাইয়া আমাদের জীবন জয়যুক্ত হইল। এই অধ্যায়ে ভগবানকে প্রিয়স্বরূপে কিরূপে লাভ করা যায় আমরা তাহা বুঝিলাম। এমন ভাবে যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকট তাঁহারা কিরূপ প্রিয় এবং একমাত্র ভক্তিযোগেই যে তাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভগবানের শ্রীমুখেই আমরা তাহার পরিচয় পাইব।

ভক্তিযোগ

১। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

২। তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

৩। সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

৪। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

উদ্ধারকারী হরি

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ"—আমি আছি, সুতরাং ভয় কি? মৃত্যুময় এই সংসার-সাগর হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য আমি নিজেই জাগ্রত রহিয়াছি। গীতার এই বাণী বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীব আমরা আমাদের চিত্তকে যুগপৎ উচ্চকিত ও উল্লসিত করিয়া তোলে। অন্তরকে আকুল করিয়া এই প্রশ্ন উঠে এমন জীব কাহারা যাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা তুমি, তোমার অন্তরে এমন উদ্বেগ! তাঁহারা কি মাটির এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন? আমাদের মত তাঁহারাও কি রক্তমাংসেরই দেহধারী মানুষ? শ্রীভগবানের উক্তিতে একটু অভিনিবিষ্ট হইলে এই উত্তর মিলে যে, তাঁহারাও আমাদের মত দেহধারী জীব। তাঁহারাও আমাদের মত সংসারে থাকেন এবং সংসারেরই কাজকর্ম্ম করেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের পার্থক্য এই যে, ভগবানের সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের মনকে যুক্ত রাখেন। তাঁহাদের সকল কর্ম্মের মূলে ভগবানকেই আশ্রয়স্বরূপে তাঁহারা উপলব্ধি করেন এবং সর্ব্বাবস্থার মধ্যে ভগবানেরই চিন্তা রাখিয়া তাঁহারা চলেন। এইভাবে চিত্ত যুক্ত রাখিবার ফলে তাঁহারা বিশ্বজগতে ভগবানেরই খেলা প্রত্যক্ষ করেন। পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির নানাভাবের অন্তরালে তাঁহারা ভগবানের সম্বন্ধ সর্ব্বত্র অনুভব করেন। শুধু তাহাই নহে, বিশ্বের প্রতি পদার্থের সহিত সম্বন্ধসূত্রে শ্রীভগবানের করুণার সংস্পর্শ তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখে এবং সেই সূত্রে বহুভাবের বিক্ষেপের মধ্যে তাঁহারা শ্রীভগবানের আত্মমাধুর্য্যে উদ্দীপিত একটি পরম নির্ভরতা অনুভব করেন। এই পথকে যুক্ত-বৈরাগ্যের পথ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ কালে—

"যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল
শুষ্ক-বৈরাগ্য, জ্ঞান সব নিষেধিল।" (চৈঃ চঃ)

প্রভু এই সম্পর্কে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১২শ হইতে ১৫শ শ্লোকের উল্লেখ করেন। প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা অন্তরে ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধি রাখিয়া আসক্তিহীন চিত্তে কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই যুক্ত-বৈরাগ্যের অধিকারী। এই পথে স্থিতি বা মন রাখিয়া সাধনা করা উচিত। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের উক্ত শ্লোকগুলিতে যুক্ত-বৈরাগ্যের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। বৈরাগ্য বলিতে ভোগ-ত্যাগ বুঝায়। ত্যাগের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ত্যাগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে নিজের যে ভোগ-ত্যাগ তাহা যুক্ত-বৈরাগ্য। 'কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা তৎ-কৃপাবলোকন', এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল কর্ম্ম যুক্ত-বৈরাগ্যে নিষিদ্ধ নহে। পক্ষান্তরে যে ত্যাগের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি নহে, কেবল নিজের ভোগ ত্যাগ তাহাকেই ফল্গু-বৈরাগ্য বা শুষ্ক-বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গৃহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"মর্কট-বৈরাগ্য ছাড় লোক-দেখানিয়া।" প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ-প্রীতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু বিষয় বাসনা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিতে গেলে সেই ত্যাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকদেখানো মর্কট-বৈরাগ্যেই পরিণত হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে —'বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব, তত্র চ ঈষদিতি ভক্তি-বিরোধিনং ত্যক্তেত্যর্থঃ', জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানোপযোগী বৈরাগ্যও পরিত্যজ্য। কারণ তাহা ভক্তিপথের বিরোধী। ভক্ত সর্ব্বাবস্থার মধ্যেই বিশ্বতোব্যাপ্ত বিভিন্ন শক্তির মূলে সর্ব্বশক্তিমানস্বরূপে শ্রীভগবানেরই প্রভাব উপলব্ধি করেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবানে চিত্তের আবিষ্ট অবস্থা বলিতে বাহ্য-সংস্পর্শের কম্পনে কম্পনে ভগবৎ-করুণার সংবেদনময় অন্তরগ্রাহ্য এমন অনুভূতিই বুঝায়। ভগবান বলিয়াছেন, মৃত্যুময় সংসারে থাকিয়া যাহারা এইভাবে তাহাদের মনটি সর্ব্বাবস্থার মধ্যে আমার দিকে তুলিয়া ধরে, আমি তাহাদিগকে স্বয়ং উদ্ধার করি এবং

সেই উদ্ধার-কার্য্যে আমার বিলম্ব সহে না, আমাকে সে কাজে যাইতে হয়। এমন যাহারা আমার ভক্ত, তাহাদিগকে নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হয় না।

ব্যক্ত এবং অব্যক্তভাবে ভগবদুপাসনার সম্পর্কে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে জীবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে তাঁহার কারুণ্য-ধর্ম্মের এমন বদান্য মহিমার সর্ব্বাতিশায়ী ঔজ্জ্বল্যের আমরা অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। ব্যক্ত-সাধনা বলিতে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের উপাসনাই বুঝায়। সকল শক্তির অভিব্যক্তির মূলে সে সাধনায় শক্তিমানের সম্বন্ধ জীবের চেতনার সূত্রে অনুভূত হয়। অন্য কথায় তাঁহার ভাবের খেলাটি ধরা পড়ে। ইহার ফলে জীবের চিত্তে শ্রীভগবানের আত্ম-ভাবটি প্রতিফলিত হয় এবং সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে তাঁহার প্রতি জীবের অনুরাগ উদ্দীপ্তি লাভ করে। এই অনুরাগ যতই ঘনীভূত হইতে থাকে ততই আমাদের দেহে, মনে, প্রাণে আমরা ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করি এবং আমরা তদ্গতচিত্ত হই। ভগবান্ দ্বাদশ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমাকে তোমার মনটি দাও, আমার চিন্তায় তোমার বুদ্ধিকে অভিনিবিষ্ট কর—তুমি আমাকেই পাইবে, ইহাতে সংশয় নাই। অব্যক্ত-সাধনার পথে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত সমগ্র শক্তিকে প্রতি পদে উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কারণ অব্যক্তের যাঁহারা সাধক বিশ্ব-শক্তিতে ভগবানের ব্যক্তভাবকে তাঁহারা নিজেদের বন্ধন স্বরূপ মনে করেন এবং এই শক্তির সংস্পর্শমাত্রে তাহা বর্জ্জন করিবার জন্য তাঁহাদের অন্তরে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, জীব দেহাভিমানী। অব্যক্তের সাধনায় প্রতিনিয়ত ব্যক্ত-শক্তির সহিত এইভাবে সঙ্ঘাত সৃষ্টির ফলে জীবের পক্ষে সেই সাধনা অত্যন্তই ক্লেশকর হইয়া থাকে। এই সঙ্ঘাতকে নিরোধ করিবার জন্য অব্যক্ত-সাধনায় সর্ব্বেন্দ্রিয়কে সংযত করিবার জন্য শম, দম, ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু অভিমান এই বস্তুটিকে কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না। ব্যক্ত-সাধনার

ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় জ্ঞান এবং বৈরাগ্যমূলক প্রকরণগুলি বিষয়াসক্তি হইতে মনকে মুক্ত করিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়ক হয় ইহা সত্য, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি অন্তরে জাগ্রত হইবার পরে সাধকের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে এইগুলির কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যুত বিষয়াসক্তি প্রভৃতি আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। "কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয় স্তথা"—(ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু)। প্রকৃতপক্ষে ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কোন সাধনাই সার্থকতা লাভ করে না। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—'ওঁ সা মুখ্যেতরাপেক্ষিত্বাৎ'—অর্থাৎ ভক্তিই মুখ্যা, কেননা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এ সব পথের সাধনাও ভক্তির অপেক্ষা রাখে। মায়াবাদী সিদ্ধান্তানুসরণকারী মোক্ষমার্গের সাধকগণ বিশ্বকে অনাত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন। প্রকৃতপক্ষে অনাত্মদর্শনের অর্থই মৃত্যুর প্রভাবে গিয়া পতিত হওয়া, অন্য কথায় আত্মহত্যা করা। সুতরাং অব্যক্ত সাধনা জীবের পক্ষে শুধু ক্লেশেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। দেহাত্যয়ের পরে বিশ্বের ব্যক্ত-শক্তির বেড়াজাল হইতে মুক্তি লাভ হইবে এইরূপ একটি ধারণা এমন সাধকের মনে জন্মে, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। কারণ কূটস্থ অক্ষর-তত্ত্ব বলিতে যে অবস্থা বুঝায়, সে অবস্থা সর্ব্বভাবের অতীত। সুতরাং তাহাকে ভগবদুপাসনা বলা চলে না এবং ভগবানের কৃপা ব্যতীত মায়াকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। স্বয়ং ভগবানের মুখেই আমরা এ কথা শুনিয়াছি। এক্ষেত্রে বলা হয় যে, ভগবানেরও ভাবাতীত একটি অবস্থা আছে, ব্যক্ত ভাবটি যে স্বরূপ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, যেখানে বিশ্ব অব্যক্ত, জীব অব্যক্ত, পরমেশ্বরত্বও অব্যক্ত। সুতরাং ব্যক্ত অবস্থা সব অনিত্য। এমন যুক্তির উত্তর গীতাতেই রহিয়াছে। গীতা বলিয়াছেন, অসৎ যে বস্তু তাহাতে কোন ভাব থাকে না। কিন্তু সৎ যে বস্তু তাহার অভাববোধের প্রতীতি সম্ভব নহে। প্রকৃতপ্রস্তাবে অক্ষরতত্ত্বের মূলে দেহাত্মবুদ্ধিগত জৈব-চেতনা সম্পর্কিত নশ্বর ভাবই আমাদের পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপে ভাবাতীত

অবস্থার নামে অভাববোধজনিত অসদনুভূতি জমাইয়া তোলে এবং এইভাবে ভগবানকেই সে ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়। কর্ম্ম জীবের পক্ষে বন্ধনের কারণ সৃষ্টি করে, সুতরাং বিশ্বকর্ম্মের সঙ্গে ভগবানের সংযোগ স্বীকৃত হইলে তিনিও বন্ধনগ্রস্ত বদ্ধজীব হইয়া পড়িবেন। এই যুক্তিতে ভগবানকেও অব্যক্তের সাধকগণ জীবের পর্য্যায়ে ফেলিয়া বিশ্ব-কর্ম্মের সম্পর্ক হইতে তাঁহাকে সংস্কৃত করিয়া তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে চান। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।" (শ্বেতাশ্বতর—৪।৯)

ব্রহ্ম মায়াশক্তি অবলম্বনে জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্ট জগতে জীব ব্রহ্ম-স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিবশে অবিদ্যার দ্বারা বদ্ধ হয়। 'মায়াধীশ-মায়াধীন ঈশ্বর জীবে ভেদ' (চৈঃ চঃ) তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন না। অহঙ্কার তাঁহাদের মনের মূলে এমনই বিকার জমাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা খোসা ছাড়াইয়া শাঁসের মত ভগবানকে খোঁজেন। ভগবৎ-কর্ম্মের মূলে সর্ব্বতোদীপ্ত প্রেমের ভাব বা অব্যয় ভাবের মাধুর্য্য তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের পক্ষে প্রেম ভাবুকতামাত্র। তাঁহারা ভাবাতীত অবস্থায় যাইতে উদ্বিগ্ন। বস্তুতঃ ভাবাতীত অবস্থা বলিতে ক্ষর, অক্ষর উভয়তঃ শ্রীভগবানের ব্যক্তভাবের সর্ব্বতোময় প্রভাবে তাঁহার আত্ম-মাধুর্য্যের অব্যয়ভাবে নিবেদিত জীবের দেহাত্মবুদ্ধির বিলুপ্তি এবং তাহার স্বরূপধর্ম্মের উজ্জীবক নিত্য এবং চিদ্ধর্ম্মাত্মক বিজ্ঞানময় উপলব্ধিই বুঝায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্,
ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ
সকল বেদের হয় শ্রীভগবান সম্বন্ধ।

অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি
তাহে নির্বিবশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। (চৈঃ চঃ)

অব্যক্তের উপাসকগণ ব্যক্ত ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয়কে নিরোধ করিয়া এইরূপ বেদবিরোধী মতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবানের অংশ-বিভূতিস্বরূপ তাঁহার অব্যক্ত ভাবটিই শুধু উপলব্ধি করিতে চাহেন। তাঁহাদিগকে 'নেতি নেতি' করিয়া অহঙ্কারের আশ্রয়ে নিজের চেষ্টায় অনুমিত সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হয়। তাঁহাদের ধারা প্রকৃতপক্ষে যোগের ধারা নয়, বিযুক্ত হওয়ার দিকেই তাঁহাদের সদাসতর্ক দৃষ্টি। দেহাত্মবুদ্ধিজড়িত অসৎ-তর্কে তাঁহাদের চিত্তে সর্ব্বদা বিক্ষেপ এবং আলোড়ন চলে। ফল্গু-বৈরাগ্যের এ পথ। এই পথের সাধকগণকে সর্ব্বাবস্থায় সকল দিক হইতে অসহায়ত্ব অনুভব করিতে হয়। তাঁহাদের জীবন শুষ্ক এবং নীরস হইয়া পড়ে।

ব্যক্ত সাধকের সাহায্যের জন্য ভগবানের উদার হস্ত সতত সম্প্রসারিত রহিয়াছে। প্রেমের ঠাকুরের করুণা তাঁহাদের জন্য সব সময় সকল দিক হইতে উন্মুক্ত। তিনি এমন উপাসকদের কাছে নিজেকে ব্যক্ত করিবার জন্যই যেন উন্মুখ। স্বীয় নিত্য স্বরূপের সংবেদন ভক্তের অন্তরে জাগ্রত করিবার আগ্রহে যুগে যুগে ভগবান্ অবতার-স্বরূপে প্রকটিত হন। রামকৃষ্ণ-নৃসিংহাদি ভগবদবতারসমূহের প্রজ্ঞানময় অনুধ্যানে ভক্ত তাঁহার মনের মূলে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবানের নিত্যসংশ্রয় উপলব্ধি করেন এবং ভগবৎ-লীলারসে চিত্তকে নিষিক্ত করিয়া মর্ত্ত্যজীবনে ভগবৎ-প্রেমকে জীবন্তভাবে উপলব্ধির সুযোগ পান। ব্যক্তভাবের এই সব উপাসকদিগকে অনুগ্রহ করিবার আগ্রহে ভগবান্ অর্চ্চাবতারস্বরূপে বিগ্রহমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকেন। সাধকগণ সেক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুরকে নিজেদের সমগ্র অন্তরের সাধ মিটাইয়া সেবা করিবার সুবিধা লাভ করেন। ভগবান্ সর্ব্ববিধ সৌলভ্যে এমন সব ভক্তের কাছে তাঁহার আত্মভাবটি ব্যক্ত করেন। বস্তুতঃ এই আত্মভাবটি বিশিষ্ট ভাবকে অবলম্বন করিয়াই বিলসিত হয়। এজন্য ইহা গণ্ডীবদ্ধ, ইহা সীমায়িত, অব্যক্তের

সাধকগণ এরূপ মনে করেন ; কিন্তু তাঁহারা এই সত্য উপলব্ধি করেন না যে বিশিষ্টভাবে ভগবানের এই অভিব্যক্তিতে ভগবানের স্বরূপ-ধর্ম্মগত পূর্ণত্ব খণ্ডিত হয় না ; পরন্তু তাঁহার সর্ব্বতোময় সংবেদনেই তিনি ভক্তের নিকট প্রকটিত হইয়া থাকেন—তাঁহাকে সেই ভাবে জানিলে সবই জানা হইয়া যায়। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ দেবোপাসকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ, পরম্ ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।' ভগবৎ-কৃপার সংবেদনে চিত্ত কামসংস্কার হইতে মুক্ত হইবার ফলে শ্রীভগবানের অব্যয় অনুত্তম পরম ভাবটি সবিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তভাবেরই ভিতর দিয়া সাধককে তাঁহার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করে ; সুতরাং বিভিন্ন দেবতার উপাসনার আগ্রহও তাঁহাদের থাকে না। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সম্বন্ধ হইতে বিরত থাকিলেই ভোগবাসনা দূরীভূত হয়, নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীগণ ইহাই মনে করেন। কিন্তু এই ভাবে ভোগ-বাসনার মূল কারণ প্রচ্ছন্ন-ভাবে তাঁহাদের চিত্তে থাকিয়াই যায়। ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের শক্তিতে ভোগ-বাসনা দূর করার জন্য চেষ্টার প্রতি তাঁহাদের অবিরত লক্ষ্য থাকে। দৃষ্টি সব সময় অহঙ্কারকে জড়াইয়া রহে। নির্বিবশেষ ব্রহ্মবাদের ভিত্তিতে জ্ঞান-বৈরাগ্য এই দিক হইতে চিত্তের কাঠিন্য সৃষ্টি করে। এজন্য এইরূপ সাধনা ভক্তিপথের অনুকূল নহে। প্রত্যুত শ্রীভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবামূলক সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিলে চিত্তবৃত্তি কোমলতা লাভ করে, চিত্তের দ্রবতা সম্পাদিত হয়। চিত্তের এইরূপ দ্রবতা সাধিত হইলে ভক্তির স্ফুরণ ঘটে। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেন—"রুচিভিশ্চিত্ত-মাসৃন্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে" অর্থাৎ শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য চিত্তের আগ্রহোদ্দীপক স্নিগ্ধতাজনক যে রস তাহাকেই ভাব বা ভক্তি বলে।

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে তৎপ্রণীত 'ভক্তি-রসায়ন' গ্রন্থের প্রথম উল্লাসে বলিয়াছেন—'দ্রবীভাবপূর্ব্বিকা হি মনসো

ভগবদাকারতা সবিকল্পকবৃত্তিরূপা ভক্তিঃ' অর্থাৎ ভগবানের মাহাত্ম্য-শ্রবণে লোকের মন প্রথমে দ্রবীভূত হয়। সেই মন পরে ভগবদাকারে আকারিত হয়। মন এই আকারটি পায় সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবৎ-কৃপার সঞ্চারে। ভগবদাকারে আকারিত মনের এই যে বৃত্তি ইহাই ভক্তি। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-কৃপার স্পর্শে চিত্তে ভগবদনুগতির উদ্দীপক অনুভূতিকে ভক্তি বলা যায়। এই অবস্থায় ভক্তের চিন্তার প্রবাহ একাকারাবৃত্তিতে ভগবানের সহিত আনন্দসম্বন্ধ-যুক্ত হয়। যুক্ত-বৈরাগ্যের বীজটি মিলে এইখানে। এইরূপে যুক্তভাব অবলম্বনে সাধন করাকেই শাস্ত্রে ভক্তিযোগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপঞ্জতঃ
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।"

—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)।

উদ্ধবের নিকট ভগবান্ ভক্তিযোগের নির্দ্দেশ-সম্পর্কে বলেন—

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ
জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগহস্য সিদ্ধিদঃ।" (ভাঃ ১১।২০।৮)

অযাচিত কৃপাপরায়ণ আমার ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সৌভাগ্যোদয়ে আমার কথাশ্রবণাদিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মে, যাঁহারা অতিশয় বিদ্বেষযুক্ত নহেন এবং অতিশয় আসক্ত নন, এমন পুরুষের পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। দ্বাদশ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকেই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এই ভক্তির সাধনোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিয়াছেন সেই কথা যে পথে তাঁহাকে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়। উপায়টি হইল তাঁহার দিকে মনটি রাখিয়া তাঁহার সেবারূপে কাজ করা। ইহাই তাঁহার ভজন। তাঁহার প্রতি মনকে যুক্ত রাখিয়া এই ভাবে ভজন

অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে কি অবস্থা লাভ করা সম্ভব হয় ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩শ হইতে ১৯শ শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অর্জ্জুনের মাধ্যমে জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় যাঁহারা তাঁহারা কেমন—কেমন তাঁহাদের লক্ষণ, কেমন তাঁহাদের আচরণ। ভক্তির পথে জ্ঞান, যোগ এসব আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। ভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকে বলিয়াছেন—যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত মদ্গতচিত্তে আমার ভজনা করেন, তাঁহারাই সকল যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন, তুমি এমন যোগী হও। তিনি সপ্তম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে বলিয়াছেন, আমার ভক্তের মধ্যে যাঁহারা নিত্যযুক্ত আমার ভজনায় একনিষ্ঠ, তাহারাই জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি এমন জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং ঈদৃশ জ্ঞানিগণও আমার অত্যন্ত প্রিয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির পথে ঐ সব উক্তিরই পরিপূর্ত্তির পক্ষে ভগবান্ জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মগত স্বাভাবিক রীতিটিই উন্মুক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ জীবের সহিত তাঁহার আত্মসম্বন্ধ বা প্রীতির এই ভাবটি সম্যকরূপে পরিস্ফুট করিবার জন্য তাহাকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ১৩শ হইতে ১৯শ শ্লোক কোন কোন ভাষ্যকার মায়াবাদমূলক জ্ঞানমার্গের সমর্থন অনুভব করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অক্ষরোপাসনাকারীদেরই প্রকৃতি ও লক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মামৃতে অভিষিক্ত অক্ষরতত্ত্বের সাধকদিগকেই অতিশয় প্রিয় বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবদুক্তিতে স্পষ্টভাষাতেই প্রকাশ পাইয়াছে—"শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাঃ" অর্থাৎ যে সব ভক্ত তাঁহার লীলাবিগ্রহে পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভাবে তাঁহার ভজনা করেন—অন্য কথায় "প্রেম্না হরিং ভজেৎ" এই শ্রুতিবাক্য যাঁহাদের জীবনে সত্য হইয়াছে উক্ত ধর্ম্মামৃত উপভোগে অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই আছে। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের যুক্তির সহিত ভগবদুক্তির কোনক্রমেই সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে দ্বাদশ অধ্যায়ে

ভগবান্ অক্ষরতত্ত্ব-সাধনার সম্পর্কে কোনই উপদেশ করেন নাই। তিনি ব্যক্তভাব বা রূপ, গুণ, লীলাশ্রিত সাধনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাসূত্রে অব্যক্ত সাধনা ক্লেশকর এবং সেই সূত্রে জীবের পক্ষে তাহার অনুপযুক্ততারই উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং অব্যক্ত বা অক্ষরতত্ত্বের সাধনার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের প্রশ্নই এক্ষেত্রে আসে না। ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে তেমন সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য সাধন করাও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ বৈরাগ্য বা অনাসক্তি নির্ব্বিশেষবাদীদেরই একচেটিয়া বস্তু নয়। কৃষ্ণসেবার পথে স্বচ্ছন্দে ভক্তগণ তাহা লাভ করিতে পারেন।

'যম-নিয়মাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ
যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ।'

প্রত্যুত দ্বাদশ অধ্যায়ে অব্যক্ত-সাধনার ক্লেশকরত্ব প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ ব্যক্তভাবের পথে সাধনাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন—মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন সেই পথেরই—অব্যক্ত বা অক্ষরতত্ত্বের সাধনার মাহাত্ম্য এখানে কীর্ত্তিত হয় নাই। ব্যক্তভাবে সাধনার সাধকগণের লক্ষণ এবং প্রকৃতিই দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩শ হইতে ১৯শ শ্লোকে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। প্রভু সনাতন গোস্বামীপাদকে উপদেশকালে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে
কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে।
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ
সব কহা নাহি যায়, করি দিগ্-দরশন।
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম,
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ,
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিত ষড়্গুণ।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী,
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।"

দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে ধর্ম্মামৃত আস্বাদনে ভগবান্ জীবকে প্রণোদিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্মামৃতের স্বরূপ কি? শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেৎ গোবিন্দ-ভক্তিতঃ' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-১।২০)। বস্তুতঃ অমৃত বলিতে এক্ষেত্রে ভগবৎ-মাধুর্য্যনিষ্ঠ ভক্তির ফলে স্বাভাবিকভাবে উপজাত জীবের স্বরূপানুবন্ধী রস বা আনন্দই বুঝাইতেছে;—কৃচ্ছ্রতাসাপেক্ষ শুষ্ক জ্ঞান-বৈরাগ্য নহে। এ সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তিই আমাদের চিত্তে উদিত হয়।

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান,
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।" (চৈঃ চঃ)।

প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবের প্রতি সর্ব্বাতিশায়ী করুণার ব্যক্ততার পথেই শ্রীভগবানের অমৃতত্ব জীবের পক্ষে অনুভবগম্য হইয়া থাকে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহার লীলা-বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া সাধনার ধারাটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে ভক্ত তাঁহাদের মন, তাঁহাদের প্রাণ সকল সম্বন্ধে ভগবানকে আপনার করিয়া পান। তিনি তাঁহাদের কাছে দেবমায়ার চাতুরী চালাইয়াও আর লুকাইয়া থাকিতে পারেন না। ফলতঃ এমন ভক্তদের উদ্ধারের জন্য ভগবানেরই দায় বড় হইয়া উঠে। তিনি নিজেই তাঁহাদিগকে মৃত্যুময় সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। শ্রুতি বলিয়াছেন—'ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি, সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি, মোক্ষং দাপয়তি'—(ত্রিপাদ-বিভূতি উপনিষৎ)। ভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি নিজেই সর্ব্ববিঘ্ন হইতে ভক্তকে রক্ষা করেন। তাহার সমস্ত অভীষ্ট পূরণ করেন। তাহার সমস্ত বন্ধন মোচন করেন। ভাগবতে জননী দেবহূতির নিকট ভগবান্ কপিলের মুখে আমরা শুনিয়াছি—"বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেব বিশ্বতোমুখম্ ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে", অর্থাৎ অন্য

দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ঐকান্তিক ভক্তির সহিত সর্ব্বব্যাপী আমার ভজনা করেন—তাঁহাদিগকে আমি মৃত্যুর পরপারে লইয়া যাই। পক্ষান্তরে অব্যক্তের সাধকদের জন্য তাঁহার জারী হয় অর্ডার—এটি কর, সেটি কর, তবে আমাকে পাইবে। অব্যক্ত, কূটস্থ, অক্ষর এবং অনির্দ্দেশ্য-তত্ত্বের সাধকদিগকে সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সর্ব্বভূত-হিতে রত হইতে হয়, তবে তাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন। অব্যক্তের উপাসকদের প্রতি তৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভগবানের এই বিশেষ নির্দ্দেশ বা সর্ত্তের আরোপ রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ যাঁহাদের মতে জগৎই মিথ্যা, তাঁহাদের পক্ষে জগতের সব কিছুই অসত্য, সুতরাং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি জাগ্রত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কারণ সমবুদ্ধির ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি হার্দ্দ্য হওয়া প্রয়োজন এবং সে বুদ্ধি চিত্তের শ্রদ্ধা-সাপেক্ষ। সর্ব্বভূতের পারমার্থিক অস্তিত্বই যাঁহারা স্বীকার করেন না, পরন্তু সর্ব্বভূতের সম্বন্ধ হইতে নিজেদিগকে বিযুক্ত রাখার জন্যই যাঁহারা তৎপর, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে তাঁহাদের চিত্তের উদ্দীপ্তি বা আন্তরিকতার উদ্রেক হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ব্যবহারিক সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই হিত-সাধনের প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের উক্তি হইতে মনে হয় অব্যক্ত-সাধকেরা যেন তাঁহার কতই পর। তবু তাঁহাদের প্রতি তিনি কৃপা-পরায়ণ। তিনি পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগকেও নিজের প্রেম-মাধুর্য্যের চাতুর্য্যে আকর্ষণ করেন। তাঁহাদিগকে দিয়া ঘরের কাজটি করাইয়া লইতে চান। কারণ সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি গেলে ভগবানের প্রতি প্রিয়বোধ তাঁহাদের অন্তরে পরিস্ফূর্ত্ত হইতে পারে। সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সর্ব্বভূতের হিতে রত হইলে ব্যক্তভাবে সর্ব্বাত্মস্বরূপে ভগবানকে পাইবার পথটি তাঁহাদের পক্ষেও প্রশস্ত হয়। এইরূপে অব্যক্তের উপাসকগণ তাঁহাকে না চাহিলেও করুণাময় ভগবানের কৃপার জালে জড়াইয়া পড়িয়া তাঁহারা তাঁহাকে পান। কিন্তু ব্যক্ত-সাধনায় এত সব ঝঞ্ঝাট নাই। সে

সাধনা সুখময়, প্রাপ্তিময় এবং অসংশয়। ভগবৎ-কৃপার প্রত্যক্ষতার বলে আশ্রয়তত্ত্ব বা অবলম্বনটি উজ্জ্বল হইলেই সাধকের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সিদ্ধ হয়। কৃপার এই প্রত্যক্ষতামূলক প্রভাব তাঁহার লীলার শ্রবণ এবং অনুধ্যান-সূত্রে ব্যক্তভাবে কাজ করে। শ্রবণের পথে ভগবৎ-কৃপার সেই সংবেদনটি অন্তরে গ্রহণ করিলেই সর্ব্বভাবে আমাদের দৃষ্টিতে শ্রীভগবানের আত্মভাবে ব্যক্ত হইবার কাজ সুরু হয়।

'ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ বদান্য
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।'

(শ্রীচৈঃ চঃ—২।২২।৫১)।

গীতার ভগবদুক্তিতে জীবের সঙ্গে শ্রীভগবানের নিজ সম্বন্ধের এই অভিব্যক্তি বীর্য্যস্বরূপে রহিয়াছে এবং এই বীর্য্যই ভারতের সমগ্র অধ্যাত্ম-সাধনাকে বিধৃত রাখিয়াছে। এই ভগবদুক্তির আলোকে সত্য ধর্ম্ম জগতে নিত্যদীপ্ত রহিয়াছে।

জ্ঞান ও ধ্যান

অব্যক্ত-তত্ত্বের উপাসনা দেহীদের পক্ষে ক্লেশকর। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান জীবের পক্ষে সেই সাধনার অনুপযোগিতা স্পষ্ট ভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যক্তভাব অর্থাৎ তাঁহার মূর্ত্ত চিন্ময়বিগ্রহের উপাসনাই জীবের পক্ষে উপযোগী—এই সত্যটি গীতায় সমগ্র দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। কিন্তু এই অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১২শ শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশে বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতের বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বোক্ত চারটি শ্লোকের অভিপ্রায় হইতে পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়াছে অনেকে এইরূপ মনে করেন। অশক্ত জীবের পক্ষে ভগবদুপাসনার সুগম পথের ক্রম নির্দ্দেশ করা ৯ম হইতে ১১শ শ্লোকের অভিপ্রায়, কিন্তু ১২শ শ্লোকের তাৎপর্য্য তদ্বিপরীত বলিয়া মনে হয়। অভ্যাসযোগে যাঁহারা অশক্ত তেমন ব্যক্তিদের জন্য সাধন-ক্রমের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভগবান যেন ১২শ শ্লোকে তাঁহার উপদেশের মোড় ঘুরাইয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অভ্যাসের অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে পারিলেই পরম শান্তি লাভ হয়। ধারাটি বুঝিতে গোল ঘটে না। কিন্তু ১২শ শ্লোকে আসিয়া ভগবান্ ৯ম হইতে ১১শ শ্লোকের উপদেশের গুরুত্বকে আপাতদৃষ্টিতে যেন গৌণ করিয়া ফেলিলেন। অভ্যাসের অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু অভ্যাসে যে অশক্ত—ধ্যানের ফলে যে বস্তু লভ্য, সে তাহা কি করিয়া লাভ করিতে পারে? অথচ সে সেই বস্তু লাভ করিবে অর্থাৎ কর্ম্মফল-ত্যাগে অধিকারী হইবে, অধিকন্তু সেই অধিকার লাভ করা তাহার পক্ষে অভ্যাসের চেয়ে, জ্ঞানের চেয়ে, এমন কি ধ্যানের চেয়েও সহজ হইবে এই যে যুক্তি, ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা আমাদের

পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক্ষেত্রে তাঁহার লীলা-বিগ্রহের চাতুর্য্যই তাঁহার উপদেশের পথে উন্মেষ করিয়াছেন। এইভাবে লীলার সর্ব্বচিত্তাকর্ষী আকর্ষণের উদ্দীপনায় জীবকে আপন করিয়া লইবার আগ্রহটি তিনি অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবের নিকট উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, যেমন ভাবে পার মনটি তোমার আমাকে দাও— 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'। কৌশলটির প্রয়োগ পূর্ব্ব হইতেই সুরু হইয়াছিল, ইহা আমরা গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়েই দেখিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপে তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০, চতুর্থ অধ্যায়ের ৯, পঞ্চম অধ্যায়ের ২৯, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০, সপ্তম অধ্যায়ের ৩০, অষ্টম অধ্যায়ের ১৪, নবম অধ্যায়ের ২২ এবং ৩৪, দশম অধ্যায়ের ৩, একাদশ অধ্যায়ের ৫৫ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সমস্যাটি ছিল ভগবদাজ্ঞা প্রতিপালনে চিত্তের আনুকূল্যে লাভের। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে প্রয়াগ-ধামে উপদেশ করেন—

"অন্য-বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।"

দ্বাদশ অধ্যায়ের ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য তদনুরূপ। কর্ম্ম বলিতে প্রভু এক্ষেত্রে যম-নিয়মাদি অভ্যাস এবং স্বর্গাদিপ্রাপক সাধনা বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান বলিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানই এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট। এ পথ জীবের পক্ষে সুগম নহে; পরন্তু কৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য্য জীবকে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার স্বরূপধর্ম্মে আকৃষ্ট করে, সুতরাং তাহা সুগম। ৮ম শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি আমার গুণানুভবেই মগ্ন থাকিবে। এখানে শ্রীভগবান তাঁহার গুণানুশীলনে জীবকে স্বভাবোচিত আনুকূল্যের পথটি ধরাইয়া দিলেন। তাঁহার মূর্ত্তলীলা পুরুষোত্তমস্বরূপ শ্রীবিগ্রহের প্রতিই তিনি অর্জ্জুনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহের আশ্রয়ে জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ লাভ করা অত্যন্ত সুলভ এবং তিনি যে স্বয়ং সেক্ষেত্রে অচিরে জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া লন—৭ম শ্লোকে

এবংবিধ আশ্বাস তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ৮ম শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্ব শ্লোকেরই অনুগত। ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের স্তবে এই ভগবদ্ভক্তিই প্রতি-ধ্বনিত হইয়াছে। ব্রহ্মা দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব উপলক্ষে তাঁহার বন্দনা করিয়া বলেন, হে কমললোচন, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিগণ ধ্যান-যোগে সম্পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি আপনাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া গুরূপদিষ্ট-পথে আপনার পদরূপ তরণীর সাহায্যে সংসার-সাগরকে গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া থাকেন অর্থাৎ সংসারে থাকিয়াও আপনার কৃপায় তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই বন্দনায় ব্রহ্মা শ্রীভগবানের চিন্ময় বিগ্রহকে—'শ্রেয়ঃ-উপায়নং বপু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়সম্মত ভাগবতের সিদ্ধান্ত-প্রদীপ টীকায় বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রে ভগবৎ-বিগ্রহের সর্ব্ববিধধর্ম্মফল-প্রদাতৃত্ব এবং সর্ব্বাশ্রয়-প্রপূর্ত্তি-সামর্থ্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ ভগবদ্ভক্তির ক্রম-পারম্পর্য্যে লীলা-মাধুর্য্যের এইরূপ তাৎপর্য্যেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়াভিনিবেশ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া পুনঃপুনঃ নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে একাগ্রতা সাধনের চেষ্টাকেই অভ্যাস বলা হয়। চিত্তকে এইভাবে সংযত করিবার প্রশ্ন পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জ্জুন ভগবানের নিকট এই নিবেদন করিয়াছিলেন যে, মনকে নিগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তুমি মনকে বশীভূত কর। "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেরও এই নির্দ্দেশ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগের সাধন কঠোর এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য। সুতরাং অভ্যাসযোগরূপ এই পন্থা অবলম্বন করা সকলের পক্ষে সহজও নয়। শ্রীভগবান অর্জ্জুনের মনোগত ভাবটি উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার প্রশ্নের সুসমীচীন উত্তর দানের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগটি লাভ হইল দ্বাদশ অধ্যায়ে

তিনি এই অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে তাঁহার প্রতি চিত্ত যুক্ত করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি তুমি এইরূপ অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার জন্য কর্ম্ম করিতে থাক। আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু কর্ম্ম করিতে করিতে পরোক্ষভাবে আমাকে স্মরণের সূত্রে আমার বীর্য্য তোমার অন্তরে পরিস্ফুর্ত্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করাও কঠিন এবং সেক্ষেত্রে কর্ম্মফল বন্ধনের কারণ সৃষ্টি করিতে পারে। সে অবস্থায় উপায় কি ? শ্রীভগবান্ এইরূপ কর্ম্মে অশক্তের পক্ষে 'যতাত্মবান্' হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। সকলের আত্মাস্বরূপ ভগবানের কৃপার প্রতি চিত্তকে উন্মুক্ত রাখাই এখানে 'যতাত্মবান্' অবস্থা-স্বরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি। "আততত্ত্বাচ্চমাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" (ভাঃ ১১।২।৩৪)। "সর্ব্ব কর্ম্মফল-ত্যাগ স্ততঃ কুরু যতাত্মবান্" গীতার এই নির্দ্দেশে শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলা-বিগ্রহের মাধুর্য্যের শক্তিই আমাদের দৃষ্টিতে খুলিয়া ধরিয়াছেন। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের রসে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইলে কর্ম্মফলে অনাসক্তি সহজভাবেই লাভ হইবে ইহাই ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য। যতাত্মবান্ শব্দটির অর্থ এক্ষেত্রে আত্মারাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের নিকট ভাগবতের 'আত্মারামাশ্চ মুনয়োঃ' এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই তত্ত্বটি বিস্তার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মাদি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত যত জীব মায়িক দেহকে অবলম্বন করিয়া 'আমি' 'আমার' এই রূপ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে, কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইলে তাহারা সকলেই তাহাদের স্বভাবগত কৃষ্ণদাস অভিমানে উদ্দীপ্ত হয় এবং গুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সব জীব কৃষ্ণ-ভজন করে। কিন্তু গীতায় বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ ভগবদুক্তির এই সহজ অর্থটি গ্রহণ করেন নাই। আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন, ব্যক্তভাবে এইরূপ শ্রীভগবানের গুণানুসন্ধান দ্বারা তাঁহার জন্য কর্ম্ম করিতে যদি কেহ অশক্ত হয়, তাহাকে শ্রীভগবান্ আত্মস্বরূপ

অনুসন্ধানরূপ অক্ষর-যোগ অবলম্বনের নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যের এই উক্তির যৌক্তিকতা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ অক্ষরযোগের সাধনা দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট সাধকের পক্ষে সমধিক ক্লেশকরই হইয়া থাকে। দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্যদেব নিজেই দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তৎকৃত গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন—'আত্মপ্রাপ্তিসাধনভূতাৎ আত্মোপাসনাৎ ভক্তিরূপস্য ভগবদুপাসনস্য স্বসাধ্য-নিষ্পাদনে শৈঘ্র্যাৎ সুখোপাদানত্বাৎ চ শ্রেষ্ঠ্যম্' অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উদ্দীপক অক্ষর উপাসনা অপেক্ষা ভগবৎ ভক্তিরূপ উপাসনার দ্বারা নিজ উপাস্য বস্তু শীঘ্র লাভ করা যায় এবং এই উপাসনা সুখকর বলিয়া শ্রেষ্ঠতর। তাঁহার এই উক্তির সহিত অশক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অক্ষরযোগ অবলম্বনাত্মক উপদেশের সর্ব্বাপেক্ষা সুগমতা সম্বন্ধে সঙ্গতি কিরূপে সাধিত হইবে? ফলতঃ অশক্ত সাধকদের পক্ষে সুগম পন্থা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দুর্গমের সাধনায় জীবকে অনুপ্রবৃত্ত করা ভগবানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সাধনের উপায় অনুসন্ধান না করিয়াও যাঁহারা পরোক্ষভাবে শ্রবণাদি সূত্রে তাঁহার মূর্ত্ত-শ্রীবিগ্রহের অল্পমাত্র সম্বন্ধও লাভ করেন, সেইরূপ সাধকদের অন্তরে অচিরে ভগবৎ-ভাবের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, এমন ভক্তগণ 'যতাত্ম' হন। এই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই দ্বাদশ অধ্যায়ের ১০ম হইতে ১২শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবদুক্তির সামঞ্জস্য সাধিত হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তৎকৃত ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন, "দুরূহাদ্ভুত-বীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে" অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণভক্ত, নাম এবং মথুরা-মণ্ডল এই পাঁচ প্রকার সাধনাঙ্গ দুরূহ অথচ অদ্ভুত বীর্য্যশালী তাহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, যে কোন একটির সহিত অল্পমাত্র সম্বন্ধ যুক্ত হইলেও চিত্তের বিশুদ্ধি সাধিত হয় এবং এইরূপ বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের অন্তঃকরণে অচিরে ভগবৎ-ভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে। ফলতঃ এইরূপ সাধনাঙ্গের

সহিত সম্বন্ধের ফলে সাধকের চিত্তে কৃত্যবোধ সাক্ষাৎভাবে না জাগিয়া কৃত্যের প্রবর্ত্তক-স্বরূপে ভগবৎ-কৃপাই কাজ করে। এইরূপে সাধকের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার কর্ম্ম স্বযত্ন-প্রয়াসের ভাব হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের শরণাগতির পথে উন্মুখতা প্রাপ্ত হয়। আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের দ্বারা তাঁহারা 'যত' অর্থাৎ তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং এইরূপে তাঁহারা যতাত্মবান্ অবস্থা লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—

'সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন
আপনার বলে করে সর্ব্ব বিস্মরণ।
ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণ-কৃপায় বান্ধে।
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত বিচার
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্যের সার।

* * *

যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ।
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ।'

অর্থাৎ কৃষ্ণ-মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের নিজের শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর সমস্ত বিস্মৃত করায়। 'আমি, আমার' বোধ দূর করে। শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্ত-বিচার প্রভৃতির কথা কিছুই মনে থাকে না। কৃষ্ণের স্বাভাবিক গুণে জীবের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যে কোনো ভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করিলে জীবের চারিবিধ পাপ অর্থাৎ পাতক, উপপাতক, অতিপাতক এবং মহাপাতক কিংবা 'অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং' অর্থাৎ অপ্রারব্ধ-ফল, কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ এই পাপ চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ফলোন্মুখ শব্দের অর্থ বাসনাময় অর্থাৎ প্রারব্ধের উন্মুখ (কারণ), কূট শব্দে বীজোন্মুখ অর্থাৎ বীজের

কারণ। প্রারব্ধ ফল যাহাতে কোনও ফল অর্থাৎ কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই ইহারই নাম অপ্রারব্ধ পাপ। ইহার পরে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য কর্ম্মফলজনিত অবিদ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণে বহির্ম্মুখতামূলক অজ্ঞানতা নাশ করিয়া জীবের চিত্তে প্রেমকে প্রকাশ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে আমরা আরও শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি—'সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ স্ততঃ কুরু যতাত্মবান্' গীতোক্ত এই ভগবন্নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য, তাহার সৌকর্য্য, সৌলভ্য এবং মাধুর্য্য। প্রভু বলিয়াছেন—

'আত্মা শব্দে স্বভাব কহে, তাতে সেই রমে
আত্মারাম জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে।
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান
দেহে আত্মা জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান।
কৃষ্ণকৃপাদি হেতু হৈতে হয় স্বভাব উদয়
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়।
সেই জীব সনকাদি সব মুনিজন
নিগ্রর্ন্থ, মূর্খ, নীচ, স্থাবর-পশুগণ।
কৃষ্ণ-কৃপাদি-হেতু হৈতে স্বভাব-উদয়
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়।
দেহারাম সর্ব্বকাম সবে আত্মারাম
কৃষ্ণ-কৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ে সব কাম। (চৈঃ চঃ)

ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তবে "সত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ বিজ্ঞানমজ্ঞান-ভিদাপমার্জ্জনম্ গুণ-প্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ" ইত্যাদি উক্তিতে এই সত্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীধর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "হে ধাতঃ ইদং নিজং তব বপু র্ন ভবেৎ তর্হি বিজ্ঞানং বিশিষ্টরূপং অপরোক্ষং জ্ঞানং ন ভবেত্যনুষঙ্গঃ। কথম্ভূত? অজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্ নিবর্ত্তকম্" অর্থাৎ নিজভাবপূর্ণ লীলাবিগ্রহ মূর্ত্তি যদি আপনার না থাকিত, তবে ভেদজ্ঞানরূপ

অজ্ঞানতা দূর করিয়া প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানসম্মত আপনার ভাবটি উপলব্ধি করা জীবের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। প্রকৃত-প্রস্তাবে এইরূপ ব্যক্তভাবে লীলাবিগ্রহের সম্বন্ধ-সূত্রে আসক্তি-শূন্য সুনির্ম্মল চিত্তে জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি যোগাঙ্গও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট সাধকের কর্ম্মফল-ত্যাগরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় এবং সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদনে পরাভক্তির উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি করেন। এইরূপ অবস্থায় সাধকের চিত্তে ফল কামনা থাকে না এবং অদ্বেষ প্রভৃতি গুণরাজী তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীভগবান্ দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোক হইতে উক্ত অধ্যায়ের উপসংহারে এইভাবে তাঁহার প্রতি যুক্তবৈরাগ্যসম্পন্ন তাঁহার ভক্তগণকেই তাঁহার অতীব প্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"আপন মাধুর্য্য কৃষ্ণ না পারে বুঝিতে,
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে"

গীতার দ্বিতীয় বা মধ্যম ষট্‌কে এইভাবে ভক্তিযোগের পরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে, স্বকর্ম করিলেও রৌরবে পড়ি মজে।" আমরা দেখিয়াছি পূর্বাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাকে আশ্রয় করিয়া উপাসনাকেই ভক্তিযোগ স্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে অব্যক্ত বা অক্ষরতত্ত্বের সাধনা কালের দ্বারা অপেক্ষিত থাকে অর্থাৎ সে পথে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে কালাতীত নিত্য ভগবৎ-তত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না—"ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্" এই ভগবদুক্তিই সে পক্ষে প্রমাণ। চির বলিতে কালের ব্যবধান বুঝায়। ভগবানের রূপ, গুণের ব্যক্ত মাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্ত ভক্তগণকে এই চিরের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন, "কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম সদ্য সত্ত রসধাম।" প্রকৃত পক্ষে আনুকূল্য এবং আভিমুখ্যের পথে ভগবৎতত্ত্বের এইরূপ অনুশীলনই শাস্ত্রে উত্তমা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং এমন ভক্তির পথেই শ্রীভগবানের পূর্ণতম-তত্ত্ব অধিগত হওয়া যায়। তিনি নিজে যাহাকে বরণ করেন তাঁহার পক্ষে তিনি লভ্য হন, শ্রুতির এই নির্দ্দেশ। শ্রুতি বলেন "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেবৈনং নয়তি।" বস্তুতঃ অনুমান-প্রমাণের প্রতিপাদ্য অনির্দ্দেশ্য সাধ্যতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া ভক্তির সাধন চলে না। শ্রীভগবানের সহিত প্রিয়ত্ব সম্বন্ধেই ভক্তি উদ্দীপিত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন, যিনি যেভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন, তিনিও সেইভাবে 'তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' ভজনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেও ইহাই সমর্থিত হয়। প্রভু বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়' কিন্তু 'যাঁর যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম'। প্রিয়তম আত্মদেবতাস্বরূপে যিনি ভগবানের সাধনা করেন, ভগবানও প্রিয়তমস্বরূপে তাঁহাকে আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁহার এমন ভক্তের কাছে মধুর হইতে মধুর, অতি সুমধুর। তিনি তাঁহাদের কাছে রূপময়, রসময় ; তিনি আনন্দময়, প্রেমময়। আত্মস্বরূপে

শ্রীভগবানের এই সাধনতত্ত্ব বিচারসাপেক্ষ নয়। এ পথে জীবের চিত্ত প্রত্যক্ষ রসানুভূতিতে স্বাভাবিক ভাবে ভগবানের প্রতি প্রাণ-ঢালা ভালবাসায় পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে। ভগবৎ-মাধুর্য্যে উৎসারিত অন্তর-রসের সুখোচ্ছ্বাসের সেই বিলাসে সাধকের দেহাত্ম-বুদ্ধি সম্পর্কিত সকল সঙ্কীর্ণতা বিদ্রাবিত হয়। তাঁহার কামনা-বাসনার সকল গ্রন্থি কাটিয়া কাটিয়া ছুটিয়া টুটিয়া যায়। ফলতঃ যে সাধনার মূলে প্রীতি নাই, সেইরূপ নীরস এবং কর্কশপথে সর্ব্ববিষয় সম্বন্ধে নির্লিপ্ত অনাসক্তির ভাব চিত্তে উদ্রিক্ত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, ভগবান্ সমগ্রভাবে বেদ বিচার করিয়া যাহাতে তাঁহার প্রতি প্রীতির উদয় হয় সেই প্রেমভক্তিকে মনীষার দ্বারা নিশ্চিত করিয়াছেন। তিন বার বিচার করা বলিতে এ ক্ষেত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন পথের বিচারকেই বলা হইয়াছে। ফলতঃ স্বল্প সুখে প্রমত্ত থাকা আমাদের স্বভাব। আমাদের মন যদি সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ভূমার রস-সংশ্লেষে তৎপরত্ব প্রাপ্ত না হয়, তবে অন্য কামনা সকল চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। ইহার ফলে অন্তরে ভগবৎ-মাধুর্য্য খোলে না, খেলে না। সে অবস্থায় সাধন-ভজনের মূলে আমাদের সযত্নকৃত আয়াসটি আমাদিগকে সংক্লিষ্ট করে। বস্তুতঃ তেমন সাধন-ভজন নিতান্ত প্রাণহীন এবং নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে সাধন-ভজনের পথে নিত্য সত্য ভগবৎ-স্বরূপটিতে চিত্ত যতই তদ্গত হয়, সাধনা ততই সজীব এবং প্রত্যক্ষতার পরম বলে প্রাণময় হইয়া উঠে এবং সাধনা যতই প্রাণময় হয়, ততই চিত্ত আমাদের শ্রীভগবানের সংবেদন সম্বন্ধে ছন্দায়িত হইয়া তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বহীন অব্যবহিত একত্ব বোধে ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। এইরূপে সাধন-ভক্তির অভ্যাস হইতে জন্মে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে অনাসক্তি এবং অনাসক্তি হইতে চিত্তে প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্ব্বিশেষ বা অব্যক্ত বা অক্ষর-ব্রহ্মের সাধনার অপেক্ষা শ্রীভগবান্ গীতায় সর্ব্বাশ্রয়-

স্বরূপে তাঁহাকে স্বীকৃতির পথে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষ বা অব্যক্তের সাধনাকে গীতায় জীবের পক্ষে ক্লেশকর বলিয়া অভিহিত করিয়া করুণাময় ভগবান জীবের পক্ষে ক্লেশকর এই যে পথ সুস্পষ্টভাবেই ইহার অনুমোদন করেন নাই। অন্য কথায় ঐ পথ তিনি পরিত্যাগ করিতেই জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেন—'উক্তান্ বহুবিধ-স্বভক্ত-নিষ্ঠান্ ধর্ম্মানুপসংহরণ-কাৎর্স্ন্যেনৈতল্লিপ্সূনাং তচ্ছ্রবণ-পঠন-বিচারণাদি-ফলমাহ যে ত্বিতি। ভিন্নোপক্রমে উক্তলক্ষণা ভক্তা একৈক-স্বস্বভাবনিষ্ঠাঃ এতে তু তত্তৎসর্ব্ব-সল্লক্ষণেপসবঃ সাধকা অপি তেভ্যঃ সিদ্ধিভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠা অতএব অতীবেতি পদম্' অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ভক্তের বিভিন্ন গুণ লক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়া তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহার প্রিয় এই কথা বলিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রতি যাঁহারা মন, বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন তাঁহারাই যে তাঁহার অতীব প্রিয় ইহাই নির্দ্দেশ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৪শ হইতে ১৯শ শ্লোকে ভগবান্ ভক্তের যে সব গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই গুলি সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে, ভগবানের বক্তব্য ইহা নয়, কারণ সে পথের দুরূহতা সুস্পষ্ট। প্রত্যুত যিনি শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-গুণে আকৃষ্ট হইয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের পথে তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিপরায়ণ হন এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন করেন, তিনি বিভিন্ন গুণ-লক্ষণবিশিষ্ট ভগবানের প্রিয় ভক্তগণের প্রত্যেকের অপেক্ষাও তাঁহার অতীব প্রিয়, ইহাই ভগবদ্ভক্তির তাৎপর্য্য। অভ্যাসের অপেক্ষা, জ্ঞানের অপেক্ষা, ধ্যানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুটি যে সর্ব্ব কর্ম্ম-ফলত্যাগ তাহা এমন ভক্তের স্বযত্নকৃত-প্রয়াস ব্যতিরেকেই আপনা হইতে লভ্য হয় ইহাই উপসংহারে শ্রীভগবানের বক্তব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন

'সৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা-জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি।' (ভাঃ-১১।২০।৩২)।

অর্থাৎ কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান্ বৈরাগ্য, যোগ, দান এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃ-প্রাপক সাধনার পথে যাহা যাহা লভ্য আমার ভক্তগণ ভক্তিযোগের দ্বারা তৎসমস্ত অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন। স্বর্গ, অপবর্গ কিংবা আমার ধাম যাহা কিছু তাঁহারা বাঞ্ছা করেন, তাহাই তাঁহারা পাইতে পারেন।

পক্ষান্তরে জীব স্বীয় চেষ্টায় অর্জ্জিত কোন গুণের দ্বারাই ভগবানে ভক্তি লাভ করিতে পারে না। কারণ, ভক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তি এবং ভগবানের নিকট হইতেই সে বস্তু লাভ করিতে হয়। ভাগবত বলেন—

'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।' (ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবানে যাঁহার ফলানুসন্ধানরহিত ভক্তি জন্মিয়াছে তাঁহাতে সকল দেবগণ বাস করেন। তিনি সর্ব্বগুণের আধার। আর যে জন ভগবদ্ভক্তিবিহীন তাহার মহদ্গুণ কোথায়? তাঁহার মন সর্ব্বদা বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়।

ভগবদ্ভক্তের গুণ প্রাকৃত গুণ নহে, তাহা অপ্রাকৃত এবং অসংখ্যেয়। মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিয়াছেন—

"গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্যসূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতি।" (ভাঃ-৭।৪।৩৬)

দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়ত্বের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য প্রকট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যে সব উপাসক ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি কিছুই কামনা করেন না, ভগবানকে প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা তাঁহার প্রীতিরসে নিত্য যুক্ত থাকিয়া তাঁহাকেই চাহেন,

তাঁহার সেবাই যাঁহারা সার বুঝিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার মাধুর্য্যে মজিয়াছেন, ভগবৎ-বিস্মৃতি তাঁহাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া দাঁড়ায়। সর্ব্বসম্বন্ধে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষানুভূতিজনিত আনন্দের চিন্ময় রসে তাঁহারা মগ্ন থাকিতেই উৎকণ্ঠাশীল, আকুল। তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শন এবং সংযতেন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মনিষ্ঠ সাধকগণের গুণ বা অধিকার লাভ না করিলেও এবং অন্যহিসাবে তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি থাকিলেও শুধু ভগবৎ-কৃপাকে সর্ব্বভাবে আশ্রয় করার ফলেই তাঁহারা ভগবানের প্রিয়। শুধু প্রিয় নহেন, তাঁহারা তাঁহার অতীব প্রিয় হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীপাদকে শিক্ষা-দানকালে বলিয়াছেন—

'ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়
সাধন করিলে প্রেম নাহি উপজয়।'

'ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি-সুখস্যাত্র
কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।' (চৈঃ চঃ)

প্রভু বলিয়াছেন "কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন, কৃষ্ণপ্রেমসেবা পূর্ণানন্দ-প্রবীণ।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখেও ভক্ত-মাহাত্ম্য অনুরূপ ছন্দে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবতে শ্রীভগবানের স্বরূপ-মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিতে গিয়া প্রহ্লাদ বলিয়াছেন "নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং-নিজলাভ-পূর্ণঃ"—ভক্ত তাঁহার নিজজন। এই নিজ বস্তু লাভ করিলেই ভগবান্ তাঁহার স্বরূপধর্ম্মের পরিপূর্ত্তি অনুভব করেন। শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় ভক্তের সম্বন্ধজনিত অনুভূতিই পরাভক্তির প্রাণস্বরূপ। এমন ভক্তের প্রগাঢ় সম্বন্ধ লাভে ভগবানের অত্যুগ্র আগ্রহজনিত দুর্ব্বলতার বশে ভগবান্ জীবের কাছে ধরা পড়িয়া যান। তিনি ভক্তের মাধুর্য্য-আস্বাদনের লালসায় মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসেন এবং এই ভাবে নামিয়া আসাতেই জীবের পক্ষে তাঁহার পরম প্র[illegible]রূপ প্রেম লাভ

হইয়া থাকে। ভগবানের যাঁহারা প্রিয় তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা তাঁহার অতীব প্রিয় তাঁহারা জগৎ-বরেণ্য। তাঁহাদের সর্ব্বত্র জয়। আর জয় সেই ভগবানের যিনি এমন ভক্ত-প্রিয়, ভক্তের প্রেমের জন্য যিনি এমন পাগল।

তৃতীয় ষটক

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ

১। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো র্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

২। অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

৩। সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

৪। যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে ভগবান্ পর পর আটটি শ্লোকে তাঁহার ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং অনন্যগতি এমন যাঁহারা তাঁহার ভক্ত তাঁহাদিগকে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই উক্তি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এমন ভক্তের সাধ্য ও সাধন-তত্ত্বের দার্শনিক ধারাটি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ক্ষর বা জড়া প্রকৃতি এবং পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা এই দুইয়ের সংযোগে জগৎরূপ-প্রপঞ্চের উদ্ভব এবং ইহার মূল কারণস্বরূপে ঈশ্বরতত্ত্বের বিস্তার এবং বিশ্লেষণ করা এজন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রশ্নটি উত্থাপন করা হইয়াছে যথারীতি অর্জ্জুনেরই মুখ দিয়া। অর্জ্জুন প্রকৃতি-পুরুষ যথাক্রমে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান-জ্ঞেয় এই তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কারণ তাহা না হইলে সাধ্যবস্তু বিনিশ্চিত হয় না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই সমস্যার সৃষ্টি করিলেন। তিনি বলিলেন—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" অর্থাৎ অর্জ্জুন তুমি আমাকেই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিদিত হও। এই যে 'আমি', যে 'আমি'কে ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে বিদিত হইবার জন্য ভগবানের নির্দ্দেশ, সেই 'আমি'র স্বরূপ কি? স্বরূপের রূপটি তিনি এ পর্য্যন্ত অনেক ভাবেই বিশেষতঃ একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপে, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপে কৃপার পরম প্রভাবে একান্ত এবং অভ্রান্ত ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু—

'দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।' (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণরূপে স্বয়ং ভগবানকে অজ্ঞানান্ধ জীব স্বীকার করিতে পারে না,

তাঁহার শ্রীবিগ্রহকে উপেক্ষা করে। ব্রহ্মা ভগবানের বন্দনা করিতে গিয়া জীবের এই দুর্দ্দশার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ
আত্মা পুনর্ব্বহির্ম্মৃগ্য অহোঽজ্ঞ-জনতাজ্ঞতা।'

(ভাঃ-১০ ১৪।২৭)

অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মায়িক প্রাকৃত দেহ মনে করে এবং দেহাত্মবুদ্ধিপ্রভাবে অনাত্মবস্তুকে পরমাত্মা মনে করে। তাহারা ভগবৎ-স্বরূপ স্বীকার না করিয়া অন্যত্র আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে তৎপর হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থ কহে ভগবান
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান।
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার।
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার।' (চৈঃ চঃ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জীবের এই অজ্ঞতার নিরসন করিয়া জীবের দৃষ্টিতে স্বীয় স্বরূপ উন্মুক্ত করা হইয়াছে এবং এই ভাবে পরাভক্তির পথে জীবের স্বরূপানুবন্ধী জ্ঞেয়তত্ত্বটি শ্রীভগবান প্রমূর্ত্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিগ্রহকে আশ্রয় করিয়াই ভগবৎ-সেবার পথে পরাভক্তি জীবের চিত্তে চিদানন্দরসে উচ্ছ্বসিত এবং বিলসিত হইয়া থাকে। ভক্তিযোগের সাধন-তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।' (গোপালতাপনী—১৮) অর্থাৎ বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-রসস্বরূপে ভক্তিযোগে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। সত্য এই যে, লীলাটি শ্রীবিগ্রহে মূর্ত্ত হওয়া চাই; নহিলে ভক্তির পরম-পুরুষার্থ সাধন-সামর্থ্যের বিকাশ সাধিত হয় না। ঘন শব্দের দ্বারা গোপালতাপনীর উল্লিখিত মন্ত্রে এই অর্থই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তসূত্রের (১।৩।১৩) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'ঘনা মূর্ত্তিঃ' অর্থাৎ ঘন অর্থে মূর্ত্তি বুঝায়। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের ভজনে পরাভক্তির পরিপূর্ত্তি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞেয়তত্ত্বে ইহাই প্রতিপাদ্য। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মায়াবাদী বেদান্তের সিদ্ধান্ত আলোচ্য হইয়া পড়ে। উক্ত বেদান্তের আচার্য্যগণ 'আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে' এই ভগবদুক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, জীবই অবিদ্যায় আচ্ছন্ন অবস্থার জন্য নিজকে ভিন্ন বস্তু মনে করে, নতুবা সে ব্রহ্ম। ঈশ্বর স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞ। তিনিই সংসার বা দেহসম্বন্ধজনিত প্রভাবে শরীরী জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞের মত হইয়া যান। বস্তুতঃ জীবই ঈশ্বর। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞে এই অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা আরোপিত হয়। তাঁহারা আরও বলেন, আরোপিত এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞই যে ঈশ্বর এই জ্ঞান সুস্পষ্ট করাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন, ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত ক্ষেত্র-সহযোগে যে একটা ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়,তাহার নিরসন করাই ভগবদুক্তির প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদীগণের এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি বা স্মৃতির দ্বারা কোন ক্ষেত্রেই সমর্থিত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহার চরণে আনুগত্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মায়াবাদী বেদান্তের পরিপোষক ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলেন—

'সৎ চিৎ আনন্দময় ঈশ্বরস্বরূপ
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস।

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ
হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহ ত অভেদ।
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে।' (চৈঃ চঃ)

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী জীব এবং ব্রহ্মের অভিন্নত্বমূলক মায়াবাদী সিদ্ধান্ত বহুভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি' মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত মন্ত্রটির অর্থ এই যে, দুইটি পক্ষী (পরমাত্মা ও জীব) একত্র সমানভাবে দেহরূপ একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। তন্মধ্যে একটি পক্ষী (জীব) কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্য পক্ষীটি (পরমাত্মা) ভোগ করেন না। তিনি কেবল উদাসীনভাবে চাহিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে ইহাই বলা হইল যে, সংসারী জীবের দেহের মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই বর্ত্তমান। জীব স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে। কিন্তু পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন নয়। কিন্তু মায়াবাদী বেদান্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠামূলক। এই মন্ত্রের মায়াবাদসম্মত ব্যাখ্যা এই যে দুইটি পাখীর মধ্যে ভোগ করে অন্তঃকরণ, ভোগ না করিয়া যিনি চাহিয়া থাকেন, সেই অপরটি জীব। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন, উক্ত মন্ত্রে স্বাদু পিপ্পল বা কর্ম্মফল যে ভোগ করে বলা হইয়াছে, সে চেতন বস্তুই হইবে। অন্তঃকরণ অচেতন বস্তু, তাহা কিছু ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং অন্তঃকরণ অর্থে জীব মনে করা অযৌক্তিক। আচার্য্য শঙ্কর মুণ্ডক শ্রুতির মায়াবাদমূলক যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়াছেন তাহার অযৌক্তিকতা সহজেই উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে। পরমাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না। তিনি উদাসীন ভাবে থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে পরমাত্মাকে গ্রহণ করিলে তিনি কর্ম্মফলের ভোগী হইয়া পড়েন। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত,

কারণ তাহা সর্ব্বশাস্ত্রের বিরোধী। ভগবান কর্ম্মফল ভোগ করেন, কোন শাস্ত্রেই এমন কথা পাওয়া যায় না। শ্রুতি বলেন, 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।' (শ্বেঃ-১।৯) অর্থাৎ জীব এবং ঈশ্বর উভয়ই অজ। কিন্তু একজন অজ (ঈশ্বর) জ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ), অপর জন অজ (জীব) অজ্ঞ (অল্পজ্ঞ)। একজন ঈশ অর্থাৎ ঈশ্বর, অপর জন অনীশ্বর। উক্ত শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে—'অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।' এক অজ (জীব) কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপর অজ (পরমাত্মা) ভুক্ত ভোগ ত্যাগ করেন।

"বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।" (বিষ্ণুপুরাণ-৬।৭।৬১)

ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তির নাম পরা। তাঁহার অপরা জীব শক্তি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জীব পরাশক্তির সমগুণ সম্পন্ন নহে। অবিদ্যা কর্ম্ম-সংজ্ঞা জড়াপ্রকৃতি তৃতীয়া শক্তি বুঝিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমৎপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট জীব এবং ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণকালে বলিয়াছেন—

"জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ।"

তাঁহার সিদ্ধান্ত—

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন,
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।"

শ্রুতিতেও জীবের এই স্বরূপই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি-ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।' (বৃহদারণ্যক-২।১।২০)

মায়াবাদীগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া প্রভু বলিয়াছেন—

"হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব,
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব।"

প্রভু বলেন, নশ্বর দেহে আত্মবুদ্ধিই জগৎ-মিথ্যা এই মতবাদের মূলে রহিয়াছে। সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে জীবের সহিত শ্রীভগবানের কারুণ্য-গুণাদিসূত্রে আত্মসম্বন্ধ অস্বীকার করিবার ফলেই এইরূপ ভ্রমের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদীদের এই যুক্তি অনুসারে ক্ষেত্র বা জড়াপ্রকৃতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সংযোগ যদি এমন মিথ্যা, অলীক বা স্বপ্নবৎ হয়, তবে জীব ব্রহ্ম হইলেও তাহার পক্ষে ঈশ্বর-প্রাপ্তি দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কারণ, মায়াবদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ অদ্বয়-বস্তু ব্রহ্মকে ক্ষেত্ররূপ জড়ের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার মত কেহ থাকে না। ফলতঃ পরিবর্ত্তনশীল জগতের সম্বন্ধে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীবের দৃষ্টিতে ভগবানের অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত স্বরূপটি উন্মুক্ত করাই সমগ্র গীতার অনুশাসন। কারণ এই সত্যের উপলব্ধিসূত্রেই আমরা মানুষ হিসাবে আমাদের জীবনের পূর্ণতা অনুভব করি এবং আমাদের নিঃস্বতা দূর হয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ-সূত্রে ভগবান বলিয়াছেন, এই শরীরই ক্ষেত্র। এ বিষয়ে বিভিন্ন আচার্য্যগণের মধ্যে মতের ভেদ নাই। শরীররূপ এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, এ কথাটা বুঝিতেও আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। আমরাও বলি, "মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোণা, মন, তুমি কৃষি কাজ না" ইত্যাদি। কৃষি কাজ জানি না, অথচ ক্ষেত্রের মালিকানাই আমাদের বড় অভিমান। এই অভিমান-বুদ্ধিতে আমরা মিথ্যা ক্ষেত্রজ্ঞ সাজিয়া বসিয়াছি। দেহে আত্মবুদ্ধিজনিত আমাদের বিপত্তি ইহাই। শ্রীভগবান্ আমাদের এই অভিমান ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। জীব ভগবানেরই কৃষি—মহাজনগণ ইহাই বলেন। গীতার দেবতাও বলিয়াছেন, ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপটি ভাল করিয়া জান। তিনি অংশী তুমি অংশ এইরূপে তদধীনত্ব উপলব্ধি

কর, তাদাত্ম্য ভাবটি তোমার মনের মূলে পাকা করিয়া লও। ফলতঃ নিজকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া মিথ্যা অভিমান তোমার যতদিন থাকিবে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তোমার আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন রহিবে; নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান তুমি সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিবে না। ক্ষেত্র বা দেহ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা তুমি তোমার স্বরূপত ভেদ রহিয়াছে। সেই ভেদ জ্ঞানটি তোমায় অসংশয়িত ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই পথেই তুমি তোমার জীবনের পরমাশ্রয়ত্বে ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপে ভগবানের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। প্রকৃতপক্ষে তোমার ক্ষেত্রজ্ঞ-অভিমানের অবলম্বনস্বরূপে রহিয়াছেন ভগবান। তাঁহাকে জানিলে তোমার সব জানা হইবে। সর্ব্বক্ষেত্রের অধিপতিস্বরূপে তাঁহাকে তোমার দেহটি নিবেদন করিয়া দিলে তোমার মানব-জমিন আর পতিত থাকিবে না। তাঁহার প্রেমে তোমার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিচয় আকৃষ্ট হইবে। ইহার ফলে ক্ষেত্রে আর অবিদ্যাজনিত আগাছা উৎপন্ন হইতে পারিবে না। হল এবং মুষল লইয়া ভগবানই তোমার চাষের কাজে লাগিয়া যাইবেন। হলের সাহায্যে তোমার অন্তঃপ্রকৃতিতে তাঁহার চাষের কাজ চলিবে, আর মুষলের দ্বারা বহিঃপ্রকৃতির অনাত্ম-প্রভাব হইতে তোমার মনকে তিনি মুক্ত রাখিবেন। ফলতঃ আমাদের দেহরূপ ক্ষেত্রের দ্রষ্টা ভগবানকেই গীতায় ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শুধু তাদাত্ম্য-অর্থে ভগবানের আয়ত্তাধীন-বৃত্তিত্ব, তদাধীনত্ব বা তদ্ব্যাপ্যত্ব-ভাবেই জীবের সম্বন্ধে গীতায় 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে সমভাবেই এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। মহাভারতে বেদব্যাসের মুখে আমরা এমন কথাই শুনিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন—

'ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ।
বাসুদেবাত্মকান্যাহ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।'

(মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব)।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৃতি, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ

এই সমস্তই বাসুদেবাত্মক। চরিতামৃত বলেন—

'ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে জীব-ব্রহ্ম জানি
জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম-ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি।'

প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের দেহের কতটুকু আমরা জানি? আমাদের পক্ষে সবই তো আঁধার। কর্তৃত্ব নাই অথচ স্বত্বের দাবী—আমাদের এই বিচার বড়ই চমৎকার। মিথ্যা আমাদের এই অহঙ্কার। ভাগবতে মহারাজ পৃথুর নিকট ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহামুনি সনৎকুমার বলিয়াছেন—হে নরেন্দ্র, স্থাবর-জঙ্গম, দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি সর্ব্বত্র শ্রীভগবান অবস্থান করিতেছেন। অনাত্মবোধে বিভ্রান্তিবশতঃ আমাদের চিত্তে অহঙ্কারের উদ্ভব ঘটে। তাঁহাকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু ভগবান্ করুণাময় তিনি ক্ষেত্রবিৎ-স্বরূপ জীবের হৃদয়ে তাঁহার সর্ব্বতোময় আত্মভাবের তাপ লইয়া প্রত্যক্ষভাবে জাগ্রত হইয়া থাকেন। এই তত্ত্বটি গীতাতেও নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; বুঝানো হইয়াছে যে, জীব ভগবানেরই আশ্রিত। ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে প্রশ্ন করিয়াছেন—উদ্ধব, তোমার দেহটি কাহাকে দিবে স্থির করিয়াছ, শ্মশানের অগ্নিকে, শৃগালকে, কুকুরকে না আমাকে? প্রকৃত-পক্ষে শ্রীভগবানের চরণে আমাদের দেহ, মন, প্রাণ, আমাদের সব কিছু নিবেদন করাতেই ক্ষেত্রবিৎ-স্বরূপে আমাদের অভিমানের সার্থকতা। বস্তুতঃ তাঁহাকে পাইলে তবে আমরা আমাদের পাকা 'আমি'কে পাই এবং তবেই জীবনের মূলে সর্ব্বাবস্থায় আমাদের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। জীবই ব্রহ্ম এই মতবাদের সমর্থনে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব তাহার জীবনের মূলে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে শ্রীভগবানের এই স্বসংবেদ্য প্রীতির প্রণোদন-লাভে বঞ্চিত থাকে। ফলে জীবের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং সমাজের সংস্থিতি ধ্বসিয়া পড়ে। অধিকন্তু 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'—এই ভগবদুক্তির যাথার্থ্য তাহাতে লঙ্ঘিত হয়। গীতার কোথায়ও মোক্ষের নামে এইরূপ ভগবৎ-তত্ত্ব-বিরোধী এবং

বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদের সমর্থন নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতা সর্ব্বভাবে ভগবানকে আমাদের জীবনে জীবন্ত এবং প্রমূর্ত্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে উপলব্ধি হইলে অনির্দ্দেশ্য, অক্ষর, নিগুর্ণ, ভগবৎ-সম্বন্ধে এইসব পারিভাষিক তত্ত্বকথার জটিলতা কাটাইয়া আমরা ভগবানকে অশেষরসে সবিশেষ, চিদাকারে সাকার, সর্ব্ববিধহেয়গুণবর্জ্জিত অনন্ত কল্যাণ-গুণে নিগুর্ণ-স্বরূপে পাই। অখণ্ডৈকরসামৃত-কলেবরে পরাবর-পরিব্যাপ্ত এবং দীপ্ত করিয়া তিনি আমাদের মনের মূলকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করেন। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহাকে উপলব্ধি করে এবং আমাদের পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় তদ্দ্বারা প্রভাবিত হয়। 'নৃদেহমাদ্যং'—আমাদের এই দেহ এইরূপে সর্ব্বভাবে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাবে দিব্যতা লাভ করে। আমাদের জীবনের সর্ব্বদ্বন্দ্বের তখন নিরসন হইয়া যায়। আমরা পরম আনন্দের কন্দস্বরূপে শ্রীগোবিন্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হই। 'নরতনু ভজনের মূল'—সামান্য নয় এই মানুষ। প্রেমের দেবতার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যে মানুষ আমরা আমাদের জীবন ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধে ছন্দায়িত হইতে পারে। ভগবানকে এমন নিজভাবে পাইবার বীজটি আমাদের মনের মূলে রহিয়াছে। সে অবস্থায় আমাদের জীবনে যৌবনের সমাগম ঘটে এবং আমাদের দেহ, মন, প্রাণ পরম দেবতার পায়ে পুষ্পার্ঘ্যের মত নিবেদন করিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়ি। প্রকৃতপক্ষে দেহাত্ম-বুদ্ধিগ্রস্ত আমাদের পক্ষে ভগবানের অস্তিত্ব অনুমান এবং প্রমাণ-সাপেক্ষ অর্থাৎ তর্কেরই বিষয় হইয়া থাকে। ইহাকে আস্তিক্য-বুদ্ধি বলা চলে না। ফলতঃ শ্রীভগবানে আস্তিক্য-বুদ্ধি তাঁহার সহিত সম্বন্ধের উপরই নির্ভর করে। গীতা বলেন, কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বের হেতুস্বরূপে প্রকৃতিই কাজ করিতেছে। অপরা প্রকৃতির এই প্রভাব প্রতিনিয়ত জীবের উপর পড়িতেছে। ভোক্তৃস্বরূপে জীবাত্মা পুরুষাভিমানে বিজড়িত রহিয়াছে—'কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'। কিন্তু এই অভিমান সত্য নহে। অপরা

বা জড়া প্রকৃতি এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি চিৎকণ জীব—এই উভয়ের নিয়ন্তা একজন রহিয়াছেন। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দ্বিবিধ ভাবের বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ ক্ষর এবং অক্ষর উভয় সূত্রে জীবের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা। তিনি জীবাত্মার আত্মা। সৎ এবং অসৎ তাঁহার এই দুই রূপ, সুতরাং তিনি সদসৎ সমস্ত। কূটস্থ অন্তর্য্যামী তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অংশ। জীব স্বরূপ-শক্তির অংশ নহে। অক্ষরতত্ত্বে অন্তর্য্যামি-স্বরূপে শ্রীভগবান্ জীবের সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকিয়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" এইরূপে জীবের প্রয়োজন মিটাইতেছেন। আবার ক্ষরভাবে বিশ্ব-প্রপঞ্চে অনিত্য বোধটি জাগ্রত রাখিয়া স্বরূপধর্ম্মে তিনি জীবকে উদ্বুদ্ধ রাখিতেছেন। ফলতঃ তিনি জীবের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা এবং মহেশ্বর এই হিসাবেই গীতায় তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে চিৎকণ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অচিৎরূপ ক্ষেত্র বা জড়া প্রকৃতি উভয়ই শ্রীভগবানের অংশ। অংশীকে আশ্রয় না করিলে অংশের সার্থকতা লাভ সম্ভব হয় না। শ্রুতিও ইহা বলেন —'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' (শ্বেঃ—৬।১৩)। এ সম্বন্ধে চরিতামৃতের উক্তি—

"প্রকৃতি চেতন নহে প্রকৃতি জড়রূপা,
শক্তি সঞ্চারিয়া কৃষ্ণ তারে করে কৃপা।"

সুতরাং পৌরুষধর্ম্ম একমাত্র ভগবানেই বর্ত্তমান। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পুরুষবিধ বলা হইয়াছে, স্থানে স্থানে পুরুষও বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কঠোপনিষদ, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিতেও ব্রহ্মকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রুতিও এক-বাক্যে বলিয়াছেন, পুরুষস্বরূপে তাঁহাকে পাইলে জীবের পরমার্থ সিদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ভাষ্যে পুরুষবিধ শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—'পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ' অর্থাৎ ব্রহ্ম পুরুষের ন্যায় মস্তক-হস্তাদি লক্ষণবিশিষ্ট। সুতরাং তাঁহাকে পাওয়ার অর্থ অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয়মুখে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বিকারের মধ্যে বিকারহীন

চিদাকারে সশক্তিক এবং সবিশেষভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করাই বুঝায়। সে অবস্থায় বিশ্বের সকল বৈপরীত্যে বা বিরুদ্ধভাবের মধ্যে অন্তর ও বাহিরে ব্যাপ্ত অদ্বয় এবং চিন্ময় ভগবানের আত্মমাধুর্য্যের অদীন মহিমার প্রজ্ঞানময় রস-সামর্থ্যে উজ্জীবিত সমন্বয়-সূত্রে তাঁহার উপলব্ধিই আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতির মূলে কাজ করে। এই অনুভূতি হইবে কোথায় ? হইবে যজ্ঞেশ্বররূপে—যজ্ঞভূমি আমাদের হৃদয়ে। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের চিত্তবৃত্তির মূলে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষানুভূতিজনিত রসোপচিত প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় সর্ব্ববিধ ভেদভাবের বিলয়াত্মক সামঞ্জস্যেই আমাদের স্বরূপনিষ্ঠ জীবনধর্ম্ম সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া জগতের অন্য কোন সম্বন্ধই আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের পিপাসার আত্যন্তিকভাবে নিরসন করিয়া আমাদের অন্তরে আত্মভাবের স্থায়িত্ব বিধান করিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"এক অশ্ব মোর মন তাতে আরোহী পঞ্চ জন,
টানাটানিতে মনের প্রাণ যায়।"

প্রাকৃত বস্তুর সম্বন্ধ-জনিত মনের বিকারে আমরা প্রতিনিয়ত এমন ভাবেই বিড়ম্বিত হইতেছি। সৎস্বরূপে ভগবান্ পরা এবং অপরা উভয় প্রকৃতিতে অনুস্যূত রহিয়াছেন। চিৎকণ জীব চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ তাঁহার শ্রীবিগ্রহে যখন সর্ব্বভাবে আনুকূল্যমূলক আত্মভাবটি উপলব্ধি করে এবং তাঁহার দিকে তাকায় জড়া প্রকৃতির অভিভূতি বা দেহরূপ ক্ষেত্রের অবিদ্যাজনিত প্রভাব হইতে সে মুক্ত হয়। এই আত্মভাবটি শ্রীভগবানের করুণার সংবেদন-সূত্রেই জীবের অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে ক্ষেত্র বা আমাদের এই যে শরীর ইহার মূল্য শুধু আত্মারূপী ভগবানের কাছেই সত্য হয়, অন্য কাহারও আমাদের এই জড় মাংসপিণ্ডরূপ দেহের জন্য দরদ নাই। সকলের দৃষ্টিতেই ইহা তুচ্ছ। অচিৎ এই যে জড় দেহ, ইহা প্রেমের দেবতারই দান, তাঁহারই এ বস্তু। সুতরাং তাদাত্ম্যধর্ম্মে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বভাবের মধ্যে তিনিই আমাদের শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছেন। ইহাকে আদর

করিতেছেন তিনিই। তাঁহাকে সেবা করিলেই দেহের প্রকৃত সেবা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে চিৎ এবং অচিৎ সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই শরীর এবং তিনিই শরীরী। এই দেহের বা ক্ষেত্রের জড়াত্মক অহং-মমত্বাভিমান কাটাইয়া এই অবস্থাটি আমাদের উপলব্ধিতে আসা চাই, তবেই আমাদের জীবনের সার্থকতা মিলিবে। এই অবস্থা লাভ হইলে তবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের মর্ম্ম আমরা বুঝিব। এইরূপে সর্ব্বক্ষেত্রের অধীশ্বর-স্বরূপে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেই সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আমরা সর্ব্বাত্মস্বরূপে ভগবানকে দেখিব, দেখিব তাঁহাকে সর্ব্বত্র। সকলকে আপন করিয়া পাইয়া আমরা নিজেদের হিংসা নিজেরা করিব না। আমরা ভিতরে তাকাইয়া ভগবানের সর্ব্বাত্মস্বরূপ মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইব, বাহিরেও দেখিব তাঁহারই লীলা। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বপ্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত ভগবানের এমন লীলার সঙ্গে যুক্ত হইয়াই জীব তাহাদের জীবনের পূর্ণতা অনুভব করে। ইহাই তাহার পক্ষে পরম পুরুষার্থ। সমগ্র শ্রুতি এই পরম পুরুষার্থের মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য।' (মুঃ-২।১।১০)।

বস্তুতঃ জীবই যে ব্রহ্ম ইহা শ্রুতির সিদ্ধান্তে কুত্রাপি সমর্থিত হয় নাই।

'আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্।' (মুঃ ২।২।১)।

অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রকাশাত্মক এবং তিনি আমাদের অতি সমীপবর্ত্তী। অন্তরাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে তিনি অবস্থিত। ইনি চেতনাচেতন সকলের মহান্ আশ্রয়। ইনি সৎ এবং অসৎ—কার্য্য ও কারণ উভয়াত্মক। ইনি সকলের বরেণ্য। বিজ্ঞান বা চিৎ-ধর্ম্মী জীব

হইতেও ইনি শ্রেষ্ঠ। ইনি সমস্ত জাতবস্তুর মধ্যে বরিষ্ঠ। এই ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। গীতোক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলতঃ গীতার বাণী দেহেন্দ্রিয়ের সর্ব্বসম্বন্ধে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুর অতীত অমৃতময় দিব্য জীবনের সন্ধান মানুষকে দিয়াছে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিশ্লেষণ-সূত্রে গীতা নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিক ব্রহ্মকে পরম সাধ্যতত্ত্ব-স্বরূপে নির্দ্দেশ করে নাই। পরন্তু সবিশেষ এবং সশক্তিক পরব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বভাবে গীতার্থে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতা শ্রীভগবানের আত্মমাধুর্য্যের আস্বাদনে জীবের সনাতন অধিকারকেই প্রতিষ্ঠা দিয়াছে।

ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়

গীতার মধ্যম ষট্‌ক অর্থাৎ সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ এবং তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পরিশেষে ভক্তিযোগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কর্ম্ম এবং যোগের পথে যাঁহারা ভগবানের উপাসনা করিতে চাহেন, ভক্তিযোগ যে তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর রহিল জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানমার্গের পথে যাঁহারা ভগবানের উপাসনা করিতে চাহেন, ভক্তিযোগই যে তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে মুখ্যভাবে অবলম্বনীয় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সেই সত্যটি জ্ঞান-বিচারের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে উপদেশকালে বলেন—

"অতএব ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগফল পায়
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়।
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়।
দারিদ্র্য-নাশ ভব-ক্ষয়, প্রেমের ফল নয়
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়।
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন।
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই জ্ঞানের সম্বন্ধেই ভগবান উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহার আনুষঙ্গস্বরূপে মায়াবন্ধের বিনাশ এবং জ্ঞেয়তত্ত্ব পরব্রহ্ম কৃষ্ণের সর্ব্বতোময় উপলব্ধিতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের উজ্জীবনের রীতিটি

তিনি উন্মুক্ত করিয়াছেন। 'জ্ঞানং সাংখ্যং পরম্ মতম্'—সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ হইতে ভগবৎ-তত্ত্বের সর্ব্বতোময় স্বরূপটি মুক্ত করিয়া জ্ঞানের পরিস্ফূর্ত্তি সাধনপূর্ব্বক ভক্তির অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এবং জীবের স্বরূপানুবন্ধী কৃষ্ণ-সেবার সম্বন্ধটি জীবকে আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীভগবানের একান্ত আগ্রহই এই অধ্যায়ে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। প্রত্যুত ভগবানের শ্রীবিগ্রহের মাধুর্য্য জীবের দৃষ্টিতে প্রকটিত করিবার রীতিটি বিশ্বরূপ দর্শনে উন্মুক্ত করিয়া ভগবান্ এই দিকেই আগাইয়া আসিয়াছেন এবং স্বাভাবিক ধারাতেই এইটি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ 'অপাণিপাদ' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের সহিত ভগবৎ-বিগ্রহের অপ্রাকৃত তত্ত্বটি এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব এই মাধুর্য্য-বীর্য্যে সর্ব্বক্ষেত্রে অবস্থিত শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মক স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। আমরা দেখিয়াছি, গীতায় দেহাদি মায়িক পদার্থকে ক্ষেত্র এবং আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে তাদাত্ম্য এই অর্থেই এক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবানের সঙ্গে জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধের নিত্যতা পরিস্ফুট করা এবং সেই সূত্রে ক্ষেত্র বা অপরা প্রকৃতির বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত 'জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস'—জীবের এই স্বরূপটি উন্মুক্ত করাই ভগবানের উদ্দেশ্য। জ্ঞানমার্গীর নিকট শ্রীভগবান্ পরমাত্মস্বরূপে উপাস্য হইয়া থাকেন। উক্তমার্গের সাধকগণ অপরা প্রকৃতির অভিভূতির স্তর অতিক্রম করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ভক্তিযোগই অবলম্বন করিতে হয়। ফলতঃ ভক্তির পথেই পুরুষাভিমানী জীব তাহা হইতে স্বতন্ত্র, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা এবং মহেশ্বরস্বরূপে পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন—'হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তের্ভক্তেরেব কলা কাচিদ্ বিদ্যা-সাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা, কর্ম্ম-সাফল্যার্থং কর্ম্মযোগেঽপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং শ্রমমাত্রতোক্তেঃ।' (গীঃ ভাঃ ১৮।৫০) অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ,

যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ প্রভৃতিতেও ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানের উপদেশ দেখা যায়। ভক্তির কৃপা ব্যতীত কর্ম্ম, যোগাদি স্ব স্ব ফল প্রদান করিতে পারে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব চেতন, প্রকৃতি অচেতন বা জড়—জীব জড়াপ্রকৃতির প্রভাব হইতে ব্যুত্থিত হইয়া 'পুরুষঃ পরঃ' যিনি, তাঁহার সহিত যুক্ত হইলেই তাহার সনাতন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থা লাভের উপায় কি এবং উপেয় বস্তুটিই বা কিরূপ পদার্থ? ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবদুপলব্ধির উপায়স্বরূপে জ্ঞান এবং উপেয় বা জ্ঞেয় এই উভয় তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ভগবান এই অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুটি বুঝিতে হইলে তাঁহার ভক্ত হইতেই হইবে, নহিলে তাঁহার ভাবটি উপলব্ধি করার যোগ্যতা জীবের জন্মিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।' (চৈঃ চঃ)

আচার্য্য শঙ্কর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকের ভাষ্যেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—'মদ্‌ভক্তো ময়ীশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমর্পিত-সর্ব্বাত্মভাবে যৎ পশ্যতি, শৃণোতি বা সর্ব্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবং গ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্মদ্‌ভক্তঃ সন্, এতদ্ যথোক্তং সম্যক্‌দর্শনং বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায় মম ভাবো মদ্ভাবঃ পরমাত্মভাব স্তস্মৈ উপপদ্যতে যুজ্যতে ঘটতে মোক্ষং গচ্ছতি' অর্থাৎ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, পরম বা শ্রেষ্ঠ গুরু। যিনি তাঁহাতে সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রেমের প্রভাবে গ্রহাবিষ্টের ন্যায় যাহা কিছু দেখেন, শুনিয়া থাকেন বা স্পর্শ করেন, তৎসমস্তই ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া মনে করেন। শ্লোকস্থ মদ্‌ভক্ত বলিতে এমন ভক্তকেই বুঝাইতেছে।

'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে'—মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে কথাটি বড়ই মধুর, বড়ই আশাপ্রদ এবং উপাদেয়। ভাগবতে ভগবান্ কপিলদেবের মুখেও

আমরা এই কথাটি শুনিয়াছি। জননী দেবহূতির নিকট নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্
অহৈতুক্যাব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।'

(ভাঃ-৩।২৯।১১-১৪)।

অর্থাৎ আমার ভক্ত তাঁহার নিজের জন্য কোন কিছুই কামনা করেন না। তাঁহাদিগকে দিতে গেলেও তাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধা মুক্তি গ্রহণ করেন না। পরন্তু আমার সেবাই শুধু তাঁহারা চাহেন। এইরূপ ভক্তগণ ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া আমার সাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' বাক্যটি অনুরূপ অর্থেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে সাধক যে কত বড় হইতে পারে, চরম সাধ্যলাভ হইলে সে কোন্ ভূমিকায় গিয়া পৌঁছে গীতায় নানাস্থানে নানাভাবে নানাশব্দের দ্বারা তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। 'ব্রাহ্মীস্থিতি', 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ' প্রভৃতি কথা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে শুনিয়াছি। চতুর্থ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে জ্ঞানের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি সাধন করিয়া সাধক 'মদ্ভাবমাগতাঃ' এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। ভগবান্ বলিতেছেন, ভক্ত তখন তাঁহার সমান ভাব বা ব্রহ্ম-স্বভাব লাভ করেন। শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ব্যতীত ব্রহ্মের অন্যান্য গুণ মুক্ত জীবের অধিগত হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত 'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' এই ভগবদুক্তি সমধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে কথা বলিয়াছেন, সে ব্যবস্থা ভক্তের জন্য। বস্তুতঃ চতুর্থ অধ্যায়ে উপদিষ্ট যে জ্ঞান সে জ্ঞান কর্ম্মনিষ্ঠ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে জ্ঞানের

জন্য উপদেশ তাহা কৃষ্ণনিষ্ঠ। চতুর্থ অধ্যায়ে ভক্ত হইবার জন্য উপদেশ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভক্তের স্বরূপধর্ম্মের উন্মেষ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে তাঁহার উপদিষ্ট জ্ঞানের সম্বন্ধে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—'যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম' অর্থাৎ আমি জীবের নিকট হইতে যে জ্ঞানটির জন্য পিপাসিত থাকি ইহা সেই জ্ঞান। এই জ্ঞান তাঁহার মনের মত জ্ঞান, কথাটি ইহাই। এই জ্ঞান শুধু ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান, তাঁহাকে পাওয়া, তাঁহাকে চাওয়া। 'আমি আছি, আমি আছি রে জীব দেখহ আমারে চাহিয়া'—এই ভাবের এ জ্ঞান। এক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তিতে সাধকের অন্তরে ভগবান তাঁহার ভাব বা প্রীতি আস্বাদনে উপযোগিত্বের নিত্য সম্বন্ধটি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি জীবের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। তিনি বলিতেছেন ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান লাভে দেহাত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইলে তাঁহার আত্মভাবটি জীব সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ এই ক্ষেত্রে গীতার উক্তিতে জীবের পক্ষে কোন কৃত্যের আরোপ করা হয় নাই। ভগবানের প্রতি আত্মভাব বা প্রীতির সম্বন্ধটি জীবের স্বরূপে স্বাভাবিক ভাবেই নিষ্ঠিত রহিয়াছে। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান লাভ হইলে জীবের স্বভাব-নিষ্ঠিত সেই আত্মভাবটি রস-সম্বন্ধে উজ্জীবিত হইয়া উঠে, উঠে ভগবানেরই প্রসাদে—তাঁহারই মাধুর্য্যের পরম বীর্য্যে। ভক্তি বা প্রেম চিত্তে পরিস্ফূর্ত্ত হইলে তাহা আস্বাদনে চমৎকারিত্ব লাভ করে। ভগবান্ রস-স্বরূপ। 'রস-আস্বাদক রসময় কলেবর' তিনি। ভক্ত-চিত্তে পরিস্ফূর্ত্ত প্রেম ভগবানের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। পারস্পরিক প্রেমের আস্বাদনের রীতিতেই ভক্ত ও ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ বিধৃত। ভক্ত চাহেন ভগবানকে, ভগবান্ চাহেন ভক্তকে। শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার জীবের স্বরূপানুবন্ধী সুখকে ঘন করে বা প্রাচুর্য্যময় মাধুর্য্য দেয়। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃহদারণ্যক-২।৪।৫) শ্রুতির ইহাই নির্দ্দেশ। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব কোন ক্ষেত্রেই তাহার স্বরূপানুবন্ধী সত্তায় বা স্বধর্ম্মে ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়

না। মুক্ত অবস্থাতেও সে কৃষ্ণসেবাই কামনা করে। 'মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ', 'অপ্রোয়ণাৎ তত্রৈব হি' অর্থাৎ মুক্ত জীবেরও তিনিই পরমাগতি এবং মুক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার উপাসনা জীবের পক্ষে কর্ত্তব্য। মুক্তি লাভের পরও সেই উপাসনা জীব পরিত্যাগ করে না। শ্রুতির এই নির্দ্দেশ। কেন করে না? মুক্তি পাইলেই তো তাহার প্রয়োজনটি মিটিল। উত্তর এই যে, না তাহার প্রয়োজন মিটে না। জীবের প্রয়োজন কৃষ্ণসেবা। মুক্তি লাভের পরও কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে জীব আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করে। বেদান্তসূত্রে নির্দ্দেশিত জীবের স্বরূপানুবন্ধী এই ধর্ম্মটি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভগবান জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরম ভাবটির সহিত তাঁহার আত্মসম্বন্ধ এখানে পরিস্ফুট করিয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন যে জীব তাঁহার প্রিয় এবং প্রিয় বা মধুর ভাবে তাঁহার উপাসনাতেই জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। এই ভাবে তাঁহার উপাসনা বলিতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতিস্বরূপে সচ্চিদানন্দময় তাঁহার উপাসনাই বুঝায়। 'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' এই ভগবদুক্তিতে জীবের প্রতি ভগবানের মধুর ভাবে তাঁহাকে পাইবার এমন দাবীই রহিয়াছে। তিনি দেখা দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন অত্যন্ত প্রিয় তাঁহার ভক্তকে। শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ বলেন—'মম ভাবায় বিদ্যমানতায়ৈ সাক্ষাৎ-কারায়েত্যর্থ উপপদ্যতে সমর্থো ভবতি' (ভক্তি-সন্দর্ভঃ) অর্থাৎ জীব তাঁহার ভাবটি পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়—ইহাই ভগবানের বক্তব্য। প্রকৃত-প্রস্তাবে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে 'গ্রহাবিষ্টবুদ্ধিঃ মদ্ভক্তঃ সন্' —ভক্তের এই যে লক্ষণ বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণে অনন্যা-ভক্তি ব্যতীত এমন অবস্থা লাভ করা যায় না। ফলতঃ রাগমার্গের পথেই এমন অনুভূতি লাভ সম্ভব হয়। এইরূপ সাধকগণের পক্ষে মোক্ষ-কামনা তুচ্ছ হইয়াই পড়িয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

'ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা-'রাগ' এই স্বরূপ লক্ষণ
ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ লক্ষণ।'

ইষ্টে স্বানুকূল্য-বিষয়ে 'স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা তস্যাঃ হেতুঃ প্রেমময়-তৃষ্ণেত্যর্থঃ। সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিরায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ'—(শ্রীল জীব গোস্বামী)। আবিষ্টতার অর্থ তন্ময়তা। আবিষ্ট অবস্থায় লোকের বাহ্য-স্মৃতি থাকে না। ইষ্টে মাধুর্য্য-রসাশ্রিত এই ভাব। এই অবস্থায় ইষ্টতত্ত্বের সংশ্লেষ বা সেবা ব্যতীত অন্যদিকে চিত্তের সংযোগ সাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

'কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ—
কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ।
অনুরাগের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ-দরশন।'

অনুরাগের পরবর্ত্তী প্রেমস্তরকেও ভাব বলা হয়। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—'কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধ-বৃজিন-সংসার-পরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং স্নাপয়ন্তস্তয়ৈব পরয়া নির্ব্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ।' (ভাঃ-৫।৬।১৭) তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ নানাবিধ অনর্থরূপ সংসার সন্তাপে সতত পরিতৃপ্ত আত্মাকে ভক্তিরসামৃত-ধারায় প্রতিনিয়ত স্নান করাইয়া যে পরমানন্দ অনুভব করেন, তাহার ফলে চরম এবং পরম মোক্ষ তাহাদের নিকট স্বয়ং উপাগত হইলেও তাঁহারা তাহাকে উপেক্ষা করেন। কারণ তাঁহারা ভগবানকে পরম প্রীতির পথে আপন করিয়া পাইয়াছেন। শ্রুতি ইঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।
(মুণ্ডক-২।২।৮)।

পর এবং অবর, জড় এবং চিৎ উভয় তত্ত্বকে দীপ্ত করিয়া ভগবানের যে রূপ তাহা দেখিলে জীবের সকল সংশয় দূর হয়। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১২শ শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন——'শ্রীগীতাসু চ—শ্রীভগবানুবাচ,

'অমানিত্বমদম্ভিত্বং' (১৩।৮) ইত্যাদিকং জ্ঞানযোগমার্গমুপক্রম্য মধ্যে 'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী' (১৩।১১), ইত্যপ্যুক্ত্বা, প্রান্তে 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্' (১৩।১২) ইতি সমাপ্যাহ 'এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্ত-মজ্ঞানং যদতোঽন্যথা' (১৩।১২) ইতি। ততো ভক্তিযোগং বিনা জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। অতোঽন্তেপ্যুক্তম্—'মদ্‌ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' (১৩।১৯) ইতি।' অর্থাৎ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ-যোগ কথন-প্রসঙ্গে ভগবান প্রধানতঃ জ্ঞানযোগমার্গের কথাই বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে, অন্তে এবং উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, এই সাধনায় সার্থকতা লাভ করিতে হইলে অর্থাৎ অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অহিংসা ইত্যাদি জ্ঞানাঙ্গ সিদ্ধির জন্য তাঁহার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি অর্জ্জন করিতে হয়।

এতদ্‌সম্পর্কিত ভগবদুক্তিতে অভ্রান্ত ভাষাতে এই সত্য গীতায় সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, যিনি সে পথেই সাধনা করুন, নিজের চেষ্টায় কেহই মায়ার বন্ধন অতিক্রম করিতে পারেন না। দশম অধ্যায়ের ১০শ শ্লোকের ভগবদুক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়—

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।'

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ ১২শ শ্লোকে 'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্' ভক্তিযোগের পথে লভ্য এমন শুদ্ধা বুদ্ধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধির স্তরে এই অবস্থায় কৃপার উজ্জ্বল আলোক আসিয়া পড়ে। সেই আলোকে সাধকের সর্ব্বোপাধির লয় হয় এবং দিব্যজীবনে তখন অভ্যুদয় ঘটে। শ্রীভগবান ভূত-প্রকৃতিমোক্ষ বলিতে বিশ্বকর্ম্মে বহুভাবে বৈচিত্র্যময় তাঁহার আত্মমাধুর্য্যের এমন সম্বন্ধ লাভেই জীবকে আকর্ষণ করিয়াছেন। ভূত-প্রকৃতি হইতে মন মুক্ত হইলে ভূত-প্রকৃতিকে নিজমাধুর্য্যের বীর্য্যে বিধৃত রাখিয়া যিনি বিনাশের মধ্যে অবিনাশী আত্মস্বরূপে বিলসিত হইতেছেন, তাঁহার লীলারসে জীব উজ্জীবিত হয়। জীবের দৃষ্টিতে সৃষ্টির সর্ব্বসম্বন্ধে 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'—তাহার

জীবন-দেবতার এমন অনাময় আনন্দলীলা বিকশিত হইয়া উঠে। অংশ জীব তখন অংশীর সহিত নিত্য সম্বন্ধ লাভ করিয়া অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনার মাঝে জীব যাঁহাকে পায়, যাঁহাকে পায় তাঁহার বুকে বিশ্বের সর্ব্বত্র সে তাঁহারই লীলায় নিজেকে বিকাইয়া দেয়। তাঁহার সেবায় সে নিত্য জীবনে পরম-পুরুষার্থতা লাভ করে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোকের 'ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং' এই ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য জীব তাঁহার স্বভাবে এই ভাবে উপলব্ধি করে। প্রিয় হইতে প্রিয়, প্রিয়তম-স্বরূপে ভগবানকে পাইয়া তাঁহার সেবাসুখানন্দে জীবের স্বরূপধর্ম্মগত উন্মুখতার ভাবটি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

জ্ঞেয়তত্ত্বের স্বরূপ

ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। ভগবানের সহিত ভক্তিযোগের সূত্রে আত্মসম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে স্বরূপধর্ম্মে তাহার প্রতিষ্ঠা ঘটে না। শ্রীভগবান্ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে ইহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আমার যাহারা ভক্ত তাহারা তাহাদের দেহের বা ক্ষেত্রের স্বরূপ এবং জ্ঞেয়স্বরূপে আমাকে বিশেষরূপে জানিয়া আমার ভাব লাভে সমর্থ হয় এবং সেইটি তাহার নিকট পরম বস্তুতে পরিণত হয়। ভাব জিনিষটি কি ? এ সম্বন্ধ শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতো লক্ষিতা যা ভক্তিঃ দৈব নিজাংশবিশেষে ভাব উচ্যতে। স চ কিং কিং স্বরূপস্তত্রাহ কৃষ্ণস্য স্বরূপ শক্তিস্বরূপঃ শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষ ॥" অর্থাৎ সামান্যভাবে যাহাকে ভক্তি বলা হয় তাহারই অংশবিশেষের নাম ভাব। এই ভাবের স্বরূপ এই যে ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপ শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষ। ভাব শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যেচ্ছাময়ী পরমা বৃত্তি। সুতরাং তাঁহার প্রসাদে বা ভক্তকে আপন করিবার জন্য শ্রীভগবনের আগ্রহে তাহা ভক্তের চিত্তে প্রণোদিত হইয়া থাকে। ভক্ত তাহা ছাড়া অন্য কিছুই চাহে না। অন্য বস্তু চাহিবার মত চিত্তবৃত্তিও তাহার থাকে না। 'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' বাক্যটির ভাব এতখানি। আমরা এখানে প্রীতির সেই অর্থেই কথাটি গ্রহণ করিয়াছি। ভক্তি এবং প্রীতি একই বস্তু। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ এই কথাই বলিয়াছেন—'সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ' (প্রীতি-সন্দর্ভঃ)। আমরা দেখিয়াছি অন্ততঃ এক্ষেত্রে আচার্য্য শঙ্করের সহিত আমাদের মতের এক রূপ সামঞ্জস্যই রহিয়াছে। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ ভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন, শ্রীভগবানের ভাবটি লাভ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের যোগ্যতার অধিকারী হওয়াই 'উপপদ্যতে' বলিতে বুঝাইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীজীব পাদ এবং শ্রীশঙ্করের উক্তির তাৎপর্য্যটি একই—উভয়ত্র প্রেমেরই প্রভাব। কারণ—

'প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার
তাঁহার কৃপায় হয় দর্শন তাঁহার।' (চৈঃ চঃ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের জ্ঞেয়তত্ত্বের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীভগবানের এই দর্শনীয় স্বরূপটি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। ভক্তই ভগবানের প্রকৃতি তাঁহার গুণ, কর্ম্ম, যত কিছু সম্যক্‌রূপে তিনিই জানেন। গীতার দেবতা পুনঃপুনঃ এ কথা বলিয়াছেন। সুতরাং ভক্তির পথেই জ্ঞেয়তত্ত্বের সন্ধান করিতে হইবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' এবং একাদশ অধ্যায়ে—

'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন,
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।'

এই উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩শ হইতে ১৮শ শ্লোকে এই জ্ঞেয়তত্ত্বের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভগবানের মুখে আমরা প্রথমে শুনি, তিনি 'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম'। আবার তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গোচরও তিনি নহেন, অগোচরও নহেন। আমরা মায়াবদ্ধ জীব। আমাদের পক্ষে এ সমস্যা জটিল। এরূপ সিদ্ধান্তে ভগবৎ-তত্ত্ব আমাদের সর্ব্ব সম্বন্ধের অতীত বস্তুতেই গিয়া দাঁড়ায় এবং কার্য্যতঃ আমাদের দিক হইতে বিচারে শ্রীভগবানের নাস্তিত্বই প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য-স্বরূপেও তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক হইয়া উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রুতির বিরোধী। শ্রুতি বলেন—'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ' অর্থাৎ ব্রহ্মের দুইটি স্বরূপ প্রসিদ্ধ—একটি মূর্ত্ত, অপরটি অমূর্ত্ত। একটি মর্ত্ত্য (মরণশীল) অপরটি অমৃতস্বভাব, একটি স্থিত (গতিহীন) অপরটি যৎ (গমনশীল), একটি সৎ (বিদ্যমান, প্রত্যক্ষ বিষয়), অপরটি ত্যৎ (সর্ব্বসময়ে পরোক্ষ)। ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত সৎ কিংবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যয়ের অগ্রাহ্য এই উভয় লইয়াই ব্রহ্ম। অন্য কথায় সৎ এবং অসৎ উভয়ের আশ্রয় যিনি, তিনিই পরম ব্রহ্ম। আমরা গীতায় দেখিয়াছি নিজের স্বরূপতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার

নিজের দিকেই অর্জ্জুনের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট করিয়াছেন। এখানেও তিনি বলিতেছেন, আমি অনাদি এবং ব্রহ্মবস্তু মৎপর অর্থাৎ আমারই আশ্রয়ভূত। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'—এই যে আমি এই আমিই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। আমিই ব্রহ্মের মূল। ব্রহ্মের নিদান আমি। পরে এ কথাটি স্পষ্টরূপেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রমূর্ত্ত-তত্ত্বে অর্থাৎ প্রত্যক্ষতার পরমবলে তিনি সম্মুখে আসিয়া না দাঁড়াইলে জীবের অজ্ঞানতা দূরীভূত হইতে পারে না। তাঁহার এমন কৃপাশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার সহিত সম্বন্ধসূত্রে জীব জ্ঞান লাভ করে এবং সাধনানুকুল প্রবৃত্তি জীবের চিত্তে উদ্দীপ্ত হয়। দেখা যায় ভগবানকে, দেখা যায় তাঁহার রূপ। শুধু অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন এমন নহে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, দেখা দেন তিনি তাঁহাকেই। ভগবান্ কপিল তাঁহার জননীর নিকট ভক্ত ভগবানের এমন প্রেমের খেলা ব্যক্ত করিয়াছেন। বলিয়াছেন—

'পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্ন-বক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি।

সাধুগণ ভগবানের মনোহর প্রসন্নবদন, অরুণলোচন এবং অলৌকিক বরপ্রদ রূপ দর্শন করেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত মনের সাধ মিটাইয়া বাক্যালাপও করিয়া থাকেন।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের নিকট সে রূপের কথা বলিয়াছেন। বিশ্ববাসী প্রভুর মুখে আস্বাদন করিয়াছে সেই রূপের মাধুরী। বলিয়াছেন প্রভু—

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!
যে রূপের এক কণ ডুবায় সর্ব্বভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
সেই রূপ রতন ভক্ত জনের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে।
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
সুসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপ তাঁর নিত্য ধাম। (চৈঃ চঃ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্' প্রভৃতি শ্লোকে চিন্ময় ভগবৎ-বিগ্রহের এমন স্বরূপই বর্ণিত হইয়াছে। 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' —শ্রুতির ইহাই নির্দ্দেশ। এইরূপ নির্দ্দেশে আমরা কি বুঝিব, শ্রুতির নির্দ্দেশিত কেমন এই রূপটি, ইহা কি কপিলদেবের উক্ত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চারিত কৃষ্ণ-মাধুরীর সঙ্গে মিলে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর এ সম্বন্ধে উক্তি—

'অপাণি'-শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ,
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ।
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ,
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ।'

প্রভু বলেন—

'নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন।'

প্রভু জ্ঞেয়তত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়,
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন,
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন।

ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন।
সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র-মন।" (চৈঃ চঃ)

ব্রহ্ম হৈতে বিশ্ব জন্মলাভ করে। এ স্থলে ব্রহ্ম অপাদানকারক। ব্রহ্মের দ্বারা ভূতবর্গ জীবিত রহিয়াছে, এ ক্ষেত্রে তিনি করণ কারক এবং পরিণামে জগৎ ব্রহ্মে স্থান পায় এই ক্ষেত্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অধিকরণ কারক যুক্ত হইতেছে। নির্ব্বিশেষ বস্তু কারকত্রয় যুক্ত হওয়া অসম্ভব সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সমস্ত কারকের কারণ-স্বরূপ হইতেছেন পরব্রহ্ম। যথা—

'যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ
যদ্ যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্-স্বসিদ্ধং
তদ্‌ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্॥'

(ভাঃ-৬।৪।৩০)

অধিকরণ যাহাতে, অপাদান যাহা হইতে, যে করণের দ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, যাহাতে সম্প্রদান, যাহার উদ্দিষ্ট কর্ম্ম, যৎ কর্তৃক কর্ম্ম, তিনিই ব্রহ্ম। যেহেতু সকলের অগ্রে আপনা হইতেই তিনি সিদ্ধ। তিনি এক এবং অনন্য। প্রকৃতপক্ষে বিকারের মধ্যে ব্রহ্মের চিদাকারকে যদি স্বীকার না করা যায়, তবে ব্রহ্মে সর্ব্বকারকত্ব সিদ্ধ হয় না এবং তাঁহার অন্যনিরপেক্ষত্ব বা অনন্যত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

গীতার "সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ" এই শ্লোকটির বিচার করিতে গিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সমস্যার মধ্যে পতিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায়, প্রভু, সাতপ্রহরিয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অদ্বৈতপ্রভুকে তাঁহার এই

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর প্রতি প্রভুর উপদেশ এইরূপ—

'প্রভু বলে সর্ব্ব পাঠ কহিল তোমারে
এক পাঠ নাহি কহি আজি কহি তোরে।
সম্প্রদায় অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে
'সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ'—এই পাঠ নড়ে।
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট
সর্ব্বত্র পাণিপাদস্তৎ এই সত্য পাঠ।'

প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে সবিশেষবাদটি সুনিশ্চিত করাই গীতার্থ ব্যাখ্যা-মুখে প্রভুর উপদেশ। হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক প্রভৃতি অবয়বসংযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, ইহাই প্রভুর প্রতিপাদ্য বিষয়। গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের ভাষ্যে 'সর্ব্বত্র' এই শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদী ভাষ্যকারগণ তৎসত্ত্বেও নির্ব্বিশেষবাদমূলক ব্যাখ্যায় শ্লোকের তাৎপর্য্য অন্যভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—'মন্দবুদ্ধীনাং দিগ্দেশাদি-ভেদবদ্বস্ত্বিত্যেবংভাবিতা বুদ্ধি র্ন শক্যতে সহসা পরমার্থ-বিষয়া কর্ত্তুমিতি অনধিগম্য চ ব্রহ্ম ন পুরুষার্থসিদ্ধিঃ', 'দিগ্দেশগুণ-গতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থ-সৎ অদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনামসদিব প্রতিভাতি' অর্থাৎ জগতে বস্তুমাত্রই দিক্, দেশ ও কালকৃত ভেদবিশিষ্ট। ব্রহ্ম ভেদহীন সৎস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয়। অল্পবুদ্ধি লোকগণ চিরসংস্কারবশতঃ হঠাৎ পরমার্থ বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে সবিশেষ বা সগুণভাবের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের এই সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিতে জ্ঞেয় বলিয়া বিনিশ্চিত হইয়াছেন এবং এই সবিশেষ ব্রহ্মের উপসনাতেই মোক্ষলাভ ঘটে, শ্রুতির এমন নির্দ্দেশও সর্ব্বত্র রহিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রও বলেন—'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ' (১।১।৭)। গীতার দেবতা সবিশেষ ব্রহ্মের শরণাগতি মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়াছেন। তিনি মুক্তির জন্য

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশ কোন ক্ষেত্রেই প্রদান করেন নাই। শ্রীমৎবৃন্দাবন দাস এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া চৈতন্য-ভাগবতে বলিয়াছেন—

"মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা,
আপনি চৈতন্য যাঁরে করাইল শিক্ষা।"

জীব এবং জাগতিক সর্ব্বভাবের সঙ্গে ভগবৎ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্যই প্রভুর আবির্ভাব। প্রভু বেদ-বিরোধী সর্ব্বসিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। বারাণসীর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় "সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ-নারায়ণ" স্বরূপে প্রভুকে বন্দনা করেন। প্রভু জ্ঞেয়তত্ত্ব-সম্পর্কিত অব্যক্ত ভাবটি নিরাকৃত করিয়া ব্যক্তাব্যক্ত সর্ব্বভাবে ব্রহ্ম-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্যক্তভাবের আশ্রয়ে সর্ব্বোপাধির লয়েই ভগবানের চিন্ময় ভাবটি আমাদের অনুভবগম্য হইয়া থাকে। "স্থানেতে এই স্থানে, কালেতে এই ক্ষণ"—কাল এবং মায়ার অতীত-ভাবে ভগবানকে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অব্যবহিতভাবে পাওয়াই সত্যভাবে তাঁহাকে পাওয়া, নিত্যভাবে পাওয়া—অখণ্ড অনুভূতির মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া। আমাদের জৈব খণ্ডিত প্রতিবেশকে পরম-বলে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার এমন উদয় ঘটে তখন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপ আছে, তাঁহার আকার নাই, এই ধরণের উক্তি বচন-বিলাসিতা মাত্র। ফলতঃ ভগবানের আকার সম্বন্ধে আমাদের খণ্ডিত বা ঔপাধিক জ্ঞান—যাহাকে নামরূপের সংস্কার বলা হয়, তাহা আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই উপজাত হয়। দৃষ্টি যেখানে নিষ্পলক, নাই সেখানে অন্য নিরিখ। সেখানে কোথায় থাকে এদিক ওদিক—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, দিক ও দেশের এমন খণ্ড জ্ঞান ? সেখানের সব ভাবে ডুব—এমন রূপ। ফলতঃ শ্রীভগবান্ নিজে আসিয়া বরণ না করিলে কোন সাধন-ভজনের দ্বারা আমাদের মনের দিক্‌দেশগত সংস্কার আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। ভগবান কর্ত্তৃক আমাদের এই বরণের ক্ষেত্রে ভগবৎ-কৃপার সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অপাদান কিংবা উপাদান সম্বন্ধে সতর্কিত ভাব সাধকের থাকে

না—দীপ্ত হয় অধিকরণ। সে অবস্থায় আমাদের অধিকারে আসেন তিনি। জীবের সেবাধিকার পরিপূর্ত্তির উপযোগী আনন্দচিন্ময়-রসোজ্জীবক পাত্রত্বদাতৃ-শক্তি তাঁহার আছে, আছে তাঁহার ইন্দ্রিয়ের। ভক্তের সেবানন্দোজ্জীবক সেই পরম-পৌরুষরসের বিলাসে নিমিত্ত-স্বরূপ তাহাতে তখন আমাদের সংস্থিতি লাভ হয়। তিনি আর তাঁহার ধাম মনের মূলে জোড়া—ভরা, আর নড়াচড়ার জায়গা নাই এমন ভাবে তাঁহাকে আমরা পাই। এইরূপে তখন তাহাতে আত্মনিবেদনে আমাদের জন্ম ও কর্ম্ম-বন্ধনের খণ্ডন হইয়া যায় এবং দিব্য-জীবনে আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে পরব্রহ্মে সর্ব্বকারকেরই সংপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং প্রভুর ব্যাখ্যাটি গ্রহণ না করিলে, 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং', 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্' প্রভৃতি জ্ঞেয়তত্ত্বের স্বরূপ-নির্দ্দেশক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পরবর্ত্তী ১২শ হইতে ১৮শ শ্লোক নিরর্থক হইয়া পড়ে। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা ব্রহ্ম। নিয়ন্তা বলিতে এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সমূহের প্ররোচক বা উদ্দীপক তিনি ইহাই বুঝায়। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত তাঁহার ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের আভাসস্বরূপেই আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকাশ-শক্তি স্ফূর্ত্তি হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম যদি আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আভাসময় না হইতেন তবে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অপর কাহারো সহিত আত্মসম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাঁহার স্পর্শ যদি আমাদের মনের মূলে না লাগিত তবে আমাদের পক্ষে কিছুই পাওয়া সম্ভব হইত না এবং আমাদের জীবনধারণ করাই অসম্ভব হইয়া পড়িত। ফলতঃ ব্রহ্ম 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত' বলিতে তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরই অভাব বুঝাইতেছে। শ্রুতি এইরূপে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত চিৎ-বিগ্রহকেই সর্ব্বভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা।
অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং—তন্মর্ত্ত্যং॥"

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তৎপ্রণীত সর্ব্বসম্বাদিনীতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত

আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের রূপবত্তা এবং শব্দবত্তা এবং তদুপলক্ষণে স্পর্শাদি-শক্তিমত্তাদি সূচিত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'নান্যৎ পশ্যতি' অন্য কিছু দেখে না—এই বাক্যে বুঝা যায় চিত্ত-শুদ্ধ হইলে যখন ব্রহ্মদর্শন হয় তখন সাধক শুধু ব্রহ্মকেই দেখেন। ব্রহ্ম ব্যতীত তিনি অন্য কিছু দেখেন না, সুতরাং ব্রহ্মের রূপ আছে, নতুবা কি দেখিবেন? এইরূপে 'নান্যৎ শৃণোতি'—অন্য কিছু শুনেন না। সুতরাং ব্রহ্মের শব্দ করিবার শক্তি আছে, নতুবা তিনি শুনিবেন কি? এইসব শ্রুতিবাক্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপে বাহ্য-প্রতিষ্ঠায় বা ব্যবহারিকরূপে আমাদের অনুভূতির মূলেও আত্ম-স্বরূপে ব্রহ্মের সম্বন্ধ-সূত্রে আমাদের সহিত তাঁহার নিত্য অন্তঃপ্রতিষ্ঠ ঘনিষ্ঠতায় আভাস হইতে বিলাসেই জ্ঞেয়তত্ত্বের স্বরূপধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি এই সত্যটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। প্রাকৃত জীব আমরা আমাদের পক্ষে দর্শনীয় নহে বলিয়া অপ্রাকৃত বস্তুকে অস্বীকার করা চলে না। শ্রুতি বলেন,

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" (ঈশ ৫)

বস্তুতঃ আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বাহ্য-সংস্পর্শে ব্রহ্মের আত্মমাধুর্য্যেই আভাসস্বরূপে কার্য্য করে, নহিলে আমাদের অন্তর-রসে তাঁহাকে অন্তিমে একান্তভাবে পাইয়া মনের উজ্জীবনধর্ম্মে আমাদের জীবনে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা থাকিত না। সে অবস্থায় আমাদের সাধন-ভজন নিরর্থক হইত এবং গীতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়িত। বস্তুতঃ সীমার মধ্যে আসিয়া প্রতিনিয়ত অসীমের মাধুর্য্যের চাতুর্য্যে শ্রীভগবান পরম বীর্য্যে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করিতে চাহিতেছেন। উপাদান ছাড়িয়া অপাদান খুঁজিলে আমাদের জীবনের প্রয়োজন মিটে না—ব্যবহারিক ভাবেও নয়, পারমার্থিক ভাবেও নহে। উপাদান কারণকে আশ্রয় করিয়াই কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাবটি আমাদের মনে জাগে। উপাদানই আমাদের

মনে প্রয়োজনের চেতনাসূত্রে সম্বন্ধের ভাবাত্মক প্রত্যয়োপযোগী অভিমান সৃষ্টি করে এবং এই অভিমানই আমাদের জীবনের মূলে সংস্থান-স্বরূপে কাজ করে। ফলতঃ চিত্তের সর্ব্ববিধ সংস্থিতি বা ভাবের মূলে থাকে বিকারকে স্বীকারের পথে মনের গতি এবং এই গতির মূলে থাকে আবার আকার। আকার বলিতে উপাদানে অন্বিত দিক্ এবং দেশে আশ্রিত আমাদের অন্তরধর্ম্মে উজ্জীবিত বস্তুর রূপটি বুঝায়। আমাদের মন কর্ম্ম-সংস্কার হইতে মুক্ত হইলে সর্ব্ব উপাদানের মূলে যিনি নিমিত্তকারণ বা সৎ-স্বরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার সহিতই আমাদের সংযোগ ঘটে এবং সর্ব্বকারণ-কারণ যিনি, আমরা উপাদানে সেই নিমিত্ত কারণকেই ব্যক্তভাবে পাই। ফলতঃ সৎ-স্বরূপে ভগবানই বিশ্বের সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন—'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ'। বিশ্বকে সৎভাবে না পাইলে ভগবানকে সমগ্রভাবে পাওয়া হয় না। অপাদানের সহিত উপাদান-কারণের এইরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে অনুমানের বিষয়ই থাকিয়া যায়। অনুমানের ক্ষেত্রে বা অনির্দ্দেশ্যের সূত্রযোগে ভগবানের জন্য সাধনা চলে না। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটি সত্য হয় না, সুতরাং আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব জ্ঞানেরও নিরসন সম্ভব নহে। ফলতঃ দ্বন্দ্ব-জ্ঞানের নিবৃত্তির মূলে সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানের ছন্দোময় আত্ম-সম্বন্ধটি বিকার বা চিদাকারেই বীজস্বরূপে কাজ করে এবং বিকারকে আশ্রয় করিয়াই আমরা ভগবানকে আপন করিয়া পাই। বিকারের মধ্যে তাঁহার চিদাকারের অনুভূতির রসরীতির চমৎকৃতি আমাদিগকে আমাদের স্বরূপধর্ম্মে উজ্জীবিত করে। ভাগবতে কালীয়-পত্নীগণের বন্দনায় এই তত্ত্ব প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা ভগবানকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—'অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে', সকল বিকারের মধ্যে অবিকারীরূপে তোমার বিহার এবং তেমন বিহারে বিশ্ব-কার্য্যে আত্মবীর্য্যের সঞ্চার। সৃষ্টির বীজস্বরূপে ভগবান্ একাকী কখন কি ভাবে ছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু যখনই তিনি নিজভাব আস্বাদন করিবার জন্য নিজকে খুঁজিতে বাহির হইলেন, তখনই

তাঁহাকে বিকারকে স্বীকার করিতে হইল। তাঁহার আত্মতত্ত্বে প্রেম পরিস্ফূর্ত্ত হইল এই বিকার-স্বীকারে। বিকারের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া বিচারে পাওয়া নয়—সঞ্চারে পাওয়া, জ্ঞানে নহে—তাঁহাকে পাওয়া প্রেমে। অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তরূপে তাঁহার অনুভূতি-সূত্রে আমাদের সহিত তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী আসঙ্গময় আত্মসম্বন্ধটিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে সৃষ্টির মধ্যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন—অনুপ্রবিষ্ট আছেন তাঁহার ভূমা বা আনন্দ-স্বরূপের বীর্য্যে এবং প্রাচুর্য্যে—'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' পূর্ণভাবে প্রেমের পরিপূর্ণ মহিমায় আছেন তিনি সর্ব্বত্র, আছেন অণুতে, আছেন মহতে, আছেন সর্ব্বভাবে বিভুস্বরূপে। জীবের আত্মানন্দ অনুভূতির উপযোগী তাঁহার করুণাময় আত্মরসৈক-প্রজ্ঞানঘন এমন স্বরূপটিই তাঁহার গ্রসিষ্ণু এবং প্রভবিষ্ণু স্বরূপ। তাঁহাকে পাইতে হইলে সব হারাইতে হয়, তখন জল, মাটি সব জুড়িয়া তিনি জাগেন। ফলতঃ বিশ্বের উপাদান কারণকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া যাঁহারা বিশ্বের অপাদান কারণ-স্বরূপ, ব্রহ্মের অব্যক্ত বা অক্ষর ভাবটিই পাইতে চান গীতার নির্দ্দেশিত জ্ঞেয়-তত্ত্বের স্বরূপটি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ফলতঃ গীতায়—শুধু গীতায় কেন, শ্রুতি-স্মৃতিতে কোথাও নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার-তত্ত্ব জ্ঞেয়স্বরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। গীতার জ্ঞেয় শ্রেয় এবং শ্রেয় হইয়াও প্রেয়।

আচার্য্য শঙ্করের মতে সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্ম জীবের উপাস্য এবং নির্গুণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেস ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তিনি বলিয়াছেন—'এবমেকমপি ব্রহ্ম অপেক্ষিতোপাধি-সম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধঞ্চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ, বেদান্তেষু উপদিশ্যত' অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, ইহাই বেদান্তের উপদেশ। তিনি বলেন—ব্রহ্মের দুইটি রূপ—নির্গুণ এবং সগুণ। যিনি সর্ব্বশক্তিরহিত, সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত, সর্ব্ববিধ রূপরহিত, যিনি সর্ব্ববিশেষত্ববিহীন তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। এই নির্গুণ ব্রহ্মই মায়িক উপাধিযোগে সগুণ হইয়া থাকেন। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-বিধায়ক।

বস্তুতঃ নির্গুণ ব্রহ্মে জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি গুণ নাই। অথচ সবিশেষ ব্রহ্মই যে জ্ঞেয় আচার্য্যদেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্বয়ং তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলেন—'যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণা জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং দর্শয়তি' অর্থাৎ যাহা হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে, তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম। এইরূপ নির্দ্দেশে শ্রুতি ব্রহ্মকেই জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ লক্ষ্যস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং জগৎ-কর্ত্তা সবিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র জিজ্ঞাস্য বা জ্ঞেয় ইহা তাঁহারও সিদ্ধান্ত। কারণ যাহা হইতে জগৎ প্রসূত হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই সশক্তিক সুতরাং সবিশেষ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যের উপক্রমেই আচার্য্য শঙ্কর তার-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—'অস্তি তাবৎ নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতং ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ—অর্থাৎ আছেন, নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত স্বভাববিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম আছেনই। বৃহতি ধাতু হইতে ব্রহ্মশব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই ব্রহ্মের নিত্যশুদ্ধত্বাদিগুণের অর্থ উপপন্ন হয়। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের প্রতিপাদ্য এই ব্রহ্মও সবিশেষ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই জ্ঞেয় সর্ব্বশ্রুতির ইহাই সিদ্ধান্ত। 'য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (ছান্দোগ্য-৮।৭।১) অর্থাৎ পাপশূন্য, জরাবিহীন, মৃত্যুর অতীত, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প হইতেছেন ব্রহ্ম, তাঁহাকেই অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহাকেই বিশেষ-রূপে জানার জন্য আগ্রহ করা কর্ত্তব্য। 'অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপং বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ (শ্বেতাশ্বতর-৫।১৩) অর্থাৎ অনাদি অনন্ত যিনি বিশ্বস্রষ্টা, তিনি বহুরূপে সংসারে অভিব্যক্ত। বিশ্বের একমাত্র রক্ষক সেই দেবকে জানিলে জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে।

'সৌম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। (ছান্দোগ্যঃ-৬।৮।৫) সমূলমন্বিচ্ছ সমূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। (ছান্দোগ্যঃ-৬।৮।৬) অর্থাৎ সৎস্বরূপ মূলটি অবগত হও। চরাচর এই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩শ হইতে ১৮শ শ্লোকে জ্ঞেয়তত্ত্ব নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। তাঁহার মুখে এমন কথাও শুনিয়াছি যে, এই জ্ঞেয়-তত্ত্ব অধিগত হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়। আচার্য্য শঙ্করের মতে এই অমৃতত্বই মোক্ষ বা পরম-পুরুষার্থ। ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত এই তত্ত্বকে আমরা কি শুধু উপাস্য বলিব? আচার্য্যের মতে জ্ঞেয় যে বস্তু তাহার মর্য্যাদা কি ইহার নাই? আচার্য্যদেবের নিজের ভাষ্যই এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকের সহিত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি মন্ত্রের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতির মন্ত্রগুলি যথাক্রমে এইরূপ :—

'সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিব ॥
১১ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
১৬ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥
১৭ ॥
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং ॥
১৯ ॥'

ব্রহ্মের জীববৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় উল্লিখিত শ্রুতি বাক্যসমূহে নিষিদ্ধ হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। মুণ্ডক শ্রুতির একটি মন্ত্র :—

'যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।'

(মুণ্ডক—১।১।৬)

এই মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণসূচক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রগুলিরই সমার্থজ্ঞাপক। আচার্য্য শঙ্কর মুণ্ডক-শ্রুতির এই মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'অচক্ষুঃশ্রোত্রং—চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপ-বিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তুনাং তে অবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদেত্যাদিচেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীরই নামরূপ-বিষয়াত্মক ইন্দ্রিয়, চক্ষু-কর্ণাদি আছে, ব্রহ্মের তাহা নাই অর্থাৎ জীবের ন্যায় প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ তাঁহার নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি চেতনবস্তু-বিশেষণে মনে হইতে পারে সংসারী জীবের ন্যায় চক্ষু-কর্ণাদির সাহায্যেই তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদাদি হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নয়। 'অচক্ষুঃ শ্রোত্রমিত্যাদি' বাক্যে সংসারী জীবের ন্যায় তাঁহার চক্ষু নাই অর্থাৎ তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ই এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই মন্ত্রটির 'অদ্রেশ্যম' অর্থাৎ ব্রহ্মের অদৃশ্য স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য্যদেব লিখিয়াছেন, 'অদ্রেশ্যম্—দৃশের্ব্বহিঃ প্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারত্বাৎ' অর্থাৎ অদৃশ্য অর্থে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনীয় নহে ইহাই বলা হইয়াছে। কারণ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহার গতি বাহিরের দিকে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর দিকে। এতদ্দ্বারা আচার্য্য শঙ্কর শ্রীভগবানের প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকেই অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে

প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তিকে তিনিও সমর্থন করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ' অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই চরাচর জগৎ পুরুষবিধ ব্রহ্মের আত্মরূপেই ছিল। তিনি দৃষ্টি-সম্পাত করিয়া নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছিলেন না। এই মন্ত্রের 'পুরুষবিধঃ' শব্দের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন, 'পুরুষ-প্রকারঃ শিরঃ-পাণ্যাদিলক্ষণঃ' অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় মস্তক, হস্তাদি বিশিষ্ট ইহা আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং জ্ঞেয়স্বরূপ এই যে ব্রহ্ম, ইনি নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি যে উপাস্য অথচ জ্ঞেয় নহেন, সর্ব্বোপনিষদসার গীতা এবং উপনিষদসমূহে তাহা প্রতিপন্ন হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ ব্রহ্মাই যে জীবের পক্ষে জ্ঞেয়স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই। কিন্তু মায়াবাদী বেদান্ত এমন সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের অভিমত আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি তাহা কেমন তাঁহার স্বমতেরই বিরোধী। আচার্য্য রামানুজ মায়াবাদী মতের সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন এই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইয়াছেন কি না। এ প্রশ্ন উঠে বই কি? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ ব্রহ্মকেই যে জ্ঞেয়স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথচ শ্রীপাদ শঙ্করের মতে মায়া দ্বারা উপহিত ব্রহ্মাই সগুণব্রহ্ম বা সবিশেষ ব্রহ্ম। মায়া মিথ্যা অতএব সগুণ ব্রহ্মও মিথ্যা। তাঁহার মতে সগুণ ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধি নিম্নাধিকারীর পক্ষেই উপাস্য; পরন্তু তিনি জ্ঞেয় নহেন অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিবার পর তিনি আর উপাস্য থাকেন না। 'তং বিশ্বরূপং ভবভূতবীজং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বং' শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির এই মন্ত্রের মায়াবাদমূলক ব্যাখ্যা অনেকটা এইরূপ যে, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই অখিলরূপধারী সর্ব্বকারণদেব জীবের চিত্তে উপাস্য রহেন। পরন্তু সাধক জ্ঞানলাভের পরে জ্ঞেয়স্বরূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করেন।

উপাস্য এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করসম্মত সিদ্ধান্তে পার্থক্য বিধানের এই যুক্তিস্বরূপে অনেক ক্ষেত্রে শ্রুতির এইরূপ একদেশদর্শিতাজনিত অপব্যাখ্যা হইয়াছে। ফলতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনাকেই জীবের পক্ষে সাধ্যস্বরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন, তিনিই জ্ঞেয়তত্ত্ব এবং তাঁহাকে জানিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। মায়াবাদী বেদান্তের সিদ্ধান্তানুসারে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয় হইলে তাঁহার উক্তি অভ্রান্ত নহে এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তত্ত্বদর্শী নহেন, সুতরাং তাঁহার তত্ত্বোপদেশ প্রদানের অধিকারও নাই। কারণ তিনি নিজেই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন— 'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনোস্তত্ত্বদর্শিনঃ' অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ দিবেন। আচার্য্য শঙ্করের মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ মায়াময়—মিথ্যা, কারণ তিনি মায়া দ্বারা উপহিত সগুণ ব্রহ্মেরই প্রকাশ সুতরাং তাঁহার উপদেশও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি গ্রহণের পথেই তাহা সম্ভব, গীতায় এই সত্যই সর্ব্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতা সর্ব্বোপনিষদের সার স্বরূপ; সুতরাং গীতাকে অস্বীকার করিলে সমগ্রভাবে শ্রুতি-স্মৃতিকেই অস্বীকার করা হয়। আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে আমাদিগকে এইরূপ গোলে পড়িতে হয়। এক্ষেত্রে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উক্তি আমাদের মনে পড়ে। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মায়াবাদমূলক ভাষ্যের সমালোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে।
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে লঙ্ঘন।
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে
শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ নহে তাহা হৈতে।' (চৈঃ চঃ)

প্রকৃতপক্ষে সবিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বলিয়াই বেদান্ত-সিদ্ধান্তে তিনি উপাস্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, হইয়াছেন প্রিয়স্বরূপে এবং জ্ঞেয় বলিয়া বিনিশ্চিত হইয়াছেন সেই ভাবে। প্রত্যুত তাঁহাকে এইভাবে জানার অর্থই সর্ব্বভাবে তাঁহাকে পাওয়া। অর্জ্জুনের সম্মুখে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহে প্রমূর্ত্ত হইয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

প্রকৃতপক্ষে নিরাকার বলিতে বিকার-রহিত শ্রীভগবানের চিদাকার এবং নির্গুণ বলিতে হেয়গুণরহিত তাঁহার অশেষ গুণের সন্নিবেশ-মাধুর্য্যই বুঝায়। তাঁহার এই মাধুর্য্যবীর্য্যে স্পৃষ্ট হইলে আমাদের মন তাঁহার দিকে উধাও হইয়া ছুটিতে চায়। আমাদের চিত্তবৃত্তি অপ্রাকৃত রস-সঞ্চারে উদ্দীপ্ত করিয়া রসময়রূপে অপ্রাকৃত আনন্দলীলায় তিনি আমাদের প্রাণে জাগেন। তাঁহার চিন্তা করিলে আমাদের বুকখানা ভরিয়া উঠে, আমাদের হৃদয়-শতদল তাঁহার অমল উজ্জ্বল দল মেলে। তিনি কামময়, 'নিরন্তর কাম-ক্রীড়া তাঁহার চরিত।' তাঁহার সংস্পর্শে গিয়া আমাদের মন, বুদ্ধি, আমাদের অহঙ্কার তাঁহার প্রেমময় রসময় সঙ্গের তরঙ্গ-লীলায় দ্রবীভূত হইয়া যায়। আমাদের অঙ্গটি বিশ্বতোব্যাপ্ত তাঁহার রূপে রসে জড়াইয়া মিলাইয়া দিয়া আমরা আমাদের স্বরূপধর্ম্মগত সম্বন্ধটি আস্বাদন করিতে উন্মুখ হই। আমাদের সহিত তাঁহার এই আত্মভাবটি সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বগুণের আভাসসম্পন্ন তাঁহার লাবণ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। সে অবস্থায় অপরকে আর পাইব কোথায়? বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, জীবের নিকট চিদচিৎবিশিষ্ট সমগ্র জগৎ যখন আত্মা বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখন আর ভেদবুদ্ধিতে বিচার করিবার

জন্য কে থাকিবে ? প্রকৃতপক্ষে দেহাত্মবুদ্ধিই ভেদভাবকে সৃষ্টি করে। দেহটি শ্রীভগবানে নিবেদিত হইয়া তাঁহার ভাবে প্রভাবিত হইলে দেহত্যাগ এবং অপর দেহে প্রবেশরূপ জন্ম-মৃত্যুর খেলা আর চলে না। একই আত্মা বিভিন্ন ক্ষেত্র বা দেহে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করিতেছেন। পৃথক পৃথক ভূতভাবের মধ্যে এমন অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু-স্বরূপে ভগবানকে দর্শন করাতেই আমাদের সম্যক্ দর্শন সিদ্ধ হয়। জড়াপ্রকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া এমন দর্শনে জীবের সহিত ব্যক্তভাবে যুক্ত হইবার নিত্য সংবেদনে শ্রীভগবানের মাধুরী প্রদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি তখন আমাদের ঘরে, তিনি চরাচরে। জড়ে শুনি আমরা তাঁহারই স্বর। সেই স্বরে আমাদের প্রতি আদরের পরম নির্ভরতা আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করি। আমাদের উপাধিগত ভেদভাব বিলুপ্ত হয়। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিকে আমাদের নজর যায়। আমরা তাঁহার প্রেমে পড়ি। তাঁহার এই প্রেমের ফাঁদে পড়িলে আর কোন বন্ধনই কেহ মানে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি বলিয়াছেন—'স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে' —(প্রশ্নোপনিষৎ-৪।৭) অর্থাৎ পক্ষিগণ যেরূপ বাসবৃক্ষের দিকে ধাবমান হয় ঠিক সেইরূপ বক্ষ্যমাণ চরাচর-জগৎ পরব্রহ্মে সম্যক্ আকৃষ্ট হইয়া চিরন্তন আশ্রয়-স্বরূপে তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। যাহার দিকে প্রেমের ঠাকুরটির এমন দৃষ্টি পড়ে তাহার কিছুই তিনি রাখেন না। তিনি চারিদিক হইতে তাহাকে যেন ঘিরিয়া ফেলেন। অন্য কোন বস্তুর প্রতি সাধকের তখন অনুসন্ধান থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি' —(শ্বেতঃ-১।১০)। যিনি 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞাধিপতির্গুণেশঃ' আমরা তখন তাঁহাকে আমাদের আত্মায় পরমাত্মাস্বরূপে উপলব্ধি করি এবং আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির প্রবর্ত্তকস্বরূপে তাঁহাকে মনন করিয়া নিজেদের সম্বন্ধ-সূত্রে ঈশ্বর-পরমাত্মার পূর্ণ বিগ্রহস্বরূপ শ্রীভগবানের সেবার আনন্দ

লাভ করিয়া আমরা অমৃতের অধিকারী হই। 'ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ' এক দেব ক্ষর এবং অক্ষর যুক্ত করিয়া আত্মমাধুর্য্যে আমাদের দৃষ্টিতে তখন দীপ্ত হন। এইভাবে আমাদের সম্বন্ধে জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক হইয়া পড়ে। 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরং পশ্যতি যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ'—যখন দ্বৈতমূলক ভেদজ্ঞান থাকে তখনই অন্যকে দেখে, কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা এইরূপ জ্ঞান জন্মে তখন সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মের প্রকাশবিশেষ রূপে উপলব্ধি হয়। এইরূপ যিনি তিনিই জ্ঞেয়।

শ্রুতির পথে সাধনা

জীবের পক্ষে জ্ঞেয় হইলেন ভগবান্। তাঁহাকে পাইলে আমাদের অমৃতত্ব লাভ হয়। শ্রীভগবানের মুখে আমরা ইহা শুনিয়াছি। তিনি জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তির সমন্বয়ের পথে জ্ঞেয়তত্ত্বের জ্ঞান লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই লক্ষণ তিনি ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৯ম হইতে ১২শ শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন। ফিরিস্তি খুবই লম্বা। এই জ্ঞান অর্জ্জন করা আমাদের মত বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই সব জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া জ্ঞেয়তত্ত্বের যে সাধনা তাহাও সুদুষ্কর। ভগবান বলিয়াছেন— ধ্যানের পথে কেহ কেহ প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকরূপে সাংখ্যযোগ অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করেন, অন্য কেহ কর্ম্মযোগে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে লাভ করেন। শ্রীভগবানের এমন বোলচালে আমরা গোলে পড়িয়া যাই। আমাদের মত মূর্খ লোকের পক্ষে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, ভগবান্ কেমন তাহাই আমরা জানি না, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তবে যাইব কেন? ধ্যান তো অনুমানের ব্যাপার নয়। সদসৎ-বিবেক-বিচারই বা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন জীবের পক্ষে সম্ভব হইবে কেমন করিয়া? ভগবানকে প্রীতির সূত্রে আপন করিয়া না পাইলে কর্ম্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করিবার উপদেশও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের মত অজ্ঞ এবং বিষয়াসক্ত জীব তত্ত্বকথা কিছু বুঝে না। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, ব্রহ্ম কি বস্তু, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কিছুই আমাদের নাই। ঐ সব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে আমাদের মাথা গুলাইয়া যায়। আমাদের অবস্থা এমনই। আমাদের পক্ষে ভগবৎ-কৃপা লাভের কি উপায়? গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে জ্ঞেয়-বস্তুর সম্বন্ধে তত্ত্বকথা অনেক ভাবে বুঝাইয়া পরে সেই উপায়টি ব্যক্ত

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানে যাহারা অনধিকারী, ধ্যান-ধারণা করিবার উপযোগী মনোবৃত্তির স্থৈর্য্য যাহারা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে এক পথ আছে। সে পথটি হইল শ্রবণ। কৃপা-পরায়ণ ভক্তদের মুখে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ করিয়া তাহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। "ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ" (নারদীয় ভক্তিসূত্র-৮।৫৮) অর্থাৎ যত প্রকার সাধন আছে তন্মধ্যে ভক্তিপথই সহজ। শ্রবণের পথে এক্ষেত্রে উপাসনার ফলোপধায়কতার সৌলভ্যে পরম বস্তুটি ভগবদ্ভক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই উপাসনা কেমন? জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট সংসারী জীব—কৃষ্ণ-সেবা বহির্ম্মুখ। ভগবানের সম্বন্ধে চিত্তবৃত্তি উদ্বুদ্ধ না হইলে তাহার পক্ষে এই সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিবার সামর্থ্যই বা কোথায়? বাঁচোয়া এই যে আমাদের সামর্থ্যের অপেক্ষা অন্ততঃ শ্রবণের ক্ষেত্রে নাই। 'লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণ-কীর্ত্তনাৎ' (নারদীয় ভক্তিসূত্র-৫।৩৭)। মহামুনি নারদ বলেন, সাধন-ভজনবিহীন ব্যক্তিও ভক্তের নিকট ভগবৎ-গুণ ও লীলাদি শ্রবণ এবং তাহা কীর্ত্তন করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভে অধিকারী হয়। ভগবানের নাম তাঁহার রূপ, গুণ এবং লীলাকথা-শ্রবণে যাহাদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয়, তাহাদের অন্তরে প্রেমের দেবতার আসন আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যায়। তিনি নিজের গরজে আসিয়া তাহাদের হৃদয় জুড়িয়া বসেন। ভক্ত-মুখোচ্চারিত শ্রীভগবানের নাম শ্রুতি-পথে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করে এবং ভগবৎ-প্রেম কামাসক্ত জীবের অন্তরেও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যিনি জীবের আত্মা, যিনি প্রিয়, তিনি এক্ষেত্রে স্বপ্রকাশ। মায়াবদ্ধ জীব নিজেই বুঝিতে পারে না কেমন করিয়া কোথা হইতে কি ঘটিতেছে। সে শ্রুতির সূত্রে নামের রসে ডুবিয়া প্রেমের রাজ্যে নিজেরই যেন অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ভগবৎ-ভক্তির কূলপরিপ্লাবী প্রবাহে জীবের যুগ-যুগান্তরের আবর্জ্জিত অবিদ্যাময় কর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হয়। সর্ব্বাশ্চর্য্যময় প্রেমের দেবতার এমন উদয়। শ্রবণের পথে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে

ভগবানের সঙ্গে জীবের এমনই সংযোগ লাভ হয় এবং সুরু হয় স্বরূপ-ধর্ম্মের সম্ভোগ। সেই গভীর, গূঢ় এবং গাঢ় সংবেদনশীল স্পর্শে সর্ব্বাত্মরসে জীবের জীবনে যৌবন-মহিমার জাগরণ ঘটে। প্রেমের দেবতার পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে জীব তখন আত্মনিবেদন করে। এই ভাবে জীবের পক্ষে লাভ হয় 'পরম পুরুষার্থরূপ প্রেম মহাধন'। নাম শ্রবণের পথে জীবকে "কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন।"

নাম-রসে যাঁহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, ভগবানের জন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে কোন সাধন-ভজন করিতে হয় না। 'স্বয়ং ফলরূপেতি ব্রহ্মকুমারাঃ' অর্থাৎ নারদ এবং সনৎকুমারাদির মতে ভক্তি স্বয়ং ফল-স্বরূপা। ভগবান্ নিজেই তাঁহার কথাশ্রবণে রুচিবিশিষ্ট ভক্তের কাছে ছুটিয়া আসেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবের জন্য শ্রীভগবানের এই ছুটাছুটির ছন্দই তাঁহার পরমবীর্য্যে প্রকটিত হয় এবং ভগবত্তাসার মাধুর্য্য সর্ব্বোপাধি লয় করিয়া সকলকে আকর্ষণ করে। প্রত্যুত ভক্তচিত্ত হইতে বিচ্ছুরিত ভগবৎ-প্রেমের এমন সংবেদন-স্পর্শ শ্রবণের পথে যিনি একবার লাভ করিয়াছেন—স্বয়ং ভগবান তাঁহার সন্নিকর্ষের জন্য আকুলতা অনুভব করেন। এই সন্নিকর্ষেই রসের উৎকর্ষ—আমাদের অন্তরের মূলে অব্যবহিতভাবে ভগবান তখন প্রতিষ্ঠিত, অন্য কথায় পীঠস্থভাবে তখন তাঁহাকে পাওয়া। এখানে কৃত্য জীবের নয়, কৃত্য দাঁড়ায় ভগবানের। ভগবানের নাম-শ্রবণে আসক্তচিত্ত জীবের কাছে অপৌরুষেয় সংবেদনে বেদের পরম গুহ্যতত্ত্ব লীলাছন্দে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠে। এই সংবেদনে অপরা প্রকৃতির অভিভূতির রাজ্যে পর্য্যন্ত চিন্ময় আনন্দরসে উচ্ছল, উজ্জ্বল, 'অকলঙ্ক পূর্ণকল', শ্রীভগবানের লাবণ্য ঝলমল করিয়া উঠে। গীতায় শ্রীভগবান্ শ্রুতিপরায়ণ বলিয়া এমন সাধকের প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতিমূলে সংবেদনময় আনন্দঘন এই অয়ণটি কেমন, কি মাধুর্য্য সেই রাজ্যের আস্বাদন, কৃপালব্ধ সাধকেরই শুধু অনুভবগম্য। ধ্যান, জ্ঞান এবং কর্ম্মপথে সাধনা প্রকৃতপক্ষে মনকে একাগ্র করিবার প্রক্রিয়া স্বরূপ; কিন্তু মনটি

ভগবানকে দেওয়া নয়। কারণ সেগুলি ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপেই গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু শ্রবণের পথে উপেয়ের সঙ্গেই সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমাদের সংযোগ ঘটে। শ্রবণ আমাদের চিত্তকে স্বাভাবিকভাবে তদ্ভাবে প্রভাবিত করে। শ্রবণ এই দিক হইতে রাগাত্মিকা সাধনা। শ্রীভগবানের রূপে রসে মাধুর্য্যে তাঁহার বীর্য্য শ্রবণের সূত্রে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমাদের চিত্তে প্রকটিত হয়। অর্জ্জুনের মুখে শ্রবণের এমনই একটি গূঢ় রীতির পরিচয় আমরা পাই। তিনি দশম অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে এই রহস্যটি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তুমি পরম ব্রহ্ম, তুমি পরম ধাম, তুমি পতিতপাবন পুরুষ, তুমি নিত্য, তুমি দিব্য, তুমি আদিদেবতা, জন্মরহিত তুমি, তুমি বিভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস এবং সকল ঋষিরাই তোমার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের মুখে যে কথা শুনিয়াছি, আজ তোমার নিজের মুখেই সেই কথাই শুনিতেছি। এক্ষেত্রে অর্জ্জুনের উক্তির রহস্য এই যে, যাহা পূর্ব্বে তৎ ছিল, ছিল তাহারা, তাহাই হইয়া দাঁড়াইল 'ত্বং' অর্থাৎ তুমি নিজে। কথাটি দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রথমে ঋষিদের মুখে শ্রীভগবানের কথা শোনা যায়, অর্জ্জুনও সেই-রূপই শুনিয়াছিলেন। ঋষি-বাক্যের শ্রুতিসূত্রে চিত্তের পরিশুদ্ধতা ঘটে। ইহার ফলে হৃদয় আলো করিয়া ভগবান জাগেন এবং স্বয়ং তাঁহারই মুখে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তাঁহার কথা শোনা হয়, প্রাকৃতে হয় অপ্রাকৃতের স্ফূর্ত্তি, জড়ে জাগে চিদ্বিভূতির রীতি। যিনি উত্তম পুরুষ, তিনিই মধ্যমের মাধ্যমে পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত হন। এই অবস্থা লাভ হইলেই জীবের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহার সাধন-ভজনের পরি-সমাপ্তি ঘটে। বাচক নিজে আসিয়া তাঁহার বচন-মাধুরীর চাতুরী আমাদের হৃদয়রাজ্যে বিস্তার করিতে থাকিলে আমাদের বাচ্য শেষ হয়, আর বলিবার কিছু থাকে না। ভাগবতে দেখিতে পাই, মহারাজ পৃথু শ্রীমন্নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

"ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ।"

অর্থাৎ হে নাথ, মহৎ-শ্রেষ্ঠগণের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্গত তাঁহাদের মুখ দ্বারা বিনিঃসৃত আপনার নাম-রূপ-গুণ-লীলার মকরন্দ-রস মোক্ষপদে নাই, সুতরাং আমি কখনও তাহা কামনা করি না। আপনার নাম-সুধা-রস পান করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা; আমি অন্য বর চাহি না। ভাগবতে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রবণের পথে পরাভক্তির এই রীতিটিকে পরিস্ফূর্ত্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ, তোমার নামের সঙ্গে তোমার বিক্রীড়াটি সর্ব্বদা বিজড়িত থাকে এবং তাহা থাকে বলিয়াই তোমার নামটি শ্রবণ-মঙ্গল বা শুনিতে মধুর হয়। এই বিক্রীড়া অর্থে শ্রীভগবানের একটি বিশেষ ক্রীড়া বুঝায়। বিশেষ বলিতে ইহাই বুঝা যায় যে, অন্য কোনরূপ সাধন-প্রকরণে শ্রীভগবানের এই ক্রীড়াটি ব্যক্ত হয় না। এই বিক্রীড়ার স্বরূপটি কি? ইহার পরিচয় কুরুক্ষেত্রে মিলে না, সেজন্য বৃন্দাবনে যাইতে হয়। ব্রজবধূসহ কৃষ্ণের রাস-বিলাসই এই বিক্রীড়া। ফলতঃ নামের শ্রুতিসূত্রেই এই বিক্রীড়ার পরমবীর্য্যে ভগবানের আত্ম-মাধুর্য্যের চাতুরী বিস্তার লাভ করে। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

"দুহুঁ নাম পুনি পুনি ভক্ত মুখে শুনি শুনি
পরম আনন্দ হৃদে পাও।"

তবেই লীলার রাজ্যে আমাদের চিত্ত অনুপ্রবিষ্ট হয়।

"হেমগিরি তনু রাই আঁখি দরশন চাই,
রোদন করয়ে অভিলাষে।
জলধর ঢর ঢর অঙ্গ অতি মনোহর
রূপেতে ভুবন পরকাশে॥"

শ্রবণের পথে প্রেমের পরিস্ফূর্ত্তিতে লীলা-মাধুর্য্যের প্রকাশ এবং তাহার বিলাসের খোলামেলা এমন খেলা। ভাগবতে রুক্মিণী দেবী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিকট লিপিতে আমরা শ্রবণের এমন বৈভবের বিশেষ পরিচয় পাই। শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রসাদে তৎকৃত

চৈতন্যভাগবতে দেবীর উক্তি অমৃত-মধুর গীতিচ্ছন্দে আমাদের পক্ষে আস্বাদ্য হইয়াছে। দেবী লিখিয়াছেন—

"শুনিয়া তোমার গুণ ভুবন-সুন্দর
দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর।
সর্ব্বনিধি লাভ তোর রূপ দরশন
সুখে দেখে বিধি যার দিলেক লোচন।
শুনি যদুসিংহ তোর যশের বাখান
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত ধায় তুয়া স্থান।"

শ্রবণের ফলে দর্শন, দর্শনের ফলে আত্মনিবেদন। ভগবৎ-প্রেমের এই রীতি সর্ব্বজনীন এবং সনাতন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নামটি শুনিবার জন্য কাণটি বাড়াইয়া দিলেই তাঁহাকে পাওয়ার ধারাটি সঠিকভাবে ধরা হইল, তখন তাঁহাকে ধরা দিতেই হইবে। শ্রবণের পথে এই সাধনা জাতি বর্ণাশ্রমাদির অপেক্ষা করে না—"শ্রুত্বান্যেভ্যো উপাসতে" বহুবচন প্রয়োগে অবিরত ভগবানের নাম শ্রবণ করিবার জন্য চিত্তের অতন্দ্রিত আগ্রহ এবং সকলের মুখে সেই নামটি শুনিবার জন্য আকুলতাই গীতার ভগবদুক্তিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নামরসাকৃষ্ট চিত্তের এমন উন্মুখতামূলক সাধনাঙ্গের মধ্যে অনপেক্ষভাবে ফল-প্রদাতৃত্বের মহিমাই ভগবদুক্তিতে ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। শ্রবণের পথে শ্রীভগবানের আত্মভাবকে ব্যক্ত করিবার এই ধারাটি শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকট দশম অধ্যায়ে তাঁহার প্রভবতত্ত্বের উপাসকের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের চিত্ত তাহাতে অভিনিবিষ্ট হয়। অর্জ্জুন নিজেও এই সত্য উপলব্ধি করেন যে, শ্রীভগবান্ নিজে আসিয়া ধরা না দিলে কেহ তাঁহাকে পায় না এবং শ্রুতিপথেই তাঁহাকে ধরিবার মত ধৃতি লাভ করা যায়। 'ঈক্ষতের্নাশব্দাৎ' —ব্রহ্মসূত্রের এই নির্দ্দেশ। প্রকৃতপ্রস্তাবে শব্দমূলে শ্রুতিকে আশ্রয় না করিয়া ভগবানের ঈক্ষণ বা তাঁহার কৃপাসূত্রে অপ্রাকৃত ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত অনুভূতি লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভাগবত

বলিয়াছেন—শ্রবণের পথে তাঁহাকে দেখিতে হয়। সে রাজ্যকে না দেখিলে আমাদের এই প্রাকৃত রাজ্য দেখিয়া সেই রাজ্যের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করা সম্ভব নয়। বেদাদি শাস্ত্রের বিচারের দ্বারা শ্রীভগবানের গুণ-কর্ম্মাদির সম্বন্ধে অনুমানই শুধু হয় কিন্তু যথাযথ অনুভব হয় না। প্রত্যুত শুধু শ্রবণের সূত্রেই সেই অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ শ্রবণ বলিতে শ্রীভগবানের গুণ, তাঁহার পরিকর এবং তাঁহার লীলা-মাধুর্য্যপূর্ণ শব্দসমূহের কর্ণস্পর্শ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য প্রথমে ভগবন্নাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। নাম-শ্রবণে চিত্তের বিশুদ্ধি সাধিত হইলে চিত্তে তাঁহার রূপের স্ফুরণ ঘটে। রূপের স্ফুরণে জাগে গুণের আকর্ষণ। গুণের স্ফুর্ত্তি হইলে নাম-রূপ-গুণের সহিত পরিকরগণের স্ফুরণ সাধিত হয়। ইহার পর লীলার স্ফুরণে চিত্তবৃত্তির সামগ্রিক ভাবে উজ্জীবন লাভ হয়। ফলতঃ আমাদের সর্ব্ববিধ অনুভূতির মূলে সূক্ষ্মভাবে শ্রবণই কাজ করে, কিন্তু ধারাটি আমরা ধরিতে পারি না। কারণ আমাদের মনের অহঙ্কৃত স্থূল স্তরের উপর আমাদের নজর এবং নির্ভর থাকে। মনের ভিতর তলাইয়া শ্রবণের সূত্রে শ্রীভগবানের অনুকম্পনের খেলা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমরা মনে করি, আমরাই সাধন-ভজনে উদ্যোগী হইয়াছি। নিজেরাই পথটি খুঁজিয়া লইয়াছি, কিন্তু উহা সত্য নহে। ভগবানই আমাদিগকে সর্ব্বদা খুঁজিতেছেন। আমাদের জন্য তাঁহার এই সংবেদনটি অন্তরে উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন-ভজনের সুরুই হয় না এবং সাধন-ভজনের নামে অহঙ্কার আমাদের মনের বিকারই বাড়াইয়া তোলে। বস্তুতঃ বেদমুখে ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের সাধনা সুরু হইয়া থাকে এবং ঋষিদের বচনের অন্তর্নিহিত বিশেষ শক্তি শ্রবণের গূঢ় রীতিতেই আমাদের সুপ্ত চিত্তবৃত্তিকে জাগ্রত করে। ঋষিদের এই শক্তি অনেকটা আমাদের চিত্তকে অপরিজ্ঞাতভাবেই শ্রীভগবানের সম্বন্ধে লইয়া যায়। ইহার ফলে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমরা আস্তিক্যবোধে

উদ্বুদ্ধ হই। বস্তুতঃ আমাদের আস্তিক্যবোধের মূলে ঋষিবাক্যের অন্তর্নিহিত জীব-চিত্তের উজ্জীবনাত্মক রীতিটি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। ঋষিদের কৃপা হইতে ঋষিদের যিনি ঋষভ শ্রুতির সূত্রেই আমরা তাঁহার অনুগতিও লাভ করিতে সমর্থ হই। ঋষিরা কৃপাময়। তাহারা নানাভাবে ভগবানের কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। 'ঋষিভির্বহুধা গীতং' ভগবানের মুখেই আমরা একথা শুনিয়াছি। ভাগবত বলেন—

"ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।"

(ভাঃ-১১।৯।৩১)

অর্থাৎ ঋষিগণ বহুভাবে ভগবানের গুণ গান করিয়াছেন। বহু মুখে তাঁহাদের কীর্ত্তিত ভগবৎ-গুণ শ্রবণে একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপের মাধুর্য্যে চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য আমরা মুখে কত বুলি আওড়াই কিন্তু তাঁহার প্রতি সত্যই আমাদের অন্তরে আগ্রহ থাকে কতখানি? আগ্রহ যদি না থাকে তবে অনুগ্রহের আকারটি ধরিব আমরা কি ভাবে? দেখিব যে, সব জায়গাতেই বিকার। আকার বলিতে স্থান বা দেশের সীমায়িত পৃথিবীর একটি পঞ্চ-ভৌতিক প্রতিবেশ আমাদের মনে উদয় হয়। ভগবানের শির-মুখ-কর-চরণ প্রভৃতির সম্বন্ধে ইহার ফলে জড়বোধ চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর এমন আশঙ্কাই করিয়াছেন। "স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি"—(ব্রহ্মসূত্র-৩।২।১১)। এই শ্লোকের ভাষ্যে তিনি এমন বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের শ্রীবিগ্রহের চিন্ময় আনন্দরসের সংস্পর্শে ভক্তচিত্তের জড় বিকারবোধ এক্ষেত্রে বিলীন হইয়া যায়। 'তাঁহার বিভূতি-দেহ সব চিদাকার' এই সত্যটি আমাদের অনুভূতিতে উজ্জ্বল আকার ধারণ করে। বস্তুতঃ যাঁহারা ভগবানের নামটি আমাদের কাণে মধুর করিয়া তোলেন—তাঁহারাই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-মূর্ত্তি; অন্য আশ্রয়ে জীবের নিগ্রহ। নামের পথে প্রেমদাতা

ভক্ত শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের শক্তিস্বরূপ। তাঁহাদের মুখে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণে তাঁহাদের সম্বন্ধ-সূত্রে ভগবানের জন্য যদি আমাদের চিত্তে আগ্রহ জাগে তবে আর চিন্তা বা উদ্বেগের কোন কারণ নাই। আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, তাঁহাদের কৃপার চাতুরীতে পড়িয়া আমরা ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী হই। তবেই ভগবানের চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহসেবার অধিকার সর্ব্ববিধ সৌলভ্যে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের পক্ষে মিলে। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ এজন্য শ্রবণকেই ভগবৎ-সাধনার শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তত্তল্লীলা-শ্রবণস্তু তত্তৎ-প্রেক্ষণং বিনাপি কার্য্যকারম্'—শ্রবণ শ্রেষ্ঠ সাধন, কারণ অন্যান্য সাধন ব্যতীতও ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় বলিয়াছেন —শ্রবণ ব্যতীত শ্রীভগবানের আস্তিক্যবুদ্ধির মূলস্বরূপ তত্তৎ-রূপ-গুণ-লীলাদির স্ফূর্ত্তিই হয় না। প্রকৃতপক্ষে গীতায় শ্রীভগবান ধ্যান, জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই তিন পথে জ্ঞেয়তত্ত্বের সাধনা ইতঃপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া অতঃপর শ্রবণের পথের যোগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। তিনি সব গোছাইয়া আনিয়া শ্রবণের মূলে সাধনায় অব্যভিচারিণী ভক্তির রীতিটি আমাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ধ্যান, জ্ঞান এবং কর্ম্মযোগের যাঁহারা সাধক তাঁহারাই উত্তম অধিকারী, শ্রুতিপথের সাধকেরা তাঁহাদের অপেক্ষা অপকৃষ্ট ভগবদুক্তির অভিপ্রায় এরূপ নহে। কেহ কেহ এই অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সহিত গীতার্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। "অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে"—এস্থলে 'তু' শব্দের দ্বারা ধ্যান, জ্ঞান এবং কর্ম্মপথে সাধনার অপেক্ষা না রাখিয়াই শ্রুতিপথের সাধকগণ শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এমন কথাই আমাদিগকে দিয়াছেন এবং তেমন সাধকগণের সাধনার পরমোৎকর্ষতা তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—'তেহপি চাতিতরন্ত্যেব', এখানে 'তেহপি' শব্দ প্রয়োগে তাঁহাদের প্রতি শ্রীভগবানের বিশেষ আকর্ষণ এবং 'এব' শব্দের দ্বারা

তাঁহাদের সিদ্ধির সুনিশ্চয়তা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। **'শ্রুতিপরায়ণাঃ'** এই বিশেষণের দ্বারা শ্রুতিপথের সাধকদিগকে বিশেষিত করিয়া ভগবান বেদার্থে তাঁহাদের বুদ্ধির প্রকৃষ্টরূপ পরিনিষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'যার কৃষ্ণ-কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্।' বস্তুতঃ গীতার জ্ঞেয়তত্ত্বের নির্দ্দেশে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য আস্বাদনে আমরা অধিকারী হই। প্রভু বলিয়াছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম॥" (চৈঃ চঃ)

গুণত্রয়বিভাগ যোগ

১। সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ॥
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

২। গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবান্ ॥
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

৩। মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ॥
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

৪। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ॥
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গতি

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়তত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই তত্ত্বটি দুরূহ, কিন্তু এইটি না বুঝিলে আমাদের জীবনের সমস্যা মিটে না। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন, যাঁহারা আমার ভক্ত একমাত্র তাঁহারাই এই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমাকে উপলব্ধির সামর্থ্য অর্জ্জন করে। এই জগতের সহিত এবং তাহার নিজের সহিত সে আমার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে। 'মামেবৈষ্যসি' অর্থাৎ ভগবানকে সর্ব্বভাবে পাওয়াই গীতার মন্ত্রবীজ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বীজ—'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে'। চতুর্দশ অধ্যায়ের মন্ত্রবীজ—"মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" অর্থাৎ তাঁহার সধর্ম্ম বা সমান অধিকার লাভ করা। পারম্পর্য্যের সূত্র ধরিয়া ধারাটি কোন দিকে অগ্রসর হইয়াছে আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। লক্ষ্যটি যিনি জীবন-দেবতা প্রীতির সূত্রে তাঁহার সহিত জীবের সমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন এবং সেই ভাবে তাঁহার আত্মমাধুর্য্য আস্বাদন এবং জীবকে তাহা আস্বাদন করানো। এই একই লক্ষ্যের উপর গীতায় পুনঃপুনঃ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপদিষ্ট সাধ্যবস্তুটি সাধনাঙ্গে অধিকতর পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধটি উপলব্ধি করা প্রথমে প্রয়োজন। পরে দেখা দেয় সেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় বা অভিধেয়। যিনি অবিভক্ত অথচ বিভক্তরূপে প্রতীত হন, তিনি সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত, অথচ সকল পদার্থের একমাত্র আশ্রয়। যিনি নির্গুণ, নিরুপাধিক, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন তিনিই আবার আকৃতি-প্রকৃতি ধারণ করিয়া মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন এবং সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াও নিখিল বিশ্বমূর্ত্তিতে আপনাকে

অব্যাকৃতভাবে অনুস্যূত রাখেন। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা সুকঠিন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"এইমত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়,
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অবিচিন্ত্য হয়।
আমি তো জগতে বসি জগৎ আমাতে,
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে।
অবিচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যগণ জানহ আমার,
এইমত গীতা-অর্থ কৈল পরচার।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব এবং জগতের সহিত শ্রীভগবানের এই সম্বন্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ঈশ্বর হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। এইটি পরিণামবাদ। পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া লইলে ঈশ্বর বিকারী হইয়া পড়েন, এই যুক্তিতে মায়াবাদী সিদ্ধান্তে জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ঈশ্বরকে বাঁচাইবার জন্যই যেন চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি যেন মর্ত্ত্যধর্ম্মী। মহাপ্রভু বলেন—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান,
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম।"

গীতার সিদ্ধান্তও ইহাই। প্রভু বলিয়াছেন—

"জীব-তত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ॥"

বস্তুতঃ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-মূলে থাকে ভগবানের এই শক্তি—পরা এবং অপরা দুইভাগে বিভক্ত। ফলতঃ পুরুষ এবং প্রকৃতি এই শক্তিদ্বয়েরই নামান্তর। অপরা প্রকৃতি ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই সব বিকার। পরা প্রকৃতি জীবভূতা, এইটি পুরুষ। ঈশ্বর যখন অনাদি, তখন তাঁহার শক্তি প্রকৃতি ও পুরুষ এতদুভয়ও অনাদি। প্রকৃতি এবং পুরুষের কারণটিই শুধু অনাদি সৃষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন ভাষ্যকার এইরূপ অর্থ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গীতার সিদ্ধান্ত

এই যে, বিকারসমূহ ঈশ্বরের অনাদি শক্তিভূতা প্রকৃতি হইতে উপজাত হয়, পুরুষে বিকার নাই। শ্রীভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিন গুণে দেহী বা পুরুষকে দেহে আবদ্ধ করে। জড়া প্রকৃতির সংস্রবে গিয়া জীবরূপী পুরুষের বিকার ঘটে। প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিলে জীব ব্রহ্ম-সংপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতি যদি অনাদি হয়, তবে জীবের পক্ষে তাহাকে লঙ্ঘন করা সম্ভব হইতে পারে না এবং তাহার মোক্ষ বাগ্‌-বিলাস মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। গীতায় এই সমস্যার সমাধান মিলিয়াছে। গীতা বলেন, সৃষ্টির কার্য্য এবং কারণ দুইয়ের কর্তৃত্ব প্রকৃতির—কার্য্যকারণ-কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু, পুরুষে ইহার ভোক্তৃত্ব। কিন্তু জীবকে ভোগ করাইবার শক্তি প্রকৃতির নাই, কারণ প্রকৃতি জড়া বা অচেতনা। পুরুষ বা জীবের এই ভোক্তৃত্বের সূত্রটি কোথায় এবং কিসে সেই ভোগ বিভিন্নরূপে অনিত্য আকারে জীবের প্রাপ্য হইয়া থাকে, এইটি প্রশ্ন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

'জগতের উপাদান প্রধান-প্রকৃতি।
জগৎকারণ নহে, প্রকৃতি জড়রূপা
শক্তি সঞ্চারিয়া কৃষ্ণ তারে করে কৃপা।'

কৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে জড়া প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতি অবিকারী নহে—বিকারধর্ম্মী, কিন্তু বিকারশীল এই প্রকৃতিতে কৃষ্ণের চিৎ-লক্ষণা কৃপা সংবেদিত হয়। পুরুষ বা জীব স্বয়ং ব্রহ্ম নয়। সে চিৎবিশিষ্ট—কৃষ্ণেরই শক্তি বা অংশ। সুতরাং প্রকৃতিতে প্রতিফলিত অংশী কৃষ্ণের কৃপা স্বভাবধর্ম্মে জীবরূপ অংশকে আকর্ষণ করে। পুরুষে বা জীবের স্বরূপধর্ম্মে বিকার নাই সত্য, কিন্তু চিৎকণ জীবের ইচ্ছা আছে এবং এই ইচ্ছা না থাকিলে তাহার ভোক্তৃত্ব ও সিদ্ধ হইত না। শ্রুতি বলেন—

'গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।

স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা

প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ।' (শ্বেঃ-৫.৭)

সংস্কারবিশিষ্ট জীব ফলাকাঙ্ক্ষার জন্য কর্ম্ম করে। সেই জীব স্বকৃত কর্ম্মের ফল উপভোগ করে। বিবিধ দেহধারী সত্ত্বাদি ত্রিগুণমণ্ডিত এই জীব। ত্রিগুণের প্রভাবে জীবের কর্ম্মাসক্তি ঘটে। এই জীব ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং জ্ঞান এই তিন পথে ভ্রমণ করে। পঞ্চপ্রাণের সে অধীশ্বর। নিজ কর্ম্মফল অনুসারেই জীবের সংসারচক্রে গতায়াত ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ জীব বা পুরুষের জড়া প্রকৃতি-নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার-স্বরূপ স্বীকৃত না হইলে মোক্ষবাদে পরম পুরুষার্থ নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রকৃতি-সম্ভোগে জীবের ইচ্ছাকে স্বীকার না করিলে সাধন-ভজন সম্পর্কিত শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।' কৃষ্ণসেবাতেই জীবের সর্ব্বাঙ্গীন সম্ভোগ, নিত্য স্বরূপধর্ম্মে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই পথে অন্তরায় ত্রিগুণ। ইহারা চিৎকণ জীবকে চিৎস্বরূপ চৈতন্যঘন পরম পুরুষের কাছে যাইতে দেয় না। তাহাকে বাঁধিয়া রাখে। বাঁধিয়া রাখে দুইভাবে—প্রথমতঃ নিজেদের তিনজনের মধ্যে প্রত্যেকের দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আপোষ-নিষ্পত্তিমূলক এইভাবে। দ্বিতীয়তঃ সেই নিষ্পত্তির নিরিখ জীবের উপর তাহাদের ক্রিয়া-সূত্রে। ফলতঃ সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ এই তিন গুণের প্রভাবেই জীবের বন্ধন। গীতাতে শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি আমরা পাই। শ্রুতি বলেন—

'সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম-
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে।' (শ্বেঃ-৫।১১)

ভোজন ও পানের দ্বারা যেইরূপ শরীরের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপই সঙ্কল্প বিষয়-সংযোগ, লোভ-দৃষ্টি ও তজ্জনিত মোহবশতঃ জীব স্বীয় পাপ-পুণ্যের পরিপাকানুযায়ী দেবাদিলোকসমূহে কর্ম্মানুরূপ দেহ লাভ

করিয়া থাকে। বস্তুতঃ জীব জড় প্রকৃতির সম্পর্কে বিকারে অভিভূত হইলেও পরমেশ্বরেরই অধীন। শ্রুতি বলেন—

'স তন্ময়োহমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্যজগতো নিত্যমেব
নান্যোহেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়।' (শ্বেঃ-৬।১৭)

তিনিই জগতের শাসক, বন্ধন এবং মোক্ষের হেতুও তিনি। তিনি অমর স্বীয় ঐশ্বর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বত্রগামী। তিনি এই ভুবনের পালক। জগৎ-শাসনকার্য্যে তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ প্রকৃতি পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। জীব তাঁহার প্রতি প্রপন্ন হইলে তবে সে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে— 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে', নির্দ্দেশটি সুস্পষ্ট। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' পার পাইবার আর পথ নাই। একেবারে সোজা কথা।

প্রকৃতপক্ষে জীবের মুক্তির প্রসঙ্গমাত্রেই ত্রিগুণের কথা আসিয়া পড়ে ; কারণ গুণই তাহার বন্ধনের কারণ। গুণের সৃষ্টি হইল কি ভাবে ? কিরূপে জীব গুণের প্রভাবে পড়িল। তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে হইলে সৃষ্টির গোড়ায় যাইতে হয়। প্রলয়কালে নামরূপ-বিশিষ্ট জগৎ স্বকর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া জীবসমূহের সহিত সূক্ষ্মরূপে ভগবানের মধ্যে লীন ছিল। শ্রুতি বলেন—

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমা তিস্রো দেবতা
অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।"
(ছাঃ-৬।৩।২)।

পরব্রহ্ম জীবাত্মারূপে ক্ষিত্যপ্‌তেজ আদিতে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রলয়ে মায়াশক্তি সুপ্তা বা সাম্যাবস্থাপন্না ছিল। কিন্তু পরব্রহ্মের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি জাগ্রতা ছিল। পরব্রহ্ম

এই শক্তির প্রভাবে সৃষ্টির সঙ্কল্প বা ঈক্ষণাদি করেন। ভগবানের সঙ্কল্পপ্রভাবে সুপ্তা প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হইলে তিনি মহাপ্রলয়ে তাহাতে লীন জীবাত্মাকে বীর্য্যস্বরূপে প্রকৃতিতে যুক্ত করেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম-মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

অর্থাৎ মহৎ-ব্রহ্ম বা প্রকৃতি বা মায়া আমার যোনিস্বরূপ—আমি তাহাতে গর্ভাধান করি। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহৎ-ব্রহ্ম তাহার যোনি এবং আমি তাহার বীজপ্রদ পিতা। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যোনি এবং উৎপত্তিস্থল এই মহৎ। নিজের ত্রিগুণাত্মিকা বিকারাদির দ্বারা সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রয়োজন সাধনরূপ ভরণ করে বলিয়া তাহাকে মহৎ বলা হয়। বীজ শব্দে জীবাত্মা এবং মহৎ-ব্রহ্ম শব্দে জড়া প্রকৃতি বা মায়া বুঝান হইয়াছে। ভগবান্ অতঃপর অন্তর্য্যামিস্বরূপে জীবের সুপ্ত কর্ম্মকে প্রবুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী ভূত-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেন।

'যোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেন তং গণম্
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্।'
(ভাঃ-৩।৬।৩)।

জীব এইরূপ ভোগায়তন দেহ লাভ করিয়া অদৃষ্টের ফল ভোগ করিয়া থাকে। পূর্ব্ব কর্ম্ম-সংস্কারানুযায়ী প্রবৃত্তিভেদে এইরূপে ভোগাসক্তির ফলে সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ গুণময়ী প্রকৃতি সনাতনস্বরূপ জীবকে সংসারচক্রে আবদ্ধ করে। "অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" (শ্বেঃ৪।৯) অর্থাৎ সৃষ্ট জগতে জীব ব্রহ্মের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব বিস্মৃত হইলে [illegible]

বা ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইলে মায়ার দ্বারা বদ্ধ হয়। শ্রুতি আরও বলেন—

'স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপানি দেহী-স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ।' (শ্বেঃ-৫।১২)

জীব আপনাতে অধ্যস্ত সত্ত্ব, রজ, তমঃ প্রভৃতি গুণ অবলম্বনে আত্মকৃত কর্ম্মবন্ধনজাত অদৃষ্টবশে স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিভিন্ন শরীরগ্রস্ত হয়। তাহাদের বিশেষ বিশেষ দেহে এইরূপ সংযোগ করণের মূলে অপর একটি বস্তুও থাকে। সেটি হইল অতীতের কর্ম্মফল অনুভবের বাসনা বা সংস্কার। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ এই তিন গুণের সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান আমাদের অনেকেরই আছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। সত্ত্ব গুণ-প্রকাশক বা জ্ঞানমূলক। এতদ্বারা দেহসম্পর্কিত সংসারাত্মক সুখ লাভ হয়। রজঃ গুণ তৃষ্ণামূলক ; ইহার ফলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং দুঃখ লাভ ঘটে। তমঃ গুণ অজ্ঞানতা বা জড়তামূলক। ইহার ফলে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি জন্মে। ভগবান উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—'সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং, বিষয়োত্থং তু রাজসম্, তামসং মোহদৈন্যোত্থং' অর্থাৎ আত্মোত্থসুখ গুণ সাত্ত্বিক, বিষয়ভোগজনিত ভোগ রাজসিক, মোহ-দৈন্যজাত ভাব তামসিক। বিষয়-সংশ্লিষ্ট ভাবমাত্রেই ক্ষেত্র বা দেহ সম্পর্কিত ; সুতরাং তাহা মায়িক এবং বন্ধনের কারণ। জীব ক্ষেত্রজ্ঞ। পঞ্চভূতাত্মক দেহই ক্ষেত্র, ইহা গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত। গুণত্রয় অপরা—জড়, কিন্তু জীবশক্তি চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্টা। এই পরা প্রকৃতিরও ভগবানই কারণস্বরূপ। সৃষ্টিমূলে মহৎতত্ত্বে বীর্য্যস্বরূপে ভগবানের সহিত জীবের সংযোগ রহিয়াছে। বুদ্ধির মূল মহৎ-তত্ত্বের ভূমি। কারণস্বরূপে ভগবানের সহিত জীবের সংযোগ রক্ষা করে বুদ্ধি। বুদ্ধির মহত্তত্ত্বাংশ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইলেও ইহা সম্পূর্ণ জড় নহে, কারণ ব্রহ্ম কর্তৃক সঞ্চারিত শক্তি ইহাতে মিশ্রিত থাকে

বলিয়া মহত্তত্ত্ব চিদচিৎ মিশ্রিত। সৃষ্টির নিমিত্ত কারণস্বরূপে জীব-মায়া এবং উপাদান কারণস্বরূপে গুণমায়া এই দুইয়ের সংযোগে মহত্তত্ত্ব বিধৃত থাকে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব। ভগবানই জীবের পিতা, তিনিই মাতা—একথা আমরা পূর্ব্বেই নবম অধ্যায়ে শুনিয়াছি। 'পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা' ইত্যাদি। কিন্তু পিতৃত্ব-স্থাপনের রীতিটি সেখানে ভগবান্ ব্যক্ত করেন নাই। এখন সেই কথাটি ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি বীজপ্রদ পিতা, আমার গর্ভাধান হয় প্রকৃতিতে। জড় গর্ভাধান হয় জড় ইন্দ্রিয়ের সংযোগে। চিন্ময় পুরুষের গর্ভাধান হয় ঈক্ষণে, কটাক্ষে, হয় তাঁহার সঙ্কল্পে। এই গর্ভাধান হইতে জাত সন্তান জীবগণ। পিতার কাছে লাভ করে ইহারা চৈতন্য, মাতা প্রকৃতিরই কাছে পায়—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়। বিষ্ণুসহস্র নাম বলেন—'ভূতানাং অব্যয়ঃ পিতা।' সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে এই পিতাকে অবলম্বন করিয়া তিন গুণে চলে সৃষ্টির গতি—ধারাটি এইরূপ। এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তি—

'তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার।
সর্ব্বতত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন।' (২।২০)

সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের সূক্ষ্ম উপাদান এবং তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের জন্ম ঘটে।

'মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাৎ রজঃ-সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ
তমঃ-প্রধানস্ত্বভবৎ দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়াত্মকঃ
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ।' (ভাঃ-২।৫।২৩-২৪)

অহঙ্কারের বিকারে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার এবং তামস অহঙ্কারের, উদ্ভব হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট, রাজস

অহঙ্কার ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট এবং তামসিক অহঙ্কার দ্রব্যশক্তিযুক্ত। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের শক্তিতেই ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব কার্য্য-নির্ব্বাহে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। এই দেবতাগণ অন্তর্য্যামিস্বরূপ ঈশ্বরের কৃপাতে প্রণোদিত হইয়া জীবের অদৃষ্টানুরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগীভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে সৃষ্ট জগতের সহিত ভগবানের সংযোগ স্থাপিত হয়। চরিতামৃত বলেন—

'সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চাবতারে
সেই ঈশ্বর-মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে।' (২।২০)

পুরুষাবতার তিনটি—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী। কারণার্ণবশায়ী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী। করুণার্ণবশায়ী 'মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়া পার' (চৈঃ চঃ)। ইনি নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতিকে স্পর্শ করেন। ভাগবৎ বলেন—

'কালবৃত্ত্যা তু মায়য়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্।।'

কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়াতে জীবশক্তিকে বা জীবাত্মাকে নিক্ষেপ করেন। 'স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসে' অর্থাৎ চক্ষুর জ্যোতিঃস্পর্শে প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করিয়া তাহাতে জীবরূপ বীর্য্যকে আধান করেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের 'জীব নিস্তারিব' এই স্বভাবটি এখানে প্রকটিত হয়। বস্তুতঃ ভগবচ্ছৃষ্টির মূলে ভগবানের নিজের কোন প্রয়োজন নাই। ইহা তাঁহার লীলা, এতদ্দারা জীবের প্রতি তাঁহার করুণারই পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় বলিয়াই জীব ভোগায়তন দেহ লাভ করে এবং অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে পারে। কর্ম্মভোগ শেষ হইয়া গেলে সে সাধন-ভজনোপযোগী দেহ পায় এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া থাকে। সুতরাং জীব কোন সময়ই ভগবৎ-

সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হয় না। জগতে আসিয়া সে সুখের সন্ধান করে এবং দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে চায়। কিন্তু মায়ার রাজ্যে সুখ মিলে না এবং দুঃখ হইতেও আত্যন্তিকভাবে জীব নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে না। মায়া জড়রূপা। তাহার নিজের কোন শক্তি নাই, সুতরাং জীবকে সুখ দান করিবার ক্ষমতাও মায়ার নাই। ফলতঃ ঈশ্বরের শক্তিতে সামর্থ্য লাভ করিয়া মায়া নানাবিধ ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করে এবং জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া তাহাকে সেগুলি ভোগ করাইয়া থাকে। সুখের আশাতেই জীব মায়িক বস্তু ভোগে প্রবৃত্ত হয়। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জীবের স্বরূপধর্ম্মে সুখের বাসনা রহিয়াছে। কারণ সুখ আস্বাদনের প্রবৃত্তি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক না হইলে মায়া-সৃষ্ট সুখের সম্বন্ধেও সে অবহিত হইত না। জীবের স্বরূপধর্ম্মে সুখ-বাসনা না থাকিলেও মায়া ব্রহ্ম-কর্তৃক সঞ্চারিত শক্তির দ্বারা নিজে জীবের অন্তরে সুখের বাসনা জন্মাইতে পারে—এই প্রশ্ন উঠে। ইহার উত্তরে বলা যায় মায়ার যদি সুখ-বাসনা থাকিত, তবে সে সুখের ভোক্তৃত্বও তাহার থাকিত। কিন্তু শাস্ত্রে মায়ার ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত হয় না। প্রকৃতপক্ষে জীব ভোক্তা বলিয়াই মায়া হইতে জীবের উৎকর্ষ। "জীবভূতাং পরাং তস্যা ভোক্তৃত্বেন প্রধানভূতাং চেতনরূপাং মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি, যয়া ইদমচেতনং কৃৎস্নং জগদ্ধার্য্যতে"—শ্রীপাদ রামানুজ গীতা-শ্লোকের টীকায় উক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী, শ্রীপাদ বলদেব, শ্রীপাদ মধুসূদন প্রভৃতি সকলেরই অনুরূপ অভিমত। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে মায়ার সুখবাসনা বা সুখভোগের শক্তি নাই, সুতরাং সংসারী জীবে সুখের বাসনা সঞ্চার করিবার সামর্থ্যও মায়ার নাই।

জীব চিৎবস্তু, সুতরাং চিন্ময়তত্ত্ব সুখস্বরূপ ভগবানের অংশ-স্বরূপে সুখবাসনা থাকা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। জীব নিত্য, সুতরাং তাঁহার এই বাসনাও নিত্য। জীবের জ্ঞাতৃত্ব এবং কর্তৃত্বও আছে।

'জ্ঞঃ অতএব হি, কর্ত্রা', 'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ'—ব্রহ্মসূত্র হইতেও জীবের এই ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই জীবের এই সুখ-বাসনা। এই বাসনা জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধসূত্রে পুরাণী প্রবৃত্তিস্বরূপে লাভ করিয়াছে। কিন্তু সংসারী জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। পরমেশ্বরের সঞ্চারিত শক্তিতে মায়া জীবের কর্ম্মবন্ধন কাটাইবার উদ্দেশ্যে জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া তাহাকে প্রাকৃত ভোগের দিকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। কিন্তু চিৎকণ জীবের পিপাসা জড়োপভোগে মিটে না। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং, যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্—ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য'—(ছান্দ্যোগ্য-৭।৩।১৪)। 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া কোন ভাগ্যবান' জীবের চিত্তে এই জিজ্ঞাসা জাগে। জীবের পক্ষে প্রয়োজন প্রেম—ভগবৎ-প্রেমেই জীবের স্বরূপধর্ম্মের পরিপূর্ত্তি, তাহার পরম পুরুষার্থ-লাভ। এই দিক হইতে সংসারের অনিত্যত্ব এবং ভোগ-সুখের পরিণামজনিত দুঃখ জীবের মনে উদ্দীপিত করিয়া মায়া প্রকৃতপক্ষে জীবকে তাহার পুরাণী প্রবৃত্তির পরিপূর্ত্তিকল্পে ভগবানের কৃপালাভে আনুকূল্যই বিধান করেন। 'বহিরঙ্গা মায়া সেও করে প্রেমভক্তি' চৈতন্যচরিতামৃতকারের এই উক্তির যাথার্থ্য এই সত্যে নিহিত রহিয়াছে। পরম পুরুষার্থস্বরূপ প্রেমের রাজ্যে দ্বন্দ্ব নাই; আছে ছন্দ, আছে আনন্দ। পুরুষত্ব স্বয়ং ভগবানে। প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সম্মোহে বিজড়িত জীবকে এক্ষেত্রে পুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সে ভগবানেরই শক্তি এবং ভগবানের পৌরুষ-বীর্য্য-সংস্পর্শেই জীবের উজ্জীবন ঘটে। এই জীবরূপী প্রকৃতি তাহার স্বামীকে জানে না—সে আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতিই চায়। সে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি বা কৃষ্ণসেবা বুঝে না। "সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।" কিন্তু 'গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণং সুহৃদ্' এমন একজন স্বামী জীবের আছেন। তিনি হইলেন শ্রীভগবান্। তাঁহার সহিতই জীবের স্বরূপধর্ম্মগত সম্বন্ধ। তাঁহাকে জানিলে জীব নিজের

পাকা আমির খোঁজ পায়। গীতা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন। গীতা এই স্বামীর যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে জীবের সুখে দুঃখে তিনি তাহাকে ভুলেন না। এই স্বামী স্বাম্য কামনাও করেন না। জীবকে আপন করিয়া পাওয়াতেই তাঁহার কামক্রীড়া পূর্ণতা লাভ করে। বাইবেলের কাহিনীতে বর্ণিত পিতা যেমন তাহার দেশান্তরগত অপরাধী পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বরও। বদ্ধজীব তাঁহাকে ভুলিয়া কষ্ট পাইতেছে, এইরূপ চিন্তায় জীবের জন্য সতত অত্যন্ত দুঃখিত থাকেন। নিদ্রিত শিশুকে মাতা যেমন কোলে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অবস্থান করেন, সেইরূপ ঈশ্বর নিজ-প্রিয় জীবকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা এবং মহেশ্বর-স্বরূপে জীবের দেহেই পরমাত্মরূপে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে জীবের জ্ঞান নাই। শ্রুতি বলেন—

'যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং
সর্বানি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বানি ভূতানি শরীরং যঃ
সর্বানি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।'

(বৃহদারণ্যক—৩।৭।১৫)

যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকেন অথচ সর্ব্বভূত যাঁহাকে জানে না, সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর। যিনি অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বভূতকে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং জীবের তিনি আত্মা। 'স কারণং, করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ'—(শ্বেঃ-৬।৯)। তিনি সকলের কারণ এবং সমস্ত করণের অধিপতি যে জীব তাহারও তিনি অধিপতি। তাঁহার জনয়িতা কেহ নাই। অধিপতিও কেহ নাই। তিনিই পরমতত্ত্ব 'পুরুষঃ পরমঃ'। এই পুরুষ জীবের দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও স্বতন্ত্র থাকেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, এই পুরুষকে প্রকৃতির সমগ্র গুণাদি সহ যিনি পূর্ণস্বরূপে জানিতে পারেন, তাহাকে আর জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয় না। জীব সেক্ষেত্রে জড়া প্রকৃতির বিকারসম্পর্কিত সম্বন্ধ অতিক্রম করে। মায়ামুক্ত জীব পর যিনি তাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে পায় এবং অবর অর্থাৎ

জড়ের রাজ্যেও তাঁহার অখণ্ড আত্মমাধুর্য্য উপলব্ধি করে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

'হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ
হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত।'

অর্থাৎ হ্লাদিনী সন্ধিনী এবং সংবিৎ এই তিনটি বৃত্তি বিশিষ্টা যে স্বরূপশক্তি তাহা কেবল ভগবানেরই আছে, জীবে তাহা নাই। আর হ্লাদকরী (সত্ত্বগুণ), তাপকরী (তমোগুণ) এবং মিশ্রা (রজোগুণ) ভগবানে নাই, কারণ এইগুলি প্রাকৃত গুণ। ভক্ত প্রাকৃতগুণকে অতিক্রম করিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ অপ্রাকৃত ভগবৎ-মাধুর্য্য এই দেহেই আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—'শুদ্ধে চিত্তে জগতোঽপি তদ্বিভূতিরূপত্বেন যথার্থায়াং স্ফূর্ত্তৌ ন দুঃখদত্বম্। তদুক্তম্—ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ' অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধি সাধিত হইলে জগৎ ভগবানেরই চিন্ময়-বিভূতিতে পরিস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়—দুঃখদায়ক থাকে না। ভগবান্ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন আমার প্রসাদে অন্তঃকরণে সন্তোষ সঞ্চারিত হইলে সমগ্র পৃথিবী সুখময় আকার ধারণ করে। এই পরতত্ত্ব সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বসম্বন্ধে আনন্দময়। ক্ষর ভূত-প্রকৃতি এবং অন্তর্য্যামি স্বরূপে জীবের নিয়ন্তা কূটস্থ অক্ষর পুরুষ এই দুইয়েরও অতীত তিনি। সর্ব্বশক্তি এবং তৎসম্পর্কে শক্তিমান্ ক্ষর এবং অক্ষর উভয়ের সমাশ্রয়ে তাঁহার স্বরূপভূতা পরমা প্রকৃতির চিৎঘন-প্রীতিরসে সমুজ্জ্বল সমুত্তুঙ্গ তাঁহার স্বরূপ। এই পরমপুরুষের অনাময় আলোকে প্রকৃতি বা পুরুষের সহিত ছন্দের সম্বন্ধ দৃঢ় হইলে জীবের স্বরূপধর্ম্মে সাধ্যতত্ত্বের সহিত বিশ্বতত্ত্বের সামঞ্জস্য সাধিত হয় এবং জীবের অমৃতত্ব লাভ ঘটে। তিনি 'সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽ-বাক্যনাদর এষ ন আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভি-সংভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি' (ছাঃ-৩।১৪।৪) অর্থাৎ যিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস তিনি সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া।

অবস্থান করিতেছেন। তিনি অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি আমাদের আত্মা। তিনি ব্রহ্ম। দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে আমি তাঁহাকে পাইব, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়তা যাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে এবং সে সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ সংশয়কে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে নিশ্চয়ই লাভ করিবেন। ভগবৎ-সম্বন্ধ জনিত অসংশয়িত এমন প্রীতি-প্রণোদিত মনোধর্ম্মের উজ্জীবনে এবং তাঁহার শ্রীবিগ্রহসেবার আগ্রহে শ্রীভগবানকে জানার অর্থই সমগ্রভাবে তাঁহাকে জানা, অনুমান বা কল্পনার ভূমি অতিক্রম করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত তাঁহাকে জানা। এইভাবে জানিয়া জীব সর্ব্বাবস্থার মধ্যে শিবকে পায়।

প্রকৃতপক্ষে জীবের সাধ্যতত্ত্ব হইলেন এই পরমপুরুষস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে পাইলে মায়ার বন্ধন কাটিয়া যায়। ভূত-প্রকৃতি হইতে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—

'এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'

যিনি সদা-সর্ব্বদা জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, বাহিরে বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাঁহারই লীলা চলিতেছে। তাঁহার আত্মমাধুর্য্যে মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া যাঁহারা তাঁহাতে অভিনিবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা অমৃতের অধিকারী। শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপদেশকালে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।'

প্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—

'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।
সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়।'

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ-মাধুর্য্য জীবের চিত্তে উদ্দীপ্ত হইলে মায়া দেহে আত্মবুদ্ধিজনক মোহে জীবকে আর অভিভূত করিতে পারে না। 'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।' (ভাঃ-২।৫।১৩) অর্থাৎ মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা পায়। দুর্ব্বুদ্ধিগণ এই মায়ায় বিমোহিত হইয়া 'আমি' ও 'আমার' এই অভিমানে পরিস্ফীত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সংস্পর্শে মায়া হইতে মুক্ত হইলে জীব বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সঙ্গতি-সূত্রে অপরিচ্ছিন্ন আত্ম-চৈতন্যে অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সব ক্ষেত্রে নিজ কারুণ্য-লীলার লাবণ্য বিস্তার সাধিত হইয়াছে। পরম পুরুষস্বরূপে তিনি জীবের ভিতরে এবং বাহিরে জাগ্রত রহিয়াছেন। এই অধ্যায়ে আমাদের আস্বাদ্য হইয়াছে তাঁহার এই লীলাটি। এইভাবে ভূত-প্রকৃতি বা ক্ষর-তত্ত্বে তাঁহার চিদ্বিভূতির খেলা খুলিয়া গিয়াছে। এইরূপে তাঁহাকে উপলব্ধিতে আমাদের জীবনে তাঁহার প্রিয়ত্বের স্ফূর্ত্তি আমরা অনুভব করি। তাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধি করিয়া জীব ক্ষর-প্রকৃতির মূলে তাঁহার অপার মাধুর্য্যটি প্রস্ফুট দেখিতে পায়—সেই রস আস্বাদনে উপাধির বিচার লঙ্ঘন করিয়া জীবের চিত্ত উধাও হইয়া ছুটে। এইরূপে জীব বিশ্বপ্রকৃতিতে রসের বিলাস-বৈচিত্র্যের অনুভূতিসূত্রে দেহাত্মবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া অবিনাশী আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে উপদেশকালে ভাগবতের

নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেন—

'অহমেবাসমেবাগ্রে
নান্যদ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।'
(ভাঃ-২।৯।৩২)

প্রভু বলেন, এই শ্লোকে ভগবান্—

'অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার
পূর্ণৈশ্বর্য্য-বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার।
সে বিগ্রহ যে না মানে নিরাকার মানে
তারে তিরস্কার করি কৈল নির্দ্ধারণে।
এই সব শব্দ হয় বিজ্ঞান-বিবেক
মায়া-কার্য্য আমা হৈতে আমি ব্যতিরেক।
যৈছে সূর্য্যাভাব স্থানে ভাসয়ে আভাস
দুই বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ।
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।'

এই অবস্থা গুণাতীত। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গীতার দেবতার উক্তিতে আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিব। এই অবস্থায় জীব শ্রীভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করে। এই সাধর্ম্ম্য লাভ বলিতে জীবের পক্ষে কৃষ্ণ-ভজন লাভ। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ দোষে মায়া হৈতে ভয়
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়।
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়।'

কৃষ্ণ-ভজনের চেতনাকেই শ্রীভগবান পরম জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন এই জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ এই

পৃথিবীতেই সিদ্ধি অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থ লাভ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।'

(কঠ-২।৩।১৪)

মায়াবদ্ধ জীব তাহার অন্তরে নিবদ্ধ সর্ব্বপ্রকার কামের বন্ধন হইতে যখন মুক্তি লাভ করে, তখন জীবিত অবস্থাতেই সে অমৃতত্বের অধিকারী হয়।

গুণাতীত অবস্থা

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান', বিবর্ত্ত বলিতে এক্ষেত্রে মায়াকেই বুঝাইতেছে।

'কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।'

প্রভু জীবের সংসার বন্ধনের কারণটি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মায়ার বন্ধনটি গুণ সম্বন্ধের বন্ধন। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। চতুর্দশ অধ্যায়ের সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিন গুণের প্রভাবে জীবের প্রকৃতির কিরূপ তারতম্য ঘটে শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকট তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সত্ত্ব গুণ প্রকাশক, রজঃ তৃষ্ণামূলক এবং তমঃ অজ্ঞানতামূলক—প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা তাহার ধর্ম্ম। রজঃ ও তমঃকে পরাজিত করিয়া একমাত্র সত্ত্বগুণ যখন হৃদয়ে বিরাজিত থাকে তখন সাত্ত্বিক সুখের উদ্ভব হয়।

ভাগবত বলেন—'রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বং সংসেবয়া মুনিঃ' (ভাঃ-১১।২৫।৩৪)। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমতঃ রজস্তমোময়ী অবিদ্যা তিরোহিত হয়। চিত্তে সে-অবস্থায় একমাত্র সত্ত্ব গুণ প্রকটিত থাকে। ইহার পর চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ শুদ্ধ-সত্ত্ব চিত্তে প্রতিফলিত হয়। শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রভাবে চিত্তে ভগবৎ-প্রীতি বা রতির জাগরণ ঘটে। শুদ্ধ-সত্ত্ব ভগবানেরই স্বরূপশক্তি হইতে সঞ্জাত; সুতরাং সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবানের কৃপার প্রভাবেই তাহা চিত্তে জাগ্রত হইয়া থাকে। ভগবৎ-কৃপার সহিত জীবের সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে নিত্য, অবিদ্যা প্রভাবে তাহা আচ্ছন্ন রহে মাত্র। মহাপ্রলয়ে জীব তাহার সূক্ষ্মভাব লইয়া ব্রহ্মেতেই বিলীন থাকে। সৃষ্টির উন্মুখকালে প্রথম পুরুষস্বরূপ ভগবান্ স্বীয় কৃপাশক্তিবলে প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করিয়া

জীবকে গুণকর্ম্ম ধর্ম্মে পুনরায় উজ্জীবিত করেন। পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—

'যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।' (শ্বেঃ-৫।৫)

আদিত্য যেরূপ উর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ববর্ত্তী দিক্‌সমূহকে প্রকাশ করিয়া দেদীপ্যমান হন, সেইরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম কারণশক্তিযুক্তভাবে মায়িক পরিণামী পদার্থকে রূপান্তরিত করেন। তিনি গুণসমূহকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন। জীব পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী গুণের প্রতিবেশটি পায়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সকল ভূতেই মায়াকৃত আবরণের তারতম্য অনুসারে লঘুগুরুভাবে জীবাত্মা বর্ত্তমান। কিন্তু সর্ব্বত্র এই আবরণ সমান নহে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাবে এই তারতম্য স্পষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ লইয়া জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করে। প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইলে জীব সেই দেহ ত্যাগ করে। ইহাই জীবের মৃত্যু। মৃত্যুকালে সংস্কার অনুসারে জীব ভবিষ্যৎ গতি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা জীবনে কল্যাণকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহাদের সংস্কার উত্তরোত্তর উন্নত-জীবনে তাহাদিগকে গতিদান করে। ভগবান্ গুণত্রয়ের প্রতিবেশোচিত কর্ম্ম এবং তজ্জনিত সংস্কারের পরিচয় এই অধ্যায়ে দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য হইল গুণাতীত অবস্থার নির্দ্দেশ। সেই লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে জীবের স্বাভাবিক রীতিটি তিনি এইবার পরিস্ফুট করিতেছেন। দেহ থাকিতেই জীব কি ভাবে এই জীবনকালেই জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ তাঁহার ভাবটি পায়? কোন কোন ভাষ্যকার দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তিই এই অধ্যায়ের মুখ্যতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা গীতার্থ সম্মত

বলিয়া মনে হয় না। দেহ হইতে মুক্তিতেই যে গুণবন্ধন হইতে মুক্তি এবং ইহাতেই যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে, অর্থাৎ জীব তাহার পরম প্রয়োজনটি উপলব্ধি করে একথা বলা যায় না। ফলতঃ দেহ থাকিতেও পরম প্রয়োজনটি লাভ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব নয়। প্রত্যুত কৃষ্ণসেবাতেই জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং গুণাতীত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। 'সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতে' (ব্রঃ সূঃ-৪।৪।৮)—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর ইহাই বলেন। মুক্ত জীব যাহা সঙ্কল্প করে তাহাই সিদ্ধ হয়। শ্রুতি বলেন—'নোপজন স্মরন্নিদং শরীরং'—(ছাঃ-৮।১২।৩) অর্থাৎ মুক্ত জীবের পিতা-মাতা হইতে সম্ভূত দেহ স্মৃতিতে থাকে না ; কিন্তু দেহ থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে মুক্ত জীব যদি অশরীরী হইবার সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে তিনি সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি শরীরবিহীনই হন। যদি তিনি শরীরী হইতে বা দেহলাভ করিতে সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে তিনি শরীরী হন। 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং বাসুদেবং ভজন্তে'—ভক্তি অঙ্গ অনুষ্ঠানের ফলে জীবের দিব্য দেহ লাভ হয়। আচার্য্য শঙ্করেরই এই ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন—প্রারব্ধ পাপ নিবর্ত্তকত্বঞ্চ কদাচিদুপাসকেচ্ছা-বশাদিতি।' শ্রীসনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—'তদানীমেব ভগবদ্‌ভজনার্থং তদ্‌যোগ্যাদেহান্তরোৎপত্ত্যা, কিংবা পূর্ব্বদেহমেব সত্তোজাত ভগবৎ-ভজনোচিত গুণ-বিশেষবত্তয়া নবীনমিবসৌ প্রাপয়তি।' অর্থাৎ অশেষ প্রারব্ধের ক্ষয় হইয়া গেলে দেহপাতের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে বটে, তথাপি ভগবদ্-ভজনার্থ সাধক ভজনোপযোগী অন্য দেহ প্রাপ্ত হন ; কিংবা সাধকের পূর্ব্ব দেহই সত্তোজাত ভগবৎ-ভজনোপযোগী গুণবিশেষ লাভ করিয়া নূতন দেহের মত হইয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকের ভাষ্যে এই প্রসঙ্গের আলোচনা কালে বলিয়াছেন, গুরুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ভক্তির আরম্ভদশা

হইতেই শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎ-প্রণতি-পরিচর্য্যাদির প্রভাবে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইয়া ভক্তগণ 'নির্গুণো মদাশ্রয়ঃ' এই ভগবদুক্তি অনুসারে ভগবৎ-গুণাদি শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় করার ফলে নির্গুণ অবস্থা বা অপ্রাকৃতত্ব লাভ করেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৫শ এবং ৩২শ শ্লোকে ভগবানকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। ফলতঃ এক্ষেত্রে নির্গুণতা বলিতে প্রাকৃত গুণরাহিত্যই বুঝায়। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের বচন পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ ঈশ্বরে নাই। তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আকর। 'সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকোহি' (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৮৪)। আচার্য শঙ্করও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৯।১১ শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—'নির্গুণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ।' প্রথম অবস্থায় ব্যবহারিক বিষয়ের সম্পর্ক-কালে সাধকের চিত্তবৃত্তি গুণময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ভক্তগণের দেহ আংশিকরূপে নির্গুণতা লাভ করে। ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ যাজনার পথে ক্রমে নির্গুণভাব দেহাংশে আধিক্য লাভ করে এবং ভক্তের গুণময় দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে। সাধনার ফলে প্রেম উৎপন্ন হইলে গুণময় দেহাংশের সম্যক্ বিনষ্টি সাধিত হয় এবং ভক্তের দেহ সর্ব্বাংশে নির্গুণতা বা অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন ভক্তের স্থূলদেহের পতন শুধু বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদের নিকট ভক্তিযোগের রহস্য গোপন রাখার নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায় দর্শিত হয়।

সার কথা এই যে, ভক্তিকামী সাধকের সমস্ত প্রারব্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেলেও তাঁহার দৃশ্যমান দেহই থাকিয়া যায় কিংবা ভক্ত দেহাদি ভোগ করিয়া থাকেন কেবল ভজনেরই জন্য। প্রকৃত-প্রস্তাবে দেহ হইতে মুক্তি গীতোক্ত উপদেশের লক্ষ্য নহে—লক্ষ্য হইল শ্রীভগবানের ভজন লাভ করা। 'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' এই ভগবদুক্তির তাৎপর্য্যার্থে শ্রীভগবানের ভাব বা প্রীতিতেই জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি ঘটে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং সেজন্যই ভগবান্ গুণত্রয়ের বিভাগ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এতদ্বারা ভক্তির

প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভক্তি লাভ হইলে দেহবন্ধন আপনা হইতেই নিরাকৃত হয়। চরিতামৃত বলেন—

'দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময়
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ-চরণ সেবয়।'

ভক্তির কৃপায় সাধকের প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ অপ্রাকৃত হইয়া থাকে এস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত। সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—'কৃষ্ণভক্তি-সুধাপানাদ্দেহদৈহিক-বিস্মৃতেঃ। তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা।' (বৃহৎ ভাগবতামৃত—১।৩।৪৫)। সুতরাং চতুর্দশ অধ্যায়ে দেহসম্পর্কিত গুণ বন্ধন অতিক্রম করাই গীতোক্ত সাধ্যতত্ত্ব; পরন্তু ইহা দেহাত্যয় নহে। বস্তুতঃ গীতার ভগবদনুভূতি দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিকে সমগ্রভাবে ভগবৎ-প্রীতিরসে চিন্ময়চ্ছন্দে উজ্জীবিত করিয়া বিশ্বের সর্ব্বকর্ম্মের মূলে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষতা বুঝায়। এই অনুভূতি মনের আংশিক ক্রিয়া বা মানসিক ব্যাপার মাত্র নয়। প্রথমে মানসক্ষেত্রে এই অনুভূতির উপলব্ধি হয়। পরে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সেই অনুভূতি বিস্তার লাভ করে। এই অনুভূতি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ-কৃপাস্পর্শে গুণতত্ত্ব বুদ্ধিকে উত্তুঙ্গিত করিয়া পরিশেষে ভগবৎ-প্রীতির উদ্দাম উচ্ছ্বাসে সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়ে—পঞ্চাত্মক জীব কোষের অবীর্য্য দূর হয় এবং সাধক নিত্যলীলার চিন্ময় মাধুর্য্যে নিমগ্ন হন। তিনি সিদ্ধদেহ লাভ করেন। ভগবৎ-ভাবের প্রভাবে তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রত্যুত ভক্তি-সাধকের পক্ষে দেহটি পরম প্রয়োজন রূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ বলেন—"নরতনু ভজনের মূল।" শাস্ত্রও এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থক। মানুষের দেহ তুচ্ছ নয়। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—"বিচিত্রাদেহ-সম্পত্তিরীশ্বরায় নিবেদিতুম্ পূর্ব্বমেব কৃতা ব্রহ্মন্ হস্তপদাদি-সংযুতা" অর্থাৎ হস্তপদাদিসমন্বিত দেহরূপ সম্পত্তি ঈশ্বরকে

নিবেদন করিবার জন্যই প্রথমে সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেহকে ভগবদ্দত্ত দ্রব্যস্বরূপে বিচার করিবার জন্য সনাতনকে নির্দ্দেশ দান করেন। তিনি বলিয়াছেন—"দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাই রে ভজনে"—গীতার ভগবদুক্তিতে এইরূপ নির্দ্দেশই রহিয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন দম্ভ ও অহংকারযুক্ত হইয়া অবিবেকিগণ দেহস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং আত্মাস্বরূপ আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া নিজের এবং অপরের পক্ষে পীড়াপ্রদ তপস্যার অনুষ্ঠান করে। তাহাদিগকে আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। প্রত্যুত গীতা সর্ব্বক্ষেত্রে দেহযোগে ভজনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, আমাকে মন সমর্পণ কর। আমার ভক্ত হও। আমার আরাধনা কর। আমাকে নমস্কার কর। সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন এবং আমার সেবায় দৃঢ়ব্রত হও। সুতরাং এক্ষেত্রে দেহকে উপেক্ষা করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন ভাষ্যকার গুণ-বন্ধনের অতীত অবস্থার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে চতুর্দশ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে উক্ত "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই ভগবদুক্তির উল্লেখ করিয়া উক্ত অবস্থাটি অক্ষর-ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত অবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বন্ধনের কথা উঠিলেই মুক্তির কথাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে, এজন্যই স্বভাবতঃ তাঁহারা ভগবানের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হওয়া বলিতে দেহ বন্ধন হইতে মুক্তি বুঝিয়াছেন। ইঁহারা ভগবানের অক্ষর ভাবটির উপরই গুরুত্ব স্বভাবতই আরোপ করিয়া থাকেন। চিৎকণ জীব চিদ্রূপ ব্রহ্মেরই অংশ। সুতরাং ক্ষর প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অংশী চিৎস্বরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিলে তাহাকে আর জন্ম-মরণ-চক্রের আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িতে হইবে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু সংসার-চক্রের এই আবর্ত্তন হইতে মুক্তি বলিতে শ্রীভগবানের সেবা-রসে অপ্রাকৃত দেহে ভগবৎ-ভজনজনিত নিবৃত্তিকেই বুঝায় এবং জগৎ সে ক্ষেত্রে মিথ্যা এইটি উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জীবের হৃদয়ে থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে গীতায় পরম জ্ঞানের উপদেশ করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ সৃষ্টি কার্য্য হইতে

নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান নাই। পক্ষান্তরে সৃষ্টির বীজপ্রদ পিতাস্বরূপে বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে তাঁহার ক্রিয়াশক্তির হেতুভূত প্রেমের অপরিচ্ছিন্ন মাধুর্য্য-তাৎপর্য্যটি উদ্ভিন্ন করাই তাঁহার অভিপ্রায়। সুতরাং শ্রীভগবানের সাধর্ম্ম্য বলিতে ক্ষরতত্ত্বের অনিত্যতা এবং অক্ষরতত্ত্বের কূটস্থভাব এই দুইয়ের অতীতস্বরূপে বিশ্ব-সৃষ্টিতে অনুলোম এবং বিলোমক্রমে লীলা-বৈচিত্র্যে তাঁহার স্বরূপনিষ্ঠ বিলাস-প্রবৃত্তিই বুঝাইতেছে। ফলতঃ গীতায় গুণাতীত অবস্থা বলিতে শ্রীভগবানে যুক্তচিত্ত নিত্যমুক্ত জীবনেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, প্রকৃতির গুণে মোহিত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিরাই অজ্ঞানী। 'যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা তামসাশ্চ যে মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি'—এই সত্য উপলব্ধি করিয়া গুণের রাজ্যে এবং গুণসম্বন্ধে অনাসক্ত থাকা—ভাগবতের মতে 'যত্র গুণেষসঙ্গঃ' এই অবস্থাকে গীতায় গুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে সর্ব্বভূতে অবস্থিত শ্রীভগবানকে দর্শন কিংবা প্রকৃতির বিনাশশীল অবস্থার মধ্যে অবিনাশী সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব নয়। অথচ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকে এইটিই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ২৯শ, ৩০শ এবং ৩১শ শ্লোকে সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বভাবে তাঁহার প্রীতিরসে আত্মনিবেদন করিয়া ভগবৎ-মাধুর্য্যের আনন্ত্য ভাবটি আস্বাদনেই শ্রীভগবান জীবের সনাতন অধিকারকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। পৃথক পৃথক ভূতগণের মধ্যে এক আত্মাকেই দর্শন এবং সেই আত্মা হইতে ভূতসকলের বিকাশ এইরূপ উপলব্ধি বলিতে বিশ্বচরাচরে ভগবৎ-মাধুর্য্যের বিলাস-রসের বৈচিত্র্য উপভোগে জীবের স্বরূপধর্ম্মে সম্প্রতিষ্ঠার গূঢ় রহস্যটিই ভগবানের শ্রীমুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতি এই সত্যকেই বিস্তার করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন সর্ব্বতোব্যাপ্ত একই সত্যকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—'ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ। ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ। লোকাস্তং

পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ। দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ। ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ। সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।' (বৃহদারণ্যক-২।৪।৬) অর্থাৎ যিনি ভূতবর্গকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ভূতবর্গ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি নিখিল বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, নিখিল জগৎ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। ভগবানই যে সকলের আত্মা। তিনিই যে সকলের প্রিয়। তাঁহাকে স্বীকার না করিলে কাহাকেও স্বীকার করা হয় না। কাহাকেও মান দেওয়া হয় না। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমাদের ভুলে কেহ ভুলে না। আমাদের স্বার্থভীরু অন্তরের ভাবটি সকলের কাছে ধরা পড়িয়া যায়। সকলেই আমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। মহামুনি যাজ্ঞ্যবল্ক্য এই সত্যটি মনস্বিনী মৈত্রেয়ীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি'। হে প্রিয়ে, পতির জন্যই পতি জায়ার প্রিয় হন তাহা নহে। ব্রাহ্মণের জন্যই যে ব্রাহ্মণ অপরের প্রিয় হন তাহা নহে। সর্ব্ববস্তুর জন্যই যে সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয় তাহা নহে। আত্মার জন্যই সর্ব্ববস্তু প্রিয় হয়। এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেববৃন্দ, এই ভূতবর্গ এবং এই নিখিল বস্তুসমূহ আত্মাতেই নিষ্ঠিত। (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্র অনাময় চিন্ময় প্রকাশে আলো করিয়া এক আত্মাই ক্ষেত্রীস্বরূপে রহিয়াছেন, 'যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ'। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ এই তত্ত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩০শ শ্লোকে এই তত্ত্বের অনুভূতিকেই ভগবান্ যোগের সর্ব্বোত্তম সীমাস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্গতচিত্তে তাঁহাকে ভজনের পথেই যে তাহা লভ্য একথাও তিনি সেখানে বলিয়াছেন। তিনি সকলের আত্মা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সেই তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইল এবং এই বিজ্ঞানে সর্ব্বসম্বন্ধে আমাদের দেহেন্দ্রিয়

এবং মনে প্রাণে তাঁহার প্রমূর্ত্ত লীলাই অনুভূতি প্রাপ্ত হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের জ্ঞেয়তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশে ইহাই পরিস্ফুট করা হইল।

'ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ-মিশ্রিত'—সৃষ্টির তরঙ্গে বিশ্বের অঙ্গে অঙ্গে ভগবানের রঙ্গময় মাধুর্য্যটি অনুভব করিতে হইলে জীবকে আপন করিবার জন্য ব্যক্ত বিকারশীল প্রকৃতির অন্তঃস্তলে তাঁহার আত্ম-ভাবের অব্যাকৃত মাধুর্য্যের উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। অক্ষরতত্ত্বে উক্ত ভাব মিলে না। ফলতঃ ভগবৎ-মাধুর্য্যের রাজ্যে গুণময়ী মায়ার প্রকাশ নাই। সেখানে যোগমায়ার খেলা চিদানন্দে বিলসিত। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ গুণাতীত রাজ্যে প্রকটিত এই আত্মমাধুর্য্যের স্বরূপটি পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন—"গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।" গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া আমার ভাব লাভ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই মদ্ভাবকে কোন কোন আচার্য্য 'মম সাধর্ম্ম্য' বা সাযুজ্যার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণরূপে সচ্চিদানন্দময় লীলা-বিগ্রহে প্রকটিত তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে না পারিলেই নিষ্পাপ, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন প্রভৃতি নিজের অধিকার সম্ভোগের দিকে আমাদের দৃষ্টি বা সাযুজ্য লাভের প্রশ্ন উঠে। কিন্তু এই ভাবে তাঁহার সহিত লয় হইয়া যাওয়াতে তাঁহার ভাবটি পাওয়া বা আস্বাদ্য হইতে পারে না। ফলতঃ আত্মভাবে বিলসিত তাঁহার দিব্য-লীলারসে চিত্ত নিমগ্ন হইলে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করা ছাড়া উপায় থাকে না। এইখানে গুণতত্ত্ব-বুদ্ধির উর্দ্ধে জীবের আত্ম-সংস্থিতি লাভ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ গুণাতীত পুরুষের স্বরূপ, লক্ষণ, আচরণ এবং যে সব গুণের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদের জীবনে অধিগত হইয়া থাকে। সেজন্য সযত্নকৃত প্রয়াস তাঁহাদের থাকে না। সর্ব্ববিধ গুণসম্বন্ধের মূলে অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যময় সত্তাকে তাঁহারা উপলব্ধি করেন বলিয়া অহং-মমতাবোধ তাঁহাদিগের মনকে

আর স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীপাদ স্বরচিত গীতাভাষ্যের উপসংহারে বলিয়াছেন—

'জীবন্মুক্তি-দশায়াং তু ন ভক্তেঃ ফল-কল্পনা
অদ্বেষ্টৃত্বাদিবৎ তেষাং স্বভাবো ভজনং হরেঃ।'

অর্থাৎ জীবন্মুক্তি দশায় ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে কোনরূপ ফল কল্পনা থাকে না। অদ্বেষাদি গুণের ন্যায় ভক্ত স্বাভাবিক ভাবেই ভগবৎ-ভজন লাভ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রত্যক্ষভাবে ভগবদনুভূতির ভূমিতে অপরা প্রকৃতিতে প্রতিফলিত গুণরাজী শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের চাতুর্য্যে অদ্বয় চিন্ময় রসের সংস্পর্শে দিব্যভাবে নব রূপায়ন লাভ করে। ইহাই ভূত-প্রকৃতি মোক্ষ। আচার্য্য শঙ্করের মতে উপলব্ধি এক্ষেত্রে অভাবাত্মক অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি অপরা বা জড়া প্রকৃতিতে পরিচ্ছিন্ন জগতের অভাব-গমন বা মিথ্যাত্ববোধ কিন্তু ভক্তের অনুভূতি এক্ষেত্রে জগতের অভাব-গমন নহে, জড়ে উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত চিদ্‌ভাবের স্ফুরণ সর্ব্বত্র ভগবৎ-ভাবেরই উদ্দীপন, ভগবৎ-কৃপার-প্রকাশে বিশ্বে চিৎ-শক্তিরই বিলাসোপলব্ধি, বিনাশশীলতার মধ্যে অবিনাশী সত্যের প্রদীপ্তি। সে অবস্থায় যথাবস্থিত দেহেও প্রাকৃত জগতের বন্ধন মোচনের প্রশ্ন সাধকের পক্ষে থাকে না। কারণ বিশুদ্ধসত্ত্বে সাধকের চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। 'তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি, তদেব শৃণোতি, তদেব ভাবয়তি, তদেব চিন্তয়তি'—(নারদ-ভক্তিসূত্র-৭।৫৫) অর্থাৎ ভক্তের দর্শনে, শ্রবণে, আলাপনে এবং চিন্তনে শুধু থাকেন তখন এক ভগবান। অব্যভিচারিণী ভক্তির বিলাস এবং প্রকাশের ইহাই রীতি। ভক্ত এমন অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে সুখময় কৃষ্ণকে সুখে আস্বাদন করেন।

ফলতঃ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের সহিত চিত্তের সংযোগ থাকিলে গুণাতীত অবস্থা লাভ করা সম্ভব হয় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"—অর্থাৎ যাহারা আমাকে হৃদয়ের অনুরাগের সহিত সেবা করে তাহারা গুণের অতীত হইয়া আমাকে

লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া থাকে। গুণাতীতের লক্ষণ কি, তাঁহাদের আচরণ কিরূপ এবং কি উপায়ে গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায় ইহাই ছিল অর্জ্জুনের প্রশ্ন। চতুর্দশ অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে ভগবান গুণাতীতের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ২৩শ হইতে ২৫শ শ্লোকে তাঁহাদের আচরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাকী রহিল কি উপায়ে গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায় এই প্রশ্নের জবাব। ভগবান উক্ত অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। গুণাতীত অবস্থা কোন পথে লাভ করা যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখ হইতে 'মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' এই উক্তিতে আমরা তাহার নির্দ্দেশ পাইলাম। সুতরাং গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে অব্যভিচারিণী ভক্তিই যে একমাত্র উপায় ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন—

'তৈর্দ্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাসহাসেক্ষিত বামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ
ভক্তিরনিচ্ছতো গতীমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে'।

অর্থাৎ শ্রীভগবানের মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার মুখের মধুর কথা, মৃদুহাস্য যুক্ত তাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী অব্যভিচারিণী ভক্তিযুক্ত ভক্তের মন হরণ করিয়াছে, হরণ করিয়া লইয়াছে তাঁহাদের প্রাণ। তাঁহারা চিৎকণ স্বরূপের লয়াত্মক দুষ্প্রাপ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন—কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। 'নৈকাত্মতাং তে স্পৃহয়ন্তি', ব্রহ্ম-সাযুজ্যে তাঁহাদের স্পৃহা থাকে না। কারণ সাযুজ্যাকাঙ্ক্ষীদের ভোগ সেবাধিকারীর সুখের তুলনায় অতি তুচ্ছ। মুক্ত জীব ব্রহ্মের অধিকার লাভ করেন ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অধিকারও জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিকার মুক্ত জীব লাভ করেন না। ব্রহ্মের সমান অধিকার ভোগের প্রশ্নই যাঁহাদের নিকট প্রধান এবং সে অধিকার লাভ না করিলেই যাঁহাদের বন্ধনজনিত বিড়ম্বনা বোধ তাঁহাদের পক্ষে

উদ্দিষ্ট অধিকারে ব্রহ্মাপেক্ষা ন্যূনতায় তাঁহারা শান্তি লাভ করিবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। পক্ষান্তরে প্রীতির পথে ভগবদুপাসনায় পূর্ণ ব্রহ্মের সমগ্রভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে, স্বয়ং গীতায় ভগবান এই সত্য ঘোষণা করিয়াছেন। যদি বলা যায় ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ অধিকারগুলিই মায়াবাদী-গণ গ্রহণ করেন, তুচ্ছ গুণসমূহ তাঁহারা বর্জ্জন করেন তাহা হইলে ব্রহ্মে তুচ্ছ বস্তুর সত্তা নিত্যত্ব যুক্ত হয়, ইহা শ্রুতিবিরোধী। প্রকৃত-প্রস্তাবে মায়াবাদী-বেদান্ত ব্রহ্মের অংশই গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের ব্রহ্ম অক্ষর-ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের যিনি প্রতিষ্ঠা—ক্ষর ও অক্ষর হইতে পরমতত্ত্ব স্বরূপ যিনি, তাঁহাকে তাঁহারা পান নাই। ইহার ফলে তাঁহারা ভূমাকেই অস্বীকার করিয়াছেন—'ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি'। গীতোক্ত ভক্তিযোগ পূর্ণব্রহ্ম বা সুখস্বরূপ ভূমাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—চাহিয়াছে রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সেবা। এইটি স্বীকার না করিলে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের সঙ্গতি সাধিত হয় না। জীব সর্ব্বাত্মস্বরূপ ভগবানকেই চায় এবং নিজের দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে চায় না। কৈবল্য বা মোক্ষ কামনা এই দিক হইতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মোক্ষলাভে অধিকার মিলে সত্য, কিন্তু মোক্ষকামী যে অধিকার লাভ করেন, সর্ব্বতোভাবে তাহা উপভোগ করিতে তাঁহারা অধিকারী হন না। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'তত চ ন তু তমেব সর্ব্বমেব চানুভবতীত্যভ্যুপগম্যম্। সর্ব্বথা তৎপ্রাপ্তে-রনভ্যুপগমত্বাৎ জগদ্ব্যাপারাদি নিষেধেন'—(প্রীতি-সন্দর্ভঃ) সুতরাং অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই চতুর্দশ অধ্যায়ের উপসংহার ভাগে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভগবানকে দেখাইতে হইয়াছে অর্জ্জুনকে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের মাধুর্য্য।

ভগবদুপাসকের চিত্তে যে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে তাহা হইতেছে আনুষঙ্গিক। জ্ঞানীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অনন্ত অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ভগবানেরই মহিমা বলিয়া তাঁহার অনুভবও ভক্তের অনুভবেরই অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে ব্রহ্মানুভবের প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য ভগবদনুভবেরই। ব্রহ্মোপাসকগণ সর্ব্বসম্বন্ধে

ভগবদনুভব লাভ করেন নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই অনুভব তাঁহারা লাভ করেন। তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হইতেছে স্বতন্ত্র ; সুতরাং ভক্ত হইতে ভিন্ন রূপে তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের অনুভব লাভ হইয়া থাকে। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'তথা ভক্তেরপি গুণসঙ্গ-নির্ধুণনান্তরঞ্চানুবৃত্তিঃ শ্রুয়তে' অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের নিবৃত্তির পরই ভগবানের সর্ব্বভাবে অনুবৃত্তি লাভ হয়। নহিলে গুণসমূহ বাধা জন্মায়।

'তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবম,
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ।'
(ভাঃ—১১।২৫।৩৩)

মনুষ্যদেহ জ্ঞান-বিজ্ঞান উপলব্ধি করিবার উপযোগী। এই দেহ লাভ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যেন মায়িক ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া আমার ভজনা করে। সুতরাং ভগবৎ-ভজন পাইলে দেহবন্ধনের আর ভয় কোথায়? অব্যভিচারিণী ভক্তির সাধক—'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' অর্থাৎ ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন। 'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'—গীতার এই নির্দ্দেশ। ফলতঃ শুধু গীতা-শাস্ত্রেই ভগবান অব্যভিচারিণী অর্থাৎ প্রেমভক্তির গুণাতীতত্ব প্রদর্শন করেন নাই। বিভিন্ন শাস্ত্রেরও এই একই সিদ্ধান্ত। ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

'এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।'
(ভাঃ—১১।২৫।৩২)

অর্থাৎ গুণকর্ম্ম সম্বন্ধের ফলেই জীবের সংসার বন্ধন ঘটে। আমাতে নিষ্ঠার সহিত ভক্তিমার্গের সাধনেই মায়াকে সম্যকরূপে নির্জ্জিত করা সম্ভব হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে—

'কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতং।'
(ভাঃ—১১।২৫।২৪)

অর্থাৎ কৈবল্যই হইতেছে সাত্ত্বিক জ্ঞান। বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদি-বিষয়ক জ্ঞান রাজসিক, প্রমাদাদিজনিত জ্ঞান তামসিক, আমা-বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে নির্গুণ। এই সূত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—

'সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্।'

(ভাঃ—১১।২৫।২৯)

অর্থাৎ আত্মার তৃপ্তিজনিত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় ভোগজনিত সুখ রাজস, মোহদৈন্যজাত সুখ তামস এবং ভগবানের আশ্রয় বা শরণাগতিজনিত সুখ নির্গুণ। সুতরাং ভক্তির পথে ভগবানের ভজনা ব্যতীত গুণাতীত অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে ভগবানের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট। শ্রীভগবানের শরণাগতি বা প্রপত্তির পথে, অন্য কথায় তাঁহার কৃপাতেই মায়া বা গুণময়ী প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব হইয়া থাকে, শ্রুতির ইহাই সিদ্ধান্ত। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে কৃপা-শক্তি নাই। সুতরাং মুক্তিদানের যোগ্যতা নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বের থাকিতে পারে না। ভাগবত বলেন—

'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
সঃ সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ।'

(ভাঃ—১০।৮৮।৫৫)

সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায় না। কৈবল্য জ্ঞানও নির্গুণ নহে, এ ক্ষেত্রে এই বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন—'কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং'—কৈবল্য সাত্ত্বিক জ্ঞান, 'মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্'—শ্রীভগবানে নিষ্ঠিত জ্ঞানই নির্গুণ। প্রশ্ন উঠিবে এই যে, কৈবল্য বলিতে যখন মোক্ষ বুঝায়, তখন কৈবল্য জ্ঞানকে সগুণের পর্য্যায়ে লওয়া হইল কেন? গুণ তো দেহসম্পর্কিত ব্যাপার। মায়ামোহজনিত বন্ধনই তো গুণ। এই বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে কৈবল্য লাভ কি সম্ভব হইতে পারে? শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তৎপ্রণীত 'ভক্তি-

সন্দর্ভে' এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে চিত্ত হইতে রজঃ এবং তমঃ নিরসিত হইয়া সত্ত্বগুণে চিত্ত উদ্দীপ্ত হইলেই যে ভগবৎ-বিষয়ক জ্ঞান জন্মে এরূপ নহে। শুকদেবের নিকট মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—'দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীনাঞ্চামলাত্মনাম্ ভক্তির্মুকুন্দ-চরণে ন প্রায়েণোপজায়তে' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবগণের এবং অমলাত্মা ঋষিগণেরও মুকুন্দচরণে সচরাচর ভক্তির উদয় হয় না। অথচ রজস্তমঃ-স্বভাব পাপীর পক্ষে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে—

'রজস্তমঃ-স্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীৎ দৃঢ়া মতিঃ।'

(ভাঃ—৬।১৪।১)

পরীক্ষিত শুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিলেন—হে ব্রহ্মন্, রজস্তমঃ-স্বভাব পাপী বৃত্রের চিত্তে ভগবান নারায়ণে কিরূপে দৃঢ়া মতি জন্মিয়াছিল? উত্তর মিলিয়াছিল—মহতের কৃপায়। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি শুকদেব বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। বৃত্রাসুর কিরূপে উক্ত জন্মে চিত্রকেতু নামক গন্ধর্ব্বরাজস্বরূপে অঙ্গিরা এবং নারদ ঋষির কৃপায় ভগবান্ সঙ্কর্ষণের অনুকম্পা লাভ করেন, তিনি তাহা বলেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান শঙ্করের মুখে চিত্রকেতুর প্রশস্তি-সূত্রে আমরা বৃত্রাসুরের ভগবৎ-ভক্তি লাভের কারণটির পরিচয় প্রাপ্ত হই। শঙ্কর বলেন—'তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু। মহাপুরুষ-ভক্তেসু শান্তেসু সমদর্শিষু।' (ভাঃ—৬।১৭।৩৫) মহাপুরুষগণের ভক্তগণের পক্ষে ভগবানে দৃঢ়ামতি লাভ করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাঁহাদের জাতিকুল যেরূপই হউক না কেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়, কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়।' বস্তুতঃ সত্ত্বাদিগুণের প্রভাবে ভগবানে নিগু'ণা ভক্তি লাভ করা যায় না। একমাত্র নিষ্কিঞ্চন মহতের কৃপার ফলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির

পথে সে ভক্তি লভ্য হইয়া থাকে। ভগবান কপিল তাঁহার জননী দেবহূতির নিকটও এই কথা বলিয়াছেন—

'মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।'

(ভাঃ—৩।২৯।১১)

ভগবানের কথা-প্রসঙ্গ শ্রবণমাত্রে ভগবৎ-সম্বন্ধে মনের অবিচ্ছিন্ন-গতিসূত্রে নিগু´ণা ভক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহাই উক্ত ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া ভগবান্ কপিলদেবের নির্দ্দেশ। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তি হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ মনের, সুতরাং সেগুলি প্রাকৃত। ঐ সব গুণের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ জীবের চিত্তে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়াসক্তি জাগ্রত করাই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কার্য্য। গুণের প্রভাবে পতিত জীব দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে। কৈবল্য-সাধনার মূলে দুঃখের আত্যন্তিক এই নিবৃত্তিই উদ্দেশ্যরূপে নিহিত থাকে। সুতরাং নিগু´ণা ভক্তিতে এই বস্তু বা সাযুজ্য কামনা নাই, তেমন কামনা থাকিতেও পারে না। কারণ, সাধকের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় গুণময় হইলেও শ্রীভগবানে সাধকের চিত্ত আবিষ্ট হইলে গুণাতীত চৈতন্যাং-শের ঘনিষ্ঠতায় তাঁহাদের জ্ঞানক্রিয়াদিও দেহাতীত অপ্রাকৃত রসে উজ্জীবিত হইয়া থাকে। অমুক্ত বা মায়াবদ্ধ জীবের চৈতন্য প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা আবরিত থাকে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম সেরূপ থাকে না, এজন্য তাঁহাদের চৈতন্যগুণ পূর্ণাংশে পরিস্ফূর্ত্ত এবং অংশী যিনি পরব্রহ্ম তাঁহার সহিত যুক্ত। বস্তুতঃ জীব চিৎকণ বা জীবে চিদংশ ক্ষুদ্র বলিয়াই মায়া জীবকে অভিভূত করিতে পারে। কিন্তু পরব্রহ্ম চিদ্ধর্ম্মে জ্বলিত জ্বলন। ('জীবঃ খলু চিৎকণঃ তস্ত চিন্মহাপুঞ্জঃ'—শ্রীল চক্রবর্ত্তী) ব্রহ্ম-চিচ্ছক্তির মহাপুঞ্জ-স্বরূপ। জীব তাঁহার আভিমুখ্য বা আশ্রয় লাভ করিলে তাহার দেহ ও চিদানন্দময় হইয়া যায় সুতরাং জীব মায়া বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত অবস্থা লাভ করে। সে অবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত যুক্ত

বা তাদাত্ম্যস্বরূপে দেহ-ক্রিয়াকে উপলব্ধি করে। শ্রুতি বলেন—'এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভিনিষ্পদ্যতে।' (ছান্দোগ্য-৮।১২।৩) অর্থাৎ মুক্ত জীব প্রাকৃত দেহ হইতে সমুত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক্ষেত্রে স্ব-স্বরূপ বলিতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী রূপ। 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস'—ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাযুজ্য মুক্তির জন্য প্রয়োজনের অপেক্ষা নির্গুণা ভক্তির অধিকারীর পক্ষে তিরোহিত হয়—বন্ধনের অনুভূতিই যেখানে নাই, সেখানে বন্ধন হইতে মোচনের প্রশ্নও অবান্তর হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় সাধক জীব পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিয়া স্বীয় স্বরূপধর্ম্মের পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবান বলিয়াছেন—

'মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গোদয়ো গুণাঃ।'

(ভাঃ-১১।১৩।৪০)

ভগবান কপিল দেবের উক্তি এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন—

'সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।'

আমার ভক্ত নিজের জন্য কিছুই কামনা করেন না। সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য তাঁহাদিগকে দিতে গেলেও আমার সেবা ব্যতীত তাঁহারা কিছুই গ্রহণ করেন না। ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এইরূপ ভক্তিযোগে ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া আমাকে লাভ করা যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে ভগবদুক্তিতে নির্গুণা ভক্তির এই রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে। "ঈশ্বরাৎ পরতঃ পরঃ"—ঈশ্বরের পরতত্ত্ব হইলেন অক্ষর-ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, তাঁহারও পরতত্ত্ব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীল সনাতনের নিকট

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আত্ম-মাধুর্য্যের চাতুর্য্য বিস্তারের রীতিটি এক্ষেত্রে আমাদের মনে উদিত হয়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—'ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণ-স্ফুর্ত্তি হৈল, মাধুর্য্যে মজিল মন।' অর্জ্জুনের নিকটও ভগবান্ এইরূপে ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিতে গিয়া ভক্তিযোগের প্রসঙ্গে আসিয়া নিজ মাধুর্য্যে ডুবিলেন। তিনি নিজকে দেখাইয়া বলিলেন, এই আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। আমার এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপটি শাশ্বতধর্ম্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আকর।

বস্তুতঃ কারুণ্যঘন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপটি এইভাবে জীবের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া ভগবান্ নরদেহের আশ্রয়ে পরম পুরুষার্থ উজ্জীবনের রস-রীতিটিই এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ দেহের বন্ধন হইতে মুক্তি এক্ষেত্রে লক্ষ্য নহে। দেহটি ভগবৎ-প্রেমে উদ্দীপিত করাই উদ্দেশ্য। 'নৃদেহমাদ্যম্'—নৃদেহের সে যোগ্যতা আছে। এইভাবে নরদেহের সহিত গীতার দেবতা তাঁহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রকট করিয়া সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তাঁহার সেবায় সর্ব্বভাবে অধিকার দিয়া মর্ত্ত্য-জীবনে মানুষকে অব্যয় মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিলেন।

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা

বাল্যকালে ফকীর ফিকিরচাঁদের একটি গান শুনিয়াছিলাম—"ভিতরে পাখী থাকে বাহিরে বিড়াল ডাকে।" আমাদের অবস্থা তো এই রকম। আমাদের প্রাণ-পাখী দেহরূপ খাঁচার ভিতর রুদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। এই খাঁচার বাহিরে বিড়াল ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটি জীর্ণ হইয়া যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবে, অমনি মৃত্যুরূপ বিড়াল আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে। ভাগবতে শ্রীভগবান উদ্ধবকে উদ্দেশ্য করিয়া দেহের এই অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে ফাঁসী দিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, এমন অবস্থায় কামনার আকর্ষণ কি তাহাকে সুখ দিতে পারে? আমরা কিন্তু এমন অবস্থার মধ্যেই পরম সুখে দিন কাটাইয়া যাইতেছি। এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কেহ উপদেশ করিলেও আমরা সে সব গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করি না। জবাব একই আমাদের মুখে লাগিয়া আছে—আমরা বিনয়ের অবতার সাজিয়া বলি, সাধন-ভজন এ সব কি আমাদের দ্বারা সম্ভব? আমরা সামান্য জীব। গীতার বাণী পরম আশ্বাসপূর্ণ। সে বাণী অন্তরের সহিত একটু অনুধাবন করিলে আমাদের মনের সকল অবসাদ দূর হয় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনায়, আশা-ভরসায় প্রাণ ভরিয়া উঠে। অনিত্য এই দেহের বন্ধন অতিক্রম করিয়া আমরা কিরূপে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হই চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ তাহাই বিশেষ-ভাবে বলিয়াছেন। প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন, অর্জ্জুন শ্রবণ কর—সংসার-বন্ধন হইতে কিরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মুক্তিলাভ করা যায়, আমি সেই কথা পুনরায় তোমাকে বলিব। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মুনিগণ এই জ্ঞানের বিষয় অবগত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা আমার ধর্ম্ম লাভ করেন এবং সৃষ্টিকালে

ব্রহ্মাদি সকলের উৎপত্তি হইলেও তাহারা উৎপন্ন হন না। প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির বিনাশ হইলেও তাঁহাদিগকে মৃত্যুভয় ভোগ করিতে হয় না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ক্ষেত্র কাহাকে বলে, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায় এবং জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ কেমন শ্রীভগবান সংক্ষেপে তাহা বলিয়াছেন। এই সঙ্গে তিনি একথাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার ভক্তগণ এই তত্ত্ব অধিগত হইয়া তাঁহার ভাব বা প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান সেই জ্ঞানের কথাই পুনরায় বলিতেছেন, কিন্তু—কেন ? তাঁহার এমন পুনরুক্তির তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই কিছু আছে। প্রত্যুত পূর্ব্বোক্তির অন্তর্নিহিত ভাবটি সমধিক পরিস্ফুট করাই এই উদ্দেশ্য। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপদেশের উপদিষ্ট বস্তু এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের উপদিষ্ট বস্তুর মধ্যে যদি আমরা বৈশিষ্ট্য কিছু উপলব্ধি করিতে পারি তবেই তাৎপর্য্যটি কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সহজ হইতে পারে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপদিষ্ট, লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—'মদ্ভাব'। ইহার পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে 'মদ্ভাবং যাতি' বা তাঁহার ভাব পাওয়ার কথা তিনি বলিয়াছেন। ফলতঃ 'মদ্ভাবং যাতি' এবং 'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। চতুর্দশ অধ্যায়ের উপদিষ্ট লক্ষ্য হইল—সাধর্ম্ম্য। 'মদ্ভাব' ও 'মম সাধর্ম্ম্য' এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কি ? 'মদ্ভাব' বলিতে ব্রহ্মভাব বুঝায় ইহা বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের অভিমত। কিন্তু এই ব্রহ্মভাব কি বস্তু ?

আচার্য্য রামানুজ এবং শ্রীপাদ-বলদেব বিদ্যাভূষণ উভয়েই 'মদ্ভাব' বলিতে ব্রহ্মের স্বভাব বুঝাইয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, 'আত্মা অপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি প্রজাপতি।' (৮।৭।১) এইরূপে

জ্ঞেয়তত্ত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুহীন, শোকদুঃখবর্জ্জিত, ক্ষুৎপিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প সেই আত্মারই অন্বেষণ করিবে এবং সাধনা করিবে। যিনি উক্ত প্রকার আত্মাকে অবগত হন, তিনি সমস্ত লোক এবং সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন, একথা প্রজাপতি বলিয়াছেন। গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ 'মদ্ভাব' বলিতে শ্রুতি-নির্দ্দেশিত ব্রহ্মের অপহত-পাপ্মাদি অষ্টগুণবিশিষ্ট স্বভাব বা সাম্য প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের উপদিষ্ট লক্ষ্য হইল সাধর্ম্ম্য। সাধক শ্রীকৃষ্ণের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সাধর্ম্ম্য বলিতে কি বুঝায়? শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যা-ভূষণের মতে 'সর্ব্বেশস্য সম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্য-সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিষ্পাপ, জরাহীন, মৃত্যুহীন প্রভৃতি গুণের সহিত সাম্যলাভ, ইহাই সাধর্ম্ম্য। সুতরাং এক্ষেত্রে মদ্ভাবে এবং সাধর্ম্ম্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। শ্রীপাদ রামানুজও বলেন—'সাধর্ম্ম্য-মৎসাম্যং প্রাপ্তাঃ'। অর্থ একই—গুণসাম্য। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন, 'সাধর্ম্ম্যং মৎ-স্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ভেদানভ্যুপগমাৎ' অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সমান ধর্ম্ম নয়। কারণ ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ঈশ্বরে ভেদ স্বীকৃত নহে। সুতরাং সাধর্ম্ম্য শব্দের অর্থ আচার্য্য শঙ্করের মতে 'মৎস্বরূপতা'। শঙ্কর বলেন, সাধক ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হন, এক্ষেত্রে পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। আমরা এই সাধর্ম্ম্য বলিতে একটু অন্য রকম বুঝিয়াছি। ইচ্ছা সেইটি বুঝাইতে চেষ্টা করা। আমাদের মতে ভাব বস্তুটি বলা হইয়াছে সম্পদ, সম্বন্ধ। ভাব কর্ত্তার ইচ্ছাধীন এবং অবস্থাধীন বস্তু, তাহার অন্যথা ঘটিতে পারে। কিন্তু সধর্ম্ম বস্তুর সহিত ধর্ম্মী বা যাহার ধর্ম্ম তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, 'নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ'। 'স্বভাব যায় না মলে'। ফলতঃ ধর্ম্ম যে বস্তু তাহা কেহ কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ধর্ম্মে থাকে ধর্ম্মীর সমগ্রতা। ভগবানের ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝি? শ্রীভগবানের ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহার

ব্রহ্মভাবটি বিধৃত রহিয়াছে ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং ভাব এবং ধর্ম্ম পৃথক বস্তু। ভগবান নিজে বৃহৎ বলিয়া তিনি ব্রহ্ম এবং জীবকে 'বৃংহনাৎ'—বড় করেন বলিয়াও ব্রহ্মের শাশ্বত স্বরূপ-ধর্ম্মটি তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্রবচনে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবকে বাড়াইবার বা আপন করিয়া লওয়াতেই তাঁহার সুখ বা আনন্দ—সেটি তাঁহার স্বভাব। নিখিল জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মের উজ্জীবক ঐকান্তিক এই সুখ এবং আনন্দরসে তাঁহার স্বরূপ পরিস্ফূর্ত্ত এবং প্রমূর্ত্ত। সুতরাং এইটিই বলিতে হয় তাঁহার ধর্ম্ম। জীবও চায় সুখ, জীবও চায় আনন্দ, সুতরাং জীবের ধর্ম্মে এবং ভগবানের ধর্ম্মে সম্বন্ধের যোগ রহিয়াছে। 'মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ'—এই ইচ্ছার পরিপূর্ত্তিতে ভগবানের ধর্ম্মের সামগ্রিক প্রকাশ এবং বিলাসের প্রাচুর্য্য এবং মাধুর্য্য।

'ধারণা ধর্ম্মমিত্যাহু ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ
যঃ স্যাদ্ধারণ-সংযুক্তাঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
ধর্ম্মমূলমিদং সর্ববং ধর্ম্মমূলং জনার্দ্দনঃ
ধর্ম্মেণ নীয়তে তস্মাৎ স্বমূলং প্রতি মানবঃ।
অয়মেব পরো ধর্ম্ম যেন গম্যো ভবেদ্ধরিঃ
যেন ন প্রাপ্যতে বিষ্ণুঃ স ধর্ম্মো মূল-বিচ্যুতঃ।'

(বৃহৎ-ব্রহ্মসংহিতা-২।৭)

অর্থাৎ বিশাল জগতের মূল ধর্ম্ম। জনার্দ্দন ধর্ম্ম-মূল। যে ধর্ম্ম মানুষকে স্বীয় মূলের দিকে লইয়া যায়, তাহাই পরম ধর্ম্ম। যাহার দ্বারা মানুষ হরিকে লাভ করিতে পারে, তাহাই ধর্ম্ম। যাহার দ্বারা হরি মিলে না সে ধর্ম্ম মূল হইতে বিচ্যুত। এক্ষেত্রে 'ধর্ম্মেণ নীয়তে তস্মাৎ স্বমূলং প্রতি মানবঃ' এই বচনটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। মানুষকে তাঁহার নিজের দিকে লইয়া যাওয়াই ভগবানের ধর্ম্ম, ভাবটি এখানে সুস্পষ্ট। সুতরাং ভগবানের সাধর্ম্ম্য বস্তুটি কি এইবার আমরা বুঝিলাম। এই ধর্ম্মে ভগবানকে পাওয়া বা পারস্পরিক প্রীতির

সূত্রে পাওয়া—সর্ব্বভাবে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে তাঁহার সধর্ম্মে তাঁহাকে পাওয়া। ভগবান অর্জ্জুনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জীবের উজ্জীবক নিজের গূঢ় বীর্য্যের এমন মাধুর্য্যটি উন্মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 'জীব নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব'—ঈশ্বরের এই স্বভাবটি ভক্তির একমাত্র জীবাতু বা প্রাণবস্তু। বস্তুতঃ ভগবৎ-তত্ত্ব মায়িক গুণ সম্পর্ক-বর্জ্জিত। মায়াবদ্ধ জীবের সে ধর্ম্ম বা ভগবানের ধর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। রসই ভগবানের ধর্ম্ম—'রসো বৈ সঃ'। আনন্দই রস, প্রীতিই রস—সম্বন্ধেই আনন্দ, প্রীতিতেই রসের স্ফুর্ত্তি। জীবকে আত্মভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ভগবৎ-প্রীতির এই রীতি সাধকের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে রস-বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট করে। ইহার ফলে ভগবানকে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে লাভ করিবার জন্য জীবের চিত্তে অদম্য উৎকণ্ঠা জাগ্রত হয়। ইহাই ভক্তি। এইভাবে ভগবানের ধর্ম্মের সান্নিধ্য বা আকর্ষণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জীব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং লাভ করে তাঁহার ধর্ম্ম। ভগবানের এমন ধর্ম্মের সংস্পর্শে তাঁহার স্বরূপশক্তির বিকাশে এবং বিলাসে জীবেরও স্বরূপ-ধর্ম্মের উজ্জীবন ঘটে। তাঁহার সহিত তাঁহার সমান ধর্ম্মে জীবের স্বধর্ম্ম লাভ হয়। ফলতঃ ভগবান যেমন জীবের প্রেমের ভিখারী তেমনই জীবের ধর্ম্ম তাঁহার প্রেমের ভিখারী হওয়া। ভগবান্ নিত্যমুক্ত। ঈশ্বর চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। জীব তাঁহারই অংশ স্বরূপে চিৎকণ। সুতরাং ঈশ্বরের ন্যায় জীবেরও স্বাধীনতা আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রেমের রাজ্যে সকলেই স্বাধীন। সেখানে অধীনতা বা বন্ধন-দশা নাই। এইজন্য জীব ঈশ্বরের অংশস্বরূপে স্বাধীন। সে নিজ রুচি অনুসারে ভগবানকে প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধি করুক এই ইচ্ছাই ভগবানের স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম্ম। প্রত্যুত জীব দুর্ব্বাসনাজনিত কর্ম্মের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িলেও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ জীবকে আত্মভাবে লাভ করিবার একান্ত আগ্রহে জীব কখন অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইবে এমন সুযোগের অপেক্ষায়

থাকেন—থাকেন নিজের প্রকৃতি, স্বভাব বা ধর্ম্মেরই দায়ে। তাঁহার এই দায়টিই জীবের মুক্তি-বাসনার ভিতর দিয়া তিনি প্রতিনিয়ত পরিস্ফুট করিতেছেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মে জীবকে সমান করিয়া লইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে গুণময়ী মায়ার উর্দ্ধে না উঠিলে জীব দেহ-সম্বন্ধ-জনিত জন্ম-মৃত্যু-জরা-জনক দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। চতুর্দশ অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে শ্রীভগবানের ইহাই নির্দ্দেশ। বস্তুতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়েই এই সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বেদের কর্ম্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মক, এজন্য কামনামূলক বা সংসারজনক। অর্জ্জুন তুমি ত্রিগুণের সম্পর্ক হইতে মুক্ত হও। কিন্তু তিনি তো আদেশ করিলেন, সে আদেশ পালন করিবে কে? কি উপায়ে তাহা পালন করিয়া গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়? যাঁহারা গুণাতীত অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর·এই যে, ভগবানের স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম্ম জীবের প্রতি তাহার করুণা। এই ধর্ম্মের উপরই জীবের এক্ষেত্রে ভরসা। ভগবান বলিয়াছেন তাঁহাকে আশ্রয় করাই গুণাতীত অবস্থা লাভের একমাত্র উপায়। এই আশ্রয়টি অব্যভিচারিণী ভক্তির পথে হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা তাঁহাকে অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা সেবা করেন, তাঁহারা গুণ সকলের সম্যক্ অতীত অবস্থা লাভ করেন। প্রত্যুত এক্ষেত্রে ভগবান্ জীবের অবলম্বনীয় স্বরূপে অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভের ক্রমটি নির্দ্দেশ করিলেও তাঁহার নিজের দিক হইতে কোন কথা বলেন নাই। আমাদিগকে সর্ব্বভাবে পাইবার বা প্রভাবিত করিবার উপযোগী তাঁহার যে ভাব—তাঁহার স্বরূপনিষ্ঠ সেই মহাভাবের প্রভাবটি তিনি খুলিয়া বলেন নাই। তিনি ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, ভাবের কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মের মূলস্বরূপ তাঁহার ধর্ম্মটি এবং সর্ব্বভাবের মূলে যেটি তাঁহার নিজ সেই ভাবের বীজটি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। কর্ম্মের কথা অনেক বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের গূঢ় মর্ম্মস্বরূপ

যে ধর্ম্মটি—

'নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।' (চৈঃ চঃ)

সেইটি তিনি গোপন রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে গুণাতীতের আচার এবং তাঁহাদের লক্ষণ সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে অনাসক্ত-চিত্ত অক্ষর-ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর সাধনের দিকেই যেন আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। কিন্তু অক্ষর-ব্রহ্ম-সাধনার পথ অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভের পথ নিশ্চয়ই নয়। বস্তুতঃ জ্ঞানীর দৃষ্টি থাকে নিজের স্বরূপের দিকে আর ভক্তের থাকে ভগবৎ-স্বরূপের দিকে। জ্ঞানী নিজেকে খোঁজেন, ভক্ত খোঁজেন ভগবানকে। জ্ঞানী নিজের কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, ভক্ত বিশ্বতোময় ভগবৎ-কর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ-প্রবাহে তাঁহার করুণার ধারায় ডুবিয়া যান। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী আরোপ-সিদ্ধা, সঙ্গ-সিদ্ধা এবং স্বরূপ-সিদ্ধা এই তিন রকমের ভক্তির কথা বলিয়াছেন। এই তিন রকমের মধ্যে প্রত্যেক প্রকার ভক্তিই আবার সকৈতবা এবং অকৈতবা—'ত্রিবিধাপি যা পুনরকৈতবা সকৈতবাচেতি দ্বিবিধা জ্ঞেয়া'—(ভক্তিসন্দর্ভ-২১৭)। ভগবৎ-প্রীতিই যেখানে একমাত্র লক্ষ্য তেমন ভক্তি অকৈতবা। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সব যেখানে লক্ষ্য থাকে তেমন ভক্তি সকৈতবা।

'দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি বিনু অন্য কামনা।'
(চৈঃ চঃ-২।২৪।৭০)

সমধিক স্পষ্টভাবে—

'অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব।
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান,
যাহা হৈতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।'
(চৈঃ চঃ-১।১।৫২)

প্রকৃতপক্ষে কৈতববর্জ্জিত ভক্তিই ভগবৎ-প্রীতি লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীভগবানের কৃপারসে নিষিক্ত হইয়া ভক্ত তাঁহারই আত্ম ভাবে অভিনিবিষ্ট হন। প্রাকৃত সত্ত্বগুণের ঊর্দ্ধে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ-সত্ত্বের ভূমিতে তাঁহার চিত্ত জাগ্রত হয়। তাঁহার অন্তর এবং বাহির জুড়িয়া জাগেন ভগবান। প্রাণস্বরূপ পরম দেবতার সেবায় জীবের অহঙ্কার তখন বিলীন হইয়া যায়। তিনি ভগবৎপ্রেম-পরতন্ত্র হইয়া পড়েন। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুমান বা প্রমাণের যোগে ভক্তি লাভ করা যায় না। অব্যভিচারিণী ভক্তি তো নহেই। ভক্তি প্রত্যক্ষতার অপেক্ষা রাখে। ফাঁকা ফাঁকা কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাহা পাকা হয় না। ভক্তি সকল রকম সঙ্কোচের ভাব কাটাইয়া অভীষ্টের ঘনিষ্ঠতায় মাখামাখি হইতে চায়। গীতার দেবতা ভক্তানুগ্রহ-তৎপর তাঁহার কারুণ্যদীপ্ত লাবণ্যময় রূপটির দিকেই চতুর্দশ অধ্যায়ের উপসংহারে আসিয়া অর্জ্জুনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। যেটি তাঁহার ধর্ম্ম, সেইটি তিনি উন্মুক্ত করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের চিত্তবৃত্তিতে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তাঁহার শ্রীবিগ্রহসেবার জন্য আগ্রহ উদ্দীপিত করিলেন। জীবও তাঁহার মধ্যে পরধর্ম্মের যে আবরণ ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছিল তিনি তাহা অপসারিত করিলেন। জীবে এবং ভগবানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিল ঘটিল। তিনি হইলেন জীবের, জীবও হইল তাঁহার। তিনি দেখাইলেন যে জীব তাঁহার—এইটিই শুধু নয়, জীবও ভগবানকে 'আমার' বলিয়া দাবী করিতে পারে। এই ভাবে চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান ব্যক্ত করিলেন তাঁহার ধর্ম্ম। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের পর প্রথমে তাঁহার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিতে চাহেন এবং সঞ্জয়ের উক্তিতে জানা যায় শ্রীভগবানও তাঁহাকে চতুর্ভুজ-রূপই দেখান। কিন্তু ইহার পর ভগবান সম্ভবতঃ অবতারীয় ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া অর্জ্জুনকে মানুষ রূপটিও একবার দেখাইয়া ফেলেন এবং আত্মমাধুর্য্যে বিস্মৃত আত্মতত্ত্বের সেই অভিব্যক্তি-সূত্রেই অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা সুরু হয়। চরিতামৃত বলেন, "জ্ঞানমার্গে

তাঁরে ভজে যেই সব, ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব।” কিন্তু এগুলি ভগবানের পূর্ণস্বরূপ নয়। চরিতামৃতেরই ভাষায় “পূর্ণতত্ত্ব যারে কহে নাহি যার সম, ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন”—ভক্তির পথে পূর্ণভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায়—পাওয়া যায় তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া। ‘মদ্ভাবায়োপপদ্যতে’ উক্তিতে উপদিষ্ট এই অবস্থার পরিপূর্ত্তিজনিত তাৎপর্য্যটি এক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে এবং জীবের প্রতি প্রীতির ভাব, জীবকে দর্শন দেওয়া যে ভগবানের ধর্ম্ম ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এই উপলব্ধির সূত্রে চতুর্দশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে “মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ” এই ভগবদুক্তিটিও আমাদের যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। ভগবৎ-প্রীতির এমন পারস্পরিক রীতির প্রগাঢ়তায় আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধি প্রলীন হইয়া পড়ে। প্রত্যুত ভগবানই তখন ভক্তের পথের সকল বাধা দূর করেন। শ্রীভগবান আনন্দ-স্বরূপ। আনন্দময়ী হ্লাদিনী ভগবানের মধ্যে নিত্যভাবে বিরাজ করেন, কিন্তু সে আনন্দটি আস্বাদ্য হইয়া থাকে সম্বন্ধের সূত্রে। ভগবানে মাধুর্য্য নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও ভগবত্তা-সার সেই মাধুর্য্য বা আনন্দময়ী তাঁহার স্বরূপশক্তির সংশ্লেষজনিত তাঁহার উল্লাসের ভাবটি ভক্তের সম্পর্কে গেলেই পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া স্বয়ং ভগবানের পক্ষেও আস্বাদ্য হইয়া থাকে। ভক্তানন্দের এই সম্বন্ধের চমৎকারিত্বে স্বয়ং ভগবানও মুগ্ধ হইয়া পড়েন—‘আপন মাধুর্য্য কৃষ্ণ না পারে বুঝিতে, ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে।’ শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বলেন—‘স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা যদানন্দ-পরাধীনঃ শ্রীভগবানপি ইতি।’ শ্রীপাদ আরও বলেন—‘হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি॥’ (প্রীতিসন্দর্ভঃ-৬৫) অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপধর্ম্মনিষ্ঠ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি-স্বরূপিনী হ্লাদিনীর সর্ব্বানন্দশায়িনী বৃত্তি ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রেমকে প্রদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। সেই প্রেম বা প্রীতির অনুভবে

ভগবানও ভক্তের প্রতি অতিশয় প্রীতিমান হইয়া থাকেন। ভক্তানন্দময় তাঁহার ধর্ম্মটি এইভাবে ভক্তের ভজনের পথে ধরা পড়িয়া যায় এবং ভক্তকে পাইয়া ভক্ত-প্রেমাধীন ভগবানকে আমরা পাই। তাঁহার সাধর্ম্ম্য আমরা উপলব্ধি করি।

'ভক্ত বাড়াইতে সেই ঠাকুর সে জানে
কি না করে কি না বলে ভক্তের কারণে।
জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়।'

(চৈঃ ভাগবত)

প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের অশেষ-কল্যাণগুণের এমন প্রভাবেই জীব গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে অব্যভিচারিণী ভক্তি শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, মাধুর্য্যের আকর্ষণে তাঁহাকে একান্তভাবে লাভ করিবার উৎকণ্ঠা হইতেই উপজাত হয়। এই ভক্তি-সংযোগে আরাধ্য শ্রীভগবানই জীবের সাধ্যতত্ত্ব। পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে, তাহা অপ্রাকৃত। 'তাঁহার বিভূতি-দেহ সব চিদাকার।' পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও সেই সত্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে—'ন তস্য প্রাকৃতী মূর্ত্তির্ম্মেদোমাংসাস্থি-সম্ভবা।' তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মানুষের মত মেদ, মাংস এবং অস্থিতে গঠিত নয়। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকের 'হি' শব্দের দ্বারা শ্রীভগবান ইহাই সুনিশ্চিত করিয়াছেন।

"প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম,
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি,
পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণের তাহা অঙ্গকান্তি।"

জ্ঞানমার্গের সাধকগণ তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় এই ভাবটিই অনুভব করেন এবং যোগীরা কূটস্থ অন্তর্য্যামী-স্বরূপে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের অংশ-বিভূতিকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীভগবান্

তাঁহার সর্ব্বভাবে পূর্ণ স্বরূপতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আমার এই দ্বিভুজ নররূপ অক্ষর-ব্রহ্ম এবং কূটস্থ পরমাত্মতত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা বা মূল। এই স্বরূপে আমিই সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি, সুতরাং আমাতেই সর্ব্বধর্ম্ম-বিধৃত। আমি সকলকে পোষণ করিতেছি, এজন্য আমিই ঐকান্তিক সুখের আকর। শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বমাধুর্য্যের বীর্য্যে পঞ্চাত্মক জীবকোষের অবীর্য্য দূর করিয়া অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের সর্ব্ব সম্বন্ধের সৌলভ্যে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে এখানে তাঁহাকে পাইবার পথটি ভগবান প্রকট করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবকে না হইলে ভগবানের চলে না। জীবের প্রতি প্রীতি আস্বাদন ইহাই ভগবানের ধর্ম্ম। ভগবৎ-প্রীতির আস্বাদন—এইটি আবার জীবের ধর্ম্ম। ভগবান গীতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে জীবের সহিত তাঁহার নিজ ধর্ম্মের সূত্রে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। জীবকে দিয়াছেন তাহার সাধর্ম্ম্য। এইভাবে শাশ্বত ধর্ম্মের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। শ্রুতি-মুখে তিনি তাঁহার এই ধর্ম্মের পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন—'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো অহমন্নাদো অহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ।' (তৈঃ-৩।১০।৬) আমিই উপভোগ্য অন্ন এবং অন্নের উপভোক্তাও আমি। অন্য কথায় ভগবান আমাদিগকে আপনার করিয়া লইয়া উপভোগ করেন—আমরা তাঁহার অন্ন। আমাদিগের তিনি ভোক্তা। আবার আমরাও তাঁহাকে উপভোগ করি, তিনি আমাদের অন্ন। এই অন্ন এবং অন্নভোক্তা উভয়ের পরস্পরের মিলন ঘটানও তিনি। ইহা তাঁহার ধর্ম্ম। আমি অন্ন ও অন্নভোক্তার মিলনের ঘটক 'অহং শ্লোককৃৎ' বারবার এইরূপ শ্রুতির উক্তির দ্বারা সেই দৃঢ়তাই অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্যবস্তু উপভোগ করেন—'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।' এই ভোগটি কেমন? শ্রুতি বলেন—'স য এবংবিৎ অস্মাল্লোঁকাৎ প্রেত্য, এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং

মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্, এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে।' (তৈঃ-৩।১০।৫) অর্থাৎ এই প্রকার যিনি আমাকে জানেন, তিনি এই লোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্নময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, তৎপর প্রাণময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, পরে মনোময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, পরে বিজ্ঞানময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন। পরিশেষে যথেচ্ছ অন্ন ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই পৃথিব্যাদি লোকে পর্য্যটন করিতে করিতে আনন্দময় শ্রীভগবানেরই জয় গান করেন। সুতরাং 'নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ'—শ্রীভগবানে আত্মনিবেদনেই সমুদয় ভোগ্য বস্তু উপাসকের অধিগত হইয়া থাকে এবং মুক্তি তাঁহার পক্ষে হয় তুচ্ছ। ভগবানের ধর্ম্মটির স্বরূপ এই যে তাহা মুক্তিকে তুচ্ছ করায় এবং জীবের সহিত নিত্য সম্বন্ধের মূলীভূত তাঁহার প্রীতির এই রীতি উপলব্ধি হইলেই জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি ঘটে। জীবের পক্ষে ভগবানকে ধর্ম্ম বা তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ বলিতে এই ভগবৎ-প্রীতি বা প্রেমবস্তুই বুঝিতে হইবে এবং গীতার তাহাই লক্ষ্য বা বিধেয়।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে অষ্টবিধ গুণের উল্লেখ আছে, জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে সেই সেই গুণের অধিকারী হয়। যাঁহারা মুক্ত পুরুষ তাঁহারা সেগুলির অধিকারী—তাঁহারা নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুহীন, শোকদুঃখবিবর্জ্জিত, ক্ষুৎপিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহারা এইসব অধিকার লাভ করিয়া যে ব্রহ্ম হইয়া যান শ্রুতিতে ইহা প্রতিপন্ন হয় না। স্বয়ং আচার্য্য শঙ্করও 'ভেদব্যপদেশাচ্চ' এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—'ন হি লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতি' অর্থাৎ প্রাপক কখনও প্রাপ্য বস্তু হইয়া যায় না। কোন বস্তু কোন বস্তুর সমান বলিতে সে বস্তুটি যে বস্তুর সহিত সমান তাহার সহিত এক হইয়া যাওয়া বুঝায় না।

বিষ্ণুপুরাণ প্রশ্ন করিয়াছেন—

'বিভেদ-জনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি।' (৬।৭।৯৪)

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে দেহে আত্মবুদ্ধিই নিরাকৃত হয় এবং সেই অজ্ঞানতা হইতে জীব মুক্ত হইলে দেব-মনুষ্যাদি দেহে একই জীবাত্মা সম্বন্ধীয় ভেদও তিরোহিত হয়। এই ভেদজ্ঞানই অজ্ঞানতা। কিন্তু নাম-রূপের নানা ভেদ তিরোহিত হইলেও জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভিতরে ভেদ থাকে। এই ভেদ কে অস্বীকার করিবে? প্রকৃতপক্ষে মুক্ত অবস্থায় জীব যদি ব্রহ্মের সহিত একত্বই প্রাপ্ত হয় তবে তাহার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। জীবের সনাতনত্ব গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে। জীবের সেই সনাতনত্ব আর থাকিবে না। বস্তুতঃ জীব সনাতন, সুখ এবং আনন্দও তাহার স্বরূপধর্ম্মে সনাতন এবং আস্বাদনের এই সনাতনত্ব চিদংশে অর্থাৎ জ্ঞাতৃভাবে; সুতরাং জীব এবং ঈশ্বরে ভেদ আছে এবং এই ভেদ আছে বলিয়াই সমান-ধর্ম্মতা আছে। এই সমান-ধর্ম্মতা সার্থকতা লাভ প্রাপ্ত হয় এবং জীব ও ব্রহ্মের প্রীতির সম্বন্ধে নিজেই উজ্জীবন অনুভব করে—'চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার'—হেন ভগবানকে পাইয়া। প্রীতির ক্ষেত্রে স্বার্থের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ এবং প্রীতি পরস্পর বিরোধী বস্তু। জীব ভগবানের প্রীতির সম্বন্ধ উপলব্ধি করিলে ব্রহ্মের বিমৃত্যু, বিশোক প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধে সে উদাসীন হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। সেগুলি তাহার পক্ষে আপনা হইতেই লভ্য হইতে পারে কিন্তু ভগবৎ-সম্বন্ধে উজ্জীবিত জীবের কাছে ভগবৎ-সেবাতেই তাহার স্বরূপানুবন্ধী সুখ। চরিতামৃত বলেন—

'প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি
প্রীতি-বিষয়-সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।'

এমন ভগবানই গীতায় সাধ্যস্বরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। চিদর্থে সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞান। মন দেহ-সম্পর্কিত গুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে বিশুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ সত্ত্বাংশ-স্বরূপে এই চিদংশ প্রতিফলিত হয়। চরিতামৃত বলেন—

'সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম
ভগবানের সত্তার হয় যাহাতে বিশ্রাম।
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার।
কৃষ্ণ-ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার।'

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বের নির্দ্দেশে এই জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা-সার পরব্রহ্মের স্বরূপধর্ম্মের মূর্ত্ত এবং রসের প্রাচুর্য্য তাৎপর্য্যে পরিস্ফূর্ত্ত প্রকাশ। তাঁহাকে জানিলে তবে ব্রহ্মের ধর্ম্মটি জীব বুঝে, তাহার আস্বাদ পায় এবং সেই সূত্রে স্বরূপধর্ম্মগত তাহার নিজ প্রয়োজন—সনাতন সুখের আস্বাদনে উপযোগী তাহার ধর্ম্ম লাভ করে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

'যে চ বেদবিদা বিপ্রাঃ
যে চাধ্যাত্মবিদোঃ জনাঃ
তে বদন্তি মহাত্মানং
কৃষ্ণং ধর্ম্ম সনাতনম্।'

ব্যাপার এই যে ধর্ম্মের স্বরূপ যিনি তাঁহাকেই এই ধর্ম্মকে রূপ দিতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ধর্ম্মের রূপ তিনি নিজেই। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'যৎকৃতো যেনৈবোপদিষ্টো গোত্রধর্ম্মঃ

অনাদ্যৃষিপরম্পরাপ্রাপ্তো ভগবদ্ধর্ম্ম, যদ্বা গাং পৃথ্বামপি তারয়তে গোত্রং স চাসৌ ধর্ম্ম', ইত্যাদি। অর্থাৎ এই ধর্ম্মের কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, উপদেষ্টাও তিনি। এই ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে ঋষিপরম্পরাসূত্রে আমরা প্রাপ্ত হই ; এজন্য এই ধর্ম্ম গোত্র-ধর্ম্ম অথবা গো বা পৃথিবীর উদ্ধার করিতে সমর্থ এই ধর্ম্ম। শ্রীভগবানের উক্তিই এক্ষেত্রে প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন—আমিই অমৃত এবং অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমিই সনাতন ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়।

'স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।'

মুক্তি পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবিকা। তিনি এই অর্থে মুক্তিপদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়।
মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয়
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়।' (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, কর্ম্মবাসনা, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় এই দশটি তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তি এইগুলির মধ্যে নবম। মহাত্মাগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির সাহায্যে দশম আশ্রয়তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া থাকেন। মুক্তিকামীর উপাস্য অক্ষরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই পদস্বরূপ।

'যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।' (চৈঃ চঃ)

চতুর্দশ অধ্যায়ের উপসংহারে এই সত্যটির প্রতিষ্ঠায় পুরুষোত্তম-তত্ত্বের ভূমিকা রচিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম যোগ

১। ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ। ১।

২। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী। ৪।

৩। সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্। ১৫।

৪। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।১৮।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সংসার বৃক্ষের স্বরূপ

'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। শ্রীভগবান্ গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের নিকট সাধ্যতত্ত্বটি সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। পুরুষোত্তমস্বরূপে এই সাধ্যতত্ত্বে জীবের শাশ্বত ধর্ম্ম বিধৃত রহিয়াছে এবং তাঁহাকে পাইলেই জীব যে একান্ত সুখের অধিকারী হইতে পারে, এই সত্যটি আমরা ভগবানের শ্রীমুখ হইতে বুঝিয়া পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আমি অক্ষরের অপেক্ষাও উত্তম—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ' সমস্ত বেদের আমিই একমাত্র বেদ্য অর্থাৎ সমস্ত বেদে আমি সাধ্যতত্ত্বস্বরূপে উপদিষ্ট হইয়াছি। এই উক্তির সঙ্গে সাধ্যতত্ত্বের সাধন-প্রকরণও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের আশ্রয়ে জীব ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে, অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে এ সম্বন্ধে তিনি সকল সংশয়ের নিরসন করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে যিনি স্বয়ং ভগবান তিনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ। তাঁহাকে ধর্ম্মপথের সাধন করিয়া সাধ্যপথ ও সাধ্যের পরিচয় বা স্বরূপ নির্ণয় করিতে হয় না। আমরা দেখিতে পাই এক্ষেত্রে সচরাচর অধিকার সম্পর্কে সমন্বয়ের কথা উঠে। জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল পথেই প্রকৃষ্টরূপে ভগবানকে পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তিযোগের উৎকর্ষতা যাহারা অনুদার-চিত্ত বা গোঁড়া তাহারাই অন্ধ-ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় এবং তাহাতে তাহাদের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মনোভাবেরই পরিচয় মিলে। এমন যুক্তিও আছে জানি। বলিতে কি, যাঁহারা এইরূপ যুক্তিজাল বিস্তার করেন, তাঁহাদের উক্তির সারবত্তা বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়ে। কারণ যিনি ভগবান্ তিনি নিজেই অন্যবিধ সাধন-প্রকরণের তারতম্য বিচার করিয়া গীতায় ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁহার উক্তিতে যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছেন সাধন-প্রকরণ সম্পর্কিত প্রশ্নের

ক্ষেত্রে তাঁহার সেই সিদ্ধান্তই প্রবল আমরা ইহাই বুঝি। সকল পথেই ভগবানকে পাওয়া যায়। যিনি যেমন ভাবেই কামনা করেন বা সাধনা করেন, তিনি সেই ভাবেই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। গীতায় এ সত্য স্বীকৃত হইয়াছে ইহা ঠিক ; কিন্তু সকল পথই সমান কিংবা সকল পথেই সমানভাবে ভগবানকে পাওয়া যায়, অন্য কথায় সকল সাধনেই সমান ফল মিলে ভগবান্ গীতায় এমন কথা কোথায়ও বলেন নাই। বস্তুতঃ গীতার ভগবদ্ভক্তিকে মর্য্যাদা দিতে হইলে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে হয় এবং নরলীল শ্রীকৃষ্ণই যে সাধ্যতত্ত্ব এ কথাও স্বীকার করিতে হয়। শুধু গীতায় নহে সমস্ত শাস্ত্রার্থে ভক্তিযোগাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে সাধ্য-স্বরূপের সমন্বয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সত্যটি পরিস্ফুট করিবার জন্যই পুরুষোত্তম-তত্ত্বের অবতারণা। শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বের পটভূমিকায় সংসারের স্বরূপ কি এবং সংসারে বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া জীবের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় এই সব কথা বলিয়াছেন। ফলতঃ সংসারের তাপ হইতে জীবের উত্তরণের অবলম্বন হইলেন তিনি। জীবের প্রতি তাঁহার করুণা স্বাভাবিক। সংসারী জীবের পক্ষে সাধ্যতত্ত্বের উপদেশে তাঁহার সহিত জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপনে ভগবানের সেই করুণার পরিচয় আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে পাই। ভগবানের ভাব এবং তাঁহার ধর্ম্মে জীবের উজ্জীবনের রীতিতে তাঁহার সহিত প্রীতির পথে সমাত্মসম্বন্ধ স্থাপনের প্রণোদনায় এইভাবে পুরুষোত্তমতত্ত্বের পরিপূর্ত্তি সাধিত হইয়াছে। ফলতঃ দ্বাদশ অধ্যায়ে যাহার সূচনা পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহারই পরিণতি।

গীতার এই অধ্যায়ে ভগবান্ জগৎকে অশ্বত্থ-বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রুতিতেও অশ্বত্থ-বৃক্ষরূপে সংসারের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। কঠোপনিষদ বলেন—"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" 'শ্ব' অর্থাৎ আগামী কল্য পর্য্যন্ত যাহার স্থিতি অনিশ্চিত, তাহাকেই এক্ষেত্রে অশ্বত্থ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তাব্যক্তময় শ্রীভগবানের লীলাতে এই বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে। সুতরাং সেদিক

হইতে ইহা অক্ষয় বট। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সেইরূপ নির্দ্দেশই দেখিতে পাই—

"যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নীয়ো ন জ্যায়াঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।"

অর্থাৎ তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নাই। তাঁহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম বা বৃহৎ অপর কেহ নাই। সেই পুরুষ বৃক্ষস্বরূপে অটলভাবে আত্মমহিমায় ঊর্দ্ধলোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেই পুরুষ পূর্ণস্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—'আজীব্যঃ সর্ব্ব-ভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্ ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্ম চরতি নিত্যশঃ।' (মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব্ব) কিন্তু বিষয়াসক্ত জীবের দৃষ্টিতে এই বৃক্ষের স্বরূপটি উন্মুক্ত নয়। তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা অনিত্য নশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা অশ্বত্থ বা অস্থায়ী। জীব অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন। সে দেহাত্মবুদ্ধিতে অভিভূত, এজন্য সংসারের আদি, অন্ত এবং যাহাতে এই সংসার সংপ্রতিষ্ঠ, জীব তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহাকে মিথ্যা বলে। ইহাকে সে মায়া, ইন্দ্রজাল, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, এইরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বকে শ্রীভগবানের ব্যক্ত মূর্ত্তিরূপে দেখাই বেদের উপদেশ। শ্রুতিতে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে—

'কিংসিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীৎ
যতোদ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দু
তদ্‌যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্।
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্
যতো দ্যাবা-পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।

মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি

বো ব্রহ্মাধ্যাতিষ্ঠদ্ ভূবনানি ধারয়ন্ ।’

(যজুঃ-২।২।২৭)

সুধিগণ ! জিজ্ঞাসা করি, যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়াছে সেই বনই বা কেমন এবং বৃক্ষই বা কিরূপ যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া পরমেশ্বর সর্ব্ব জগৎ পালন করিতেছেন ? যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ। হে মনিষিগণ, ব্রহ্ম স্বীয় সঙ্কল্পবলে ত্রিভুবন ধারণ করিয়া তাহাতে নিজেও অধিষ্ঠিত আছেন।

মৈত্রেয় ঋষি পরাশরকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

‘নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ।’

(বিষ্ণুপুরাণ-১।৩।১)

উত্তরে ঋষি বলিয়াছেন—

‘শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ।’

(বিষ্ণুপুরাণ-১।৩।২)

অগ্নির উষ্ণত্ব, অগ্নির পক্ষে স্বাভাবিক। কেন উষ্ণ এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। এইরূপ ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি আছে এবং সেগুলি অচিন্ত্য, প্রাকৃত জ্ঞানের গোচরীভূত নয়। এই সব অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই নির্গুণ, অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ এবং অমলাত্মা হইয়াও ব্রহ্ম সৃষ্টাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং তাহা হইতে তিনি অবিকারী রহেন।

জীবের জ্ঞান প্রাকৃত বস্তুনিচয়েই সীমাবদ্ধ ; সুতরাং জীব ব্রহ্মের এই অচিন্ত্যশক্তির স্বরূপ ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বে বিশ্বাত্মদেবতার ব্যক্তভাবটি উপলব্ধি করিতে না পারিলে জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের অস্তিত্ব বা

তাঁহার শক্তির সক্রিয় এবং জাগ্রত স্বরূপটির অনুপলব্ধির ফলে জীব নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। সে তাহার চারিদিকে শূন্যতা উপলব্ধি করে। মৃত্যুই তাহার পরম পরিণতি বলিয়া সে মনে করে এবং তাহার জীবনের মূলে কোনরূপ সংস্থিতি সে খুঁজিয়া পায় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে মায়াবাদমূলক জ্ঞানের সাধনাকে এইদিক হইতে বেদ-বিরোধী অনাত্মবাদই বলিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদী বেদান্তে ব্যাখ্যাত বিবর্ত্তবাদ বা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই সিদ্ধান্তকে যদি স্বীকার করিতে হয় তবে কূটস্থ অক্ষর-তত্ত্বের সাধনায় বা জীবাত্মার জড়বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত অসঙ্গ বা অক্ষর স্বরূপজ্ঞানেই সাধ্যতত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ক্ষর ও অক্ষরের অপেক্ষাও উত্তম বলিতে কিছুই আর থাকে না। সে ক্ষেত্রে গীতার সব কথা ফাঁকা হইয়া দাঁড়ায়। গীতায় শ্রীভগবান্ জীবের দৃষ্টিতে যে সাধ্যতত্ত্বটি সর্ব্বোত্তম-স্বরূপে প্রমূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং অক্ষরাদপি চোত্তম' এই তত্ত্বকে অস্বীকার করিতে হয়। বেদ জীবের মৃত্যুকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং জগৎকে মিথ্যা বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন নাই। আমাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান এই নশ্বর জগতে বেদ অবিনশ্বর "যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা" এমন সত্যকে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সত্যের উপলব্ধিতেই মৃত্যুময় জগতে অমৃতত্বে জীব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কাল-চক্রে পরিবর্ত্তনশীল এই জগৎ এবং নশ্বর এই অশ্বত্থরূপ সংসার-বৃক্ষ ঊর্দ্ধে বিশ্বাধার পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি সর্ব্ববিধ বিকারের মধ্যেও অব্যাকৃত। 'সত্যং পরং ধীমহি' পরম সত্যস্বরূপ তিনি। তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। ধর্ম্মের তিনি প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। বেদ ইঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

'স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।' (শ্বেতাশ্বতর—৬।৬)

যাহা হইতে এই জগৎ প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তিনি সংসারবৃক্ষ ও কালের বিভিন্ন পরিণামের উর্দ্ধে নিত্য সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি ধর্ম্মের আকর এবং পাপবিনাশক। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ তাঁহার আনন্দময় শ্রীবিগ্রহ। আত্মভাবে বিশ্বাধার সেই দেবতাকে অধিগত হইয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করে। বেদ বিশ্বের সর্ব্বত্র রসময় এই অমৃতস্বরূপ দেবতাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। বেদ বিশ্বে দেখিয়াছেন সর্ব্বত্র মধু, উপলব্ধি করিয়াছেন মধু-মাধবের খেলা। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের করুণার স্পর্শ যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মনের মূলে আমরা অনুভব না করি, ততদিন পর্য্যন্ত দেহে আত্মবুদ্ধি আমাদের নিরসিত হইতে পারে না, সাম্যের ভাবটিও অন্তরে আমরা পাই না। প্রকৃতপক্ষে অক্ষর-তত্ত্বের সাধনার মূলে সূক্ষ্মভাবে দেহে আত্মবুদ্ধিজনিত এমন সংস্কারই কাজ করে এবং মুক্তি-কামনার নামে আমরা নিজেদের স্বার্থ ই সিদ্ধ করিতে চাই। "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"—এই বোধ এমন অবস্থায় আমাদের জীবনকে উজ্জীবিত করিতে সমর্থ হয় না। এই সাধনায় আমরা ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারি কিন্তু সেখানেও সংসার-চক্র বিঘূর্ণিত থাকে। সাধক সে সাধনায় লোকান্তর-প্রাপ্ত হইতে পারেন, ক্রম-মুক্তির একটি ধারা তাঁহার জীবনে প্রতিফলিতও হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ-মুক্তির তিনি অধিকারী হন না। সংসাররূপী অশ্বত্থ বৃক্ষের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীভগবান এই সত্যটি অসংশয়িতভাবে আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন।

অশ্বত্থ বৃক্ষটি কেমন এইবার একটু চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ইহা ঊর্দ্ধদিকে মূলবিশিষ্ট। সপ্তলোকের উপরে ব্রহ্মলোক। এখানে এই বৃক্ষের মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং পৃথিবীতে শাখা-উপশাখার যোগে পত্র-পল্লব বিস্তারের দ্বারা বৃক্ষটি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। পত্রের দ্বারা বৃক্ষ প্রাণ আহরণ করে। সুতরাং মর্ত্ত্যলোকে রহিয়াছে সংসার-বন্ধন; আবার ব্রহ্মলোকে সেই বন্ধনের পাক পাকা হইয়া জমিয়াছে—মূলে গাড়িয়া বসিয়াছে।

ধর্ম্মের নামে কাম্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে জীব সাময়িকভাবে সংসার-বৃক্ষের উর্দ্ধস্থ মূলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি লোকে উৎপন্ন হয় এবং নিম্নে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিপ্রাপ্ত হয়। দেবাদি উর্দ্ধলোকেও সংসার। ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন ঘটে, ইহা গীতারই বাণী। সুতরাং কামকামীর পক্ষে সংসার-চক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নাই। ফলতঃ সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে কামনা তাহাও কাম্যকর্ম্মেরই অন্তর্গত এবং সে পথে জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্মের পরিপূর্ত্তি সাধিত হয় না।

চিন্তা করুন, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ উল্টাইয়া রহিয়াছে। উপরে সপ্তলোক—সেখানে ভোগৈশ্বর্য্য-কামনার শিকড় গাড়া আছে, সুতরাং রহিয়াছে বন্ধন। আবার মর্ত্ত্যলোকে তাহার শাখা-প্রশাখা বিষয়-বাসনারূপ পত্রপল্লব বিস্তার করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেখানেও বন্ধন। জীব একটি পিপীলিকার মত এই পত্র-পল্লবের পাকে পড়িয়া ঘুরিতেছে। যদি এই সংসার-চক্র তাহাকে অতিক্রম করিতে হয়, তবে প্রথমে পত্র-পল্লবজাল ভেদ করিয়া তাহাকে উপশাখা হইতে শাখায়, শাখা হইতে কাণ্ডে পৌঁছিতে হইবে। পরে কাণ্ড ধরিয়া দেব-লোকাদি প্রাপ্তি কামনারূপ মূল ছেদন করিতে হইবে। এই মূল আবার কোমল বা শিথিল নহে—সুবিরূঢ় অর্থাৎ অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং ইহাকে ছেদন করিবার পক্ষে অন্য কোন অস্ত্র নাই, অস্ত্র হইল অসঙ্গ বা অনাসক্তি। সুতরাং অস্ত্রটি বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে একটুও সহজলভ্য নয়। আবার সে অস্ত্রও যেমন তেমন হইলে চলিবে না। সে অস্ত্রটিও দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন—অর্থাৎ অনাসক্তির ভাবটি জীবের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় প্রত্যয়ে উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দীপ্তি জীবের পুরুষার্থ লাভোপযোগী নিজবীর্য্যের প্রাচুর্য্যে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী চিন্ময় রসধর্ম্মের উদ্দীপক হওয়া দরকার। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, তাঁহার লীলারস আস্বাদনের লালসা জীবের অন্তরে একান্ত এবং জীবন্ত হইলে তবেই তাঁহার প্রতি আমাদের স্বরূপধর্ম্মের সর্ব্বাংশে

উজ্জীবনোপযোগী এমন আসক্তি উৎপন্ন হইতে পারে এবং বিষয়ের সঙ্গ হইতে আমরা তখন অসঙ্গ অবস্থায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই। ভগবানে আসক্তি জন্মিলে বিষয়ে অনাসক্তি স্বাভাবিক ভাবেই উপজাত হয়। উপযোগী অস্ত্রটি মিলে আমাদের শুধু তখন। শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৯ তম শ্লোকে বলিয়াছেন—

'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে।'

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে বলিয়াছেন, ভগবান হরিতে যাঁহার রুচি জন্মিয়াছে, তাঁহার বিষয়াসক্তি আপনা হইতেই বিলয় হইয়া যায়। অনাসক্তির এই অবস্থায় সাধককে সংসার ত্যাগ করিতে হয় না। প্রত্যুত অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিয়াও এমন সাধক প্রকৃত বৈরাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আমরা এ সম্বন্ধে অভয় আশ্বাস লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার,
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার।'

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়েও এই শরণাগতিই সর্ব্বভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, উপদিষ্ট হইয়াছে অসকৃৎ আবৃত্তির পথে। ভগবান বলিয়াছেন, 'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে'—সেই আদি পুরুষের আমি শরণাগত হই, যাহা হইতে এই চিরন্তন সংসার প্রসৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ের এইটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের জপে, ইহার অর্থ-ভাবনায় শরণাগতি অবলম্বনপূর্ব্বক পরমপদের জন্য সাধনা করিতে হইবে। সংসার-চক্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে ইহাই গীতার উপদেশ। শ্রুতি বলিয়াছেন—'স অকাময়তঃ', তিনি কামনা করিলেন। ভগবানের কামনা হইতে বিশ্বজগৎ বিসৃষ্ট হইয়াছে। বেদান্তে আমাদের সর্ব্বকর্ম্মের মূলে শ্রীভগবানের এই কামনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। নমস্কার বিহিত হইয়াছে সেই কামদেবতার

—"কামোঽকার্ষীন্নমো। কামোঽকার্ষীৎকামঃ করোতি, নাহং করোমি। কামঃ কর্ত্তা, নাহং কর্ত্তা।" এই প্রকামতত্ত্বেই ভগবানের লীলা-মাধুর্য্য প্রমূর্ত্ত এবং বিশ্বজগৎ সেই বীজেই বিধৃত। চরিতামৃতে ভগবদুক্তি—'আমার রসে জগৎ সুরস'—শ্রীভগবানের এই রসস্বরূপে ডুবিলে জীব আনন্দী হয়। 'সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ইহ সবার আধার' যিনি তাঁহাকে পাইয়া আমাদের সর্ব্বকাম পূর্ণ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ আকাশ যদি না থাকিত তবে কে থাকিত ? 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি' অর্থাৎ আনন্দ হইতেই ভূত সমস্ত জন্মগ্রহণ করে। আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে এবং আনন্দের মধ্যেই শেষকালে ভূতসমূহ প্রবেশ করে। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, তিনি রসস্বরূপ। আনন্দই সুখ। ব্রহ্মের অংশস্বরূপে সুখের বাসনা জীবের পক্ষে সনাতনী বা স্বাভাবিক। গীতায় তাঁহার এই রসময় এবং ঐকান্তিক সুখের আকরস্বরূপের সাধনাই বিধেয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে' অর্থাৎ আমিই সর্ব্ববস্তুর উৎপত্তিস্থল। সর্ব্ববস্তু আমা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বের পরিবর্ত্তনশীলতার মূলে শ্রীভগবানের এই লীলা-মাধুর্য্য বীর্য্য স্বরূপে রহিয়াছে। তিনি আদি-পুরুষ। আর সবই শক্তি—জীবের পুরাণী বা সনাতন প্রবৃত্তি রসময় সেই পুরুষেরই সর্ব্বভাবে অনুগতিতে বা প্রপত্তিতে। তাঁহাকে লাভ করিলে বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের উপলব্ধিতে আসে। শ্রুতি এই পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, বলিয়াছেন তাঁহার সহিত জীবের পুরাণী প্রবৃত্তি সূত্রে সংযোগের কথা—

'যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।' (শ্বেঃ-৪।১৮)

জীব যখন অবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত হয়—দিবারাত্রির অধ্যারোপ থাকে না, সৎ এবং অসতের ভেদভাব চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হয়, তখন চিত্তে নির্ব্বিকল্প শিব ও সুন্দর আত্মস্বরূপ দেবতার অভিব্যক্তি ঘটে। তিনি তৎপদের লক্ষ্য। তিনি সবিতারও বরণীয়। পুরাণী প্রজ্ঞা তাহা হইতে প্রসৃত হইয়া শুদ্ধ চিত্তে প্রকটিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মীস্থিতিতে ভগবান এই সত্যেরই সূচনা করেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে অস্বীকার করিলে বিশ্বের সর্ব্বত্র উপলব্ধি হয় বিকার। আমাদের দৃষ্টিতে জাগে বিভীষিকা, আমরা দেখি মৃত্যুকে। এই মহাভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে বিশ্বাত্মস্বরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার নিকট প্রপন্ন হইতে হইবে।

'উদারা মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি,
নানা কাজে ভজে তবু পায় ভক্তি-সিদ্ধি।' (চৈঃ চঃ)

প্রকৃতপক্ষে প্রপন্ন না হইলে কেহ ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং প্রপন্ন হইলে বিশ্বের বিভিন্ন ভাবের মূলে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ব্যক্তভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। কিন্তু অক্ষর-তত্ত্বের সাধনায় এ বস্তু মিলে না। কারণ জগৎ মিথ্যা এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের প্রবৃত্তির মূলীভূত ভগবৎভাবের উজ্জীবক সূত্রটিই আমরা সে ক্ষেত্রে অখণ্ড আগ্রহে ধরিতে উন্মুখ হই না। বিশ্বে ব্যক্ত কোন ভাবই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তরে গ্রহণ করি না। ইহার ফলে মর্ত্ত্যজীবনের চেতনায় আমরা নিজদিগকে নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থার মধ্যে পাই। এমন নিঃস্ব জীবনের দুঃস্বপ্ন প্রতিনিয়ত আমাদিগকে আহত করে। বিশ্বকর্ম্মের সম্পর্কে ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রেম তো দূরের কথা, মমতাবোধজনিত কোন সম্বন্ধই স্বীকৃত হয় না। ইহার ফলে এ জগতে আমাদের অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তি-স্বার্থগত ক্ষুদ্র চেতনা ব্যতীত বৃহৎ-ভাবের কোন অর্থই

কি এই জগৎ-সৃষ্টির মূলে নাই? শ্রুতি তেমন কথা বলেন না। শ্রুতি বলেন—

'তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।'

এ সমস্তই ব্রহ্মপুরুষের মহিমা। পরন্তু ব্রহ্ম এই সমুদয় হইতে অধিক। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার এক পাদ মহিমা, অপর তিন পাদ অমৃত এবং দিব্যলোকে অবস্থিত। শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও জগদাতীতরূপেও বর্ত্তমান থাকেন। ফলতঃ ভগবান অন্য কোন স্থান হইতে উপাদান লইয়া আসিয়া নিশ্চয়ই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সুতরাং এই বিশ্বের বীজটি যে তিনিই নিজে এবং বিশ্ব যে তাঁহার লীলার প্রকাশ এবং বিলাস বা নিজকে লইয়াই তাঁহার কারবার ইহাও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ভগবান আমাদিগকে বিশ্বজগতে আনিয়া জেল খাটাইয়া লইতেছেন এবং এই জগৎ বিরাট একটা কারাগার ব্যতীত অন্য কিছু নয়, নিজেদের মূঢ়তার বশে আমরা এইরূপ অনাত্মভাবের বশীভূত হই। পক্ষান্তরে বিশ্ব-সম্পর্কিত ক্ষরের ভিতর ভগবানকে উপলব্ধি করিলে বিকারের মধ্যে অবিকারী তাঁহার আত্মভাবের সঞ্চার-সামর্থ্য স্বীকারোপযোগী করুণার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার ভাবটুকু অন্তরে রাখিলে ভগবানকে আমরা এখানে এই বিশ্বেই আমাদের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় সর্ব্বসম্বন্ধে সমগ্রভাবে পাই। প্রত্যুত অক্ষরতত্ত্বের কষ্টকর সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজনই তখন থাকে না। কারণ ক্ষরতত্ত্বে অবিনশ্বর তাঁহার নিত্য সত্ত্বার উপলব্ধিতে অক্ষরজ্ঞান আপনা হইতেই আসে। আমরা আমাদের নিজেদের স্বরূপধর্ম্মগত পুরাণী বা চিরন্তনী প্রবৃত্তিতে নিজেদের স্বরূপধর্ম্মগত চিৎ-শক্তির সংযোগে স্বতঃই প্রজ্ঞাবলে সংস্থিত হই। এই-রূপে প্রত্যক্ষতার পরম বলে এই মর্ত্ত্যজীবনেই তখন ক্ষর-অক্ষর উভয়ত আমাদের অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা ঘটে। আমাদের যিনি সর্ব্ব অবস্থায় 'স্ব' আমরা তাঁহাকে পাই। আমাদের পুরাণী প্রবৃত্তির সঙ্গে এইখানেই

আমাদের জীবনের সঙ্গতি—এইখানেই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা। স্বরূপধর্ম্মে জীবের প্রতিষ্ঠা লাভের উপযোগী যুগ-পরম্পরাগত ঋষিবর্গের উপদিষ্ট ধারাটি এইখানে বিধৃত রহিয়াছে। এই হিসাবেও ইহাকে পুরাণী প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই প্রবৃত্তির প্ররোচনা ভগবান হইতেই আসিয়াছে। ঋষিদের তিনিই ঋষভ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব মায়াবশে কর্ত্তৃত্বাভিমান যুক্ত হইয়া প্রবৃত্তির গুণসমূহ ভোগ করে এবং তাহার ফলে অনিত্য বস্তুতে আসক্তিবশতঃ দেবাদি সৎজন্ম, পশ্বাদি অসৎজন্ম ও সদসদযোনিরূপ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়। জীব প্রাণত্যাগ কালে তাঁহার স্থূল দেহটিই পরিত্যাগ করে, কিন্তু সে সূক্ষ্মদেহের সহিত পূর্ব্ব দেহের সংস্কারগুলি বহন করিয়া লইয়া যায়। আবার প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সে নূতন ভোগোপযোগী স্থূল দেহ পায়। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ আহরণ করে, তেমনই মায়াবদ্ধ জীব শরীর ত্যাগ-কালে পূর্ব্ব দেহ হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণকে লইয়া সংস্কার-গুলি সহ বহির্গত হয়। অবিদ্যাময় সংস্কারাচ্ছন্ন জীবের চিত্ত বহির্ম্মুখী হওয়ায় সে নিজের নিত্যমুক্ত এবং সনাতন স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারে না। জীব এই সত্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না যে, ভগবানই সাধিভূত, সাধিযজ্ঞ এবং সাধিদৈব-স্বরূপে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবাত্মার সঙ্গে কূটস্থ, নির্গুণ, অক্ষরাত্মাও রহিয়াছেন—রহিয়াছেন জীবকে কোলে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি' (বৃঃ-৪।৩।১১)। অক্ষরস্বরূপ কূটস্থ পরমাত্মা শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মাকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া আছেন। তিনি স্বয়ং আছেন অসুপ্ত, তাহার নিজের চোখে ঘুম নাই। তিনি জীবকে কর্ম্মানুসারে ভোগের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রীতি-সম্বন্ধে জাগাইয়া তোলেন। ভগবান গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১০ম শ্লোকে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জীব কর্ম্মফল

ভোগ করে বটে, কিন্তু আমারই শক্তি তাহাকে সেই ভোগে উদ্বুদ্ধ করে, করে সে এই ভোগটি চায় বলিয়া—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'। জীব যখন শরীর ভোগ করে কিংবা জীব যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন অধিদৈবস্বরূপে আমিই তাহাকে আতিবাহিক দেহে বহন করিয়া থাকি। আমিই সেক্ষেত্রে ঈশ্বর। মায়াবদ্ধ জীব তাহার সহিত আমার এই নিত্য প্রীতির সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারে না। তাহার সহিত আমার প্রীতির এই নিত্য সম্বন্ধ বুঝিলে সে আমাকেই আত্ম-নিবেদন করিত। তাহার সমস্ত কৃত্যের বোঝা আমার উপর চাপাইয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইত। শ্রুতিতে প্রেমময় দেবতার এই মূর্ত্তি দেখিবার উদ্দেশ্যে বহুভাবে আকুলতা ব্যক্ত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—

'যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি।' (৩।৫)

অর্থাৎ হে রুদ্র, আমাদের সুখবিধানকারী রূপে তুমি সর্ব্বদা আমাদের দেহে অবস্থান করিতেছ। তোমার সেই শুদ্ধ, আনন্দঘন, কল্যাণময়রূপে তুমি আমাদের দিকে দৃষ্টি সম্পাত কর। আমাদের পরমাভীষ্ট পূর্ণ হোক। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ভগবান্ বলিয়াছেন, যতাত্মবান্ যোগীগণ আমার সহিত জীবের এই নিত্য প্রীতির স্বরূপটি উপলব্ধি করেন। কিন্তু অযতাত্মা যাহারা তাহারা যত্ন, চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়াও সেই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারে না। এক্ষেত্রে দ্বাদশ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকটির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আমরা সেখানে 'যতাত্মবান্' শব্দটির অর্থ আত্মারাম এইরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 'যত্নাগ্রহ বিনা শ্রদ্ধা না জন্মায় প্রেমে'—(চৈঃ চঃ) শ্রীভগবানের মাধুর্য্যই এই আগ্রহ স্বাভাবিকভাবে জীবের চিত্তে জাগ্রত করে। সুখরূপ কৃষ্ণ। জীবও চায় সুখ। জীবকে একদিন জাগিতেই হয়। কৃষ্ণ-প্রেমের টানে পড়িতেই হয়। জীব

জাগিয়া উঠে আত্যন্তিক সুখ আস্বাদনের আগ্রহে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এই স্বাভাবিক সম্বন্ধই ভগবান পরিস্ফুট করিয়াছেন—

"পুরুষ-যোষিৎ আদি স্থাবর-জঙ্গম,
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।"

তিনি—তাঁহার এই স্বরূপটি। ভাগবত বলিয়াছেন, 'কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভি' (ভাঃ-৩।১৯।৩৬)। যদি আমরা একটু কৃতজ্ঞ হই তবে বিশ্বজগতে আমাদের প্রতি করুণাময় শ্রীভগবানের সংবেদনটি উপলব্ধি করিতে আমাদের একটুও বিলম্ব ঘটে না। বাস্তবিক পক্ষে কি লইয়া আমরা অহঙ্কার করিতেছি? আমরা যে তাঁহার গর্ব্বেই সব বিষয়ে গর্ব্ব করি। আমরা সহজেই এই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই যে, আমরা যেসব বস্তু লইয়া গর্ব্ব করি, সবই অনিত্য—এই মুহূর্ত্তে যাহা আছে, পরমুহূর্ত্তে তাহা নাও থাকিতে পারে। ক্রমে আমাদের অহঙ্কারেরও লয় হয় এবং সাধুগুরুস্বরূপে ভগবানের সংশ্রয় আমাদের মিলে। এইভাবে ভগবৎ-কৃপায় অজ্ঞানতা আমাদের দূর হয়। পরমপুরুষস্বরূপে সর্ব্বশক্তিমানের সহিত আনন্দরূপিনী হ্লাদিনী-স্বরূপিনী তাঁহার পরমাপ্রকৃতির মিলিত মাধুরীর উজ্জীবন-রীতি ক্ষরপ্রকৃতিতেও অঙ্গাঙ্গীভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া তখন আমাদের সর্ব্ববিধ অবীর্য্যের নিরসন ঘটে। ভাগবত-জীবনে আমরা সে অবস্থায় নিজেদের সনাতন স্বরূপ উপলব্ধি করি। মহর্ষি শাণ্ডিল্য এমন ভাগবত জীবনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'বহুমান-প্রীতিবিরহেতর-বিচিকিৎসা-মহিমখ্যাতি-
তদর্থ-প্রাণ-স্থান-তদীয়তা সর্ব্বতদ্ভাবাপ্রতিকূল্যাদীনি চ
স্মরণতো বাহুল্যাৎ'—(শাণ্ডিল্য-সূত্র-২।১।১৫)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পূজা, তৎপ্রতি প্রীতি, তদ্ভিন্ন অন্য বস্তুতে বিরক্তি, তন্ময় অবস্থায় সর্ব্বত্র তাঁহার ভাবের উপলব্ধিতে অপ্রতিকূলভাব সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এমন সাধকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বভাবে ভগবদাভিমুখ্য প্রাপ্ত হয়। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ইহাকেই

সাসঙ্গ সাধন বলিয়াছেন। ভগবানের পূজা তাঁহার প্রতি প্রীতি ব্যতীত এই অবস্থায় সাধকের তাঁহাদের চিত্ত অন্য কোন কিছুতেই অভিনিবিষ্ট হয় না। ভগবৎ-সম্বন্ধ হইতে ক্ষণেকের জন্য বিচ্যুতি ভক্তের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। প্রতিকূলতার ক্ষেত্রেও তাঁহারা শ্রীভগবানের স্মরণে উদ্দীপিত বীর্য্যে এবং মাধুর্য্যে আনুকূল্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ফলতঃ 'জল বিন্দু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে'—সাসঙ্গ সাধকের জীবন ভগবদ্ভাবে এমনই প্রভাবিত থাকে। সর্ব্বভাব বলিতে এমনই ভাব, ভগবৎ-সম্বন্ধ ব্যতীত ভক্তের জীবনে অভাবের একান্ত অনুভূতি—বিরহের আগুনে তাহার অন্তর এবং বাহির এই দুইদিক জুড়িয়া দুঃসহ দহন-জ্বালা। স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনো উপাধির বিচার এক্ষেত্রে থাকে না। ভক্ত সব ভুলিয়া প্রেমের আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। নিজের সর্ব্বস্ব তাঁহার প্রিয়তম দেবতার পায়ে বিকাইয়া দেয়। এই অবস্থা লাভ করিলে বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা আমাদের অন্তরে প্রাণের দেবতার আনন্দ-সম্বন্ধটি ষোল আনায় বুঝিয়া পাই, মজিয়া যাই তাঁহারই লীলা-রসে। আমাদের ইচ্ছা তাঁহারই ইচ্ছায় নিবেদিত হয়। আমাদের কাম তখন পরিণত হয় প্রেমে। আমাদের প্রবৃত্তি ভগবৎ-মাধুর্য্যের উৎস-মুখে গিয়া পড়ে এবং পুরাণী প্রবৃত্তিতে একান্ত সুখে সঙ্গতি লাভ করে। এই সঙ্গতিতেই প্রেমভক্তির অনুভূতি। এই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয়। প্রতিনিয়ত প্রবর্দ্ধমান অবিচ্ছিন্ন প্রীতিরসে শ্রীভগবানের লীলা-লাবণ্য তৎকালে আমাদের চিত্তে উদ্ভিন্ন হয়। সৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিতে সে অবস্থায় আর নিরর্থক থাকে না। প্রেমের দেবতার নিজ প্রয়োজন ইহাতে রহিয়াছে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। সে প্রয়োজন আমাদিগকে তাঁহার আপন করিয়া পাওয়া এবং সেই ভাবে তাঁহার নিজ-মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করা ; আর সেইসঙ্গে আমাদিগকেও তাঁহার নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন করানো। সে প্রয়োজন তাঁহার নিজের জন্য, সে প্রয়োজন আমাদের জন্য। পরস্পরের সমাত্মসম্বন্ধে এই বিশ্বসৃষ্টি ছন্দোময়। ইঁহা তাঁহারই

আনন্দলীলা। এই সত্যটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইলে মায়া আমাদের পথ হইতে লজ্জাভরে সরিয়া দাঁড়ায়। এইভাবে ভগবানের এই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মর্ত্ত্য-ভূমির অধিভূত ক্ষেত্রেই তখন যজ্ঞেশ্বর দেবতা তাঁহার জন্য আমাদের চিত্তে যজ্ঞপ্রবৃত্তি জাগ্রত করিবার উপযোগী অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সর্ব্বভাবে তাঁহার তাপ লইয়া জাগেন। ফলতঃ শ্রীভগবান্ গীতায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে ক্ষর প্রকৃতিতে অনুস্যূত তাঁহার এমন পরাবর-স্বরূপের সংবেদনটি উপলব্ধি করিবার কৌশলই এখানে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমাদের যোগের স্বাভাবিক ধারাটি তিনি ধরাইয়া দিয়াছেন। জীবের জন্য তাঁহার তাপই গীতার ভাব। বস্তুতঃ গীতার উপদেশে আমাদের জন্য তাঁহার এই তাপটি—তপনীয় বর্ণ লইয়া আত্মভাবে বিশ্বে তাঁহার এমন ব্যক্ত লীলাটি যদি আমরা উপলব্ধি করিতে না পারি এবং তাঁহার উপদিষ্ট যোগের স্বাভাবিক ধারাটি অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পথের অনুসন্ধানে যদি আমাদের বিচিকিৎসা জাগ্রত হয়, তবে তেমন যোগ কুযোগেই পরিণত হইবে। গীতার সার কথা এই যে, শ্রীভগবান আমাদের সহিত নিত্য প্রীতির সম্বন্ধে বিজড়িত রহিয়াছেন। আমাদের জন্য তাঁহার দৃষ্টি সতত জাগ্রত এবং বিশ্ব ভগবানের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধটি আচ্ছন্ন করে নাই। এই বিশ্ব ভগবানেরই অঙ্গ-স্বরূপ। তাঁহারই যজ্ঞ-মূর্ত্তি। ফলতঃ এই সত্যটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে মায়া, আচ্ছন্ন করিয়াছে অবিদ্যা, আচ্ছন্ন করিয়াছে আমাদের অহঙ্কার। আমাদের মনের মূলে ভগবানের করুণার সংস্পর্শ ঘটিলে, এই আঁধার তখনই দূর হয় এবং বিশ্বে আমরা বিশ্বেশ্বরের প্রমূর্ত্ত লীলাটি জীবন্ত করিয়া পাই। সে অবস্থায় জগতে দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু আর থাকে না, থাকে না জড়ত্বের অনুভূতি। জীব স্বভাবতঃ চিৎকণ। জড়ত্ব হইতেছে চিৎ-তত্ত্বের অভাব এবং দুঃখ হইতেছে আনন্দের অভাব। ফলতঃ ব্রহ্মের অংশী-স্বরূপ জীবের পক্ষে দুঃখের অনুভূতি বা জড়ত্বের অভিভূতিজনিত গ্লানি আগন্তুক অবস্থামাত্র। জীবের পক্ষে এগুলি ভাববস্তু নহে, পরন্তু অভাবাত্মক।

সুতরাং জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মের বিচারে এগুলির অস্তিত্ব বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধ হয় না। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—'মায়াকৃত-চিদানন্দশক্তি-তিরোভাব-লক্ষণাভাবমাত্র শরীরত্বেন নির্দ্দেতব্যত্বাদিতি'। অভাবই একটি ভাববস্তুরূপে আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য হইয়া থাকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে মায়ার প্রভাবে জীবের স্বাভাবিক চিদ্ধর্ম্ম আচ্ছন্ন হয় বলিয়া এইরূপ ঘটে। 'যাহাঁ কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার'—রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই জীবের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু—'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। প্রকৃত-পক্ষে দুঃখের নিবৃত্তি সাধন জীবের লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য হইল আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তি। তাঁহাকে পাওয়ার অর্থ তাঁহার হওয়া; সর্ব্বভাবে তাঁহার সেবাতে নিজকে নিবেদন করা। এই একই সত্য গীতায় বিভিন্ন উপদেশের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।'

সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সব স্থিতি, এই সত্যের উপলব্ধিতেই জীবের কামনা-বাসনার চিরন্তন নিবৃত্তি ঘটে এবং তাহার পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমৎ রূপগোস্বামীকে উপদেশকালে এই রহস্যই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রভু বলিয়াছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপন
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়
বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।' (চৈঃ চঃ)

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ

শ্রুতি যে তত্ত্বকে রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তিনিই পুরুষোত্তম; তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণে। তিনিই অব্যয় অমৃতের উৎসস্বরূপ এবং ঐকান্তিক সুখের প্রাপক। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদকে উপদেশ কালে বলেন—

'কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার,
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর।'

বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ডগণ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকার্য্য। স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্য্য এ সকলেরই সমাশ্রয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ হন 'সর্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর-শেখর।' তিনি—'চিদানন্দদেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর।' সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণের সহিত জীবের সম্বন্ধও শ্রীভগবানের দ্বারাই কৃত এবং তাহার মূলে তাঁহার অপরিসীম কারুণ্যগুণই নিহিত রহিয়াছে। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয়বিভাগযোগে শ্রীভগবান এই রহস্যটি উন্মুক্ত করেন। তিনি ইহাও বলেন যে, একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারাই জীব কারুণ্যগুণনিলয় শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পূর্ণ ভগবৎ-তত্ত্বস্বরূপ পুরুষোত্তমের সহিত জীবের এই স্বরূপনিষ্ঠ সংযোগ বা সম্বন্ধটি কেমন এবং এই সম্বন্ধের উপলব্ধির পথে অব্যভিচারিণী ভক্তি উপজাত হইলে জীব কি ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির তাৎপর্য্যে এই পরম মাধুর্য্য পরিস্ফুর্ত্তি লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রাণ-কেন্দ্রের পরিচয় পাইতে হইলে গীতোক্ত ভগবদ্ভক্তির মধুচ্ছন্দটির সহিত অন্তরে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় এবং এজন্য গীতার যিনি পুরুষোত্তম তাঁহাকে জানা এবং বোঝা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

মহারাজ, সকল প্রাণীর স্বীয় আত্মাই স্বভাবতঃ প্রিয়। আবার স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি আত্মার প্রিয় বলিয়া প্রিয় হইয়া থাকে, তাহারা স্বভাবতঃ প্রিয় নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শুধু জীব সকলেরই আত্মা নহেন, পরন্তু তিনি চিদচিৎ সমস্ত পদার্থেরই আত্মা। এই জগতে সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের নিকট স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত পদার্থই ভগবানের রূপস্বরূপে উপলব্ধি হয়। এই জগতে অকৃষ্ণাত্মক কোন বস্তুই নাই। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার দ্বারাই জীবের জন্ম-মরণ-প্রবাহরূপ সংসারের নিবৃত্তি ঘটে এবং পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

'ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনং।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহং।'

অর্থাৎ নৃসিংহদেব বলিয়াছেন, তুমি দেবদেব জনার্দ্দন, তোমার শরণ প্রাপ্ত হইলাম। এইভাবে যে আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। শরণাগতের কাতর আহ্বানে ভগবান্ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কুরুরাজ সভায় নির্য্যাতিতা দ্রৌপদীর আহ্বান তাঁহাকে এমনই চঞ্চল করিয়া তোলে। তাঁহাকে শরণাগতের রক্ষার জন্য ছুটিয়া যাইতে হয়—

'ঋণমেতং প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়েনোপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনঃ।'

(মহাভারত)

অর্থাৎ প্রপন্ন যিনি, ভগবানের উপর তাঁহার এমনই প্রভাব। তাঁহাদের কাছে ভগবান এমনই কৃতজ্ঞ। গীতার দেবতা জীবকে বদ্ধাবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য প্রপন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ প্রপত্তি অবলম্বনের জন্য দেশ, কাল, পাত্রাদির কোন নিয়ম নাই, সেজন্য শুদ্ধি এবং অশুদ্ধিরও প্রশ্ন ওঠে না। যে কোন অবস্থাতেই শ্রীভগবানে আগ্রহশীল ব্যক্তি তাঁহার চরণে প্রপন্ন হইয়া

উদ্ধার লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রে দেখা যায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইয়া রাজ্য, দ্রৌপদী লজ্জা-নিবারণার্থ বস্ত্র, কালীয় দিব্যজীবন, গজেন্দ্র শ্রীভগবানের চরণসেবা, বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রপত্তির ক্ষেত্রে একটি বস্তু লক্ষ্য করিবার থাকে। তাহা হইল যাঁহার নিকট প্রপন্ন হইতে হইবে সর্ব্বগুণের পরিপূর্ণতায় তাঁহাকে পুরুষ বা পৌরুষসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে পৌরুষ বলিতে জীব এবং ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ-সামর্থ্য বুঝায়। পৌরুষের এই পূর্ণতার ফলেই ভগবানের কারুণ্য এবং তাঁহার বদান্য-গুণরাজী প্রাচুর্য্য প্রাপ্ত হয়। আশ্রিত প্রপন্নের পক্ষে দুঃখ-মোচনে প্রপত্তির বিষয়ীভূতস্বরূপে এই পৌরুষই জীবকে তাঁহার প্রতি উন্মুখ করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"সেই ভৃত্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ,
সেই প্রভু যে না কভু ছাড়ে নিজজন।"

পতিত জীবকে নিজজনবোধে তাহার প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহে আগ্রহসম্পন্ন এমন স্বামিত্ব ভগবানের কোন স্বরূপে নিত্য এবং সত্য এই প্রশ্ন উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার লীলায় জীবের সহিত এমন ভগবানের নিত্য এবং নিজ সম্বন্ধটি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য, কারুণ্য-স্বরূপ-পূর্ণতা।
ভক্ত-বাৎসল্য আত্ম পর্য্যন্ত বদান্যতা।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস।"

কারণ কি? কারণ এই, 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস,' সে ইহা বিস্মৃত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পৌরুষ-বীর্য্য-প্রসূত কারুণ্য এবং বদান্য ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যে জীবকে বিস্মৃত হইতে পারেন না। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি হইলেন শ্রী। 'শ্রু' ধাতু হইতে শ্রী শব্দটি নিষ্পন্ন। শ্রী নিজমাধুর্য্য বলে একদিকে ভগবানকে আকৃষ্ট করিয়া

জীবের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার উদ্ধারকল্পে ভগবানের চিত্তে আভিমুখ্য বা জীবকে ঐশ্বর্য্য-বিনির্ম্মুক্তভাবে স্বমাধুর্য্যে বরণ করিবার জন্য সংবেদন সৃষ্টি করেন এবং অপরদিকে নিজ মাধুর্য্যবলে ভগবানকে আশ্রয়ের জন্য নিত্য-বহির্ম্মুখ জীবের চিত্তকে উদ্দীপিত করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গাস্বরূপিনী সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী এই শ্রীই রাধা। শ্রীরাধা দেবী কৃষ্ণময়ী। তিনি পরদেবতা—'সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহা হৈতে।' প্রেয়সী রাধারাণীর বশে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ পৌরুষ-সম্পন্ন হন। শ্রীরাধা মহাভাবময়ী। ফলতঃ বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে আনন্দময়ী এই হ্লাদিনী শক্তির নিত্যসংশ্লেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রসস্বরূপত্ব প্রতিনিয়ত সম্ভোগ করিতেছেন। 'কৃষ্ণ হন, ধীরললিত'—'প্রায়শঃ প্রেয়সীবশঃ;' এই তাঁহার স্বরূপ। শ্রীভগবানের এই পৌরুষেই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে এবং জীব ও জগতের সহিত ভগবৎ-সম্বন্ধটি আনন্দের ছন্দে ছন্দে নিত্যলীলারসে বিলসিত হইতেছে। শ্রুতি এই নিত্যলীলার সন্ধান দিয়াছেন। বলিয়াছেন—'স একো ন রমতে, দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ, সহৈতাবানাস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ।' পুরাণে ও দেখিতে পাই ভগবান মহাদেবকে বলিয়াছেন—

'অহমাসাং মহাদেব গোপীনাং প্রেম-বিহ্বলঃ।
ক্রিয়ান্তরং ন জানামি নাত্মানমপি নারদ।'

গীতার দেবতা এই গূঢ় তত্ত্বটি জীবের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া তাহার সহিত শ্রীভগবানের আত্মভাবে গুপ্ত লীলাটির নিত্য সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বিশ্বজগৎকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন এই সত্যটি যে, জীব যে অবস্থাতেই পতিত থাকুক না কেন, সে কৃষ্ণের সম্বন্ধ ছাড়া নয়। তিনি বলিয়াছেন, সমস্ত সৃষ্ট জীবের অন্তরে সুখভোগের জন্য যে পুরাতনী প্রবৃত্তি বা সনাতন আকুতি রহিয়াছে পরমপুরুষস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মূলা-প্রকৃতি হ্লাদিনী শক্তির সংশ্লেষে প্রতিনিয়ত তাহা উৎসারিত হইতেছে। সুতরাং কামাসক্ত জীবের কাম-প্রবৃত্তির পরিপূর্ত্তির বীজটি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যে স্বাভাবিক

সম্বন্ধে নিহিত রহিয়াছে। জীবের মন ইতরাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের অংশস্বরূপে অংশীর নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হইলে সে অনন্ত রস-মাধুর্য্য আস্বাদনে দ্বন্দ্বহীন ছন্দোময় অবস্থা লাভ করে এবং সর্ব্ববিধ ভ্রম-প্রমাদের অতীত অবস্থায় আত্মসত্তায় অধিষ্ঠিত হয়।

'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার।'

শ্রুতি বলেন, আনন্দ হইতে অখিল ভূত জন্ম লাভ করিয়াছে এবং আনন্দ-সংস্পর্শে ভূতনিচয় জীবিত রহিয়াছে। যদি কোন ভাবে জীব পরম আনন্দের কন্দ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ লাভ করে, তবেই তাহার স্বরূপনিষ্ঠ পুরাণী প্রবৃত্তি উজ্জীবিত হয়। ইহার ফলে জীব সর্ব্ববিধ ইতর কামনা হইতে মুক্ত হয়।

ফলতঃ অংশস্বরূপ জীবের সহিত অংশী পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আত্মসম্বন্ধই জীবের বিষয়ানন্দের মূলেও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্যোতিতে যৈছে নাহি কভু ভেদ
রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।'

রাধাশক্তির সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্ম স্বরূপত প্রতিষ্ঠিত। 'রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।' জীবকে বরণ এবং তাহার উজ্জীবনে তিনি যুগলতত্ত্বে নিত্য পৌরুষসম্পন্ন। তিনি বশী। তিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষী। সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এবং বীর্য্যে তিনি লীলা-পুরুষোত্তম। জীব ভুল করে কিন্তু মূলে তাহার ভুল ঘটে না। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আত্মমাধুর্য্যই জীবের মনে প্রতিফলিত হইয়া তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণে পড়িয়া জীব জন্ম হইতে জন্মান্তর-প্রবাহের গতিতে

প্রধাবিত হইতেছে, হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপে তাঁহারই বংশীর নিনাদ-লহরীর চাতুরীতে। প্রকৃতপক্ষে যতদিন জীব কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ না করিবে, বিষয়সুখের ভিতরেও ততদিন সে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে না। কারণ বিষয় সুখের ভিতর দিয়াও জীব যে রস উপভোগ করিতেছে তাহার মূলে কৃষ্ণসেবার রসোল্লাসেরই আভাস-স্বরূপে তাহা কাজ করিতেছে। জলে চাঁদের ছায়া পড়িতেছে মৎস্য সুধাকরের সুধা আস্বাদন করিবে এই ভ্রান্তিতে ছায়ার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে; পিপাসা তাহাদের মিটিতেছে কি? বদ্ধ জীবেরও এই অবস্থা। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে বিষয়াসক্ত জীব যাহাতে রসস্বরূপ এই আত্মদেবতার সেবা-সম্বন্ধ লাভের অধিকারী হইতে পারে, সেজন্য শ্রীভগবানের একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন শুধু সাধন-ভজনের দ্বারা রসস্বরূপ পরম দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে হইবে এই তত্ত্বটি যে তিনি পুরুষোত্তম। সে তিনি কেমন। কেমন তাঁহার আকর্ষণ আগে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধটি আগে পাকা করিয়া লইতে হইবে। প্রাণরসে ডুবিয়া তাঁহার বশে যাইতে হইবে। কিন্তু 'সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়'—কেমন সেই সাধন? 'ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে বল'—পুরুষোত্তমস্বরূপে কৃষ্ণভজনের ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য। যাঁহারা যুক্তচিত্ত ভক্ত তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়, তাঁহাদের মন-প্রাণ শ্রীভগবানের এই আত্মমাধুর্য্য আস্বাদনে উদ্দীপিত হয়। তাঁহারা হৃদয়ে তাঁহার আত্মভাবের ব্যক্ত লীলাটি দর্শন করেন। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোকের যিনি প্রসবিতাস্বরূপে ভরণ এবং পোষণ করিতেছেন উত্তমপুরুষ সেই ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইয়েরও উপরে। এই দুইকে কূটস্থ অন্তর্য্যামিস্বরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন পরমাত্মা। উত্তমপুরুষ ক্ষরের অতীত, অক্ষরের অতীত—পরমাত্মারও অতীত, 'পরমাত্মার আত্মা কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস'। চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী

এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিয়াছেন—

'আত্মা অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়
সেই গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয়।'

অর্থাৎ পরমাত্মা কৃষ্ণেরও অংশ বা বিভূতি। শ্রীভগবান রাজর্ষি সত্যদেবের নিকট বলেন—

'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি।'

(ভাঃ-৮।২৪।৩৮)

যাহাকে পরব্রহ্ম বলা হয় সেই নির্ব্বিশেষ স্বরূপটি আমারই মহিমা বা বিভূতি। আমার অনুগ্রহেই তাহাকে তুমি অপরোক্ষভাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'মহিমানমৈশ্বর্য্যং বিভূতিঃ নির্ব্বিশেষমিতি যাবৎ। অতএব মে ময়া অনুগৃহীতম্ অনুগ্রহেণ প্রকাশিতং হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্যসি। স তু যদ্যপি মদনুভবান্তর্ভূত এব ব্রহ্মানুভব ইত্যতো নাস্তি মত্তঃ পৃথগনুভবাপেক্ষা, তথাপি ভক্তি-প্রকাশিত-সাক্ষান্মদনুভবেতন্মাত্রানুভবো ন স্ফুটো ভবতি। যদি তদীয় স্ফুটতায়াং তদেচ্ছা কথঞ্চিৎ বর্ত্ততে, তদা সাপি ভবেদিতি ভাবঃ।' যাহাকে পরব্রহ্ম বলা হয়, তাহা আমারই মহিমা বা বিভূতি। আমার অনুগ্রহেই তুমি অপরোক্ষভাবে তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। ভক্তির প্রভাবে ভগবানের নির্ব্বিশেষ অনুভবও সেই অনুভবের অন্তর্ভূক্ত হয়। তথাপি সেই অনুভবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভবটি পরিস্ফুট হয় না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে পরিস্ফুটভাবে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা যদি কাহারও হয়, তাহা হইলে সেই ইচ্ছাও ভগবান্ পূর্ণ করেন। ফলতঃ 'পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ' এই পদটির বিচারে কোন কোন ভাষ্যকার উত্তমপুরুষ এবং পরমাত্মা একার্থবাচক এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য সেইরূপ নয়। বস্তুতঃ তদাত্মক হিসাবে অর্থটি এক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে। পরমাত্মারও

উপরে উত্তমপুরুষ, পরমাত্মারও তিনি আত্মাস্বরূপ। পরমাত্মার উর্দ্ধস্তরে গিয়া পরম আনন্দের কন্দ যিনি পরমাত্মারও আত্মা 'উৎ' স্বরূপ তাঁহার উৎকৃষ্ট, অনাবৃত বা নিরাবরণ সম্বন্ধটি সর্ব্বভাবে জীবের আস্বাগ্য হইয়া থাকে এবং সেই ব্যাহৃতিতে অর্থাৎ মন্ত্রার্থের মৌলিক সম্বন্ধের উজ্জীবন-সূত্রে জীবের স্বরূপধর্ম্মে সঙ্গতি সাধিত হয়। গীতার যিনি পুরুষোত্তম তিনি সবিশেষ, তিনি চিদাকার। শ্রুতি বলিয়াছেন—

'তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেব
অক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ
পাপ্নভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ
পাপ্নভ্যো য এবং বেদ।' (ছাঃ-১।৬।৩)

তাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্যবর্ণ ও কেশ সুবর্ণবর্ণ এবং তাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়বই জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার লোচনযুগল পদ্মের মত সমুজ্জ্বল। তাঁহার নাম 'উৎ'। কারণ তিনি সুরসমূহের উর্দ্ধে স্থিত। যিনি এই 'উৎ' নামধারী পরমাত্মাকে জানেন, তিনি সমুদয় পাপ হইতে অবশ্যই উর্দ্ধে উত্থিত হন। নাম, গুণ, লীলা—সর্ব্বকামময় ধাম। মন্ত্রবর্ণকে উদ্ভাসিত করিয়া প্রিয়স্বরূপ এই দেবতার রূপ ফুটিয়া উঠে। গুরুর স্বরের সান্দ্র এবং সুনিবিড় সংস্পর্শে অশেষ রসের উন্মেষে মধুর মধুর সুরের লহর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—বাজিয়া উঠে বাঁশী। জাগিয়া উঠে ধ্বনি, নাচিয়া উঠে সেই চরণে সর্ব্বস্ব দান করিবার জন্য মন-প্রাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন জিনি
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়।' (চৈঃ চঃ)

মধুর মুরলীর ধ্বনি। সে ধ্বনি কেমন? সে ধ্বনি 'নবাভ্রগর্জ্জিত জিনি'—ধ্বনি সম্বন্ধে প্রভুর এই উক্তি। সকল জুড়িয়া গম্ভীর গুরু গুরু গর্জ্জন তাহাতে অখণ্ড একটা প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বাত্মক পরি-তৃপ্তির প্রতিবেশে রস-সম্বন্ধের সান্দ্র-সংস্পর্শে সমগ্র চিত্তের চকিতচারু

চমৎকৃতিতে সোৎকণ্ঠ উদগ্র আভিমুখ্যের উদ্দীপন। এক্ষেত্রে নাদ জ্ঞানীর উদ্দিষ্ট জ্যোতিতে মিলায় না কিংবা যোগীর উদ্দীষ্ট পরমাকাশেও জীবাত্মাকে লয় করে না। রূপাভিসারের অভিমুখে ধ্বনি এক্ষেত্রে জীবের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া আসঙ্গ-লালসার তুঙ্গ-তরঙ্গ বিস্তার করে। নাদ বা ধ্বনি সাধকের চিত্তে রূপ ও গুণ সম্বন্ধে অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের রাজ্যের পরম রহস্য উন্মুক্ত করে। নাদ এখানে কোমল, স্নিগ্ধ, মধুর স্পর্শে প্রগাঢ় নিবিড় ধ্বনির বিচ্ছুরণে চন্দ্রালোকের ছটায় লীলাকে খুলিয়া দেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া এই ধ্বনি বা নাদের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নব ঘন জিনি ধ্বনি
যার গানে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবে জগতের কাণে
পুণঃ কাণ বাহুড়ি না যায়।
কহ সখি, কি করি উপায়?
কৃষ্ণের সে শব্দ গুণে হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি যায়।
নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়।
সে শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত
স্মিতকর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্মবিভূষিত।
সে অমৃতের এক কণ কর্ণ-চকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়
না পাইয়ে মরয়ে পিয়াসে।' (চৈঃ চঃ)

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন, পুরুষোত্তমস্বরূপে সর্ব্বতোভাবে তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহার ভজনকেই অসংমূঢ়ভাবে অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহের সর্ব্বসম্বন্ধে তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তি বলিতে শ্রীভগবানের সেবাই বুঝায় —'ভক্তিঃ ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিনী। 'হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং'—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের যিনি অধিপতি তাঁহার সেবাই ভক্তি। ভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা বা নিগুর্ণা ভক্তির সাধনসম্পর্কেই পুরুষোত্তমের উল্লেখ করিয়াছেন— "অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।" সুতরাং পুরুষোত্তমতত্ত্ব পরমাকাশ-তত্ত্ব নয়। নাদে সেখানে লয় হইয়া যাওয়াও নাই, কারণ লয় হইয়া গেলে আর সেবার সৌভাগ্য রহিল কোথায়? শ্রুতি-নির্দ্দেশিত পুরুষ নাই। পুরুষবিধের সম্পর্কে কোন ব্যাপারও নাই, অথচ পুরুষোত্তম! এমন যুক্তির মাথা নাই মাথা-ব্যথারই মত। পুরুষোত্তম যিনি, তাঁহার বিগ্রহ চিন্ময়। অপ্রাকৃত ধামের বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্যের উন্মেষে তাহার চিন্ময়-লালার মাধুর্য্য বিস্তার—তিনি চিদাকার। ভাগবতীয় এই তত্ত্বটি অত্যন্ত গূঢ়, কিন্তু তাহা হইলেও পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবদুক্তিতে সাধু-গুরুর কৃপায় সর্ব্বভাবে ভজনের তাৎপর্য্যটি উপলব্ধি করিলে সত্যটি পরিষ্কার হইয়া পড়ে। এই সাহসেই বিষয়টি বিস্তার করিবার জন্য চেষ্টা করা গেল। ফলতঃ যাহারা স্বর্গকামী তাঁহারা নিজেদের সুখই কামনা করেন, ভগবানের সেবার কথা তাঁহাদের মনে কখনই জাগিতে পারে না। কৈবল্য মোক্ষ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাধনাতে সেব্যসেবক-ভাবের সম্বন্ধ নাই। সুতরাং স্বর্গ এবং মোক্ষ ভক্তিসাধকের পক্ষে উভয়ই প্রতিকূল। ভাগবত বলেন—

'নারায়ণপরা সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি,
স্বর্গাপবর্গনরকেস্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।' (ভাঃ৬।১৭।২৮)

সুতরাং কৈবল্য সাধনের ফল এবং ভক্তি সাধনের ফল একরূপ নহে,

উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সাযুজ্যাদি মুক্তিতে দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিতে পারে কিন্তু ভক্তিপথে ভজনোপযোগী ভগবৎ-মাধুর্য্যের আস্বাদনটি মিলে না। উভয়ের অনুভূতিতে পার্থক্য কি ভাগবতে কুমারগণ বা চতুঃসনের স্তুতিতে তাহা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—

'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্‌ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ।' (ভাঃ-৩।১৫।৪৮)

অর্থাৎ হে প্রভো, তোমার যশ পরম রমণীয় এবং পরম পবিত্র। তোমার চরণে শরণাগত কুশল ব্যক্তিগণ তোমার কথায় রসজ্ঞ। তাঁহারা তোমার প্রসাদরূপ আত্যন্তিককেও অর্থাৎ কৈবল্য বা সাযুজ্য মোক্ষকেও আদর করেন না। অন্য ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলা যাইবে? বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিপদেও তোমার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ভীতির উদ্ভব হয়! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে জানিলে পরমাত্মতত্ত্বের স্বরূপও সাধকের পক্ষে সম্যক্‌রূপে অধিগত হইয়া থাকে।

গীতায় ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্তম—জীব এবং ঈশ্বরতত্ত্বকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ক্ষর পুরুষ বলিতে এখানে ক্ষর বা পরিবর্ত্তনশীল ভূত-প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বাভিমানে বদ্ধ জীবকে বুঝায়। বিষ্ণু পুরাণ বলেন—

'যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা
বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলা-
নবাপ্নোত্যত্রসন্ততান্।
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ
শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল
তারতম্যেন বর্ত্ততে।'

অর্থাৎ জীবাখ্য ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি মায়ার প্রভাবে পতিত হইয়া অখিল সংসারতাপ প্রাপ্ত হয়। মায়া বা অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন জী'শক্তি সর্ব্বভূতে তারতম্যরূপে অর্থাৎ উচ্চ নীচ অবস্থায় রহিয়াছে। শ্রুতি বলেন—

'মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'।

(কঠ ১।৩।১১)

অর্থাৎ মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পরমপুরুষ, তাঁহার উপর অন্য কিছু নাই। তিনিই শেষ সীমা, তিনিই পরম গতি। ইনিই গীতার পুরুষোত্তম। পরমাত্মারূপ কূটস্থ অক্ষর পুরুষ অব্যক্ত, ক্ষর এবং অক্ষর সর্ব্বাংশ আশ্রয়ে পুরুষোত্তম—ব্যক্তাব্যক্ত জুড়িয়া অদ্বয়-চিন্ময় লীলায় সাধকের দৃষ্টিতে প্রমূর্ত্ত। কবিরাজগোস্বামী 'সর্ব্ব-অবতংস' বলিতে পুরুষোত্তম এই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজীবের শ্রবণাকর্ষী লীলা-মাধুর্য্যই আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে পুরুষোত্তম-তত্ত্বে পরমাত্মার কূটস্থতার আবরণ উন্মোচন করিয়া আমাদের উপলব্ধি করিবার উপযোগীভাবে শ্রীভগবানের সর্ব্বাতিশায়ী আত্ম-মাধুর্য্যের ব্যক্ত ভাবটি রহিয়াছে। 'পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ' এই পদে সেই মাধুর্য্যের প্রকাশ এবং বিলাসই গীতার শব্দার্থে ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি পুরুষোত্তম, যিনি কৃষ্ণ, তিনি সর্ব্ব-অবতংস। সকলে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য কর্ণ বাড়ায়—'জগৎ-নারীর কাণে মাধুরী গুণে বান্ধি টানে'। যিনি শ্রীকৃষ্ণের আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর এই লীলাটি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সর্ব্বভাবে দেহেন্দ্রিয় মন, প্রাণ, সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন। মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম নাই, ইহা সত্য নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জীব যখন মুক্ত হয়, তখনই তাহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্ম সুরু হয়। নতুবা পশুর কর্ম্ম—ভয়াবহ পরধর্ম্মের প্রভাবে পড়িয়া সে মরে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় যথার্থ কর্ম্মের আরম্ভ। সে কর্ম্ম শ্রীভগবানের সেবা এবং সেই সেবা-পিপাসার

বিরতি নাই। বিশ্বের সেবা প্রতি জীবের সেবা, সর্ব্বভাবে ভগবানের সেবাই মুক্ত পুরুষের জীবনে নিত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সেবা ছাড়িয়া মুক্ত জীব অন্য কিছু চাহেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'নিজপ্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণ সেবা বাধে
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।' (চৈঃ চঃ)

গীতার পুরুষোত্তমযোগে এই গুহ্যতম তত্ত্বটি গূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে। এই বীজের বিকাশ এবং বিলাস প্রেমে। প্রেমই পরম পুরুষার্থ। প্রেম বলিতে সর্ব্বভাবে সেবা বুঝায়। প্রিয়ের প্রীতিবিধানই প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রিয়ের সেবা করিয়া নিজের জন্য কিছু চাওয়া প্রিয়ত্ব-বিরোধী। শ্রুতি বলেন—'তদৈতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।' (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮) অর্থাৎ আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতে প্রিয়তর। কারণ ইনি অন্তরতম। সুতরাং 'আত্মানমেব প্রিয়-মুপাসীত' অর্থাৎ প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান সর্ব্বভাবে তাঁহাকে সেবা করিবার উপযোগী তাঁহার প্রিয়স্বরূপটি উন্মুক্ত করিয়াছেন। যাহাকে পাইলে সুখ হয় তিনিই প্রিয়। হ্লাদিনী শক্তির সহিত সংশ্লেষেই ভক্তজনকে সুখ দিবার যোগ্যতা লাভে তিনি এমন প্রিয়, তিনি পুরুষোত্তম। আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ তাঁহার সে স্বরূপটি উপলব্ধি করিলে জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করে। তিনি এখানে প্রকট করিয়াছেন তাঁহার সেই নিজ মাধুর্য্যের বীর্য্য। 'এষহ্যেব আনন্দয়াতি'—(তৈত্তিরীয়—২।৭)। তিনি মধুপাতা, মধুদাতা—মধুর হইতেও তিনি মধুর—মধুর ভাবে আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি। এই মধুরে সব ভাবের সমাহার—ভগবানকে সর্ব্বভাবে পাওয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষাদান কালে বলিয়াছেন, 'পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে'—সমস্ত শাস্ত্রের সার এই পরম পুরুষার্থ পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ এইরূপে এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। এজন্য ভগবান নিজে এই অধ্যায়টিকে 'ইতি

গুহ্যতমং শাস্ত্রং' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্য্যাদা দিয়াছেন। তিনি এই অধ্যায়ের উপসংহারে আসিয়া লাখ কথার এক কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। বলিয়াছেন—অর্জ্জুন, তুমি এবার নিষ্পাপ, আর তোমার চিন্তা নাই। পুরুষোত্তম-তত্ত্ব তুমি আমার মুখে শুনিলে। এইটি তুমি সমগ্র অন্তর দিয়া উপলব্ধি কর, তবেই তোমার পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে, নতুবা অন্য কোন ভাবে সে বস্তু মিলিবার নয়। তাৎপর্য্যটি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেই আমরা পাইয়াছি—

'এই তো কহিলুঁ ভক্তির দিগ্‌দরশন
ইহার স্বরূপ মনে করহ ভাবন।'

তবেই তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। আমাতে প্রেম মিলিবে।

সর্ব্বভাবে ভজন

তৃতীয় অধ্যায়ে উপসংহারে ভগবান বলিয়াছেন, কাম অতি দুর্জ্জয় শত্রু। মনকে বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া জ্ঞান-বিরোধী এই শত্রুকে তুমি বিনাশ কর। দশম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কামকে জয় করিবার উপযোগী বুদ্ধির ধৃতি বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি যে তাঁহার কৃপাতেই লাভ হয় সে কথাও তিনি বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা আমাতে সতত যুক্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজন করে আমি তাহাদিগকে আমাকে লাভ করিবার উপযোগী শুদ্ধা বুদ্ধি প্রদান করি। আমার প্রসাদ-প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের দ্বারা তাঁহাদের মোহান্ধকার বিনষ্ট হয়। আমার অনুকম্পায় তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম-তত্ত্বে শ্রীভগবান্ কামজয়োপযোগী প্রসাদ-প্রদীপ্ত জীবের স্বরূপানুবন্ধী তাঁহার সেই আত্ম-ভাবটি ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন যিনি পুরুষোত্তমরূপে আমাকে জানিয়াছেন, তিনি আমার সর্ব্বতত্ত্ব অধিগত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজনা করেন। সর্ব্বভাবে তাঁহাকে এমন ভজনা করার অর্থ যে মধুরভাবে তাঁহাকে ভজনা করাইয়া আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে বুঝিয়াছি, এখানে তাহারই আরও একটু বিস্তার করা যাইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—'অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বস্যাত্মনঃ। সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। ব্রহ্মেদং সর্ব্বং।' (বৃঃ ২।৫।১৪) অর্থাৎ এই আত্মা সর্ব্বভূতের পক্ষে মধু, সর্ব্বভূত ইহার পক্ষে মধু। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম জ্ঞানই সব।

'রসো বৈ সঃ'—ভগবান রসস্বরূপ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান রসময় এবং অমৃতময় এই তাঁহার প্রমূর্ত্ত স্বরূপটি প্রকটিত করিলেন। তিনি বলিলেন, আমাকে এইভাবে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, সর্ব্বভাবে আমাকে ভজনের অধিকার তাঁহার লাভ হইয়াছে অর্থাৎ তিনি কামকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'প্রেম্না হরিং ভজেৎ'

শতপথ শ্রুতির এই বাক্য তাঁহার জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। চরিতামৃত বলেন—

'কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল।
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম।
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ-পরিজন
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন।
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।'

ভগবান এমন ভক্তের অধীন। তিনি তাহার নিকট তাঁহার সর্ব্বতত্ত্ব প্রকট করেন এবং সর্ব্বভাবে তাহাকে তাঁহার ভজনের অধিকার দান করেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপসংহারে এমন প্রতিশ্রুতি আমরা পাইয়াছি। বস্তুতঃ এই প্রতিশ্রুতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেই পরিস্ফূর্ত্ত—

'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে
যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে।'

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীভগবানের সর্ব্বভাবে সাধনা বলিতে মধুরভাবেই তাঁহার সাধনা বুঝায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমৎ রায়

রামানন্দ মধুরভাবে ভজনেই কৃষ্ণ-প্রীতির পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।' (চৈঃ চঃ)

এই পথে ভজন—রসের পথে, রাগের পথে, প্রীতির পথে ভজন। এই ভাবে ভজনে সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্য সুখ, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ। ভাগবত বলেন—'তুষ্টি-পুষ্টি ক্ষুৎ-পায়োঽনুঘাসং' অর্থাৎ ক্ষুধিত ব্যক্তির প্রতি গ্রাস অন্ন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তুষ্টি-পুষ্টি লাভ হয় প্রীতির পথে ভজনে জীবের স্বরূপধর্ম্মেরও সেইরূপ সাক্ষাৎ-সম্পর্কে পরিপুষ্টি ঘটে। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ তৎপ্রণীত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে সাধনকে সাসঙ্গ এবং অনাসঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সাধনে আসঙ্গ নাই তাহা হইতেছে অনাসঙ্গ সাধন এবং যাহাতে আসঙ্গ আছে তাহা হইতেছে সাসঙ্গ সাধন। সাসঙ্গ সাধন বস্তুটি কি? এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন—'আসঙ্গেন সাধন-নৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাৎ-ভজনে প্রবৃত্তিঃ' অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবানের ভজনের প্রবৃত্তিই সাসঙ্গ সাধন। অনাসঙ্গ ভাবে সাধনে শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করা যায় না এবং সর্ব্বভাবে তাঁহার ভজনের অধিকারী হওয়াও সম্ভব নয়। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—'সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি' অনাসঙ্গভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ভজনে প্রবৃত্তিহীনভাবে বহুকাল সাধন করিয়াও হরিভক্তি লাভ হয় না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা এবং সবিশেষতত্ত্বের সাধনার এইখানে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং' (গীতা-৯।২৯)। প্রত্যুত ভক্তির পথে সাধকের জন্য স্বয়ং ভগবানের চিন্তা, কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের জন্য তাঁহার এতাদৃশ প্রসাদ

পরিলক্ষিত হয় না; কারণ তাঁহারা ভগবানকে চাহেন না—মোক্ষই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। সুতরাং মোক্ষের সাধকগণ শ্রীভগবানকে প্রিয়ভাবে উপাসনা করেন না। পক্ষান্তরে প্রিয়স্বরূপে শ্রীভগবানের সাধনার বিরুদ্ধ পথেই তাঁহাদের মতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাঁহারা প্রিয়ত্বের প্রসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া নিজেরাই ব্রহ্ম এই ভাবে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তৎপর থাকেন। নাদানুসন্ধানের কথা উঠে। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। শব্দকে আশ্রয় করিয়া সাধনায় নাদের উপলব্ধি হয়ই; কিন্তু নাদানুসন্ধানের পথে পরমাকাশে নিজকে লয় করিবার সাধনা পুরুষোত্তমের সাধনা নয়। পুরুষোত্তম হইলেন ভক্তচিত্তহারী বংশীধারী হরি। নাদের পথে ধ্বনি। ধ্বনির অন্তরে জ্যোতিঃ। 'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং'—ধারাটি এই রূপ। ধ্বনি যেখানে কর্ণে বর্নময় সেইখানেই সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জীবকে বরণ করিয়া শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্বময় আত্ম-বীর্য্যে মাধুর্য্য-লীলার বিস্তার—এই বিস্তারে জাগিয়া উঠে তাঁহার চিদাকার। আমরা তখনই পাই সর্ব্ববিধ সৌলভ্যে এবং তেমন স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁহাকে সেবা করিবার অধিকার। যেখানে ভগবানের পৌরুষকেই স্বীকার করা হইতেছে না, সেখানে পুরুষোত্তম-তত্ত্বের কথা নিতান্তই ফাঁকা হইয়া পড়ে। ভগবানের পৌরুষ বলিতে জীবের মন, বুদ্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উজ্জীবনোপযোগী তাহার মাধুর্য্য-বীর্য্যই বুঝায়। কথাটি আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, তথাপি বিষয়টি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে। পুরুষোত্তমের ধাম রূপের রাজ্য, সেখানে রসের খেলা। বস্তুতঃ নৈর্ব্যক্তিক সাধনায় মুক্তি মিলে কিন্তু প্রেম-ভক্তি মিলে না সুতরাং তাহা কোন দিক হইতে বিচারেই সর্ব্বভাবে ভজনস্বরূপেও গণ্য হইতে পারে না। ভক্তি সম্বন্ধ খোঁজে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।' ভগবানের সহিত সম্বন্ধটি জমিয়া উঠিলেই দেহেন্দ্রিয়-মনোময় সর্ব্বভাবে জীবের জীবন ছন্দোময় এবং অমৃতময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে পুরুষোত্তমতত্ত্ব উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—'এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত'—অর্জ্জুন, তুমি এই তত্ত্ব বুঝিয়া বুদ্ধিমান হও। চরিতামৃত বলেন—

'ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামীর সুবুদ্ধি যদি হয়
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।'

এই বুদ্ধিলাভের উপায় কি? উপায়—কৃপা। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে উপদেশকালে বলিয়াছেন—

'আত্মা শব্দে বুদ্ধি কহে—বুদ্ধি বিশেষ
সামান্য বুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ।
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্থ আর।
কৃষ্ণ-কৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়
সব ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি করে কৃষ্ণ পায়।
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়।' (চৈঃ চঃ)

এই অধ্যায়ে মাধুর্য্যের মাধ্যমে জীবকে শ্রীভগবান কামবীজে তাঁহার প্রেমে মজিয়া সাধনার কৌশলটি ব্যক্ত করিয়াছেন। জীবের কর্ত্তব্য এই অধ্যায়ে অভ্রান্তভাবে বিনিশ্চিত হইয়াছে। চরিতামৃতের ভাষায়—

'কীর্ত্তি মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি।
মুক্তমধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি।
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ?
কৃষ্ণনাম গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ।'

সৎ চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ

অর্জ্জুন বলিয়াছেন—'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত হইলাম। আমার কর্ত্তব্য কি আমাকে উপদেশ করুন। এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পড়িয়া গেলেন। বিপদ দেখা দিল বিপদহারী যিনি শ্রীহরি তাঁহার। এতদিন তিনি যাহা করেন নাই, তাহাই তাঁহাকে করিতে হইল। অন্য উপায়ই বা তাঁহার কি আছে ? ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে নারদ ঋষি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে একটি পরম রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মহারাজ, মনুষ্যলোক মধ্যে আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। ভুবনপাবন মুনিগণ আপনাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া থাকেন। আপনাদের গৃহে মানবরূপী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে আপনারা আপনাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, পূজ্য, বিধিদাতা, পরামর্শপ্রদানকারী এবং গুরু বলিয়াই জানেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম পুরুষ। মহৎ ব্যক্তিগণ কৈবল্য-নির্ব্বাণ-সুখ উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। শুকদেবের এই উক্তি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে পাণ্ডবদের গৃহে কৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপটি গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। গুরুগিরির দায়ে পড়িয়া শ্রীভগবানকে তাঁহার এই গুপ্ত আত্মভাবটিকে এবার ব্যক্ত করিতে হইল। যিনি ক্ষরস্বরূপ ভূত-প্রকৃতির নিয়ন্তা, অক্ষরস্বরূপে যিনি অনাসক্তভাবে চেতনাচেতন বিশ্বের ভোক্তা এবং ক্ষর ও অক্ষরের অতীত তত্ত্বস্বরূপে যিনি সকলকে ধারণ এবং পোষণ করিতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার সর্ব্বাত্মস্নপন স্বরূপটি অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্ব-জগতে এবার উন্মুক্ত করিতে হইল। মায়াময়-যবনিকা উত্তোলন করিয়া জীবের প্রতি অপরিসীম কারুণ্যের লাবণ্যময় স্বরূপধর্ম্মটি তাঁহাকে এখানে প্রকটিত করিতে হইল। তাঁহাকে বলিতে হইল অর্জ্জুন, তুমি আমার ভক্ত ও সখা। আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল জানি ; কিন্তু তুমি তাহা

জান না। আমি জন্মরহিত, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আমি, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের আমি ঈশ্বর। কিন্তু আমি নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমার অবতার। কথাটি যিনি বলিলেন তিনি কিন্তু অবতার নহেন। তিনি অবতারী। তিনি স্বয়ং ভগবান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, অসুরনিধনাদি কার্য্য স্বয়ং ভগবানের নয়, সেগুলি তাঁহার অংশের দ্বারা কৃত হয়—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।"
"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকর্ম্মে তাঁহার এই দিব্যভাবের তত্ত্বটি উন্মুক্ত করাই গীতার উদ্দেশ্য। শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন, আমার এই তত্ত্বটি যিনি অধিগত হইয়াছেন, দেহত্যাগের পর তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি আমাকেই লাভ করেন। কৃষ্ণ-লীলার দিব্য রস-সম্বন্ধে জন্মকর্ম্মের মূলীভূত কামসংস্কার সমূলে উৎসাদিত হয়, ভগবদুক্তির ইহাই তাৎপর্য্য। তত্ত্ব শব্দের একটি অর্থ—স্বরূপ, সুতরাং অদ্বয়জ্ঞানই কৃষ্ণের স্বরূপ। 'জ্ঞানং চিদেকরূপং'—একমাত্র চিদ্বস্তুই জ্ঞান। এই চিৎ এর সহিত সৎ এবং আনন্দের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। 'একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ পুরুষ। তত্ত্ব শব্দের আর একটি অর্থ সার বস্তু। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই সৎ, চিৎ, আনন্দের বিগ্রহে শ্রীভগবানের পূর্ণতম বিকাশ এবং তাঁহার ভগবত্তা হইতেই অন্য ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই তত্ত্ববস্তু বা সার সত্য। শ্রুতি বলেন, "কৃষ্ণো বৈ পরদৈবতং"। অচিন্ত্যশক্তিবলে সাকার নরবপু হইলেও তিনি অনন্ত, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। প্রকৃতপ্রস্তাবে পরিবর্ত্তনশীল ক্ষরতত্ত্বের আশ্রয়ে যেইরূপ চিৎধর্ম্মী জীবের সাধ্যবস্তু মিলে না; সেইরূপ অক্ষর বা নির্ব্বিশেষতত্ত্বের আশ্রয়েও তাহার পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। জীব ও জগৎ ক্ষর এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ এই তত্ত্বকে আত্মধর্ম্মে দীপ্ত

করিয়াই পূর্ণতম পরব্রহ্ম তত্ত্ব। এই দুই-ই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং উভয় শক্তি কৃষ্ণে পরিবর্ত্তনশীল হইলেও নিত্য। তিনি 'সর্ব্বকারণ-কারণ।' শ্রীকৃষ্ণ চিদানন্দময় সর্ব্বাশ্রয়, তিনি সর্ব্বেশ্বর। 'সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্মরূপ, সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাদিস্বরূপ।' শ্রীকৃষ্ণের নর-লীলাকে আশ্রয় না করিলে জীবের পক্ষে পরব্রহ্মের পূর্ণতম তত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভব নহে। অব্যক্ত বা নির্গুণ ভাবের সাধন দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের ক্লেশেরই কারণ সৃষ্টি করে—শ্রীভগবান এ সত্য গীতায় সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপকে যাঁহারা সাধ্যতত্ত্বস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তও জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। কারণ এইরূপে ঐশ্বর্য্যময় কৃষ্ণকে পুরুষোত্তম-তত্ত্বস্বরূপে স্বীকৃতিতে শ্রীভগবানের কারুণ্য-মাধুর্য্যের সংস্পর্শে জীব তাহার স্বরূপধর্ম্মগত প্রেমরূপ পরম প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ঐশ্বর্য্যের পথে ভগবৎ-তত্ত্বের সাধকগণের যুক্তি এই যে ভগবানের মাধুর্য্য তাঁহার একটি গুণ মাত্র পরন্তু পূর্ণতত্ত্ব নয়। কিন্তু তাঁহাদের সেই ধারণা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। পরব্রহ্ম কৃষ্ণ পূর্ণ-স্বরূপ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।' শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। অপ্রাকৃত এমন পূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধিগত বিচারে হয়ত প্রয়োজনানুযায়ী জড়শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয় না কিংবা হিসাবে সেই দিক হইতে অভাব ধরা পড়ে। ফলতঃ ভগবানের পূর্ণস্বরূপের অনুপলব্ধি-গত অজ্ঞানতাই ইহার কারণ। কিন্তু ইহাতে পূর্ণস্বরূপ যিনি তাঁহার পূর্ণতার অভাব হয় না, কারণ সেখানে পূর্ণতা নিত্যসিদ্ধ। মথুরায় কংসের রঙ্গভূমিতে দর্শকগণ নিজেদের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করে। এ সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি—

"মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।”

অর্থাৎ কংসের মল্লগণ সুকুমার শ্রীকৃষ্ণকে বজ্রের ন্যায় মহা কঠোর অনুভব করে। মথুরাবাসী জনগণ তাঁহাকে নরশ্রেষ্ঠ রূপে দেখেন। যুবতী ললনাগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মদনমোহনরূপে দর্শন করেন। গোপগণ তাঁহাকে দেখেন নিজেদের সখা। অসাধু নৃপতিপণ তাঁহাকে দণ্ডদাতারূপে দর্শন করেন। পিতৃ-মাতৃস্থানীয় যাঁহারা তাঁহারা দেখেন শিশু। ভোজপতি কংসের দৃষ্টিতে তিনি মৃত্যুরূপে অনুভূত হন। অভক্তগণ তাঁহাকে দেখেন ভয়ানক বীভৎস রূপে। যোগিগণ মূর্ত্ত পরব্রহ্ম স্বরূপে শান্তরসে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি আস্বাদন করেন। যাদবগণ তাঁহাকে পরদেবতাস্বরূপে উপলব্ধি করেন। আত্মাস্বরূপে প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধির অভাবেই এমন ভেদ দৃষ্টি। আত্মতত্ত্ব অধিগত হইলে—প্রিয়স্বরূপে তাঁহাকে পাইলে অখিলরসের আকরস্বরূপেই তাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভগবৎ-মাধুর্য্যই এমন উপলব্ধির মূলে বীর্য্য বিস্তার করে। ভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্য তখন তাঁহার মাধুর্য্যের অনুগত হইয়া ছন্দে ছন্দে দিব্যানন্দে অদ্বয় চিন্ময় লীলায় বৈচিত্রতা পায়। চরিতামৃতের উক্তি—“ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।” নারদপঞ্চরাত্রে ঐশ্বর্য্য বা মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্যমাত্রজ্ঞানযুক্ত ভক্তির সাধনাকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

‘মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ় সর্ব্বতোঽধিকঃ।
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্ত স্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্ম্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশঙ্করী।’

অর্থাৎ মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তি সুদৃঢ় এবং সর্ব্ব বিষয় হইতে অধিক। এইরূপ ভক্তি ব্যতীত সার্ষ্ট্যাদি মুক্তি কখনই লাভ করা যায় না। মাধুর্য্যময়ী ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচ্ছিন্ন মনের গতি বিদ্যমান থাকে। ভক্ত সদাসর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে পরিপ্লুত থাকেন। এই ভক্তিতে কোন

অভিসন্ধি বা স্বার্থ-কামনা থাকে না। এই ভক্তিই বিষ্ণুর বশকারিণী। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমন লীলাতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা। পুরুষোত্তম-তত্ত্বে জীবের উজ্জীবনোপযোগী সর্ব্বসম্বন্ধে পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ত্তি। চরিতামৃতে স্বরূপদামোদরের শ্রীমুখে ব্রহ্ম-সংহিতার এই বাণী আমরা শুনিয়াছি—

'পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন-ধাম।
চিন্তামণি যাঁহা ভূমি রত্নের-ভবন
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ-ভূষণ।
কল্পবৃক্ষলতা যাহা সাহজিক বন
ফুল-ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন।
অনন্ত কামধেনু যাহা চরে বনে বনে
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে।
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত
সহজে গমন করে নৃত্য পরতীত।
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃতসমান
চিদানন্দ রসাস্বাদু যাঁহা মূর্ত্তিমান্।
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ
কৃষ্ণ-বংশী করে যাঁহা প্রিয় সখী কাজ।' (চৈঃ চঃ)

এই উপলব্ধির রাজ্যে সব মধুময়—'সলিলে বহে মধু অনিলে বহে মধু।' পরম সত্যে জীবের অমৃতে প্রতিষ্ঠা ঘটে। অবশ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোমপতির উপাসনাতেও জীব মায়ামুক্ত হইতে পারে এবং আনন্দও লাভ করিতে পারে। প্রত্যুত ভক্তির পথে না গেলে সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য বা সাযুজ্য কোন মুক্তি বা মুক্ততা-জনিত আনন্দও মিলে না আমরা ইহা দেখিয়াছি। পঞ্চরাত্র হইতে উদ্ধৃত বচনে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে স্বরূপে চিচ্ছক্তির বিলাস যত অধিক, সেই রূপে আনন্দ ও মাধুর্য্যও তত বেশী। ব্রজেন্দ্রনন্দন

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যের দ্বারা কবলিত। তিনি রসস্বরূপ। শ্রুতি বলেন—রসই আনন্দ এবং আনন্দই সুখ। ফলতঃ জীবের অন্তরে রস বা আনন্দের অনুভূতিই তাহার সুখ। এই সুখের জন্য পিপাসা সনাতন-ভাবেই জীবের অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছে। রসানন্দের এই পিপাসা যতই আত্মসুখ-বাঞ্ছা বা কাম সম্বন্ধ হইতে বিবর্জ্জিত হইবে, জীবের পক্ষে আনন্দ ততই উপভোগ্য হইবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—যিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইব। এই বিষয়ে যাঁহার সংশয় নাই তিনি উক্তরূপ গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হইবেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেই জীবের পক্ষে সমাত্ম-সম্বন্ধে রসধর্ম্মের এমন উজ্জীবন-বীর্য্য রহিয়াছে এবং সেই রসের আস্বাদনে জীবের চিত্ত আবিষ্ট হইলে তাহার স্বরূপধর্ম্মগত রস-পিপাসার পরিপূর্ত্তি সাধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া জীবের অন্য উপাস্য আর থাকে না। গীতায় শ্রীভগবান্ লীলাপুরুষোত্তম স্বরূপে তাঁহার এই ব্যক্ত ভাবটির দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—দেবোপাসকগণ দেবতাদের সেবা করিয়া অস্থায়ী ফল লাভ করে। আমার ভক্তগণ আমাকে উপাসনা করিয়া আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাঁহার এই ব্যক্তভাবটি আশ্রয় না করিলে পুরুষোত্তমতত্ত্বটি জীবের পক্ষে উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয় তত্ত্বের অতীত শ্রীভগবানের পর ভাবটি কৃষ্ণের নর-মাধুর্য্যেই আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য পরম বীর্য্যস্বরূপে নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার এই ব্যক্ত মাধুর্য্যে চিত্ত অনুপ্রবিষ্ট হইলে পরিবর্ত্তনশীল ভূত-প্রকৃতির মধ্যে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার অপ্রাকৃত রসে আমাদের মন, বুদ্ধি পরিপ্লাবিত হয় এবং আমাদের দৃষ্টিতেও নশ্বর জগতে অবিনশ্বর আত্মসত্তায় শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠেন। সে অবস্থায় কৃষ্ণবীর্য্যে আমাদের মনের সর্ব্ববিধ সম্পর্কে আস্বাদনের উপযোগিতায় শ্রীভগবানের প্রেমের

লীলা বিলসিত হয়।

'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।'

যিনি এইরূপ প্রেমের দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, ভগবানকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় না এবং ভগবানও তাঁহার দৃষ্টি হইতে দূরে যাইতে পারেন না। গীতোপদিষ্ট পথে ভগবদ্দর্শনের এইটিই বৈজ্ঞানিক ধারা। সর্ব্বভূতে অবস্থিত শ্রীভগবানের নিত্য ভাবটি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্র অদ্বয়তত্ত্বে তাঁহার চিন্ময় অনুভূতিতে দেহ, মন, প্রাণে জীবের উজ্জীবন লাভে স্বরূপগত ধর্ম্মে নিত্য প্রতিষ্ঠার বীজ রহিয়াছে কৃষ্ণলীলার ব্যক্তভাবে। এই ব্যক্তভাব বলিতে ঐশ্বর্য্য-বিনির্ম্মুক্ত তাঁহার মাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপটিই বুঝায়। এই মাধুর্য্য জীবের সর্ব্ববিধ অবীর্য্য দূর করে এবং সর্ব্বাত্মস্বরূপ দেবতার অনুগতিতে জীবের কামপিপাসার একান্তভাবে নিবৃত্তি সাধিত হয়। জীব সর্ব্বভূতে নিজের জীবনদেবতার ব্যক্তভাবে প্রভাবিত হইয়া বিশ্ববীজে ডুবিয়া যায়, সর্ব্বসম্বন্ধে নিজেকে অনুভব করে। তখন সবই আপন, সুতরাং জীবের 'কৃষ্ণকৃপা, কৃষ্ণসেবা-সমুদ্রে মজ্জন।' সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তখন ভজন—সাসঙ্গ ভজন, সর্ব্বভাবে ভজন, এমন ভজনে প্রেমরূপ পুরুষার্থ-লাভে তখন জীবের জীবন সার্থকতা লাভ করে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যিনি বিনাশশীল সর্ব্বভূতে আত্মদেবতার অবিনাশী লীলার বিলাস প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই যথার্থ দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। যিনি পৃথক্ পৃথক্ ভূতসমূহে এক আত্মাকে দর্শন করেন এবং সেই আত্মা হইতেই ভূতসকলের বিকাশ উপলব্ধি করেন, তিনিই ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়াছেন। পুরুষোত্তমতত্ত্বে মায়াময়ী প্রকৃতির অভিভূতির ক্ষেত্রেও এইরূপ বহুর মধ্যে একই সত্যের চিন্ময় লীলার দর্শন লাভ সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাংশিস্বরূপে জানিলে এবং বুঝিলে 'পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ'—(চৈঃ চঃ) তাঁহার পরমাত্ম-স্বরূপ এই অংশটিও আমাদের উপলব্ধিগত হয়। বস্তুতঃ পরমাত্মতত্ত্বে যে

উদার, অব্যক্ত এবং আনন্ত্য ভাবটি রহিয়াছে, পুরুষোত্তমতত্ত্বে তাহা বিশ্বের বহু ভাবে ভগবৎ-প্রেমে প্রমূর্ত্ত অর্থাৎ লীলায়িত হয় এবং রূপে রূপে জীবকে আকর্ষণ করে। "একোঽহম্ বহুস্যাম্—প্রজায়েয়", বেদ-প্রতিপাদ্য এই পরব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপধর্ম্মে তাঁহার রস-মাধুর্য্য আস্বাদনে পরম তাৎপর্য্য কৃষ্ণের ব্যক্ত লীলায় প্রকটিত হইয়াছে। "রস আস্বাদক রসময় কলেবর"—শ্রীকৃষ্ণের নরবপু তাঁহার নিত্যভাবেরই অভিব্যক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য উদ্গীত হইয়াছে। সেই মাধুর্য্যের রীতি-প্রকৃতির পরিচয় আমরা পাইয়াছি—

'কর্ম্ম যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি, তপ ধ্যান
ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ।' (চৈঃ চঃ)

চরিতামৃত বলেন—

"ব্রহ্ম শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান।
শ্রুতি-পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস
তাহা নাহি মানে পণ্ডিত করে উপহাস।
চিদানন্দ কৃষ্ণ-বিগ্রহ মায়িক করি মানি
এ ত বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী।"

পণ্ডিত বলিতে এ ক্ষেত্রে আচার্য শঙ্করকেই বুঝাইতেছে। শঙ্করের মায়াবাদ এইখানে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তানুসারে নাস্তিকতায় পরিণত হয়। সুতরাং ইহা বেদবিরোধী। কারণ ইহার ফলে অনাত্মবাদকেই প্রতিষ্ঠা দান করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নর-লীলাকে যাঁহারা পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন এবং নির্ব্বিশেষবাদের প্রতিষ্ঠা দানের জন্য তাহা ভাবাদর্শমাত্র বলিয়া নিজেরা অখণ্ড ব্রহ্মোপলব্ধির পথিক স্বরূপে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন, ভগবৎ-প্রেম হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া এড়াইয়া যাইতে গিয়া নিজেদের আত্মঘাতী

প্রবৃত্তির বিড়ম্বনায় তাঁহারা পতিত হইয়া থাকেন। কারণ অনাত্মদর্শনের অর্থই মরণ। ব্যক্তভাব বলিতে কেহ কেহ খণ্ডজ্ঞানগত উপলব্ধি বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ভাব জৈব-প্রবৃত্তিজনিত দুর্ব্বলতা মাত্র। তাঁহারা ভাবাতীত অবস্থায় পোঁছিতে চাহেন। ভাব গাঢ়তা লাভ করিলে প্রেমে পরিণত হয় এবং চিন্ময় আনন্দের ছন্দোময় রসে ডুবিয়া আমরা জীবনের অনন্ত সম্বন্ধে মাধুর্য্য আস্বাদনের অধিকারী হই, একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের অনেকের এই মত যে কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ রূপ—নিত্য বস্তু নয়।

ফলতঃ শ্রীভগবান্ বিশেষও নহেন, আবার তাঁহার স্বরূপকে নির্ব্বিশেষও বলা যায় না। একাধারে তাহাতে বিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমাশ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার বিশেষ রূপের সংস্পর্শে জীবের খণ্ডবুদ্ধি বিলীন হইয়া অশেষরূপের উন্মেষ হয়। ভগবদাবির্ভাবের সেই চিন্ময় প্রভাব আমাদের স্বভাবকে বদলাইয়া দেয়। দেশ এবং কালের পরিচ্ছিন্ন প্রতিবেশ হইতে আমাদের মনকে মুক্ত করে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন—বিশেষ হইতেছে ভেদের প্রতিনিধি। যাহা ভেদের অভাবচ্ছলেও ভেদের প্রতীতি জন্মায় তাহাই বিশেষ—"বিশেষবস্তু ভেদ-প্রতিনিধি র্ন ভেদঃ" অর্থাৎ ভেদের অভাব সত্ত্বেও বিশেষ ভেদের প্রতীতি জন্মায়, ইহা অচিন্ত্য। শ্রীভগবানের বিশেষ লীলার আশ্রয়ে জীব অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপে তদ্ভাবগত হয় এবং মহাভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়ে। এইভাবে স্বতনু দিয়া জীবকে বরণ করা ভগবানের স্বভাবেরই ইহা প্রভাব। এই অবস্থায় এক মহাভাবেই নানাভাবের খেলা চলিতে থাকে—'অন্ত কোথা তার?' বিভিন্ন ভেদ-ভাব একের সংবেদনে চিৎঘন আপ্যায়নে জীবকে অখণ্ড এবং অদ্বয় আত্মতত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট করে। প্রেমের সংস্পর্শে জীবের বাঞ্ছাপূর্ণকল্পে ভগবান তাঁহার অদীন লাবণ্যে নিজের চৈতন্যময় আত্মসত্তাকে জীবের কাছে অশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে ব্যাকুল হন। সুতরাং বিশেষ বলিতে এ ক্ষেত্রে খণ্ড জ্ঞান বা পরিচ্ছিন্ন ভাব থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ

নরাকৃতি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন—"অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ'। (চৈঃ চঃ)। বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে—অশেষে বিশেষ রসের উন্মেষ নাই। সেক্ষেত্রে শ্রীভগবানের মাধুরীর অব্যক্ত বা অসম্যক্ প্রকাশ হয় মাত্র। বস্তুতঃ বিশেষ ভাবটি নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেরও সম্বল স্বরূপ। নতুবা নির্ব্বিশেষ এবং নিঃশক্তিক পরব্রহ্মে গগনের ন্যায় জড়ত্ব আসিয়া পড়ে ; তাঁহার চিৎ-শক্তির বিলাস থাকে না। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের মানুষী তনুকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার পর অর্থাৎ বিশ্বতোব্যাপ্ত আত্মলীলার মাধুর্য্য-বীর্য্যের চাতুর্য্য নিত্য এবং সত্যস্বরূপে রহিয়াছে। ভগবত্তার সার বা প্রাণই হইল মাধুর্য্য। শ্রুতি বলেন—

'একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥' (কঠ-২।২।১২)

কৃষ্ণ বশী। স্থাবর জঙ্গম সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। এই বশ করিবার ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের শক্তিই অধিক। ঐশ্বর্য্য অনেক ক্ষেত্রে শুধু দেহের উপরই প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে মনের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা ঐশ্বর্য্যের নাই। কিন্তু মাধুর্য্যের আধিপত্য দেহ এবং মন উভয়ের উপর। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনই শক্তি যে জীব তাহার আকর্ষণে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে উৎকণ্ঠিত হয়। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য নিত্য —ইহাও সত্য। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য তাঁহার চিচ্ছক্তিরই বিলাস তাহাতে জড়ত্বের সম্পর্ক নাই। ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের সুতরাং কৃষ্ণ-তত্ত্বে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য উভয়ের পূর্ণতম বিকাশ। ফলতঃ শুধু মাধুর্য্যের পথে সাধনায় আমাদের লৌকিক এবং ঐহিক বা সামাজিক প্রয়োজন প্রতিপালনে সর্ব্বার্থে সঙ্গতি সাধিত হয় কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা শুধু তখনই সম্ভব যখন আমরা জৈব প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে আমাদের স্বরূপনিষ্ঠিত চিদংশে

প্রভাবিত হই। জীবনকে আমরা নিত্য করিয়া পাই। প্রকৃতপক্ষে সে প্রশ্ন প্রাকৃত জীবন-সম্পর্কিত এবং তাহা জীবের স্বরূপধর্ম্মগত নিত্য বস্তু নহে। পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণতত্ত্বে অবতার অংশও রহিয়াছে। 'অসুর-সংহার আদি হয় অংশ হৈতে'—(চৈঃ চঃ)। চরিতামৃতের উক্তি—

'যাঁর যেই ভাব তাঁর সেই সর্ব্বোত্তম
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তারতম।'

চরিতামৃত আরও বলেন—

'কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর-নারায়ণ
কেহো কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন।
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার।
কৃষ্ণ যদি অবতরে সর্ব্বাংশ আশ্রয়
সর্ব্বাংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়।
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে।'

গীতায় সাধ্যস্বরূপে তারতম্যের বিচার রহিয়াছে। এই বিচারের দ্বারা গীতার দেবতা অমৃতত্ব লাভের পথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন।

'ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত, কেবল ভাব আর
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি পাই ব্রজেন্দ্রকুমার
'ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।' (চৈঃ চঃ)

ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যে এই ভেদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর :উক্তিতে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ তৎপ্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দেবী ভগবতীর নিকট সদাশিবের উক্তি তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সদাশিব বলেন—

'জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তি যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।'

জ্ঞান-সাধনের পথে মুক্তি সুলভ হইতে পারে, যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মে

স্বর্গসুখাদি ভোগও লাভ করা যায়। কিন্তু সে সব বহু সাধনেও হরি ভক্তি মিলে না। এই বিচারের সিদ্ধান্ত ঘটিয়াছে গীতায় পূর্ণস্বরূপ পুরুষোত্তমে। শ্রীভগবান তাঁহার পুরুষোত্তমস্বরূপের দিকেই জীবের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। এই সত্যটি আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার পূর্ণস্বরূপ ভগবদুক্তিতে ইহাও সুস্পষ্ট।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে আর তাঁহার লীলায় পরব্রহ্মের পরভাব এবং তাঁহার ভূতমহেশ্বরত্ব অর্থাৎ সর্ব্বজীবের সঙ্গে চিন্ময় আনন্দের সম্বন্ধে আত্মরসের উজ্জীবন-বীর্য্য অব্যয় মাধুর্য্যে উন্মুক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ। পুরুষোত্তমস্বরূপে শ্রীভগবানকে অসংমূঢ়রূপে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বসম্বন্ধে মধুরভাবে তাঁহার সেবাই গীতায় সাধ্যস্বরূপে বিনিশ্চিত হইয়াছে। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতাভাষ্যের উপসংহারে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরুষোত্তম এই কৃষ্ণ কেমন ?

'শ্যামসুন্দর শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাবিভূষণ
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মূরলীবদন।' (চৈঃ চঃ)

সরস্বতীপাদের সিদ্ধান্ত—

'বংশী-বিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু-সুন্দর-মুখাদরবিন্দনাভাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং পরমতত্ত্বমহং ন জানে।'

সুতরাং দ্বিভুজ নরলীল কৃষ্ণকেই তিনি জীবের উপাস্য, অনুধ্যেয় এবং সাধ্যতত্ত্বস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনিই গীতার পুরুষোত্তম। বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে গীতামাহাত্ম্যে এই সত্যটি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে—

"একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীত-
মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।"

দৈবাসুরসম্পদ বিভাগ যোগ

১। দৈবী সম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ॥
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

২। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ॥
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

৩। ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ॥
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

৪। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ ॥
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

ষোড়শ অধ্যায়

দেবতা ও অসুর

সৃষ্টি করিব এই ভাবটি মনে জাগিলেই দ্বন্দ্বজ্ঞান এবং এই ভাবটি হইতে মুক্ত হইলেই জীবের পক্ষে দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির দিকে তাকাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব জ্ঞান তাঁহাকে অভিভূত করিল। তিনি সৃষ্টির প্রবৃত্তিমূলে পাপকে উপলব্ধি করিলেন। শঙ্কান্বিত প্রজাপতি সৃষ্টি হইতে দৃষ্টিকে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তরের মূলে দৃষ্টি দিলেন, জাগিলেন সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ। ইঁহারা সৃষ্টির ভাব হইতে মনকে মুক্ত রাখিলেন। চতুঃসন এজন্য শুদ্ধ মনের স্বরূপ। তাঁহারা গুরুতত্ত্ব। নিজেদের সৃষ্টির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। শ্রীভগবানের চিৎ এবং অচিৎ, জড় এবং চেতন উভয় বিভূতিকে বিধৃত করিয়া তাঁহার অক্ষর, অব্যয়তত্ত্ব-পুরুষোত্তমস্বরূপে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু মানুষের অবস্থা এরূপ নয়। তাহাদের মন অপরা প্রকৃতির অভিভূতিজনিত দ্বন্দ্বজ্ঞানে সংবদ্ধ। তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে কেহ স্বভাবতঃ দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত, অপরে আসুর প্রকৃতিসম্পন্ন। সবাই তো মানুষ, তবে প্রকৃতিতে একরূপ হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় মানুষের স্বরূপনিষ্ঠ স্বভাবের বিচার করিতে গেলে সকল মানুষই এক। দেশ, কাল এবং জাতিগত ভেদটি তাহার পক্ষে আগন্তুক অবস্থা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—

> "কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ দোষে মায়া হৈতে ভয়
> কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়।"

এইভাবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার ফলে জীবের যে স্বার্থ সাধিত হয় এরূপ নহে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণ-সেবাতেই তাহার একান্ত স্বার্থ বা পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কৃষ্ণে প্রেমভক্তি জন্মিলে বিশ্ব-প্রকৃতির মূলে জীব নিত্য সত্যে আত্মসংস্থিতি অনুভব করে। ইহার ফলে ঐহিক প্রয়োজন সাধনের সূত্রেও তাহাদের সনাতন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়।

কৃষ্ণ সেবার অর্থই আত্মসেবা, জীবের পূর্ণতার উপলব্ধি, সর্ব্ব সম্বন্ধে তাহার জীবনের সৌষ্ঠব বা সঙ্গতি। "ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"—কৃষ্ণ-সেবার পথে জীবনের এই সঙ্গতি লাভ করিলে দ্বন্দ্বজ্ঞানের উর্দ্ধে জীবের মন উন্নীত হয় এবং তাহাকে মৃত্যুময় জীবনের গ্লানিভার আর বহন করিতে হয় না। কিন্তু জীব অজ্ঞানতার বশে এই সত্যটি অনুভব করিতে পারে না।

"সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে জারি তারে মারে।"

আমরা মানব-সভ্যতার অভ্যুন্নতির কথা সদাসর্ব্বদাই শুনিতে পাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাধনায় মানুষ চমক সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু এই সাধনায় মানুষের মহত্ত্ব কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে এই সত্যই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে, বৈজ্ঞানিক সাধনার এই অগ্রগতি মানুষকে হৃদয়ের সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে আসুরিক স্পর্দ্ধায় উত্তরোত্তর পরিস্ফীত করিয়া তুলিতেছে। মানুষের দর্প-দম্ভের আজ শেষ নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্ব-কথা
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা।
যে যে গুণে মত্ত হৈয়া করে অহঙ্কার,
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার।" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীভগবান এই প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষদিগকে অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া নিজেদেরই অনিষ্ট করে এবং জগতের ধ্বংসের কারণ সৃষ্টি করে। বর্ত্তমানে আমরা এই পথেই চলিতেছি। বস্তুতঃ নিজেদের বুদ্ধির বড়াই আমরা যতই করি, আমাদের অজ্ঞানতার সীমা-পরিসীমা নাই। আমরা জ্ঞানের অহঙ্কার করিয়াও অজ্ঞান। আমরা নিজেরা সব কিছু বুঝি বলিয়া মনে করি অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে নিজেদের প্রকৃত

স্বার্থ কিসে এইটুকু বুঝিবার মত বিচার-বুদ্ধিও আমাদের নাই। ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বের বায়ুমণ্ডল প্রতিনিয়ত বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ নির্ব্বিবেক বিচারে মানুষের মন উত্তরোত্তর ইতরাসক্তিযুক্ত হইয়া দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের কারণ সৃষ্টি করিতেছে। মানুষ কাম-ভোগকেই বর্ত্তমানে জীবনের পুরুষার্থ মনে করে। এই ভোগপ্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের অপরিমেয় চিন্তা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে প্রলয়ান্তকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। চিন্তার ফল সংক্রামক। শ্রুতি বলেন,—

"বাতি গন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈব হি।
ধর্ম্ম যস্ত মনুষ্যাণাং বাতি গন্ধঃ সমন্ততঃ।"

একটি সুগন্ধি পুষ্প বিকশিত হইলে তাহার গন্ধ যেমন চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে তেমনি মানুষের চিন্তার ধর্ম্মও বিস্তারশীল। আমরা ভাল বা মন্দ যেরূপ চিন্তাই করি না কেন, জগৎ তদ্দ্বারা প্রভাবিত হয়। মহানারায়ণোপনিষদে বলা হইয়াছে—'যথা বৃক্ষস্য সংপুষ্পিতস্য দূরাৎ গন্ধো বাত্যেবং পুণ্যস্য কর্ম্মণো দূরাৎ গন্ধো বাতি। যথাসিধারাম্ কর্ত্তেঽবহিতামবক্রামে যদ্যুবে যুবে হবা বিহ্বয়িষ্যামি কর্ত্তম্ পতিষ্যামী-ত্যেবমমৃতাদাত্মানং জুগুপ্সেৎ।' অর্থাৎ যেভাবে বাতাস বৃক্ষ হইতে পুষ্পের গন্ধ দূরে ছড়াইয়া দেয়, সেই ভাবে সৎকর্ম্মের ফলও বিস্তার লাভ করে। কিন্তু অসৎ কর্ম্মের ফল সকল সময় স্থূলভাবে আমাদের অনুভবগম্য হয় না, সূক্ষ্মভাবে সেগুলি মনকে দুর্ব্বল করিয়া অধঃপতনের কারণ সৃষ্টি করে। যদি কোন ধারাল অস্ত্রের উপর দিয়া যাইতে হয় তখন যেমন 'আমি পড়িয়া যাইব', 'পড়িয়া যাইব' সদা সর্ব্বদা মনে এইরূপ আতঙ্ক থাকে, সেইরূপ অসৎকর্ম্মের ফলও মানুষের কামোপভোগ-জনিত সুখকে শূন্যগর্ভ করিয়া ফেলে। ভগবান্ বুদ্ধের উক্তি এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মপদের পুষ্পবর্গ নামক অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন—চন্দন, টগর, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পের গন্ধ বায়ুর অনুকূল দিকেই প্রবাহিত হয়, কিন্তু সৎকর্ম্মের প্রভাব প্রতিকূলতার

ক্ষেত্রেও কার্য্যকর হইয়া থাকে। এই হিসাবে সকল চিন্তাই সংক্রামক। অসৎ চিন্তার ফলে শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরই অনিষ্ট হয় না পরন্তু তদ্দারা সমগ্র জগতের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ সৎ-চিন্তার ফলে সর্ব্বত্র সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক যিনি তিনি পুণ্যময় প্রতিবেশস্বরূপ। "তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি" তীর্থকে তাঁহারা তীর্থ করেন। তাঁহারা নিজেরা তীর্থীভূত। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধস্বরূপ। বস্তুতঃ গন্ধই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার মূলে কাজ করে। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতির মূলে থাকে গন্ধ। গন্ধই সঙ্গের স্থায়ীভাবের উজ্জীবক। আমাদের স্থূল ভোগায়তন দেহের সহিত সম্বন্ধের অভিমানে আমাদের অন্তরে প্রাণধর্ম্মও জাগায় এই ঘ্রাণ। সাধন-ভজনে চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদিত হইলে স্থূল ইন্দ্রিয়েও এই ঘ্রাণ অনুভূত হয়। কোন বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ যতই গাঢ়, গভীর এবং আয়ত হইতে থাকে ততই সেই বস্তুর গন্ধ-তন্মাত্র সূক্ষ্ম পরমাণুর আকারে আমাদের দেহকে প্রণোদিত করে। আমরা তদনুযায়ী প্রতিবেশটি পাই।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমানকালে মানব-সমাজ নৈতিক অধোগতির চরম স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব মানুষ মানিতে চাহে না। ইহার ফলে মানুষ ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ধর্ম্মই নীতিকে মানুষের কর্ম্মসাধনার মূলে সমষ্টির স্বার্থ-চেতনাকে উজ্জীবিত রাখিয়া সমাজকে সংস্থিতি দিয়া থাকে। ঈশ্বরকে স্বীকার করার অর্থই হইল সমষ্টির স্বার্থে অর্থাৎ পরার্থের প্রণোদনায় মানব-মনের উন্নয়ন এবং সমগ্রের সংবেদন-সূত্রে পশুত্বের ঊর্দ্ধে মানব-জীবনের পরম মহত্ত্বের উপলব্ধি। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—'সমগ্রাণাং তপঃ সুখং।' শ্রুতিও এই কথাই বলেন, 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং—নাল্পে সুখমস্তি।' ব্রহ্ম অর্থে বৃহৎ বস্তু শ্রীভগবান এবং তাঁহার সহিত সংযোগে সমগ্রের জন্য তপস্যাই সুখের মূল এবং সেই সুখের

সমষ্টির উপলব্ধিতেই মানুষের মহত্ত্ব—তাহার অব্যয় আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠা। আসুরিক প্রকৃতি-সম্পন্ন পুরুষেরা প্রতি জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়। তাহারা অধম গতি লাভ করে, শ্রীভগবানের ইহাই নির্দ্দেশ। তিনি কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটিকে নরকের দ্বার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে কামই মানব-জীবনের অভ্যুন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায়। বিষয়ের সংস্পর্শে আমাদের মনের মূলে সর্ব্বত্রই স্থূলভাবে না হইলেও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মভাবে কাম-সংকল্প জাগ্রত হয়। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল বিষয়ের বিচারও আমাদের মনে সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং ক্রোধের উদ্ভব হয়। শারীরিক বলপ্রয়োগাদিতে আমরা এই ক্রোধের স্থূল রূপটিই প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ বিষয়োপভোগে মনে আসক্তি সঞ্জাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধের প্রভাবে চিত্তবৃত্তি ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বৃহতের সহিত আত্মসম্বন্ধে আমাদের জীবনের পূর্ণতার অনুভূতি হইতে আমরা বঞ্চিত হই। বাহিরের কোন উপচারই এই অবস্থায় আমাদের মনের দৈন্য দূর করিতে পারে না। পক্ষান্তরে চিৎ-প্রকৃতি সম্পন্ন জীব আমরা, চিদ্ধর্ম্ম আমাদের স্বভাবনিষ্ঠ হওয়াতে বাহিরের জড়ের উপচার সংগ্রহের আগ্রহ আমাদের নিগ্রহই বর্দ্ধিত করে। এই অবস্থায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া আমরা কামোপ-ভোগের বশবর্ত্তী হই এবং আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ সৃষ্টি করি। ইহাই আসুরী প্রকৃতির স্বরূপ।

ছান্দোগ্যে 'আসুরী উপনিষদ' এই নামে একটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে আসুরী প্রকৃতির ভাবটি বিশ্লেষিত করা হইয়াছে। প্রজাপতি বলিয়াছেন—আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ, এমন আত্মাকে অধিগত হওয়া উচিত। তবেই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। দেবতাগণের মধ্য হইতে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্য হইতে বিরোচন উভয়ে এই আত্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য প্রজাপতির শরণাগত

হন। প্রজাপতি উভয়কে বলিলেন, উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, সুবস্ত্র-পরিহিত এবং পরিষ্কৃত হইয়া তোমরা উভয়ে একটি জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ঐ জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে দেখিয়া আত্মার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারিবে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। তাঁহারা উভয়ে জলে দৃষ্টি দিলেন। প্রজাপতি প্রশ্ন করিলেন—কি দেখিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা দুইজনেই যেরূপ সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত, সুবসন-পরিহিত ও সুপরিষ্কৃত আছি জলে আমাদের প্রতিবিম্বও ঠিক তেমনই দেখিতেছি। প্রজাপতি বলিলেন, ইনিই আত্মা। তাঁহারা দুইজনেই তৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু অসুররাজ বিরোচন গুরূপদিষ্ট তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি বুঝিলেন না যে সংসারী জীব হইতেছে ছায়াযুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানতার আবরণে সত্য তাঁহাদের দৃষ্টিতে আভাসরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন 'অচ্ছায়ম্ তমো-বিবর্জ্জিতম্'—(বৃহদারণ্যক-৩।৮।৮)। তিনি অসুরগণের নিকট গিয়া বলিলেন এই দেহই আত্মা। এই দেহেরই তুষ্টি ও পুষ্টিতে তোমাদের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু ভুল বুঝিলেন না। তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন না। তিনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। তিনি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, এই শরীরটি উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে জলে প্রতিবিম্বিত ছায়ারূপ আত্মা যেরূপ অলঙ্কৃত হয়, দেহ পরিষ্কৃত হইলে তাহা যেমন পরিষ্কৃত হয়, ঠিক তেমনই তো দেহ অন্ধ হইলেও উহা অন্ধ হইবে, কাণা হইলে কাণা হইবে এবং এই শরীর নাশ হইলে ছায়া দেহরূপ আত্মাও তদনুযায়ী বিনষ্ট হইবে। কিন্তু গুরু বলিয়াছেন—আত্মা মৃত্যুহীন, বিজর, নিষ্পাপ ইত্যাদি। সুতরাং দেহের সুখবিধানে কিংবা তাহার তোষণ-পোষণে আত্যন্তিক নিবৃত্তি নাই; মহাভয় হইতে মুক্তি মিলে না। ইন্দ্র বুঝিলেন গুরুর বাক্যটি নিশ্চয়ই তাঁহার পক্ষে বুঝিতে কোথায়ও কিছু গোল ঘটিয়াছে। এরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রে গুরু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি বুঝিয়া লইতেই উপদেশ দিয়াছেন। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া তিনি পুনরায় প্রজাপতির শরণাগত

হইলেন। ইন্দ্র একশত এক বৎসর কাল গুরুসেবায় সমাশ্রিত থাকিয়া, অবশেষে পরম-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিলেন। প্রজাপতি তাঁহার তত্ত্বদৃষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। তিনি উপদেশ দিলেন—"মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা। তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ। প্রিয়া-প্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥" (ছান্দোগ্য ৮।১২।১)

প্রজাপতি গুরুস্বরূপে ইন্দ্রকে এই উপদেশ দিলেন—এই শরীর মরণশীল, ইহা মৃত্যুকবলিত। কিন্তু ইহাতে অমর এবং নিত্য সত্যস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠান। যিনি দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন তিনিই সুখ এবং দুঃখ-গ্রস্ত হন। তাঁহার সুখ-দুঃখজনিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিরাম নাই। যিনি দেহাত্মবুদ্ধিবিহীন তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। ফলতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিপত্তিই আমাদের দুর্গতির কারণ। ভাগবতে ভগবান জীবের এই দুর্গত অবস্থাটি কিরূপ বুঝাইবার জন্য উদ্ধবকে বলিয়াছেন, কাম হইতে জীবের চিত্তে বিরোধের ভাব সৃষ্ট হয়। এই বিরোধের ভাব হইতে দুর্বিষহ ক্রোধের উদ্ভব ঘটে। তাহার ফলে মৃত্যুময় তামস ভাব জীবের চিত্তবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহার স্বার্থ-বিভ্রংশ ঘটে। সে মূর্চ্ছিত বা মৃতের মত অবস্থায় পতিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, যাঁহারা অনাত্মদর্শী সূর্য্যহীন তমোময় অন্ধলোকে তাঁহাদের গতি হয়। বলা বাহুল্য, ঈশ্বরে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই তাঁহারা পরলোকও বিশ্বাস করেন না, সুতরাং নরকের ভয়ও তাঁহারা রাখেন না। কিন্তু মন বস্তুটি তাঁহাদেরও আছে এবং সেই মনের ধর্ম্ম হইতে তাঁহারাও মুক্ত হইতে পারেন না। কথায় আছে—'হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে, মন বাঁধবে কে ?' পরকে আপন করাতেই মানুষের মনের উজ্জীবন। পক্ষান্তরে কাম-সঙ্কল্পের পথে আমাদের নিজেদেরই অসহায়ত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পশুর মত প্রতিনিয়ত ভীতিগ্রস্ত, মরণত্রস্ত জীবনের গ্লানিভার আমাদিগকে বহন করিতে হয়। শ্রুতি এইরূপ কামোপভোগের প্রবৃত্তিকে আত্মঘাতী পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হইতেও এই সত্যটি অবধারণ করা কঠিন নহে। কিন্তু আমরা সব বুঝি অথচ নিতান্ত সহজ সত্যটি বুঝি না। উপায় কি? পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া মানব-সমাজকে অভয় বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি একটি পরম সত্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন, আশ্বস্ত করিয়াছেন। ভগবান্ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভৃতি দৈবীসম্পদ মোক্ষের কারণ এবং দম্ভ, দর্প, অভিমান প্রভৃতি আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাণ্ডব! তুমি শোক করিও না। তুমি মানুষ। তুমি স্বরূপানুবন্ধী দৈবী সম্পদ লইয়া উন্নত জন্ম লাভ করিয়াছ। প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়কুলে কিংবা কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য ভগবান তাঁহাকে অভিজাতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য এরূপ নহে। কারণ কথাটির সূত্রপাতেই তিনি বলিয়া লইয়াছেন—'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা'। দৈবী সম্পদ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু এবং আসুরিক সম্পদ সংসার-বন্ধনের কারণ। দৈবী সম্পদ যদি মানুষের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম না হইত তবে তাহার পক্ষে কোনদিনই মুক্তি লাভ করা সম্ভব হইত না। বস্তুত ভগবানের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য। সংসারী জীবের এই সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। ভগবৎ-স্মৃতি জাগিলে সম্বন্ধটিও জাগে। দৈবী সম্পদে অর্জ্জুনকে অভিজাতস্বরূপে উল্লেখ করিয়া প্রকৃতপক্ষে ভগবান মানুষের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিয়াছেন। মানুষের স্মৃতিতে তাঁহার সহিত তিনি মানুষের নিত্য সম্বন্ধ জাগ্রত করিয়াছেন। কৃষ্ণ-লীলা, নিত্য লীলা। গীতায় এই পরম সত্যটি আমরা ধ্যানে পাইয়াছি, পাইয়াছি তাঁহারই করুণায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি স্মরণ করিলে আমরা ভগবানের স্বরূপধর্ম্মগত এই করুণারই পরিচয় পাই। তিনি বলিয়াছেন ভগবান্ শুধু বড় নহেন, তিনি আমাদিগকে বাড়াইবার জন্যই ব্যগ্র, এজন্যই তিনি বড়।

অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরুক্ষেত্রের প্রলয়ান্তকর প্রতিবেশে পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কাজে জীবকে বাড়াইবার জন্য তাঁহার এমন কারুণ্য-গুণটি বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তিনি মানুষকে পশু-জীবনের ঊর্দ্ধে তাহার সনাতন স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছেন। তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মানুষ সামান্য নহে, সে অমৃতের অধিকারী। 'দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম দেহেঽস্মিন্ ক্ষণভঙ্গুরে'—মানুষ অভিজন। সে দৈবী সম্পদের অধিকারী। শুধু তাহাই নয়, মানুষকে মান দান করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বদা ব্যাকুল। মানুষ তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেও তিনি কখনও মানুষকে বিস্মৃত হন না। মানুষ যাহাতে তাঁহাকে স্মরণ ও মনন করিতে পারে তিনি তাহাকে তদুপযোগী করণ-কলেবর দিয়াছেন। 'নৃদেহং আদ্যং' অর্থাৎ মানুষ ভগবানকে সমাশ্রয় করিবার উপযোগী দেহ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিকারী হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামী মহারাজের ভাষায় পরব্রহ্মের আনন্দ-লীলা জীব আস্বাদন করুক তিনি ইহাই চাহেন। এজন্য তিনি জীবকে তাঁহার পরম প্রেম উপলব্ধি করিবার উপযোগী নরদেহ দান করিয়া স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব"—ষোড়শ অধ্যায়ের এইটি মহামন্ত্র। এই মন্ত্রটির স্মরণে এবং মননে আমরা মানব-জীবনে অমৃতত্বের উজ্জীবন অনুভব করিতে পারি। আমরা মর্ত্ত্য জীব। আমাদের জন্য ভগবানের এমন বেদনা কেন? চক্রীর অসুরান্তক চক্রেরই ইহা চাতুরী না মাধুরী—কি বলিব আমাদের জন্য তাঁহার প্রীতির এমন রীতিকে? আপনারাই বলুন।

ধর্ম্মধ্বজী আসুরিকতা

শ্রীভগবান্ আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ষোড়শ অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১৬শ শ্লোক পর্য্যন্ত যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী তাহাদের কথাই প্রধানতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কাম্যবিষয়ের ভোগে অত্যন্ত আসক্ত ইহারা নরকে পতিত হয়, ভগবান একথা বলিয়াছেন। ইহার পর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন জীবের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। ১৭শ হইতে ২০শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ ইহাদের স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সকল আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন লোক নিজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা কাহারও নিকট বিনীত হয় না। ধনসম্ভূত মান ও মদে প্রমত্ত ইহারা। ইহারা নিজেদের নাম জাহির করিবার জন্যই ব্যস্ত এবং সেই উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ বা ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই ইহাদের লক্ষ্য। সুতরাং ইহাদের কর্ম্ম অশাস্ত্রীয় বা শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং অসূয়া এই সকল আশ্রয় করিয়া ইহারা নিজ দেহে এবং অপরের হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে। এই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূর স্বভাব, অশুভ কর্ম্মকারী নরাধম ব্যক্তিদিগকে আমি অনবরত আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করি। ইহারা কোন দিনই আমাকে পায় না। আমাকে না পাইয়া ইহারা উত্তরোত্তর অধম হইতে অধম জীব রূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী প্রথম পর্য্যায়ের আসুরিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকেরা নরকে পতিত হয়। নরক ভোগের পর তাহারা উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তিতে এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের লোকদের দুর্গতি অতি ভীষণ। তাহাদের কোনদিনই নিষ্কৃতি নাই। ভগবানের দৃষ্টিতে ইহাদের অপরাধ অসহ্য। ইহারা

বকবৃত্তিপরায়ণ। প্রকাশ্যভাবে নিরীশ্বরবাদী বরং ভাল, কারণ তাঁহাদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া সন্মার্গ আচরণ করা সম্ভব হয়। যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী তাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস ভবিষ্যতে জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। সরলভাবে ভগবানের শরণ লইলে তাঁহাকে তাহারাও পায়। যিনি একটু কৃতজ্ঞ হন তাঁহারই ভগবৎ-সেবার অধিকার মিলে। কিন্তু কুটিল অর্থাৎ যাহাদের মন এবং মুখ এক নহে এমন পাটোয়ারী বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভগবৎ-কৃপা কখনই লাভ করিতে পারে না। ফলতঃ ঈদৃশ কুটিল ব্যক্তিরা প্রকৃতিতে নিরীশ্বরবাদীদের অপেক্ষাও হিংস্র, তাহারা অতি ভীষণ। এই সব ধর্ম্মধ্বজী নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের নামে অপরকেও অধঃপাতিত করে। ইহারা বাঘ-ভাল্লুকের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, কারণ হিংস্রজন্তুগণ আমাদের দেহেরই অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু এই শ্রেণীর ধর্ম্মধ্বজী সচ্চরিত্রতার ছল পাতিয়া অপরের সর্ব্বনাশ করে। ইহাদের সংসর্গে মানুষের চিত্ত কলুষিত হয়।

"স্ত্রৈণ-মদ্যপরে প্রভু অনুগ্রহ করে
নিন্দক বেদান্তী যদি তথাপি সংহরে"

যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী—'না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।' কিন্তু বক-ধার্ম্মিকগণের পক্ষে সে সম্ভাবনা নাই। বক-ধার্ম্মিক লোকদের প্রকৃতি অতি কুটিল, ইহারা অসূয়াপরায়ণ। অসূয়ার একটি অর্থ গুণে দোষ দর্শন। সাধু ব্যক্তিদের দোষানুসন্ধানে অসূয়াপরায়ণ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা তৎপর। তাঁহাদের গুণে ইহারা দোষই আবিষ্কার করে।

"বাটোয়ার সবে মাত্র এক জন্মে মারে
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে।"

শাস্ত্র বলেন—মহতের যে নিন্দা করে শুধু সে-ই পাপের ভাগী হয়, তাহা নহে, মহতের নিন্দা শুনিলেও পাপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী
নিন্দার কি দায় তারে হাসিলেও মরি।

সাধু নিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়,
জন্ম জন্ম অধঃপাত চারি বেদে কয়।"

উদ্ধৃতি কয়েকটি চৈতন্য ভাগবতের, প্রভুরই শ্রীমুখের এই বাণী। বরাহপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মদ্ভক্তং শ্বপচং বাপি নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
পদ্মকোটী শতেনাপি ন ক্ষমামি কদাচন॥"

শাস্ত্র বলেন যে ব্যক্তি যাহার নিন্দা করে সে ব্যক্তি অপরের নিন্দা দ্বারা তাহার পাপের ভারই গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহার নিন্দা করা হয়, তাহার পাপের ভার এইরূপে অপসারিত হইয়া তাহার চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে থাকে। চৈতন্য ভাগবত বলেন—

"নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম সবে পাপ লাভ,
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ।"

অসূয়া শব্দের আর একটি অর্থ পরশ্রীকাতরতা, পরের সুখে বা উন্নতিতে হিংসা করা। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—এই শ্রেণীর আসুরী ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অপরের দেহে অবস্থিত আমাকেই দ্বেষ করে। ভাগবতে কপিল দেব তাঁহার জননীর নিকট বলিয়াছেন—ভগবান ভূতাত্মাস্বরূপে সর্ব্বদেহে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে যজ্ঞের নামে ভস্মেই তাহাদের ঘৃতাহুতি অর্পণ করা হয়। সর্ব্বভূতস্থ ভগবানকে অবজ্ঞা করিয়া মূর্ত্তি-পূজায় বিড়ম্বনা ব্যতীত অন্য কিছু মিলে না। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু-প্রসাদস্য কেবলং দাম্ভিকা জনাঃ।"

চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"বৈষ্ণব-হিংসার কথা সে থাকুক দূরে,
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে।
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজায় দ্রোহ করে,
পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সব মোর দাস,
এতেকে যে পর হিংসে সেই পায় নাশ।"

প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের গ্লানি আমাদের সমাজ-জীবনকে যতটা অভিভূত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে অধর্ম্মের পীড়ন বোধ হয় ততটা ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে এইরূপ স্বার্থ-কুটিল দুরাচারতা চারিদিকে চলিতেছে আমরা ইহাই দেখিতে পাই। নিজের নিজের স্বার্থের বেসাতিতে সন্ন্যাসীর গৈরিক ধারণ করিয়া এই শ্রেণীর ধর্ম্মধ্বজীগণ ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া চলিতে চাহেন। তাঁহারা সংসারী লোকদিগকে কৃপার পাত্রে পরিণত করিয়া নিজেদের পরিস্ফীতির অনুভূতিতে মসগুল থাকেন। ইঁহারা নামেই সন্ন্যাসী, অন্তরে ঘোরতর বিষয়ী। মঠ, মন্দির, আশ্রম-প্রতিষ্ঠার নামে বিষয় চিন্তায় ইঁহারা সতত ব্যাকুল। শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি—বিশেষভাবে ধনী, মানী প্রভৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত করিবার দিকেই ইঁহাদের সদাসর্ব্বদা দৃষ্টি। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"অহঙ্কার-দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে,
অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে।"

কিন্তু একদিন জানিতেই হয়। এই শ্রেণীর তথাকথিত ধার্ম্মিকের দল দেখাইতে চাহেন যে, শাস্ত্রনিষ্ঠা তাঁহাদেরই একান্ত এবং একচেটিয়া বস্তু। ইঁহারা নিজেদের সত্যযুগের মুনি-ঋষি বলিয়া মনে করেন, এমন কি ইঁহারা নিজেরা ভগবানের অবতার এমন কথা প্রচারের অভিসন্ধিও ইঁহাদের প্রতিবেশে এবং ইঁহাদেরই কৌশলে প্রশ্রয় পায়। হিন্দুর শাস্ত্র যুগোচিত ধর্ম্মকে স্বীকার করে। পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপযোগী বীর্য্য হিন্দুধর্ম্মের আছে এবং এজন্যই সে ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া জাতি-বর্ণের আভিজাত্যের প্রতিবেশে নিজেদের সুবিধা ষোল আনা লুফিয়া লইব, অপরে মরুক বা বাঁচুক, ইঁহাদের এইরূপ মনোবৃত্তি

মনুষ্যত্বের বিরোধী। এই শ্রেণীর লোকের এমন ভ্রান্ত শাস্ত্রনিষ্ঠার আঘাতে সমাজ-জীবন প্রতিনিয়ত আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। শাস্ত্রের বুলি আওড়াইয়া ইঁহারা নিজেদের পদ, মান ও মর্য্যাদা পাকা করিয়া লইয়া থাকেন কিন্তু মানুষকে মর্য্যাদা হইতে বঞ্চনা করিতে ইঁহারা সতত প্রযত্নপরায়ণ। শ্রীভগবান এই শ্রেণীর লোকদিগকে দ্বেষকারী, হিংস্র এবং নরাধম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহাদের কার্য্য শাস্ত্র-বিধিবহির্ভূত ইহা সুস্পষ্ট করাই এক্ষেত্রে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং তেমন কর্ম্ম মানব-মর্য্যাদার বিরোধী হইতে পারে না। ধর্ম্মের নামে মানবতা-বিরোধী এবম্বিধ স্বার্থভীরু অনুদার অনাচারের বিরুদ্ধে গীতার দেবতার বচনে বজ্রানল উদ্‌গীরিত হইয়াছে। সে আগুনের তাপ আমরা সমগ্র অন্তর দিয়া অনুভব করিতে পারি কি? নহিলে গীতার কথা, ধর্ম্মের কথা, ঋষি-প্রণিহিত শাস্ত্রের কথা বলিবার কোন অধিকারই আমাদের নাই। গীতোক্ত মানবতামূলক সার্ব্বভৌম সত্যকে মর্য্যাদা দান করিতে যদি আমাদের চিত্তবৃত্তি আগ্নেয় বীর্য্যে উদ্দীপিত না হয় এবং ধর্ম্মের নামে মানুষকে অবজ্ঞা করিবার মত ঔদ্ধত্যে আমরা অন্ধ হই তবে কার্য্যতঃ গীতার দেবতার প্রতিই আমাদের অসূয়া প্রদর্শিত হইবে। তিনি মানুষের দেহ লইয়াই আসিয়াছিলেন। মানুষের জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। মানুষের মাহাত্ম্যই তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। এমন মানুষটিকে যদি আমরা মনে স্থান না দেই তবে আমরা নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর, তবে বলিতেই হয় যে আমরা হৃদয়হীন এবং আমরা আসুরিক প্রকৃতি-সম্পন্ন। আমাদের তেমন অপরাধের ক্ষমা মিলিবে না। অসূয়াবশে আমরা আসুরী প্রকৃতিতে অভিভূত হইব। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এ সম্বন্ধে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উক্তি ভাগবতেরই প্রতিধ্বনি—

'সর্ব্বভূতে শ্রীবিষ্ণু আছেন ইহা না জানিয়া
বিষ্ণু পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া।

এক হাত দিয়া বিপ্র চরণ পাখালে
আর হাতে ঢিল মারে মাথা ও কপালে
এ সব লোকের কি কল্যাণ কোন দিনে
হইয়াছে—হইবেক ভাবি দেখ মনে।'

রূপে রূপে তিনি, সব রূপেই তিনি। শ্রুতি বলেন—

'একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।'

(গোপালতাপনী-১।৫)

নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। সব রূপে তাঁহাকে নমস্কার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি।' (চৈঃ চঃ)

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ

১। ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

২। তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

৩। সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ॥
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

৪। যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে আপনা জানান,
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।"

শাস্ত্র-নিষ্ঠা ব্যতীত ভগবৎ-কৃপায় অধিকারী হওয়া যায় না। প্রভু সর্ব্বভাবেই এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন কলির অবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে প্রভু বলেন—

"সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র-পরমাণ,
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান।"

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের উপসংহার-ভাগে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এই নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন যে শাস্ত্রবিধি অনুসারে মানুষ যদি নিজের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত না করে তবে স্বভাবতঃ কামাসক্তচিত্তে তাহারা যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় লইবে। তাহার ফলে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাজনিত দুর্গতির পথে তাহারা নিজেরাই নিজেদের সর্ব্বনাশের কারণ সৃষ্টি করিবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে শাস্ত্রসমূহকে আশ্রয় করিয়াই বৈজ্ঞানিক পথে জীবনকে উন্নয়ন করা সম্ভব হইতে পারে। শাস্ত্রবিধির প্রতি মর্য্যাদাবোধবিহীন হইলে অধ্যাত্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করা ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা তো যায়ই না পরন্তু ঐহিক জীবনেও সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনের প্রতি শ্রীভগবান্ স্বয়ং এইরূপ গুরুত্ব আরোপ করার পরমুহূর্ত্তেই সপ্তদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের মুখে আমরা যে প্রশ্নটি শুনিতে পাই, তাহাতে আমরা বিস্ময়ের মধ্যে পতিত হই। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই অর্জ্জুনের প্রশ্ন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়াছেন অথচ শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরারাধনা করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার,—সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানী তাঁহারা শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘন করিলে তাঁহাদের

কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় ভগবান্ ষোড়শ অধ্যায়ে সে কথা সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, যাঁহারা শাস্ত্রবঞ্চিত তাঁহাদের কি ভগবদারাধনার কোন অধিকার নাই? ভগবান কি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা হাতে লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং দণ্ডবিধি অনুসারে না চলিলে তাঁহার কাছে কি কোনরূপ মার্জ্জনা মিলে না? যদি তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ এইরূপই হয়, তবে তিনি করুণাময়, প্রেমময়, তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই সব উক্তি নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। গীতায় শ্রীভগবানের নিত্য কারুণ্যময় স্নেহময় স্বরূপটিই উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি দণ্ডদাতা ভগবান্ হইয়া বসেন নাই কিংবা নিজের স্বাম্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। গীতার ভগবান্ সকলের প্রিয়তম, তিনি সকলের আত্মা। ভাগবত বলেন—'স বৈ প্রিয়তম আত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি ইতি বেদ যো বৈ বিদ্বান্'—অর্থাৎ ভগবান সকলের প্রিয়তম, তিনিই আত্মা ইহা যিনি অবগত হইয়াছেন তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। ভগবৎ-তত্ত্বে অণুমাত্রও ভীতির অবসর গীতা রাখেন নাই। গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন, শূদ্র, স্ত্রী ও বৈশ্য এমন কি যাহারা পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ অন্ত্যজ প্রভৃতি যেই হউক, যদি আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহারাও নিশ্চয়ই পরম গতি প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভগবান এখানে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুইটি বর্ণকে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু কেন, তাঁহাদের পক্ষে কি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না? এই প্রশ্নের উত্তর নবম অধ্যায়ের ৩৩শ সংখ্যক শ্লোকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভগবন্নির্দ্দেশের পরবর্ত্তী শ্লোকে রহিয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন—পুণ্যশাল ব্রাহ্মণ, ভক্ত এবং রাজর্ষিগণ তাঁহাদের অথবা ভক্ত রাজর্ষিগণের আর কথা কি? অনিত্য সুখহীন মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যদেহ যখন লাভ করিয়াছ আমার ভজনা কর। এক্ষেত্রে ভজনের আজ্ঞাই বলবৎ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা পুণ্যাত্মা এমন ব্রাহ্মণ এবং যাঁহারা রাজর্ষি এমন ক্ষত্রিয় তাঁহাদিগকেই বিশেষ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা

হইয়াছে। তাঁহারা ভগবৎ-ভজনে প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়াই—অন্য বিচারে নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর নিকট বলিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।" (চৈঃ চঃ)

অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতে স্বভাবতঃই মনে হয়, যাহারা শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধসমূহ অবগত নহেন, অথবা তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ অথচ শ্রীভগবানে শ্রদ্ধাবুদ্ধিবিশিষ্ট অর্জ্জুন এ ক্ষেত্রে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে তাঁহাদের সম্বন্ধেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের নিষ্ঠারই প্রকৃতি জানিতে চাহিয়াছেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ফলকামনাহীন শ্রদ্ধাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। চিত্তের কি এমন অবস্থা হইতে পারে না যেখানে শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠাবুদ্ধির প্রগাঢ়তায় আমাদের চিত্ত শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা লাভ করিতে পারে এবং ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধটি ফলকামনাবিহীন স্বাভাবিক হইয়া উঠে—সেজন্য কোন শাস্ত্রে যুক্তিই অবলম্বন করিতে হয় না কিংবা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে ভগবানের সাধন-প্রবৃত্তি প্রণোদিত হওয়াতে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করাই আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়ে? শ্রীভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥'

এস্থলে শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনের বাধ্য-বাধকতা আরোপিত হয় নাই। ভগবানের ভজনে তদ্গতচিত্ত যিনি তিনিই শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত-প্রস্তাবে এখানে শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎভাবে ভজনের প্রবৃত্তিকে আত্যন্তিক শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। এই শ্রদ্ধাটি কেমন বস্তু এবং এ বস্তুটি আমাদের পক্ষে লভ্য হয় কি ভাবে? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—'সা চ ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিভিরেব কৃতার্থী ভবিষ্যামীতি, ন

তু কর্ম্মজ্ঞানাদিভিরিতি দৃঢ়ৈবাস্তিক্যলক্ষণৈব তাদৃশ শুদ্ধ-ভক্ত-সঙ্গোদ্ভূতৈব জ্ঞেয়া।' অর্থাৎ এ স্থলে শ্রদ্ধা শব্দে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিতেই আমি কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব, কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা পারিব না শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভের ফলে উদ্ভূত এইরূপ দৃঢ়া আস্তিক্য-লক্ষণা শ্রদ্ধাই এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট। গীতার এই সব ভগবদুক্তিতে অর্জ্জুনের চিত্তে শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপার সম্বন্ধে একটি একান্ত আশ্বস্তির ভাব উদ্রিক্ত হয়। সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নে তিনি সেইটির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আগ্রহবান হন, ইহাই মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই পরম আশ্রয়। তিনিই পরতত্ত্ব। এই সত্য সম্বন্ধে জীবকে সচেতন করাই শাস্ত্রবিধি সমূহের উদ্দেশ্য। ভগবান বলিয়াছেন, অন্য দেবতার উপাসকগণ অল্পবুদ্ধি; এ জন্য মূল পুরুষ ও পরম ফলদাতা আমাকে ত্যাগ করিয়া তাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে। কিন্তু দেবতাগণের কামীর কামনা পূরণ করিবার শক্তি নাই। অজ্ঞতাবশতঃ কামনাপূর্ত্তির জন্য দেবতার শরণাপন্ন হইলেও ভগবানই সেই সেই দেবতার দ্বারা পরোক্ষে সেই সেই কামনা পূর্ণ করেন। শাস্ত্রনিষ্ঠায় আমাদের এই ভ্রান্তি নিরাকৃত হয়। বস্তুতঃ শাস্ত্রবিধির দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ই আমরা অধিগত হইতে পারি কিন্তু ভগবানকে আমরা পাই না। কারণ শাস্ত্রবিধি উপেয় নহে, তাহা উপায় মাত্র। ফলতঃ উপেয়স্বরূপে শ্রীভগবানকে উপলব্ধি না করা পর্য্যন্তই শাস্ত্রবিধিসমূহ প্রতিপালনের কর্ত্তব্যবোধ আমাদের চিত্তে সক্রিয় থাকে। উপেয়স্বরূপে ভগবানকে পাইলে সাধনাঙ্গরূপ উপায়ের বিচার প্রত্যক্ষানুভূতির ফলে বিলুপ্ত হয় এবং আত্মতত্ত্বটি তখন অব্যবহিতভাবে স্বতঃ-প্রকাশের মাধুর্য্যে আমাদের অহঙ্কারগর্ভ অবীর্য্যকে দূরীভূত করে। ফলতঃ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবৎ-ভজনে এইরূপে চিত্তবৃত্তি জাগ্রত হইবার পরও শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনের খুঁটিনাটি পরিপাটি করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে ভগবৎ-ভজনেই অন্তরায় উপস্থিত হয়।

ভাগবত বলেন—

'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥'

(ভাঃ-১।২।৮)

অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ ও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি হরিকথায় রতি উৎপাদিত না হয় তবে তাহা শুধু বৃথা শ্রমস্বীকারেরই কারণ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে শ্রবণাদি সাধনার পথে ভগবৎ-কৃপা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে যে পর্য্যন্ত আমরা অনুভব না করি, সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্রের বিধান কার্য্যকর হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষানুভূতির রাজ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের মাধুর্য্য-বীর্য্য শ্রীভগবানের একান্ত আনুগত্যে দিব্যজীবনে সাধককে স্বাভাবিক ভাবে উদ্দীপিত করে। সে অবস্থায় শাস্ত্রবিধি-প্রতিপালনগত কৃত্যের ঊর্দ্ধে জীবের চিত্তবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈধীভক্তি এইরূপে চিত্তের বিশুদ্ধি সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎ-রূপে ভগবৎ-সম্বন্ধের উপলব্ধিতে রাগানুগা বা প্রেমভক্তির স্তরে জীবকে পৌছাইয়া দেয় এবং এই দেওয়াতেই তাহার কৃত্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শাস্ত্রানুযায়ী বৈধীভক্তির প্রশ্ন উঠিলেই সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের বিচারও আসিয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার,
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।' (চৈঃ চঃ)

এই বিচারের সীমা কোন পর্য্যন্ত? কোন অবস্থাকে বলিব কৃষ্ণ-ভজন যেখানে জাতিকুলাদির বিচার নাই? বস্তুতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদির অধিকারভেদে বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে জাতিকুলের বিচার বিশেষ ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণভজন বস্তুটি অধিকারের বিচারে মিলে না। প্রত্যুত অধিকারের বিচার ভুলিয়া কৃপাকে স্বীকারে ভগবৎ-প্রেম আমাদের চিত্তে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে উপজাত হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অবলম্বনে কর্ত্তব্য সাধনের পথে প্রণোদিত করেন। বর্ণাশ্রম-বিধি

পালনের সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য বস্তু কিন্তু ভগবৎ-প্রেমরূপে বিবেচিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলেন—যুদ্ধের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অপর কিছু নাই। সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিলে রাজ্য এবং যুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গ-সুখ লাভ হইবে। সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট বস্তুটি এখানে পাওয়া গেল। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের ফল ইহকালের সুখ এবং পরকালে স্বর্গাদি ভোগ। এ সবই অনিত্য বস্তু। জীব চিৎ-তত্ত্ব, সুতরাং স্বর্গ-সুখাদি রূপ জড় ধর্ম্মাত্মক অনিত্য বস্তু তাহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম হইতে পারে না। জীবের লক্ষ্য এই স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম লাভ হয় কৃষ্ণ ভজনে। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব এ সম্বন্ধে সচেতন নয়, এই জন্যই ভগবৎ-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জীবকে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস-রূপ শ্রদ্ধা অবলম্বনে করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। শাস্ত্রানুসারে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভগবৎ-ভজনে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। 'পরমার্থে ঈশ্বরের কেহো ভিন্ন নয়'—(চৈঃ ভাঃ)। পদ্মপুরাণে দেখা যায় বশিষ্ঠদেব দিলীপকে বলিয়াছেন—"শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌনৃমাত্রস্যাধিকারিতা।" কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—"অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ" অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রে অন্ত্যজেরাও বৈষ্ণব দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-ভজনে এই শ্রদ্ধা অন্তরে জাগ্রত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নতুবা জীবনে পরম পুরুষার্থ লাভে সাধারণ শ্রদ্ধার বিশেষ কেন, কোন মূল্যই নাই। প্রত্যুত অনেক স্থলে এইরূপ শ্রদ্ধা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী লোকাচার বা দেশাচারজনিত চিত্তের সংস্কারমাত্র, তাহা মানবতাবিরোধী সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মে প্রবৃত্তিস্বরূপে শ্রদ্ধা সকলেরই আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, 'শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ।' বস্তুতঃ আমাদের অহঙ্কার মূলে শ্রদ্ধাই উপাদান স্বরূপে কাজ করে। শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বাঁচিয়া থাকি। শ্রদ্ধা ভগবানের দান। আমাদের জীবনের মূলে তাহা সত্যকাঙ্ক্ষ

আশ্রয়। ভগবানের নিকট হইতে জীবনের মূলীভূত দানরূপে সংস্থানটি আমরা বুঝিয়া পাইলে সত্যে আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব আমরা। বিভিন্নরূপে ভগবানের দানই যে আমাদের জীবনের সংস্থান ইহা উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা অহঙ্কারবশতঃ দেহ এবং দেহসম্পর্কিত সুখভোগ যাহাদের নিকট হইতে পাই, তাহাদের দানকেই স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং সত্য বস্তুতে শ্রদ্ধা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। নিজেদের সুখভোগের সুবিধা আমরা কোথায় কতখানি পাইতেছি সেই বিচারেই আমরা অপরের দানকে মূল্য দিই। সেইখানেই জড়াইয়া দিই আমরা শ্রদ্ধাকে। ইহার ফলে আমরা বিড়ম্বনায় পড়ি। 'শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় প্রত্যয়'—এই বিশ্বাস বা প্রত্যয়টি কি বস্তু? শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখেই উত্তর মিলিয়াছে—'কৃষ্ণভক্তি হৈতে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়'—এমন বিশ্বাস, এই প্রত্যয়। এই প্রত্যয়টি আমাদের মিলিয়াছে কি? কৃষ্ণভক্তি হইলেই যে আমাদের জীবনের প্রয়োজন মূলে সমস্ত কর্ম্মের সিদ্ধি হয় ইহা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি কি? আমরা কি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভগবানই আমাদের জন্য সমস্ত কর্ম্ম করিতেছেন। বিশ্বের কর্ম্মে কর্ম্মে চলিতেছে তাঁহারই লীলা? তাঁহার এই লীলায় আত্মনিবেদন করাই আমাদের ধর্ম্ম, ইহা কি আমরা বুঝিয়াছি? পুত্রস্বরূপে, মিত্রস্বরূপে যিনি আমাদের জীবনের মূলে সংস্থান দিতেছেন, মুচি-মেথররূপে, বিড়াল-কুকুররূপে আমাদের কাছে তিনিই তো আসিতেছেন। তাঁহার দানই আমাদের অভিমানের মূলে সমভাবেই রহিয়াছে। তাঁহার দিকে তাকাইয়া আমরা যদি তাঁহার এই কৃপার দানটি হাত পাতিয়া লই তবে সব দানই পূর্ণ। আর যদি সে দিকে না তাকাইয়া অহং-মমতাবশে আমরা অহঙ্কৃত হই তবে সব দানই অনিত্য এবং অসত্যে পরিণত হয়। ভগবান যত কিছু দিতেছেন সবই ভাল, নিজেদের কর্তৃত্বের মোহে তাঁহার এই দাতৃত্ব স্বীকার না করিয়া আমরা সর্ব্ববিধ বন্ধন এবং বিভীষিকার

মধ্যে গিয়া পড়ি। শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে এই অহঙ্কৃত ভাবটি আমাদের কাটিয়া যায় এবং আমাদের চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভ করে। যিনি জীবনের মূলে শ্রীভগবানের কৃপাকে নিত্য সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, সব দানই তাঁহার দান ইহা বুঝিয়াছেন—অনুভব করিয়াছেন সর্ব্বভাবে তাঁহারই কৃপা, তিনিই লাভ করিয়াছেন তাঁহার দানে আপনার মান। ভগবানের গৌরবে তাঁহার গর্ব্ব। তিনি স্বরূপ-ধর্ম্মে চিত্তের পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শাস্ত্র-বিধানের গণ্ডি তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার উপেয় যখন মিলিয়াছে তখন তাঁহার পক্ষে উপায়ের আর প্রয়োজন কোথায়? তিনি অধিকারী হইয়াছেন অব্যভিচারিণী ভক্তির—'যথা ব্রজগোপীকানাং।' শাস্ত্রবিধির ঊর্দ্ধে রাগানুগা এই ভক্তির সুর। রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ—এই স্বরূপ-লক্ষণ,
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ।'

অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিতে বা আন্তরধর্ম্মে সাধক এই অবস্থায় ভগবৎ-মাধুর্য্যের আস্বাদনে দুঃসহ তাপ উপলব্ধি করেন। বাহ্যে সাধক দেহে ভগবৎ-ভাবে তাঁহার সর্ব্বাবস্থায় আবিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থা সাধনাভিনিবেশজা নহে, ইহা প্রসাদজা অর্থাৎ ভগবানের প্রসাদে ইহা মিলে। নির্গুণা ভক্তির রীতি যেখানে পরিস্ফূর্ত্ত গুণ এবং গুণী সে ক্ষেত্রে অব্যবহিত মাধুর্য্য-বীর্য্যে সমীহিত। গুণের সঙ্গেই গুণীর অঙ্গাঙ্গী-ভাবে সেখানে সম্বন্ধ। শ্রীভগবান চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ লীলাবিগ্রহে সেখানে প্রমূর্ত্ত। তিনি প্রধান বা মায়া এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব এবং সত্ত্বাদি গুণেরও অধীশ্বর। তিনিই সংসার হইতে মুক্তি এবং বন্ধনেরও কারণ। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের প্রসাদে উপজাত এই শ্রদ্ধা বিশুদ্ধসত্ত্ব-সংশ্রিত। ভাগবতে শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—**'রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ। এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ।'** (ভাঃ-৭।১৫।২২) রজ এবং তমগুণকে সত্ত্বগুণের

দ্বারা জয়, সত্ত্বকে ভগবানে নৈষ্ঠিকীবুদ্ধি বা উপশমের দ্বারা জয় করিতে হয়। গুরুকৃপার সর্ব্বাত্মক অনুভূতিজনিত চিত্তের নিবৃত্তিই উপশম। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী উপশম বলিতে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি বুঝিয়াছেন—'পরব্রহ্ম-নিষ্ঠাতত্ত্বদ্যোতকমাহ।' গুরুভক্তির দ্বারা পুরুষ এই ভাবে গুণসমুদয়কে অনায়াসে ও যথার্থরূপে জয় করিতে সমর্থ হয়। সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতীক জ্ঞানদাতা গুরুর প্রতি 'ইনি মানব' এই অসৎবুদ্ধি যদি থাকে তবে শাস্ত্রানুযায়ী সাধনা সব হস্তিস্নানের ন্যায় বিফলতা প্রাপ্ত হয়।

ভগবান কপিল ভাগবতে জীবের স্বরূপধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া জননী দেবহুতির নিকট বলিয়াছেন—

"চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে।
অহং মমতাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্।
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্।
জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চহতৌজসম্।"

চিত্তই জীবের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ। গুণময় বিষয়ের সহিত যুক্ত হইলে জীব বন্ধনগ্রস্ত হয়। চিত্তে ভগবন্নিষ্ঠা লাভ হইলে জীবের মুক্তি ঘটে। 'আমি' 'আমার' অভিমানজনিত চিত্তমল দূরীভূত হইলেই জীবের মন শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ভগবানের কৃপাশক্তি। নির্ম্মলচিত্তে বিশুদ্ধ-সত্ত্বের প্রতিফলনে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবৎ-লীলার স্ফুরণ ঘটে। জীব তখন তাহার সনাতন আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বিষয়াসক্ত সাংসারিক জীবের বৈধী ভক্তির পথে চিত্তের এইভাবে পরিশোধনের দ্বারা শাস্ত্রানুমোদিত

পথে অধ্যাত্মতত্ত্বে ক্রমোন্নতির উপায়ই বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।' উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুযায়ী অধিকারী ত্রিবিধ। প্রভুর উক্তি অনুসারে—

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।"

শাস্ত্রযুক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধার ফলে যিনি ভজননৈপুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই উত্তম অধিকারী। আচার্য্যস্বরূপে সংসারী জীবকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই আছে।

'শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান,
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান।'

যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে এবং শাস্ত্রসম্মত যুক্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন, অথচ শাস্ত্রে দৃঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তিনি ভক্তি বিষয়ে মধ্যম অধিকারী, তিনিও ভাগ্যবান্। কালক্রমে তিনিও উত্তম অধিকার লাভ করিবেন।

'যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন
ক্রমে ক্রমে তিহোঁ ভক্ত হইবে উত্তম।'

শাস্ত্রে যাঁহার নিপুণতা নাই, অধিকন্তু শাস্ত্র-বিরোধীদের যুক্তিতর্কে যাহার বুদ্ধি সহজেই বিচলিত হয় তিনি ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকারী। সুতরাং দেখা যাইতেছে তিন শ্রেণীর অধিকার লাভ করাই শাস্ত্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। শ্রীভগবান পরম কৃপাশীল। তাঁহারই ইচ্ছায় সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকতা প্রধান এই তিন গুণযুক্ত বা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জীবের জন্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই শাস্ত্র-বিধি যাহারা লঙ্ঘন করে তাহারা জ্ঞানপাপী। যাহারা শাস্ত্রবিধি জানেন না, সুতরাং কামোপভোগ প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ, তাহারা এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে ইহা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনকারীদের ন্যায় তাহারা

আসুরিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন উন্মার্গগামী হয় না। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তদুপযোগী উপায় বা সাধনের বিধান শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকারী-ভেদে সকলের ক্রমোন্নতি সাধন এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য। জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে শাস্ত্রের আশ্রয় লাভে সকলেরই অধিকার আছে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরাজ উদ্ধবের নিকট বলেন, ব্রহ্মকল্পের আদিতে ও কল্পান্তে অন্তর্হিত ব্রহ্মাকে আমি পুনরায় উপদেশ করি। ব্রহ্মা হইতে পরম্পরাক্রমে তাহা বিভিন্ন যুগে শাস্ত্রবিধিরূপে প্রচলিত হয়। জীবে রজস্তমোগুণসম্ভূত বিবিধ বাসনা বা স্বভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব তাহাদের রুচি ও স্বভাব অনুসারে তাহাদের নিকট মৎস্বরূপভূত বেদোক্ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা নানাভাবে প্রকাশিত হয়। এইরূপে জীবের চিত্তে বাসনাভেদে বা রুচিভেদে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। কেহ বা গুরুর উপদেশ পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন মতবাদগ্রস্ত এবং অন্যান্য কতকগুলি ব্যক্তি অতিশয় তমঃ-প্রকৃতিসম্পন্ন। ইহারা বেদ বিরুদ্ধ-মত গ্রস্ত হয়। মনুষ্যগণ আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম বা রুচি অনুসারে নানা প্রকার সাধন ও পুরুষার্থ লাভের পথে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনের পথে একমাত্র সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব বেদবাণীতে সাক্ষাৎভাবে আমিই বলিয়াছি এবং তাহাই মৎস্বরূপভূত ধর্ম্ম। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সাধনার ফলে জীবের চিত্ত যতই নির্ম্মলতা লাভ করে, নিজের ইচ্ছাপ্রবৃত্তি এবং দেহাত্মবুদ্ধি হইতে উপজাত মোহের মূলে ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রভাবটি সে যতই অনুভব করে, ততই সে গুণের বন্ধনকে অতিক্রম করে। এই ভাবে অন্তরে সর্ব্বাত্মময় দেবতার প্রতি প্রীতির অনুভূতি লাভে বিভিন্ন দেবতার উপাসনার কামাত্মক চেতনা হইতে জীব মুক্ত হয় এবং তাহার মর্ত্ত্য-জীবনের রূপান্তর ঘটে। জীবের জীবনে, তাঁহার আহার-বিহারে, যজ্ঞ-তপস্যায় ফলাকাঙ্ক্ষা তখন আর থাকে না। ক্রমে ঈশ্বরোপাসনাই তাহার জীবনের মুখ্য লক্ষ্যে পরিণত হয়। পরিশেষে বিভিন্ন দেবতার উপাসনায় বিশ্লিষ্ট এই শ্রদ্ধাই জীবকে সৎভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কথায় ভগবদ্ভাবনিষ্ঠ

গুণাতীত বা নিগুর্ণা ভক্তিকে পরিনিষ্ঠিত করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণ গুণ-জ্ঞান
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ।"

প্রকৃতপক্ষে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধাই মায়িক গুণের সহিত সম্পর্কযুক্ত। শ্রীভগবান্ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্ম-শ্রদ্ধা তু রাজসী
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নিগুর্ণা।"

(ভাঃ-১১।২৫।২৭)

অধ্যাত্মবিষয়ক অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে বিশ্বাস হইতে উপজাত যে শ্রদ্ধা তাহাই সাত্ত্বিকী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা রাজসী। অধর্ম্ম বা পরধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা শুধু ভগবানের সেবাই চাহে। এই শ্রদ্ধা নিগুর্ণা। ভাগবতে ভগবান্ কপিলদেবও জননীর নিকট শ্রদ্ধার রুচিভেদে ভক্তির বিভেদ বর্ণনা করিয়াছেন—

"ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥"

(ভাঃ-৩।২৯।৭)

তিনি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ প্রভাবিত প্রকৃতির অনুযায়ী ভক্তিকে তামসী, রাজসী এবং সাত্ত্বিকী এই তিন ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহারা হিংসা, ক্রোধ পরায়ণ, তাহারা তামস ভক্ত। যশ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কামী যাহারা তাহারা রাজস এবং যাহারা পাপক্ষয়হেতু বা শাস্ত্রনির্দ্দেশানুযায়ী পূজার্চ্চনা প্রভৃতি করে তাঁহারা সাত্ত্বিক ভক্ত। কিন্তু ভগবানকে লাভ করিতে হইলে গুণাতীত হইতে হয়। কামনা-বাসনাযুক্ত সাধনাই সগুণ সাধনা। সগুণ বা গুণময় স্বরূপের ভজনায় গুণময় ধন, জন, স্বর্গ, সুখভোগাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গুণাতীত

অবস্থা লাভ করা যায় না। মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ লক্ষ্মীপতি, তাঁহার আরাধনাকারীগণ, লক্ষ্মী বা সম্পদের অধিকারী হন না কেন? উত্তরে শুকদেব বলেন—

'যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখ-দুঃখিতম্।
স যদা বিতথোদ্যোগো নির্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্।
তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে।'

(ভাঃ-১০।৮৮।৮)

শ্রীহরি নির্গুণ বা গুণাতীত তত্ত্ব, সুতরাং তাঁহার ভজনে অনিত্য ভোগ-সুখ মিলে না। পক্ষান্তরে যাঁহারা তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারা যাহাতে একান্তচিত্তে তাঁহার ভজনা করিতে পারেন, এজন্য শ্রীহরি তাঁহাদের ধন-সম্পদ প্রভৃতি কাম্যবস্তু হরণ করেন। যাঁহারা সুখভোগের জন্য দেবতাগণের ভজনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ধন-সম্পদ লাভ করিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইয়া পড়েন এবং পরে নিজেদের উপাস্য দেবতাদের কথাও বিস্মৃত হন এবং তাঁহাদেরই অবজ্ঞা করেন। কিন্তু কৃষ্ণ ভজনে এ ভয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনকে উপদেশকালে বলেন—

"কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে, মাগে বিষয় সুখ
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ।
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব,
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।"

'গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি', 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন'— ইহাই গীতার নির্দ্দেশ। কৃষ্ণভক্তি নির্গুণা। প্রত্যুত কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেমলাভেই জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই সত্যটি যেখানে

অস্বীকৃত বা অনাদৃত সেখানেই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘিত হয়। তাহার ফলে স্বেচ্ছাচারজনিত আসুরিক কামোপভোগ-প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র প্রশ্রয় লাভ করে। এই প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে জীবকে মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপধর্ম্মগত দৈবীসম্পদে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব এবং সকলের অন্তরাত্মা হইয়াও লোকানুগ্রহের জন্য মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করিয়া থাকি। জীবের প্রতি আমার অনুগ্রহের মূলগত আত্ম-সম্বন্ধটি না জানিয়া যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে তাহারা রাক্ষসী এবং আসুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "বেদৈশ্চ সর্ব্বরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং"—দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগের পথে ত্রিবিধা শ্রদ্ধার বিশ্লেষণ করিয়া ভগবান্ ষোড়শ অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রদ্ধাবুদ্ধিহীন যাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনকারী তাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন—তাহাদের ইহলোকে সুখ মিলে না, পরকালেও শান্তি তাহাদের লভ্য হয় না। কিন্তু শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনের অন্ধসংস্কারগত সঙ্কীর্ণতা অন্তরে লইয়া যাঁহারা শ্রদ্ধা-বুদ্ধিবিহীন ভাবে যজ্ঞ-তপস্যাদি বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের কর্ম্মও ভগবান কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে, নিন্দিত হইয়াছে সমধিকভাবে। বস্তুতঃ কর্ম্মের মূলে শ্রদ্ধা প্রথমে আবশ্যক—'আদৌ শ্রদ্ধা'—কিন্তু সেই শ্রদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিমূলক ভজন-ক্রিয়ার উদ্দীপক হওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট—

'চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে
স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে।" (চৈঃ চঃ)

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দ্বারা ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য বস্তু লাভ হয়। কিন্তু জীবের অন্তরে ভোগের এই আকর্ষণ যতদিন বিদ্যমান থাকে, তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। 'কামাত্মনঃ স্বর্গপরা' প্রভৃতি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত ভগবদুক্তিই এক্ষেত্রে প্রমাণ। শ্রুতি ও বলিয়াছেন—'বর্ণাদিধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা

ভবন্তি'—মৈত্রেয় উপনিষৎ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবানকে উপেয়স্বরূপে অবলম্বন করিতে হইবে। তবেই তৃপ্তি, তবেই নিবৃত্তি, তবেই স্বরূপানুবন্ধী আনন্দময় সত্তায় জীবের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এতদ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়। প্রত্যুত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগের মূলে আমাদের অন্তরে ভগবৎ-ভজনের আত্যন্তিকী লালসা জাগ্রত থাকা প্রয়োজন। ভগবানের লীলাকথা শ্রবণের আগ্রহ হইতে এই লালসা সাক্ষাৎস্বরূপে এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের অন্তরে জাগে। শ্রীভগবানের গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনে চিত্তে আসক্তি জন্মিলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘিত হয় না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে উদ্দীপিত ভক্তিতে নিষ্ঠাবুদ্ধি জাগ্রত হইবার ফলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সম্পর্কিত কৃত্যের প্রতিপালনের মধ্যেই সাধকের জীবনের লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে না ইহা স্বাভাবিক, কারণ সে অবস্থায় ভক্তের চিত্তবৃত্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির পথে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শ্রীভগবানের ভজনানন্দেই নিমগ্ন থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—'লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যাপেক্ষা ন স্যাৎ, সত্যাঞ্চ তস্যাং লোভত্বস্যৈব অসিদ্ধেঃ' অর্থাৎ ভগবৎ-ভজনে চিত্তে লালসা বা লোভ জাগ্রত হইলে শাস্ত্রযুক্তির জন্য অপেক্ষা থাকে না। বাস্তবিকপক্ষে লোভ বা লালসার জন্য যেখানে শাস্ত্রযুক্তির প্রয়োজন সেখানে লোভই জাগে নাই বুঝিতে হয়। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বলেন—'শাস্ত্রবিদ্ভির্হি বহিঃসুখপ্রাপ্তিদুঃখহানী এব পুরুষার্থত্বেন নির্ণীতে। তে চ—তাদৃশ্ ভক্তানাং বহিরেব তৈর্জ্জ্ঞায়তে নান্তঃ। তেষামন্তস্তু সুখ-দুঃখে ভগবৎপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিকৃতে এব।' অর্থাৎ শাস্ত্র-বিচারকারিগণ বাহিরের সুখ এবং দুঃখহানিকেই পুরুষার্থ মনে করেন। সেই বিচারের দ্বারা ভজনানন্দী ভক্তের বাহিরের আচরণই তাঁহাদের লক্ষ্যে পড়ে, অন্তরের ভাবটি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভগবানকে প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতেই তেমন ভক্তের সুখ-দুঃখের কারণ ঘটে। এই অবস্থায় শাস্ত্রোপদিষ্ট পরম বস্তু ভগবৎ-সেবাই সাধকের জীবনে সার্থকতা লাভ করে। অন্য

কৃত্যের তখন লয় সাধিত হয়। শাস্ত্রবিধির ঊর্দ্ধে ভগবৎ-প্রেমের এমন পারিপাট্য শাস্ত্রযুক্তির গণ্ডী অতিক্রম না করিলে উপলব্ধি করা যায় না। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর অনুবাদক শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিবল্লীর কবি শ্রীমৎ রসময় দাস বলেন, এই প্রেম—

'শাস্ত্রজ্ঞ জনেতে ইহা না জন্মে কখন,
সাধক জানয়ে ইহা না জানে অন্য জন।'

শ্রীমৎ রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাকালে রায় প্রথমে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনকে সাধ্যবস্তু সাধনের পন্থাস্বরূপে উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রভু তাহা অস্বীকার করেন, বলেন 'এহ বাহ্য'। তদ্রূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনকারীদের চিত্তে ভগবৎ-ভজনের আকাঙ্ক্ষা না থাকিতে পারে এই আশঙ্কাই প্রভুর অস্বীকৃতির কারণ। অতঃপর শ্রীমৎ রামানন্দ 'স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার' বলিলেও প্রভুর পুনরায় সেই একই উক্তি—'এহ বাহ্য আগে কহ আর।' সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মত্যাগ বা স্বধর্ম্মত্যাগও ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ নয়, প্রভুর ইঙ্গিতটি এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। ফলতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম-ত্যাগের ক্ষেত্রেও অধিকারের বিচার আছে। শাস্ত্রের বিধান—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এ সম্বন্ধে বলেন—'তথা আকস্মিক-মহৎকৃপা-জনিতা শ্রদ্ধা বা যাবদিতি শ্রদ্ধাতঃ পূর্ব্বমেব কর্ম্মাধিকারঃ। শ্রদ্ধায়াং জাতায়াং তু ভক্তাবেব কেবলায়ামধিকারো, ন কর্ম্মাণীতি ভাবঃ।' অর্থাৎ মহৎ-কৃপার ফলে শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক কেবলা ভক্তিতে অধিকার জন্মে, তৎপূর্ব্বে নহে। কিন্তু মহৎ-কৃপা দুর্ল্লভ বস্তু। ভাগবতে বিদুর মৈত্রেয়কে কহিলেন—

'দুরাপাহ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।' (৩।৭।১০)

অর্থাৎ যাঁহারা নিত্য দেবদেব জনার্দ্দনের গুণ কীর্ত্তন করেন সেই

সব বৈকুণ্ঠ-পথগামী সাধুগণের সঙ্গ লাভ বহু তপস্যার ফলেই সম্ভব হইয়া থাকে। চরিতামৃত বলেন—

'সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে।
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়
সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়।'

আমরা সংসারী বদ্ধ জীব। আমাদের পক্ষে এই ভাগ্য কবে লাভ হইবে এবং এ জীবনে আদৌ লাভ হইবে কি না কে জানে? সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থার মধ্যে এই শ্রদ্ধালাভের উপায় কি নাই? আছে। 'সর্ব্বেঽধিকারিণোহ্যত্র হরিভক্তৌ'—পদ্মপুরাণে নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে হরিভক্তিতে সাধারণ মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। গীতার দেবতা সকলের পক্ষে বেদবিধি লঙ্ঘন না করিয়াও সর্ব্বাবস্থার মধ্যে অর্থাৎ কি সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক সকল প্রকৃতির জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কৃষ্ণভজনের উপযোগী শ্রদ্ধা কিরূপে লভ্য হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকলের পক্ষে শ্রদ্ধার বীর্য্যস্বরূপে তাঁহার পরম অনুগ্রহ-প্রাপ্তির উপায়টি তিনি পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং ভগবৎ-ভজনে নৈপুণ্য লাভের গূঢ় রহস্যটি তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি জীবকে একটি মহামন্ত্র শুনাইয়াছেন। সেই মন্ত্রবীর্য্যে চিত্তকে নিষ্ঠিত করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শাস্ত্রবিধির অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয় সম্বন্ধে অনপেক্ষভাবে আমাদের পরম প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে সাধনা ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রের তত্ত্বসারস্বরূপ এই মন্ত্র। এই মন্ত্র—'ওঁ তৎ সৎ'। ভগবৎ-কৃপাসূত্রে গ্রথিত এই গ্রন্থি কণ্ঠে হার করিয়া পরিলেই জীবের নিস্তার ঘটে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ভগবদুক্তিতে গুণাতীত ভক্তি লাভের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে সেই অধিকার লাভে জীবের পক্ষে উপায়টি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত এই ভক্তির অধিকারী হইতে হইলে সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের

মুখোচ্চারিত মন্ত্রার্থের উপলব্ধিতে আমাদের চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিতে হইবে। 'বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্' (শ্বেতা-৬।২২)। শাশ্বত ধর্ম্ম এবং পরব্রহ্মের স্বরূপভূত পরমতত্ত্বটি তবেই আমরা অধিগত হইতে সমর্থ হইব। যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি পরাভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই সব মহাত্মাদের পক্ষেই শ্রীভগবানের মুখোদ্গীরিত 'ওঁ তৎ সৎ' এই বেদ-মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবটি অনুভবযোগ্য হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।'

এই অনুভবটি কেমন ? ঠাকুরমহাশয়ের উক্তি—'বৈষ্ণবের পদরেণু ভূষণ করিয়া তনু যাহা হৈতে অনুভব হয়।' এমন যাঁহারা তাঁহাদের নিকটই মন্ত্রার্থের প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ মন্ত্রদেবতা স্বীয় তত্ত্বের সহিত স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজকে তাঁহাদের নিকট প্রকটিত করেন। এই প্রকট করা বা প্রকাশের অর্থ নিজের মাধুর্য্য-বীর্য্যে ভক্তকে বরণ করা। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিষয়টির গূঢ় তাৎপর্য্য এবং মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিব। এস্থলে বক্তব্য শুধু ইহাই যে এমন প্রকাশেই চিত্তে দৈবী প্রকৃতির উজ্জীবন অর্থাৎ 'কৃষ্ণ-ভক্তি হৈতে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়' এমন প্রত্যয় লাভ হয়। মন্ত্র কৃপাশক্তির প্রকাশে সাক্ষাৎসম্পর্কে মূর্ত্ত হয় নামে। নাম ছন্দোময় সম্বন্ধে বীজে মনকে মজায়। নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

'মহাত্মনস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।'

মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভূতের কারণ-স্বরূপে বা প্রভব বীর্য্যে অব্যয়তত্ত্ব স্বরূপে আমার অখণ্ড এবং অদ্বয় মাধুর্য্য-রসে ডুবিয়া আমাকে অনন্যচিত্তে ভজনা করেন। 'যেই ভজে সেই বড়'

—তিনিই মহাত্মা। কবিরাজ গোস্বামীর কৃপায় এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি পাইয়াছি—

'প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার।'

যিনি ভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভার গ্রহণ করেন। নামোচ্চারণের দ্বারা তিনি ভগবানকে জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের উক্তি—

'জিতন্তেন জিতন্তেন জিতন্তেনেতি নিশ্চিতম্
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।'

(শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর)

শ্রীভগবান্ এমন ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন। নামাশ্রিত ভক্তের সকল কৃত্য প্রতিপালনের দায়িত্ব তিনি নিজেই লইয়া থাকেন। সুতরাং শাস্ত্রবিধি পালনের কর্ত্তব্য হইতে তিনি মুক্ত হন। তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র অন্যত্র অর্জ্জুনের নিকট একথা বলিয়াছেন—

'তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন।'

গীতাতেও ভগবান সেই একই কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। আসুন, শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে আমরা তাঁহার অমৃতময় সেই বাণী আস্বাদন করি।

ওঁ তৎ সৎ

শাস্ত্রবিধিতে শ্রদ্ধার মূলে একটি ভাব কাজ করে। সব শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই ভাবটি আমাদের মনে জাগ্রত করা। প্রকৃতপক্ষে জীব-সাধারণের কর্ম্মকে ভগবৎ-কর্ম্মে বা যজ্ঞে পরিণত করাই বেদের একমাত্র লক্ষ্য। সপ্তদশ অধ্যায়ে বেদের কাম্য-কর্ম্মাংশবর্জ্জিত ভগবৎ-প্রাপ্তিতে সমুদ্দিষ্ট একমাত্র কর্ম্ম-সাধনায় শ্রীভগবান্ একটি সুনির্দ্দিষ্ট ক্রম প্রদান করিয়াছেন। গীতার এই ক্রমটি হইল ওঁ, তৎ এবং সৎ। গীতা বলেন, এই তিনটি একই ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ অর্থাৎ নাম এবং তিনটি নামে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ ওঁ শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, তৎ শব্দ দ্বারা বেদ এবং সৎ শব্দ দ্বারা যজ্ঞ অভিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহ ভগবানের এই তিনটি নাম অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে সার্থকতা লাভ করে। প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ক্রমের পরাক্রমে কৃপা-শক্তির প্রকাশ এবং বিলাসে অপরিচ্ছিন্নভাবে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনস্বরূপে আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্রে এই তিনের অদ্বয় চিন্ময় আনন্দের ছন্দে ভগবৎ-মাধুর্য্যের পূর্ণ এবং প্রজ্ঞানময় অভিব্যক্তি ঘটে। সে অবস্থায়—

'কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ।' (চৈঃ চঃ)

এই তত্ত্বকে আমরা জীবনে সত্য করিয়া পাই। ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়াত্মক ব্যক্ত ভাবটি ওঁ শব্দের মূল অর্থ। মাণ্ডুক্য শ্রুতি বলেন—'ওঁ মিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং। ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যস্ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব'। অর্থাৎ জগৎকারণরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বময় স্বরূপই ওঁ শব্দে উপলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ অক্ষরব্রহ্মের উপাসকগণ ওঁকার বা প্রণবের "এতদ্ধেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধেবাক্ষরং পরং" এইরূপ পরমতত্ত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্ বেদবীজং সনাতনং॥" প্রণব সমস্ত মন্ত্র ও উপনিষদযুক্ত বেদের কারণ এবং পরব্রহ্ম পরতত্ত্বস্বরূপ অবিকারী সনাতন সত্য। নির্ব্বিশেষবাদীগণের মতে মায়াতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বেদ-প্রতিপাদ্য সত্য। তাঁহাদের পক্ষে ওঁকারের এই সর্ব্ববীজত্ব উপেক্ষিত। ওঁকারের অবিকারী সনাতনতত্ত্বস্বরূপে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দরূপ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত তৎপরত্বে অপরিচ্ছিন্ন সম্মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষাৎবাচক নামকে মর্য্যাদা দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। ইহাদের মত বেদ-বিরোধী। শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্ব্বিশেষ মায়াবাদকে খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে ঔপনিষদিক তত্ত্বেরই প্রধানতঃ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বোপনিষদসার গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই প্রণব, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম—'বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ'। আমি জগতের মাতা, ধাতা এবং পিতামহও আমিই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যুক্তি এই যে, ঋক্ বেদের 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', সামবেদের 'তত্ত্বমসি', যজুর্ব্বেদের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং অথর্ব্ববেদের 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', এই চারিটি বাক্য বেদের এক একটি দেশ নির্দ্দেশ করে; পরন্তু সেগুলি সমগ্র বেদের বাচক নয়। সুতরাং এককভাবে এইগুলিকে মহাবাক্য বলা যায় না, ব্যক্তাব্যক্ত পর ও অপর সর্ব্বভাবে প্রণবস্বরূপে 'সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ।' কঠোপনিষদ শ্রুতিতে এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ওঁ ইত্যেতৎ'—(১।২।১৫)। বস্তুতঃ বেদান্তের মায়াবাদমূলক ভাষ্যে ব্রহ্মের শুধু অব্যক্ত ভাবটি গৃহীত হইয়াছে, ব্যক্ত ভাবটি গৃহীত হয় নাই। এতদ্বারা 'তস্য বাচক প্রণবঃ' ব্রহ্মসূত্রের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং বেদের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। 'ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং' পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত। কাশীধামে সন্ন্যাসীদের নিকট প্রভু প্রণবতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিধান
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম।

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ।'

বেদের একদেশ মাত্রায় নহে পরন্তু ওঁকারকে অমাত্র এবং অনন্তমাত্র এবং অদ্বৈত তত্ত্বে উপলব্ধি করিতে হইবে, ইহাই শ্রুতির নির্দ্দেশ। গীতায়ও এই উপলব্ধির ধারা আমরা পাইয়াছি। ওঁকার ও ব্রাহ্মণ, তৎ ও বেদ এবং সৎ ও যজ্ঞ—গীতায় শ্রীভগবান এই ত্রয়ীকে একার্থক অদ্বয় বস্তুস্বরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। একই সূত্রে গ্রন্থি দিয়া নামের তিনি মালা গাথিয়াছেন। এইভাবে নামাশ্রয়ে জীবকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবৎ-প্রেম লাভের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সহজ পথ তিনি দেখাইয়াছেন—'অদ্বয় চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।' এই তিনের অদ্বয় চিন্ময় ভাবটি কেমন? ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ আমারই তনু। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মের ব্যক্তাব্যক্ত ভাবটি ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়াই শ্রদ্ধার পথে আমাদের চিত্তে জাগিয়া উঠে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই ব্রাহ্মণ। ফলতঃ ভক্তে আমরা প্রত্যক্ষভাবে এবং সক্রিয়স্বরূপে ভগবৎ-ভাবটি পাই। মহাপ্রভু বলেন—'বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।' শ্রদ্ধার মূলে ধ্যান আমাদের চিত্তবৃত্তির উদ্দীপ্তি স্বরূপে কাজ করে। "শ্রৎ সত্ত্বং বা সত্যং ধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা।" শ্রদ্ধার আলোকে সত্যের প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশে বা প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে চিত্তের সংস্থিতিতে বীর্য্যই ধৃতি—এই ধৃতি অর্থাৎ উত্তম বস্তু প্রাপ্তিজনিত মনের পূর্ণতা আমাদের অন্তরে স্থৈর্য্য বিধান করে। উত্তম এমন বস্তুর প্রাপ্তিরই ক্রমস্বরূপে অভিসন্ধিবিহীন-ভাবে সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত পরিনিষ্ঠিত হয়। 'নিষ্ঠা হৈতে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।' ইহার ফলে তৎ বা সাধ্যতত্ত্বে আমাদের চিত্ত সাধুভাবে বা অসংশয়িত ভাবে আভিমুখ্য প্রাপ্ত হয়। আমরা পূর্ণস্বরূপে অভিধেয়টি পাই। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ-ভক্ত সঙ্গ করি কৃষ্ণ-ভক্ত অঙ্গ হেরি
সুধান্বিত শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান নববিধ মহাজ্ঞান
এই ভক্তি পরম কারণ॥'

"কৃষ্ণের যতেক গুণ ভক্তেতে সঞ্চরে"—ভক্তের আশ্রয়ে শ্রীভগবানের সহিত আমরা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আত্ম-সম্বন্ধ অনুভব করি। এই ভাবে আত্ম-সংস্পর্শ লাভে আমাদের কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তৎভাব প্রাপ্ত হয়। আমাদের চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ করাতে অব্যয় অমৃতের উৎসস্বরূপ ভগবৎ-প্রেমের ধ্রুব ধারা বা ব্রহ্মসূত্রটি আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। অন্য কথায় যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তাহাতে অভিনিবিষ্টতায় আমাদের মন তদ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কূটস্থ অন্তর্যামী হইলেন অক্ষর পুরুষ। তিনি পরম কৃপায় আমাদের অন্তরে অবরোধ স্বীকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি তখন গুরুরূপ কৃষ্ণের কৃপাতেই ব্যাপ্তিশীল দীপ্তিতে দিক্ ও দেশ আলো করিয়া জাগিয়া উঠেন। গুরুকৃপা এইভাবে অন্তরে বাহিরে সমভাবে শ্রীভগবানের দিব্য বিভূতির সহিত আমাদের চিত্তকে যুক্ত করে। স্বল্প সুখের মোহ ছাড়িয়া আমরা তখন অন্তরে বাহিরে অখণ্ডভাবে ভূমার স্বরূপটি আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ি। এই অবস্থায় আমাদের সমগ্র জীবন যজ্ঞে পরিণত হয়। আমাদের সব জুড়িয়া সৎস্বরূপে জাগেন ভগবান। আমরা অসতের ভোল হইতে মুক্ত হই। হম্ হইতে তুম্, তুম্ হইতে তখন হয় হোম। আমরা নিজদিগকে সর্ব্বভাবে সঁপিয়া দেই ভগবানের পায়। আমাদের মন নমঃনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপে অক্ষর বা কূটস্থ পুরুষ তৎ এবং সেই অক্ষর পুরুষই আবার ক্ষররূপে বহুভাবে বিভক্ত হন। এইরূপে বহুভাবে বিভক্ত হইয়াও তাঁহার অব্যয় সৎস্বরূপে তিনি অবিভক্ত থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ সাধক সর্ব্বানুস্যূত তাঁহার এই সদ্ভাবটি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মাত্রাতীত বা চিরমাত্র আত্মলীলারসে নিমগ্ন হন। ভাগবত বলেন—'সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদম্ আত্মতয়াত্মবিদঃ।' বিশ্বের সর্ব্বত্র সদ্ভাবেরই সে অবস্থায় মাখামাখি এবং নামরসে প্রেমে মগ্ন হইয়া তখন হয় চাখাচাখি।

'ওঁ', 'তৎ' এবং 'সৎ' এই তিনটিই ব্রহ্মের নাম। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ওঁ-কার এই একাক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁ-কার:

এই ব্রহ্ম-নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ ওঁ-কারকে আলম্বন-স্বরূপে সমাশ্রয় করিয়া বেদবিহিত সাধনাঙ্গের প্রবর্ত্তন বা অনুষ্ঠান সুরু হয়; নতুবা কোন কর্ম্মই বেদবিহিত হয় না। ওঁ-কার এই অর্থে ব্রহ্মবাচক। তৎ শব্দে ব্রহ্মের অভিমুখে চিত্তবৃত্তির গতি বা ক্রিয়া, অন্যকথায় ফলকামনা না রাখিয়া ঈশ্বরার্থে যজ্ঞ, তপঃ-কার্য্য বা দান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম ও তৎ শব্দ-বাচক। সৎ শব্দও ব্রহ্মবাচক, কারণ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে চিত্তের যে স্থিতি তাহা সৎ শব্দে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে কর্ম্মের মূলে তৎপরত্বভাবে গ্রহণ করিয়া যে কর্ম্ম তাহাই সৎ। বস্তুতঃ সর্ব্বা-বস্থার মধ্যে নিত্য সত্যের সঙ্গে যুক্তভাবটিই সদর্থে ব্যক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মই সত্য অন্য সবই মিথ্যা। 'ওঁ তৎ সৎ' এইটি বাক্য নয়—মন্ত্র। মন্ত্র অর্থই শক্তি। শুধু শক্তিও নয়, শক্তি-সমন্বিত ব্যক্তি। ব্যক্তিও শুধু নয়—সর্ব্বভাবে ব্যক্তভাবে আমাদিগকে তাঁহার সহিত যুক্ত রাখিবার মত ব্যক্তিত্ব বা শক্তিমত্তাতেই ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব। আবার শুধু শক্তিমত্তাই নয়। তাঁহার সেই শক্তির মাধুর্য্যে আমাদের আত্মসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করিবার মত তাঁহার বীর্য্যবত্তা। এমন মাধুর্য্যে এবং এমন বীর্য্যে আমাদের মত বদ্ধজীবকে সমাত্মসম্বন্ধে আকৃষ্ট করিবার উপযোগী চাতুর্য্যময় মন্ত্রই নাম। নামই মন্ত্রের আত্মা। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন—'ভগবন্নামাত্মকা হি মন্ত্রাঃ।' নামের কাছে অধিকারের বিচার নাই। পাপী-তাপী সকলের সুহৃৎ নাম। এইভাবে 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্রের সম্বন্ধচ্ছন্দের অনুধ্যানে মন্ত্রমূর্ত্তিতে অমূর্ত্তক যিনি তুরীয়তত্ত্বে তাঁহার সর্ব্বাত্মক লীলার উন্মেষ ঘটে। মন্ত্র পরিণত হয় নামে। নামে মন্ত্রে অভেদ হইলেই মন্ত্র-চৈতন্য সাধিত হয়। চৈতন্যময় সেই লাবণ্যের কারুণ্য-মহিমায় তখন সাধকের ডুব। তাঁহার দৃষ্টিতে জাগে রূপ—কেবল রূপ। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সব নামই ওঁ তৎ সৎ এই ত্রিবৃৎ-তত্ত্বে নিত্যলীলায় প্রমূর্ত্ত। পৃথক পৃথক ভাব ছাড়িয়া এই তিনটি সাধকের অন্তররস-সংবেদনে সম্বন্ধযুক্ত ভাবে

গ্রন্থিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। অদ্বয় সেই চিন্ময় রস ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বাত্মসম্বন্ধের উজ্জীবক উদ্গীথস্বরূপে জীবের চিত্তগ্রন্থির উন্মোচনে পৌরুষ বীর্য্য বিস্তার করে। অ-কার ব্রহ্মা, উ-কার বিষ্ণু, ম-কার মহেশ্বর ইহার উপরে অর্দ্ধমাত্রার সমাশ্রয়ে ওঁকারের পূর্ণতা। চরিতামৃত বলেন—

'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর এই সৃষ্ট্যাদির ঈশ্বর
তিন আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের কৃষ্ণ অধীশ্বর।'

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর এই তিনটিই মাত্রা। অধীশ্বররূপে তুরীয়তত্ত্ব কৃষ্ণ অর্দ্ধমাত্রা। 'অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বপ্রতিষ্ঠিতম্'—(গোপাল উত্তর-তাপনী)। ওঁ-কারের ঝঙ্কারে পর বারে ব্যক্তাব্যক্তে কৃষ্ণনামে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের আনন্দ-লীলার বিস্তার। 'নাম চিন্তামণি কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ।' অ-কার, উ-কার এবং ম-কার এই ত্রিভঙ্গিম নামে প্রেমের তরঙ্গে এই ভাবে অনঙ্গ লীলা। শ্রুতিতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে—'এতদ্ধেবাক্ষরং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই অক্ষর ভগবৎ-তত্ত্ব। ভাগবতে শ্রুতির অভিমানিনী দেবতাগণ বলিয়াছেন, ভগবান তাঁহার দুর্গম আত্মতত্ত্ব প্রকট করিবার জন্য চিন্ময় লীলাবিগ্রহে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাঁহার পবিত্র লীলারূপ অমৃত সাগরে অবগাহন করিয়া অর্থাৎ তাঁহার চরিত-কথায় শ্রবণ, মননাদির দ্বারা অভিনিবিষ্ট হইয়া যাঁহারা চিত্তে নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের চরণ-সরোজবিহারী হংসকুলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অমৃতত্বে অভিষিক্ত হন। তাঁহারা মোক্ষও কামনা করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিনে ভেদ নাহি তিনে চিদানন্দরূপ' সুতরাং নাম এবং ওঁকারে ভেদ কোথায়? ফলতঃ ভেদ স্বীকার করিলে ওঁকারে বিকার-ধর্ম্ম আরোপিত হয়। ওঁকার-সাধনা মাত্রাগত হইয়া পড়ে। নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যেমন সচ্চিদানন্দ, তাঁহার নাম এবং নামের অক্ষরও তেমনই সচ্চিদানন্দময়। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীভগবানের ভূমা এবং তাঁহার অনন্ত শক্তি সর্ব্ব ভাবকে দৈবীভাবে উজ্জীবিত করিবার উপযোগী প্রত্যক্ষতার পরম বলে উপবৃংহিত হইয়া

নামে পরিণত হয়। আমাদের শ্রবণ এবং স্মরণার্হ মাধুর্য্য-বীর্য্যে ওঁ-কার আমাদের বরণযোগ্য ভাবে শ্রীভগবানেরই ভর্গ বা নাম। ওঁ-কারকে ব্রহ্মজ্ঞানে চিরমাত্র বা মাত্রাভেদরহিত রূপে উপাসনাই সর্ব্বশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলেন ওঁ-কারের অ-কার, উ-কার এবং ম-কার এই তিনটি মাত্রাই মৃত্যুর অধীন। একই ব্রহ্মে এই তিনটি মাত্রাকে পরস্পর সম্বন্ধে ছন্দোময় অদ্বয় চিন্ময়তত্ত্বে চিরমাত্র অমৃত রসের উদ্দীপ্তি বা পর্য্যাপ্তিতেই ওঁ-কারের সাধনা বিধেয়। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে ওঁকার নামেই পরিণত হয়। ধন্যাত্মক শব্দ বর্ণাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। ধ্বনি লীলায়িত হইয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করে বর্ণে। এইরূপ মাত্রাদি-বিভাগরহিত অতিমাত্র-তত্ত্বে যিনি ওঁ-কারকে জানিয়াছেন তিনিই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ওঁ-কারের নাদময় ম-কার এই পাদটিই শুধু সত্য, অপর অঙ্গ মিথ্যা ইহা ভ্রান্তিমাত্র। ব্রহ্মভাবে ওঁকারের সাধনায় অনুলোম গতিক্রমে অকার বা স্থূল জগতে পর্য্যন্ত উদ্দীপিত হয় ভগবানের চিৎবিভূতি। নামই ব্রহ্ম। নামই ওঁ-কার। 'অক্ষরাণাম-কারোহস্মি' আমি অক্ষরের মধ্যে অকার। দ্বন্দ্ব-সমাসেও তাঁহারই সম্বন্ধ—উ-কার। শ্রীভগবানের কৃপাকে আশ্রয় করিয়া সাধনায় ওঁ-কারেরই ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে চরাচরে জাগে নামেরই চিদাকার। উ-কারের এই দ্বন্দ্ব-সমাসের সম্বন্ধে ম-কারে শব্দ ব্রহ্মময় বেণুধ্বনিতে জড়াইয়া মাখাইয়া জাগেন সর্ব্বসম্বন্ধে শ্রীগোবিন্দ। নাদকে আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধমাত্রাচ্ছন্দে চিৎতত্ত্বের এই সম্বন্ধটি খোলে। তখন সুরু হয় সব জুড়িয়া ব্রহ্মলীলা। সকলকে বাড়াইবার জন্য ওঁ-কাররূপী পরব্রহ্মের নামরূপে নামিয়া আসিয়া চরাচরে এই প্রেমের খেলা। সগুণ, নির্গুণ সব ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার গুণ—

'নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস আলিঙ্গন হৃদয়-রসায়ন,
পরশ-রসায়ন সঙ্গ।'

এই স্পর্শরসে ত্রিভঙ্গিমায় তখন চলিতে থাকে রঙ্গ। নামে 'ওঁ, তৎ, সৎ' এই তিনটি তত্ত্বই লীলাচ্ছন্দে চিদানন্দরসে প্রমূর্ত্ত। ওঁ অর্থাৎ প্রণবব্যাপ্তিত তৎ বস্তু, সৎ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা স্বপ্রকাশতত্ত্ব। শ্রুতিতেও এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—'ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎযশঃ' অর্থাৎ ভগবানের নাম তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বা যশস্বরূপ। তাঁহার নাম, তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি অভিন্ন—প্রতীক নহে, প্রতিমা নহে, তাঁহারই স্বরূপ। বস্তুতঃ অন্যভাবে ভগবানকে সাক্ষাৎসম্পর্কে উপলব্ধির উপায় নাই। ওঁ তৎ সৎ এই ত্রয়ী বা ত্রিবৃৎ আমাদের চিত্তকে মন্ত্রবীর্য্যে প্রণিহিত করিয়া নামরূপে ভগবৎ-প্রেমলাভে সামর্থ্যসম্পন্ন করে। ওঁকার, ব্রাহ্মণ বা যজ্ঞমূর্ত্তি। গুরুরূপে তাঁহার অনুধ্যানকে আলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে তদর্থে বা ভগবদুদ্দেশ্যে আমাদের সর্ব্ব কর্ম্ম উদ্দীপিত হয়। ইহার ফলে তাহা সদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের পুরুষার্থ সিদ্ধ করে। "ব্রহ্মানুচুঃ নাম গৃণন্তি যে তে।" নামই সকল সাধন-ভজনের অঙ্গী—"নামে চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বসিদ্ধি সাধন-উদ্গম।" চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে শ্রদ্ধালাভ হয় না। শ্রদ্ধা ব্যতীত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—দান, তপস্যা সব অসৎ। ইহলোক বা পরলোকে কোথায়ও তাহা ফলদায়ক হয় না। শ্রীভগবান্ এই সত্যকে সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মবাদীগণ ওঁ এই পদ উচ্চারণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন এবং উপদেশ করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে ব্রহ্মবাদী এই নির্দ্দেশটি ব্রাহ্মণের সমার্থক বুঝিতে হইবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ শাস্ত্র-বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্তটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। 'ইতিহাস সমুচ্চয়' হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—'শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্' অর্থাৎ শূদ্র বা ভগবদ্ভক্ত ব্যাধ কিংবা চণ্ডালকে যিনি জাতিবুদ্ধিতে দেখেন তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—'সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তাঃ জনার্দ্দনে'—যাঁহারা

জনার্দ্দনের ভক্ত নহেন তাঁহারা যে বর্ণেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহারা শূদ্র। ভগবানের নামে রতি ভক্তি জন্মিলে কুক্কুরভোজী চণ্ডালও সোমযাগের অধিকারী হইয়া থাকেন। ভাগবতের এই বাণী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীল সনাতন বলেন, এই বচনের দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবকে সমভাবে গণ্য করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিতে কোন কোন আচার্য্য ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝাইয়াছেন। কারণ বেদে তাঁহাদেরই অধিকার। ওঁকার এই মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারও তাঁহাদের মতে এই ত্রিবর্ণেরই আছে, শূদ্রের নাই। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে কি মোক্ষাকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করা অবৈধ? গীতোক্ত ভগবদুপদেশে এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—সৃষ্টির প্রারম্ভে সহজাত যজ্ঞের প্রবৃত্তি দিয়া ব্রহ্মা প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি জীবকে নির্দ্দেশ দেন—'এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা সদা সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট প্রদানে কামধেনুর তুল্য হউক।' এই ক্ষেত্রে 'সহযজ্ঞা' প্রজা বলিতে শুধু ত্রৈবর্ণিকগণের প্রতিই ব্রহ্মার এই আদেশ ইহাই কি বুঝিব এবং তদনুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকের তাৎপর্য্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে তো বেদবিধি অনুযায়ী কর্ম্ম না করাতে শূদ্রকে পাপভাগী হইতে হয় না এবং তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকের তাৎপর্য্যের সহিত সমাজ-সংস্থিতিমূলক ধর্ম্মের সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার নিকট চতুর্ব্বেদী ঋষিগণও উপদেশপ্রার্থী ছিলেন। ইহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কি অসৎ বলিতে হইবে? প্রকৃতপক্ষে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবিদগণ যজ্ঞ, দান, তপঃক্রিয়া সম্পাদন বা প্রবর্ত্তন অর্থাৎ উপদেশ করেন। শ্রীভগবানের এই উক্তির তাৎপর্য্যার্থেই এই প্রশ্নের সমাধান রহিয়াছে। শ্রীভগবানের সব নামেই ওঁকারবীর্য্য নিহিত রহিয়াছে এবং সেই বীর্য্য সমগ্রভাবে ওঁ তৎ-সৎ এই ক্রম-পরাক্রমে নামাশ্রয়ী সাধকের সর্ব্ব কর্ম্ম সদ্ভাবে সম্পাদনে সামর্থ্য সঞ্চার করিয়া

তাঁহার পক্ষে পরমার্থ সিদ্ধ করায়। ওঁকার হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে নামে চিদানন্দ রসের অভিব্যক্তি বা ব্রহ্মের পূর্ণতত্ত্বে পরিস্ফূর্ত্তি। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের কর্ম্মকে তাঁহার নামের আশ্রয়ে সমাধিকারেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ওঁকারের পূর্ণার্থ ই নামে পরিস্ফূর্ত্ত, চিন্ময় লীলায় প্রমূর্ত্ত। এই সত্যটি যাঁহারা স্বীকার না করেন তাঁহারা প্রতীক-স্বরূপেই ওঁকারকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের সাধনা মৃত্যুর স্তরেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা বেদের বিরোধী মতই সংস্কারবশে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন না এই কথাই বলিতে হয়। সমস্ত কর্ম্মই প্রকৃতপক্ষে বেদবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্মও যদি শাস্ত্রবিহিত না হয়, তবে তাহা ফলপ্রদ হয় না। সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মও যদি অশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও অনর্থকর হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলে জন্মের জন্য কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কিছু নাই এবং কর্ম্মবন্ধন জন্মের ফলে অতিক্রম করাও সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী এইগুলি মানুষের অহঙ্কারকেই প্রবর্দ্ধিত করে। ভাগবতে কুন্তীদেবী ভগবানকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন, এইরূপ অহঙ্কারীগণ কখনই আপনার নাম উচ্চারণ করিতে অধিকারী হয় না। প্রকৃতপক্ষে নাম উচ্চারণে প্রণবও উচ্চারিত বা উদ্গীত হয় এবং তাহা হয় শাস্ত্রানুমোদিত এবং যুগোচিত ভাবে। সুতরাং বৈষ্ণব, শূদ্রাদির পক্ষেও প্রণবোচ্চারণের অধিকার আছে—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীরও ইহাই সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, শূদ্রাদির সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে নিষেধবিধি দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণব যাঁহারা তাঁহাদের সম্পর্কে। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে অদীক্ষিত যাঁহারা তাঁহাদের সম্পর্কেই নিষেধবিধি আরোপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নৈমিষারণ্যে ব্রাহ্মণেতর কূলে জাত পরমভাগবত শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণের সমক্ষে ভাগবত পাঠ করিতেন। তিনি প্রণব বাদ দিয়া বা প্রণবের পরিবর্ত্তে অন্য কোন শব্দ যোজনা করিয়া পাঠ করিতেন, এরূপ

প্রমাণ মিলে না। ফলতঃ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্র-বিগর্হিত এবং ব্রাহ্মণের সহিত বৈষ্ণবের তুল্যত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবত বলেন—

'সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্—
নাম-ব্যাহরণং বিষ্ণোঃ যতস্তদ্বিষয়ামতিঃ।'

অর্থাৎ সর্ব্বভাবে যে পাপী শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে তেমন ব্যক্তির চিত্তও নির্ম্মলতা লাভ করে এবং ভগবদ্বিষয়ে মতি জন্মে। ভগবদ্ভক্তির তাৎপর্য্য এই ভাবে গৃহীত হইলেই সকল দিক হইতে পারম্পর্য্যসূত্রে আধ্যাত্মিক সত্যের সহিত তাহার সঙ্গতি সাধিত হয়। শ্রুতি বলেন—"ওঁ ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম। যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসার-মহাভয়াত্তারয়তি ত্রায়তে চ তস্মাদুচ্যতে তারম্।" (অথর্ব্ব-শিরা উঃ-৩।৫) অর্থাৎ ওঁ ইহা ব্রহ্মের অতি নিকটস্থ নাম। এই নাম উচ্চারণ করিলে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে জীব সংসাররূপ মহাভয় হইতে ত্রাণ পায়। ভগবান্ তাহাকে ত্রাণ করেন। এজন্য ওঁকার তার বলিয়া অভিহিত হয়। ওঁকার এইরূপ ত্রাণ করিবারশক্তি লইয়া আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে রহিয়াছেন। কতটা নিকটে ইহার উপর শ্রুতি বলিয়াছেন্—"স উ প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষ শ্চক্ষুঃ।" তিনি আমাদের প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু। তিনি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষা প্রিয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্ব্বমোঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্।" (ছাঃ-২।২৩।৩) অর্থাৎ পত্রের শিরার দ্বারা যেরূপ পত্রের অবয়ব-গুলি গ্রথিত ও পরিব্যাপ্ত সেইরূপ ওঁকারের দ্বারা সমগ্র শব্দরাশি পরস্পর নিবদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত। ওঁকার এই সমস্ত—সবই ওঁকার। শ্রুতি আরও বলেন—"যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি" (ছাঃ-৭।৪।১) অর্থাৎ যখনই লোকে নামোচ্চারণের সঙ্কল্প করে তখনই বাগিন্দ্রিয় নামধর্ম্মে অনুপ্রেরিত হয়। অতঃপর মন্ত্রসকল নামে একীভূত হয়। মন্ত্র সকল নামাত্মক।

কিন্তু নাম মন্ত্রের অপেক্ষা সমধিক শক্তি সম্পন্ন। শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য আমাদের নিজেদেরই সাধন-ভজন করিতে হয়। কিন্তু নামে সে অপেক্ষা নাই। নাম উচ্চারণের ইচ্ছা করিলেই নাম জিহ্বাকে প্রণোদিত করিয়া স্বীয় মধুর রসপ্রবাহে দেহেন্দ্রিয়কে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। শ্রীপাদ লক্ষ্মীধর তৎপ্রণীত শ্রীভগবন্নামকৌমদীতে বলেন—'মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ।' শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বলেন—"একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ।" বস্তুতঃ নামের নেদিষ্ঠত্ব বা নৈকট্যের ইহা ধর্ম্ম। সমাত্মসম্বন্ধে আমাদের সহিত নামের ঘনিষ্ঠতা এইখানে। এইরূপে নামী হইতে নাম সমধিক শক্তি-শালী। আচার্য্য শঙ্কর কঠোপনিষদের "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং" (১।১।১৬) এই মন্ত্রের ভাষ্যে বলেন—"যত এবম, অতএব এতৎ আলম্বনং এতৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্। 'এতদালম্বনং পরম্" অর্থাৎ যেহেতু নাম এবম্বিধ শক্তিশালী, সেই হেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে নামাশ্রয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ততম। শ্রীভগবান্ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—"শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়ম্ ময়োপবৃংহিতম্।" প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় নামের ক্রিয়া এবং আমার শক্তিই ইহার মূলে বলাধান করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যতদিন পর্য্যন্ত এই বলটি অন্তরে না পাই বা ভগবানকে আমাদের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়সম্বন্ধে লাভ না করি, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। হরি বলিতে 'সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন' তাঁহার এই লীলাটি আমাদের অনুভূতিতে জীবন্ত হইয়া উঠে না। বস্তুতঃ ওঁ, তৎ, সৎ এই তত্ত্বের নির্দ্দেশে ভগবান্ সর্ব্বশাস্ত্রের বিধিনিষেধের সার তত্ত্বটি উন্মুক্ত করিলেন। আমরা সর্ব্বাবস্থার মধ্যে নামাশ্রয়ে শাস্ত্রনিষ্ঠিত শ্রদ্ধাবুদ্ধির অধিকারী হইলাম। ভগবানের সব নামই ওঁকারে বা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে চিদাকারে প্রমূর্ত্ত। গীতোক্ত প্রভবতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুভূতির রাতিটি বীজস্বরূপে আমরা পাইলাম। ওঁ, তৎ, সৎ মনের মূলে

এই ত্রিবিধ কম্পনে আত্ম-মাধুর্য্যের সংবেদনে ত্রিভঙ্গিম রঙ্গে অনুলোম এবং প্রতিলোমক্রমে প্রেমের দেবতা তাঁহার অনঙ্গলীলার তরঙ্গ-প্লাবনে আমাদিগকে তুরীয়তত্ত্বে আকর্ষণ করিলেন। নামই ওঁকার—নামে এবং ওঁকারে কোন পার্থক্য নাই। ওঁ তৎ সৎ—এই ভগবন্নির্দ্দেশে বেদোক্ত পরম সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীজীবপাদ বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও 'শ্রীবিষ্ণুসহস্র নামের' ভাষ্যে সেই মন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মন্ত্রটি এই—'ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সদিত্যাদি।' অর্থাৎ হে বিষ্ণো, তে (তব) নাম চিৎ (চিৎস্বরূপম্) অতএব মহঃ (স্বপ্রকাশ-রূপম্) তস্মাৎ অস্য (নাম্নঃ) আ (ঈষদপি) জানন্তঃ (ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ, তথাপি) বিবক্তন্ (ব্রুবাণাঃ, কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ) সুমতিং (তদ্বিষয়াং বিদ্যাম্) ভজামহে (প্রাপ্নুমঃ), কথং যতঃ ওঁ তৎ (প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু) সৎ (স্বতঃ-সিদ্ধম্) ইতি। অর্থাৎ হে বিষ্ণু, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ। সুতরাং এই নামের উচ্চারণ মাহাত্ম্যাদি সম্যক্‌রূপে না জানিয়াও, সামান্য কিছু মাত্র জানিয়াও যদি আমরা কেবল তোমার নামাক্ষর মাত্র উচ্চারণ করি, তাহার ফলেই আমরা তোমার বিষয়িনী বিদ্যা বা প্রেম লাভ করিতে পারিব; যেহেতু নাম স্বপ্রকাশস্বরূপ।

ঋক্ বেদের আর একটি মন্ত্র এক্ষেত্রে আলোচিত হইয়াছে। মন্ত্রটি—

'পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ
শ্রবস্যবশ্রব আন্নমৃক্তম্।
নামানি চিদ্ দধিরে যজ্ঞিয়ানি
ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ। ওঁ তৎ সৎ।'

অর্থাৎ হে দেবতা, আপনার পাদপদ্মে বারংবার প্রণাম করি। কারণ ঐ উচ্চারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভক্তগণ যশঃ এবং মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে। অন্য কথা কি, যাঁহারা তৎসম্বন্ধে আলোচনা

করেন, পরস্পর কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরে আপনার প্রতি প্রেম উপজাত হইলে আপনার সাক্ষাৎকার লাভের লালসায় আপনার নামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। (হরিভক্তি-বিলাসে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর টীকা)।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার আত্যন্তিক স্বরূপটি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ভাবে ভগবানের কৃপায় জীব অধিগত হইল। ওঁকার কীর্ত্তনীয় নহে। তাহা উপাংশুভাবে জপ্য। প্রণব সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—ব্যক্তাব্যক্ত উভয়রূপে প্রণবই নাম। নামই কীর্ত্তনীয়। সঙ্কীর্ত্তনই কলির যুগধর্ম্ম। ইহা ছাড়া জীবন্মুক্ত যাঁহারা শুধু তাঁহাদেরই সূক্ষ্ম প্রণব জপে অধিকার। সুতরাং ওঁকার জপে সকলের অধিকার নাই। অনুগীতায় ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, দেবতা ও ঋষি, সর্প ও অসুরগণ ব্রহ্মার নিকট গিয়া শ্রেয় উপদেশ করিতে প্রার্থনা জানায়। প্রজাপতি ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ইহার অর্থানুসন্ধান করিতে গিয়া সর্পগণের মনে দংশনের প্রবৃত্তি, অসুরগণের মনে দম্ভ ভাব, দেবতাদের চিত্তে দান প্রবৃত্তি এবং মহর্ষিগণের অন্তরে দমগুণের সঞ্চার হয়। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জীবন্মুক্তি লাভের পরে তবে প্রণব জপে সাধনার অধিকার লাভ হয়, নহিলে জপে অনর্থ ঘটে। এই সঙ্কট হইতে জীবের পরিত্রাণের পথ মিলিল। ওঁকারের অধিকার-সম্পর্কিত সঙ্কট সর্ব্বজনের পক্ষে কাটিয়া গেল। কলির সাধন-ভজন—ত্যাগ, তপস্যা-বিহীন জনেরাও পাইল, পাইল পরিত্রাণের পথ, পাইল কীর্ত্তনের উপায়, রক্ষিত হইল ধর্ম্ম। বাস্তবিকপক্ষে ওঁকারকে 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রীভগবান নামে তাঁহার সর্ব্বশক্তি সঞ্চার করিলেন, জীবকে দিলেন সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তাঁহার ভজনের অধিকার। নাম-সাধনার বৈজ্ঞানিক রীতিটির বিশ্লেষণে এই চাতুরীটি উপলব্ধি না করিলে গীতার দেবতার করুণার বদান্য লীলাটি আমরা পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে পারি না। তিনি পরোক্ষ

থাকিয়া যান। সর্ব্বভূতের সুহৃৎস্বরূপে তাঁহাকে আমরা পাই না। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে তত্ত্বটি উন্মুক্ত করিয়াছেন আমরা তাহার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হই। আমরা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা অন্য কথায় ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য্য যেমন কিরণরাশির আশ্রয় সেইরূপ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমাশ্রয়স্বরূপে আমরা ভগবানকে চিৎঘন বিগ্রহে পাই না। আমরা শাশ্বতধর্ম্মের অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মের নিধানস্বরূপে তাঁহাকে পাই না। অব্যয় অমৃতস্বরূপে বা আমাদের নিত্যমুক্ত স্বরূপধর্ম্মে তাঁহাকে আমরা পাই না। কিংবা ঐকান্তিক সুখের আকরস্বরূপে বা প্রেমভক্তির রসোৎসব-লীলায় তাঁহাকে আমরা আস্বাদন করিতে পারি না। এইরূপে ভগবদ্ভজনের প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইলে আমাদের বুক ভরে না। গীতার অক্ষরে অক্ষরে গীতার দেবতাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। আমাদের জীবনে দৈন্য থাকিয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত অবস্থা লাভের যে ক্রমটি ব্যক্ত হইয়াছিল, সপ্তদশ অধ্যায়ে তাহা সার্ব্বভৌম সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইল—দেওয়া হইল যুগোচিত তাঁহার সাধনাঙ্গ, প্রকীর্ত্তিত হইল নামের মহিমা। ওঁকার জগৎ জুড়িয়া নামে আত্মমহিমায় প্রকট হইলেন—বেদের প্রতিষ্ঠা ঘটিল। ক্ষর অক্ষর, সর্ব্বভাবযুক্ত পুরুষোত্তমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণে এই পথে আমাদের জীবন অর্ঘ্যোপচারস্বরূপে নিবেদিত করিবার স্বাভাবিক ধারাটি আমরা লাভ করিলাম। এমন আত্মনিবেদিত পুরুষকে যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিয়া নামকে জড়াইয়া জাগিলেন যিনি নামী তিনি। ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ এক অঙ্গে সার্থকতা লাভ করিল। গুরু, মন্ত্র, দেবতা এক হইয়া গেল। বিশ্বচরাচরে ব্রজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল—'ওঁকারার্থং সমুদ্‌গীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদং শিশোঃ।' ওঁকার মহাবাক্যস্বরূপ হইলেন নাম এবং নাম ঈশ্বরেরই চিন্মূর্ত্তি—নামে প্রেমের লীলারই স্ফুর্ত্তি। নামে সর্ব্বশাস্ত্রের সার সত্য প্রতিষ্ঠিত।

নাম-সাধনায় সর্ব্বশাস্ত্রের সঙ্গতি—শাস্ত্রনিষ্ঠার পূর্ণাঙ্গতা বা পরিপূর্ত্তি; সুতরাং নামাশ্রয়ে শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনজনিত কোন ত্রুটি সাধককে স্পর্শ করে না। নামের সাধক সর্ব্বাবস্থায় প্রেম ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। আদিপুরাণে শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন—

'মম নাম সদা গ্রাহী মম সেবা-প্রিয়ঃ সদা
ভক্তি স্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তি কদাচন।"

যিনি সর্ব্বদা আমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি সর্ব্বদা আবার সেবাপ্রিয়। আমি তাঁহাকে আমার ভক্তি প্রদান করি, কখনই মুক্তি বা মোক্ষ দান করি না।

'কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া
কভু ভক্তি নাহি দেন রাখেন লুকাইয়া।' (চৈঃ চঃ)

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের মুখে আমরা সেই কথাই শুনিয়াছি—

'হরিদাস কহে নামের দুই ফল নয়
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।'

নামের এমনই মহিমা। কলির যুগাবতার গৌর-কৃষ্ণের মুখে কৃষ্ণচন্দ্রের উক্তিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—

'হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।' (চৈঃ চঃ)

মোক্ষযোগ

১। ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ ॥
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

২। যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ॥
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

৩। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

৪। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রীতির বিবর্ত্ত-রীতি

'সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি'—ইহাই গীতার প্রথম ষট্‌কের সার কথা। 'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ' প্রীতিপূর্ণ এমন উক্তিতে ভক্তের জন্য নিজের ব্যথাটি প্রকট করিয়া 'শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া' দ্বিতীয় ষট্‌কের উপসংহারে ভগবান শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত তাঁহার অতীব প্রিয় এই আশ্বাস দানে ভক্তকে নিজের বুকে টানিয়া লইয়াছেন। 'মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে' ভক্তকে এই প্রতিশ্রুতি দানে তৃতীয় ষট্‌কে 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত' শ্রুতির এই সত্যের প্রতিষ্ঠায় গীতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত উপদেশের অপূর্ব্বত্ব এইখানে। গীতার অধ্যায়গুলি সাধনার স্তর পারম্পর্য্যসূত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে। গীতোক্ত উপদেশগুলি অনুধাবন করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। গীতার দেবতা নিজেই বিধেয় অর্থাৎ উপদিষ্টতত্ত্বের অনুবাদস্বরূপে সম্মুখে হাজির রহিয়াছেন। এমন প্রত্যক্ষ সত্যের উপরই গীতার ভিত্তি স্থাপিত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জ্জুনকে যুযুধান আত্মীয় স্বজনগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া স্বজনের নিধনাশঙ্কায় তিনি অর্জ্জুনের চিত্তে আর্ত্তভাব উদ্দীপ্ত করেন। এই সূত্রে জীবাত্মার সনাতনত্বের বিশ্লেষণ মূলে গীতোক্ত উপদেশের বিন্যাস এবং বিস্তার সুরু হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের এই রীতিটি কিন্তু ভগবান নৈর্ব্যক্তিক রাখেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত জীবের সাধ্যতত্ত্বের অনুবাদস্বরূপে তিনি নিজে প্রমূর্ত্ত থাকিয়া উপদেশ করিয়াছেন। ফলতঃ নিজেকে দূরে রাখেন নাই। নিজেকে জীবের সঙ্গে জড়াইয়া লইয়াছেন। অর্জ্জুনকে তিনি নিজের সমাত্ম-সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, বলিয়াছেন—আমি, তুমি এবং রাজগণ পূর্ব্বে ছিলাম না এরূপ নহে, পরেও যে থাকিব না ইহাও নয়। আমরা সকলেই যেমন এখানে বর্ত্তমান আছি, তেমনি

পরেও থাকিব। এইরূপে যজ্ঞেশ্বর-স্বরূপে কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞানল তিনিই যে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। জীবের প্রতি নিত্য এবং সতত ক্রিয়মান তাঁহার সংবেদনটি তিনি জীবকে ধরাইয়া দিলেন। জীবের হৃদয়ে যজ্ঞেশ্বরস্বরূপে অবস্থান করিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন ইহা বুঝাইয়া দিলেন। কামবীজস্বরূপে তিনি নিজবীর্য্যে জীব ও জগৎকে ধারণ এবং পোষণ করিতেছেন এই সত্যটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। যিনি এইভাবে বিধেয়স্বরূপে আছেন, অনুবাদস্বরূপে তিনি স্বয়ং নরবপু ধারণকারী হরি। তাঁহাকে আমরা আমাদের সম্মুখে পাইলাম। এই প্রত্যক্ষতার পরম বীর্য্যটি অর্জ্জুনের অন্তরে গূঢ়ভাবে আগে উপ্ত হইল। পরে প্রশ্নোত্তরের পারম্পর্য্যসূত্রে মধুসূদনের মুখ-মারুতে গীতাধর্ম্মে জীবের সহিত শ্রীভগবানের প্রীতির রীতি তাঁহার পরম মাধুর্য্যে পরিপূর্ত্তি লাভ করিতে থাকিল। বাস্তবিকপক্ষে গীতার কোন স্থানেই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ঘাঁটি পাকা করিবার পথে কোন ত্রুটি রাখা হইল না। কারণ সম্বন্ধটি পাকা না হইলে যে খট্‌খটি লাগিয়া যায়। সর্ব্বোপনিষদের সার গীতোক্ত সত্যের প্রতিষ্ঠা করাই চলে না। বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বাত্মদেবতার সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বন্ধনের বিকার সৃষ্টি হয়—চিদাকারটি আড়ালে পড়ে। কর্ম্মে বন্ধনের বিভীষিকা জাগে। বিশ্ব-কর্ম্মে বিশ্বেশ্বরকে আমরা পাই না। ফলে একান্ত অসহায়ত্ব আমাদের জীবনকে অভিভূত করে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে সর্ব্বতোময় সংবেদনে অর্জ্জুনের মনের মূলে শ্রীভগবানের আত্মসম্বন্ধের ছন্দোময় লীলা-কমলের দল খুলিয়া গেল। কর্ম্মের মূলে যজ্ঞেশ্বর দেবতা তাঁহার মাধুর্য্য-বীর্য্য উন্মুক্ত করিলেন। আমরা ভগবৎ-প্রেমের স্পর্শ পাইলাম। প্রেমের রাজ্যে সর্ব্বত্র স্বাধীনতা—ডিক্টেটরী সেখানে অচল। ভগবান চাহেন জীবকে, জীবও চাহে ভগবানকে। এই পরস্পরের চাওয়াটি সার্থক হয় যজ্ঞে। ভগবান জীবের জন্য যজ্ঞ করিতেছেন, জীবকেও সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া শুনাইলেন, হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, কারণ ত্রিভুবনে আমার কোন বস্তু অপ্রাপ্য নাই তথাপি আমাকে অবিরত কর্ম্ম করিতে হইতেছে। আমি কর্ম্ম না করিলে লোক সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তোমাদিগকেও এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে। যজ্ঞের প্রবৃত্তি তোমাদের মধ্যে সনাতন এবং সেই প্রবৃত্তি আমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তুমি তো আমারই। সনাতনস্বরূপে আমারই অংশ তুমি। এইভাবে জীবের সহিত আমার নিত্য সম্বন্ধ। তোমার সকল কর্ম্মে আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানল উদ্দীপ্ত হইলে আমার প্রতি তোমার প্রীতির এই নিত্য সম্বন্ধটি উন্মুক্ত হইবে। বিশ্বকর্ম্মে তুমি আমার লীলাসঙ্গী হইবে। ভগবান্ বলিলেন, এইরূপ আমার যে ভক্ত সে আত্মধ্যানপরায়ণ তপস্বীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ এবং পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কর্ম্মীর অপেক্ষাও সে শ্রেষ্ঠ। এইরূপে তুমি আমার ভজনযোগ্য পরাভক্তির অধিকারী হইবে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতায় নির্দ্দেশের মধ্যে কোন ঘোর প্যাঁচ নাই। সম্বন্ধের পরোক্ষতাই আমাদের জীবনের যত রকম জটিলতার কারণ—

'মীমাংসক কহে ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান।
বেদমতে কহে তেঁহো স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লইয়া বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ-ব্যতিরেকে তেঁহো হয়ত সগুণ॥' (চৈঃ চঃ)

মীমাংসা কর্ম্মশাস্ত্র কর্ম্মবাদমূলক। বেদমন্ত্রানুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠানই মীমাংসকগণের মুখ্য সাধন। তাঁহাদের পক্ষে মন্ত্রই দেবতা, পৃথক কোন দেবতা ফলদাতৃস্বরূপে নাই। কর্ম্ম করিলেই স্বর্গাদিলাভ ঘটে—মীমাংসকগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। সাংখ্যবাদীগণ বহুপুরুষবাদী। প্রকৃতি এক কিন্তু পুরুষ বহু। সাংখ্যবাদীগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকগণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এই চারি প্রকার পরমাণুর মিশ্রণেই জগৎ। মায়াবাদ আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত। পাতঞ্জল দর্শন যোগশাস্ত্র। চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগের লক্ষ্য। এজন্য ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলেও চলে। যোগদর্শনানুসারে সৃষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বর একটি তত্ত্ব এইটুকু স্বীকার করিলেই হইল। বেদমতে জগতের মূল কারণ ভগবান এবং তিনি জীবের নিয়ন্তা ও মোক্ষদাতা। বেদান্ত-মতে ঈশ্বর সাকার। তিনি নির্গুণ বলিতে তাঁহার অপ্রাকৃত গুণই বুঝায়। গীতায় বেদান্তের সার সিদ্ধান্তস্বরূপে জীব এবং জগতের সহিত ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতা জীবকে সনাতন সত্তার সন্ধান দিয়াছেন। সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানের সাধনায়, কর্ম্মক্ষেত্রের উপদেশে ভক্তির ক্রম-বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভগবৎ-কৃপার সর্ব্বাত্মক সংশ্লেষটি সমগ্র গীতার্থে উন্মেষিত হইয়াছে। গীতার দেবতার উপদেশের অন্তর্নিহিত আমাদের সহিত তাঁহার নিত্য প্রত্যক্ষ সম্পর্কের এই ভাবটি উপলব্ধি না করিলে গীতাভাষ্যে বিকৃতি ঘটিবে, ইহা স্বাভাবিক।

গীতার মায়াবাদী ভাষ্যকারগণ জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্মের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মুক্তিকেই লক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং জ্ঞান বলিতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইহাই তাঁহাদের পক্ষে প্রতিপাদ্য হইয়াছে। গীতার কর্ম্ম ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠেয়। এই অনুষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক রীতিকেই গীতায় যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মুক্তির লক্ষ্য ভগবান নহেন, ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মও নয়। বস্তুত ভগবৎ-বোধশূন্য হইয়া মাত্র বিচারের দ্বারা কর্ম্মে অসঙ্গ বা অনাসক্তি লাভ করিলে আমরা

কর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারি না। কারণ কর্ম্ম করিতে গেলেই অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। আমি কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্ম ভগবানকে অর্পণ করিলাম, এ কথার কোন অর্থ হয় না। কারণ কর্ম্ম করিয়াছি আমি, সুতরাং ফলভোগ আমাকেই করিতে হইবে। প্রত্যুত ভগবৎ-কর্ত্তৃত্ব দর্শনযুক্ত যে অসঙ্গবোধ তাহাই কর্ম্মফলের ভোগকে নিরস্ত করিতে পারে। শ্রীভগবান্ এজন্য কর্ম্ম-সন্ন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য্যটি উন্মুক্ত করিতে গিয়া কর্ম্মযোগের অবতারণা করিয়াছেন। মায়াবাদ-মূলক সন্ন্যাসের অহঙ্কারের ভাবটি সর্ব্বদা সজাগ থাকে, কিন্তু ভগবৎ-উদ্দেশ্যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীভগবানে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হওয়াতে অহঙ্কৃতভাব আপনা হইতে বিলুপ্ত হইতে থাকে। এই অবস্থা যুক্ত অবস্থা। 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদ্' অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুতে চিত্ত যুক্ত হইলে ক্রমে কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বভাব মুক্ত হইয়া শারীর-ক্রিয়া মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জীব তখন অনিত্য শরীরীভাব-মুক্ত নিজের সনাতন-আত্মস্বরূপটি উপলব্ধি করে। ফলতঃ গীতা কোন ক্ষেত্রেই কর্ম্মত্যাগের জন্য প্রয়াস সমর্থন করে নাই। বিশ্ব-জীবনে ব্যক্তিত্বসূত্রে বিরোধের ভাব গীতা আমাদের অন্তরে জাগায় নাই। 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি', 'সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং, 'ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা' এইভাবে কর্ম্ম করাই গীতার নির্দ্দেশ। বিশ্বকর্ম্মের মূলে শ্রীভগবানের সংবেদন রহিয়াছে, ইহাই বেদান্ত-সম্মত সত্য। কিন্তু বেদান্ত-সম্মত এই সিদ্ধান্ত মায়াবাদীগণের অন্তরকে স্পর্শ করে না। দৃষ্টি তাঁহাদের সঙ্কুচিত। সর্ব্বগত ব্রহ্মসম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি আয়ত নহে। তাঁহাদের লক্ষ্য স্ব-বিমুক্তি অর্থাৎ স্বার্থ। চিত্ত তাঁহাদের কঠোর। ভগবানের বেদনায় তাঁহাদের চিত্ত আর্দ্র হইবার নহে। বিশ্বের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার মতও তাঁহারা কিছু পান না। বিশ্বকর্ম্মে তাঁহারা ভগবানকে উপলব্ধি করেন না। মায়াবাদী অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কেহ কেহ এই কথা বলিয়া থাকেন যে ভগবানের স্বরূপ আমাদের মন এবং আমাদের বুদ্ধির অগোচর। ভগবৎ-প্রাপ্তির অবস্থা ভাষায় অব্যক্ত।

সে যে কেমন পাওয়া এবং কি পাওয়া ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শুধু আমি—আমিই সেই, এই ভাষাতেই আত্যন্তিক সেই উপলব্ধির অবস্থা কিছুটা ব্যক্ত করা সম্ভব হইতে পারে। ভগবৎ-সম্বন্ধে একাত্মতার এই পরম নিগূঢ়ভাবের যাথার্থ্য আমরাও বুঝিতে পারি। সর্ব্বগ্রাসী সে যে প্রেম। ভগবানে তেমন অত্যুগ্র এবং উদগ্র প্রেম জাগিলে তো কথাই থাকে না। আমাদের চিত্ত তৎগত হইয়া পড়ে। চিত্তে সেইরূপ একান্ত ভাবের জাগরণে বিশ্বের সহিত সর্ব্বভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধ আমাদের চিত্তে ছন্দোময় এবং আনন্দময় হইয়া উঠিবে। আমাদের পক্ষে তখন অনাত্মদৃষ্টি কোথাও থাকিবে না, ইহাই শাস্ত্রসম্মত এবং প্রথম ষটকের উপদেশও ইহাই। ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সাধনায় শুদ্ধচিত্তে উদ্ভাসিত এই সত্যের উপরই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ষটকের ইহাই সারতত্ত্ব।

ইহার পর জ্ঞানের কথা। দ্বিতীয় ষটকের লক্ষ্য এই জ্ঞান এবং তাহার স্বরূপ। এখানে উঠে মনোধর্ম্ম এবং প্রাণ-ধর্ম্মের বিচার। মন জ্ঞানমুখী, প্রাণ ভক্তিপর-বৃত্তিযুক্ত, এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু মন এবং প্রাণের সংযোগ ব্যতীত চোখ আমাদের খোলে কি? যোগ বলিতে আমরা যে বস্তু বুঝি, তাহার সত্যকার সম্ভোগ সম্ভব হয় কি? বস্তুতঃ মন বা বুদ্ধির প্রাখর্য্যের যুক্তিতে প্রাণকে যাঁহারা গৌণ করিতে চাহেন, হৃদয়কে তুচ্ছ করিয়া বুদ্ধিই যাঁহাদের কাছে বড়, তাঁহাদের অনুভূতিতে জড়ত্বের অভিভূতি থাকেই এবং যোগ তাঁহাদের পক্ষে উদ্যোগ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। চোখের জল সব ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করে এমন যুক্তি ভুল। পক্ষান্তরে সে জল মন এবং বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিয়া আমাদের দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়াই তোলে। প্রাণের সঙ্গে মনের যেখানে মিলন সেখানেই প্রজ্ঞার জাগরণ ঘটে। আমাদের স্মৃতি স্বরূপধর্ম্মে উদ্দীপিত হইবার সুযোগ সেখানেই পায়। বুদ্ধি জড় কিন্তু প্রজ্ঞা আত্মার আলোকে চিন্ময়। প্রজ্ঞাবলে আমরা আমাদের জীবনের

মূলে স্বরূপানুবন্ধী চিদ্ধর্ম্মে পরিপূর্ত্তি বা পূর্ণের অনুভূতি লাভ করি। সৃষ্টির রহস্য এই অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। মনের উপর প্রাণের নিরাবরণ কম্পনে বা প্রতিফলনেই চিদানন্দময় সত্য অপাবৃত-ভাবে আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

'আকাশাৎ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা।
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মন্তস্থভূষিতাং।'

অর্থাৎ আকাশ হইতে প্রাণ ঘোষবান হয়, মনের স্পর্শে গিয়া তাহা ছন্দোময় নানা রূপ ধরিয়া উঠে। ওঁকাররূপী পরব্রহ্ম অন্তরের চিদাকাশে স্পন্দিত হইলে প্রাণের সেই খোলামেলা খেলার সংস্পর্শে গিয়া মন লীলার রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'সর্ব্ব-দেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণ-শক্তি,
তাঁহারেই করি স্নেহ তাঁহাকেই ভক্তি।' (চৈঃ ভাঃ)

কোথায় মিলিবে প্রাণ? প্রশ্ন তো জীবনে ইহাই। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন—'যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং।' রথনাভিতে শলাকাসমূহ যেমন সম্প্রবেশিত থাকে তেমনই প্রাণে সমস্ত প্রবিষ্ট রহিয়াছে। ফলতঃ আমাদের কামনা-বাসনার ভিতর দিয়া স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়-প্রচেষ্টার পথে প্রাণেরই সন্ধান করিতেছে। কিন্তু অসত্যাশ্রিত আমাদের মন প্রাণের মূল উৎসটি ধরিতে পারে না। অসত্য হইতে সত্যের সংস্রবে যাইতে হইবে। উপায় কি? শ্রুতি বলেন, 'যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি। নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি। বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্' (ছান্দোগ্যঃ-৭।১৭।১) অর্থাৎ যিনি সবিশেষ-ভাবে বা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই সত্য বলেন। সেই ভাবে সত্যকে উপলব্ধি না করিয়া কেহ সত্য বলিতে পারে না। এই সবিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আবশ্যক।

গীতার জ্ঞানের ধারা এই বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩শ এবং ২৪শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, আমি কর্ম্ম না করিলে সৃষ্টি-ধ্বংসের কারণ ঘটে, এজন্য আমাকে সদা-সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইতেছে। বিশ্ব জুড়িয়া ভগবৎ-কর্ম্মস্বরূপে এই প্রাণের খেলা চলিয়াছে। প্রাণ ভগবানেরই উপাধি। তাঁহার এই শক্তিটি অনাহত শব্দের আকারে আমাদের অন্তরে উদ্গীত হয়। সেই ধারার সংস্পর্শে আমাদের দেহ দিব্যভাবে উজ্জীবিত হয়। সুতরাং আমাদের এই দেহটি তুচ্ছ নহে। প্রকৃতপক্ষে প্রাণশক্তির সঞ্চারকারী যিনি সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণের সেবাতেই আমাদের দেহ সার্থকতা লাভ করে। এই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণই আমাদের প্রাণস্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'যত দেখ রাজা দিব্য দিব্য কলেবর
কনকভূষিত গন্ধ-চন্দনে সুন্দর।
যম-লক্ষ্মা যাহার বচনে লোকে কয়
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়।
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া
কেহ ভস্ম হয়, কারে এড়েন পুতিয়া।'

শ্রুতিতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে—'অথ যদ্যপ্যেনামুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিষন্দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাঽসীতি ন মাতৃহাঽসীতি।' অর্থাৎ যদি কেহ কয়েকজন মৃত ব্যক্তির দেহ একত্র করিয়া শূলের দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দগ্ধ করে তথাপি কেহই বলিবে না যে তুমি পিতৃঘাতী মাতৃঘাতী হইয়াছ, কিংবা ব্রহ্মঘাতী হইয়াছ ইত্যাদি। প্রাণস্বরূপ ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করাই ভগবৎ-বিজ্ঞান এবং তাহাতেই আমাদের জীবনের প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাণই মনের বল। প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই মনের খেলা। মন খোলে মেলে প্রাণেরই দোলে। মনের নির্ভর প্রাণের উপর, প্রাণই মনের ঘর। প্রাণের টান না থাকিলে, মনের স্থান কোথায়? মনের ধর্ম্ম অন্বেষণ, প্রাণের ধর্ম্ম—দান, বরণ, আলিঙ্গন। প্রাণের স্পর্শ না পাইলে

মন শুধু এদিকে ওদিকেই চলে এবং ছুটাছুটি তাহার মিটে না। এই সঙ্কট অতিক্রম করিবার জন্য করুণাপরায়ণ ভগবান তাঁহার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইতে আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। গীতায় বিশ্বকর্ম্মের মূলে প্রাণময় জাগ্রত ভগবানের সহিত প্রীতির সূত্রের সন্ধান আমাদের মিলিয়াছে। দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে তাঁহার কৃপাই আমাদের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনীয়। গীতার দেবতা তাঁহার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতি তাঁহার উক্তি অনুনয়ের আকারেই আসিয়াছে, এই কথাই বলিতেই হয়। এ যেন আমাদের কাছে প্রার্থনা। আমরা ভগবানের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিব কি? করিলেই তিনি কৃতার্থ হইবেন। ফলতঃ আমরা প্রাণহীন। এজন্য আমাদের জীবন দৈন্যময়। এই দৈন্যভার অন্তরে লইয়া আমরা আমাদের বুদ্ধি-বিচারের যতই অহঙ্কার করি না কেন, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যান-ধারণা সকল পথেই আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে এবং ইন্দ্রিয়সুখের পাকচক্রে পড়িয়া সংসার-বন্ধনই আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। গীতার দেবতা আমাদিগকে আপন করিয়া লইবার জন্য তাঁহার বদান্য-লীলার প্রজ্ঞানঘন লাবণ্য বিস্তার করিয়াছেন। শিক্ষাদানের ছলে এ যেন আমাদের কাছেই তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা। অর্জ্জুন বিষাদগ্রস্তচিত্তে যাঁহার নিকট আর্ত্ত হইয়াছিলেন, গীতার উপসংহারভাগে আমরা তাঁহাকেই অর্জ্জুনের নিকট আর্ত্তস্বরূপে তাঁহার পরম প্রসাদে প্রমূর্ত্ত দেখিতে পাই। তিনি অর্জ্জুনকে তাঁহার ইষ্ট বলিতেছেন, বলিতেছেন—'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।' আবার তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় বলিতেছেন, বলিয়াও যেন তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না, বলিতেছেন বারংবার। বলিতেছেন প্রতিজ্ঞা করিয়া যে তুমি আমার। অর্জ্জুন তাঁহার উক্তি একাগ্রতার সঙ্গে শুনিয়াছেন—অর্জ্জুনের মুখ হইতে এই জবাবটি পাইলেই তিনি যেন কৃতার্থ হইয়া যান। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একাদশ অধ্যায়ের পর হইতে গীতোক্ত

সাধনা অনুলোম গতির রীতি অবলম্বন করিয়াছে। ভক্তের সাধনা—ভগবান কর্ত্তৃক ভক্তের সাধনার পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভক্তকে ভগবানের ভজন করিতে হইবে কি ? ভগবানই যে ভক্তের ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আসিয়া বরণ করিতেছেন। এই বরণই তাঁহার ভজন। আমাদের প্রতি গীতার দেবতার এমন প্রীতি এবং তাহার এই বিবর্ত্ত-রীতি কাহার চিত্তে না চমৎকৃতির সৃষ্টি করে ? তিনি তো দূরে নহেন। ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—'প্রাণেরই প্রাণ তুমি প্রাণ-রমণ।' তাঁহার করুণায় আমাদের অন্তর গলিয়া গেলে সম্মুখেই তাঁহাকে আমরা পাই। তিনি আমাদিগকে বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ করি তাঁহার গুণলীলা। গীতার সাধনাঙ্গে আমাদের প্রতি তাঁহার এই অন্তরঙ্গ ভাবটি সর্ব্বত্র তরঙ্গিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমাদিগকে চাহেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম 'অশ্রোত্রমবাক্' (৩।৮।৮)। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আমরা দেখিতে পাই—ব্রহ্ম 'সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ' (৩।১৪।২) অর্থাৎ ব্রহ্ম অবাকী এবং অনাদর। মায়াবাদীগণ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যাঁহাকে বাগিন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত এবং অনাদর বা সকলের সম্বন্ধে আগ্রহবিহীন বলিয়াছেন, আমরা অপ্রাকৃত নরদেহধারণকারী সেই পূর্ণব্রহ্মেরই বচনে বচনে আমাদের জন্য এমন ব্যথা দেখিতেছি। আমাদের প্রতি তাঁহার নজরে নজরে এমন আদরের পরিচয় আমরা পাইতেছি। তিনি আমাদের সুহৃৎ অর্থাৎ সমপ্রাণ। আমাদের সহিত প্রাণধর্ম্মের এমন প্রদ্দীপ্তিতেই তিনি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর। সুখে দুঃখে আমাদের সঙ্গীস্বরূপে আমাদের ঘরে থাকিয়াই চরাচরে তাঁহার বিভূতি বিলসিত। তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যকে জড়াইয়া রহিয়াছে। এই মাধুর্য্যই গীতার বীর্য্য। প্রথম ষট্‌কের উপসংহার হইতে এই মাধুর্য্যের গতি উত্তরোত্তর পরিস্ফীত হইয়া তৃতীয় ষট্‌কে সর্ব্বভাবে আমাদিগকে তাঁহার প্রীতির বিবর্ত্তের রীতিতে পরিপূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। আমাদিগকে দিয়াছে তাঁহার শরণাগতি।

বিবর্ত্ত-রীতিতে আবর্ত্ত

সান্ত হইতে অনন্ত। সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধির ক্রম গীতার ষট্‌কের শেষ ভাগে অর্থাৎ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ-দর্শনের মধ্যে পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, গোপাঙ্গনাগণ প্রতিলোম এবং অনুলোম উভয়পথে শ্রীহরিকে ভজনা করেন। অনুলোম হইতে প্রতিলোম আবার প্রতিলোম হইতে অনুলোম সাধ্যতত্ত্বের সাধনার এইটিই পূর্ণ ক্রম। 'কৃষ্ণকে নাচায় প্রেম'—নাচায় ভক্তের জন্য, আবার ভক্তকে নাচায় কৃষ্ণের জন্য। নিজে সব জুড়িয়া তিনে এক হইয়া নাচে উপর্যাধ ব্যাপ্ত করিয়া—'নাহিক নিয়ম।' ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, যিনি পৃথক্ পৃথক্ ভূতসমূহকে আত্মাতেই একত্র অবস্থিত দর্শন করেন এবং সেই আত্মা হইতেই ভূত সকলের বিকাশ উপলব্ধি করেন, তিনিই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মা এব ইদং সর্ব্বং"—আত্মাই এই সমস্ত। ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবের নিকট প্রশ্ন করেন—মহামুনি, আপনি বলিয়াছেন স্ব স্ব পুত্র হইতেও শ্রীকৃষ্ণের উপরে ব্রজবাসীগণের অধিক স্নেহ ছিল। তাহাতে আমার মনে এই সন্দেহ হয় যে, নিজ নিজ পুত্রের উপরেও ব্রজবাসীগণের যে স্নেহ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, অপরের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের উপরে তাহাদের তেমন স্নেহ কি প্রকারে হইতে পারে? উত্তরে শুকদেব বলেন, মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ সকলের আত্মা। শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের নিকট স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত পদার্থই তদ্রূপ। সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া জগতে অন্য কোন বস্তুই নাই। বিশ্বরূপ-দর্শন পর্য্যন্ত গীতোক্ত উপদেশে প্রতিলোম গতির রীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বরূপ-দর্শনের পর প্রতিলোম হইতে অনুলোমের রীতিতে গীতা সান্তের মধ্যে যিনি অনন্ত তাঁহাকে, মহৎ হইতেও যিনি মহীয়ান্, অণু হইতে অণুর অন্তরে যিনি তাঁহাকে প্রজ্ঞানময় ঘনীভূত সংবেদনে সমাত্মসম্বন্ধে প্রমূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে। এই পথে শরণাগতি

বা সর্ব্বভাবে প্রণতিতে গীতোক্ত পরম গুহ্য তত্ত্বের শাশ্বত এবং অব্যয় স্বরূপটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দুই ষট্‌কে কর্ম্মের পথে গীতোক্ত সাধনার প্রতিলোম গতি, কর্ম্ম হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি এই ধারা ধরিয়া উর্দ্ধাভিমুখে সম্প্রসারিত হইয়াছে। প্রতিলোম সাধনা হইতে পরে আসিয়াছে অনুলোম সাধনা। প্রতিলোম সাধনা কৃতিসাধ্যা অর্থাৎ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুলোম সাধনা কর্ম্মের মূলে ভগবদনুভূতির বীজটি উপলব্ধি করিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের অন্তরে রাগানুগা রতি উদ্দীপ্ত হইয়াছে। এই রতির সার্থকতা প্রণতিরই পথে। গীতার দেবতা সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে তাঁহার নিজ ভাবটির উপলব্ধি-সূত্রে সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাগতিতে আমাদের জীবনের সার্থকতা পরিস্ফুর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই ভাবে প্রতিলোম হইতে অনুলোম-ক্রমে ভগবদনুভূতিতে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সঙ্গতিতে গীতোক্ত সাধনার পরিপূর্ত্তি।

প্রকৃতপক্ষে অনুলোম গতিই জগতের সর্ব্বত্র। ভগবান বিশ্ববীজ-স্বরূপ। তিনি তাঁহার নিজভাবটি বিস্তার করিয়া এই বিশ্বকে ধারণ এবং পোষণ করিতেছেন; প্রতিক্ষণ নামিয়া আসিতেছেন আমাদের দিকে। এমনই তাঁহার কৃপা—তিনি আমাদের জন্য কি করিতেছেন, এইটি পাওয়াকেই বলিব কৃপা। কৃপা বলিতে কোন কোন মহাজন 'কর' 'পাও' এই ভাবটি বুঝিয়াছেন। আমরা কিন্তু কৃপা বলিতে ভগবান আমাদের জন্য কি করিতেছেন তাহা বুঝিয়া পাওয়াই বুঝিয়া থাকি। বস্তুতঃ আমরা নিজেদের কাজের কথাই শুধু ভাবি, ধর্ম্মের সাধনের ক্ষেত্রেও আমাদের সেই বিচার। কিন্তু ক্রতুস্বরূপে ভগবান আমাদের জন্য কাজ করিতেছেন, এইটি আমরা স্মরণ করি না অথবা কি করিয়াছেন তাহাও তলাইয়া বুঝিতে চাহি না। মায়াবদ্ধ জীব দেহাভিমানবশতঃ ভগবৎ-কৃপার এই নিত্যস্ফুর্ত্ত উৎসটির সন্ধান পায় না, তাই সাধনার গতিতে উর্দ্ধমুখে উঠিতে চায়। উঠিতে হয়ও, কারণ নিজেদের অসহায়ত্ব একান্ত করিয়া না বুঝিলে শ্রীভগবানে নির্ভরতা জীবন্ত হয় না।

নিঃস্বতার অনুভূতিতে নিজেদের অহঙ্কার নিঃশেষ না করিলে ভগবৎ-প্রেমের স্পর্শ আমরা অনুভব করিতে পারি না। ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলার অবিশ্রান্ত অনুধ্যানে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্তরে আগুন জ্বলিয়া না উঠিলে এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি নিজে জীবকে বরণ না করিলে কোন ভাবেই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় নাই। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগের পথে চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে এ সব কথা অনেকটাই পরোক্ষ। প্রিয়স্বরূপে ভগবানকে অন্তরে উপলব্ধি না করিতে পারিলে চিত্ত কাহারও স্থির হয় না। 'হৃষীকেশে হৃষীকানি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি, স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীব-চঞ্চলে।' প্রিয়স্বরূপে তাঁহাকে পাইতে হইলে তিনি আমাদের জন্য কি করিতেছেন ইহা উপলব্ধি করা আগে প্রয়োজন, কারণ প্রিয়ত্ব বস্তুটি পারস্পরিক। গীতায় ভাগবত-ধর্ম্মের মূলীভূত এই সার্ব্বভৌম সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট কুলজাত অতএব তাঁহাদের কর্ম্ম উৎকৃষ্ট এবং চণ্ডাল অপকৃষ্ট কুলজাত সুতরাং তাহাদের জন্মগত বৃত্তি বা স্বকর্ম্ম অপকৃষ্ট। ধর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া আমরা স্বভাবতঃ এইরূপ সংস্কারে অভিভূত হইয়া থাকি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই ভ্রান্ত সংস্কার সর্ব্বাংশে বিচূর্ণ করিয়াছেন। সমস্ত কর্ম্মের মূলেই আছেন ব্রহ্ম—ইহা গীতার দেবতা দেখাইয়াছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন, স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও পারিপাট্যের সহিত অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে শ্রীভগবান স্বভাব-নিয়ত কর্ম্মকে স্বধর্ম্ম এবং তৎবিরোধী কর্ম্মকে পরধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উক্তিটি বুঝিতে গোল ঘটিবার কথা। কিন্তু পরবর্ত্তী ৪৮শ শ্লোকে ভগবদুক্তিতে তাৎপর্য্যটি সম্যক্‌রূপেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই শ্লোকটি উপদেশ নহে, আমাদের প্রতি শ্রীভগবানের আদেশ স্বরূপেই আসিয়াছে বলিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন

দোষযুক্ত হইলেও সহজ-কর্ম্ম ত্যাগ করিও না। সর্ব্বারম্ভের মূলেই দোষ ধূম দ্বারা অগ্নির ন্যায় কর্ম্মকে প্রভাবিত করে। সর্ব্বারম্ভ বলিতে কেহ কেহ কর্ম্মমাত্রকেই বুঝাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে সব কর্ম্মেরই প্রথমটি দোষযুক্ত থাকিবে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু বিহিতভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে সেই কর্ম্মের ভিতরই ব্রহ্মার্পণরূপ অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। আবার কেহ কেহ সর্ব্বারম্ভ বলিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মূলে আমাদের সঙ্কল্প বা অভিসন্ধি বুঝিয়াছেন। সব কর্ম্মের মূলে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধের ভাবটি গ্রহণ না করিলে কর্ম্ম আমাদের সঙ্কল্প-সংশ্লিষ্ট হয় এবং সঙ্কল্প বলিতে কাম-সঙ্কল্পই বুঝিতে হইবে। কোন কর্ম্মই দোষের নয়, কিন্তু কর্ম্মের আরম্ভই দোষ। আমরা নিজেদের পক্ষে সহজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যখন অভিমানবশতঃ উচ্চতর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্‌যুক্ত হই—কর্ম্মের আরম্ভ তখনই আসিয়া দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত অর্থই সমধিক উপাদেয় বলিয়া মনে হয়। কারণ সহজ-কর্ম্মে দোষযুক্ত ভাবটি উদ্রিক্ত করা এ ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় না। সব কর্ম্মই ঈশ্বরের। তিনি প্রভু, আমি ভৃত্য। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। এই ভাবটি লইয়া কর্ম্মকে দেখিলে সহজ কর্ম্মেও কোন অবস্থাতেই দোষযুক্ত ভাব আমাদের চিত্তে উপজাত হইতে পারে না। পরন্তু আমাদের সমস্ত কর্ম্ম মানব-ধর্ম্মে উদ্দীপিত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্ম্মের বাহ্য আকারটি যেমনই হোক্ না কেন কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ভগবানের সেবা। এই সেবার ভাবটি আমাদের চিত্তে সঞ্জাত হয় ভগবানের সহিত সম্বন্ধের সূত্রে। এই সম্বন্ধের ভাবটি লইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে সেই কর্ম্ম-সাধনের পথেই আমাদের পরমার্থ সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে এবং কর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রশ্নই সে ক্ষেত্রে উঠে না। বস্তুতঃ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মূলে ভগবদ্ভক্তি না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানের সূত্রে আমাদের অহঙ্কার আসিবে এবং অহঙ্কারের আনুষঙ্গিকভাবে কর্ম্মে আসক্তিও উৎপন্ন হইবে। সে ক্ষেত্রে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের চিত্তের পরিশুদ্ধি কোন ভাবেই ঘটিবে না। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ইহাই ধারা।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, বহুপ্রকার করণ, বিবিধ চেষ্টা এতৎসহ দৈব—এই পাঁচটি সমস্ত কর্ম্মের মূলে থাকে। মানুষ শরীর, বাক্য এবং মনের সাহায্যে যে কর্ম্মে উদ্‌যুক্ত হয়, উক্ত পাঁচটি তাহার হেতুস্বরূপে কাজ করে। 'দৈব' বলিতে কেহ কেহ অন্তর্য্যামী বা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ সোজাসুজি ঈশ্বরকে বুঝাইয়াছেন, কিন্তু আমরা দৈব বলিতে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারই বুঝিয়া থাকি। কারণ এই সংস্কারবশেই জীব কর্ম্মের আরম্ভকারী কর্ত্তা বলিয়া নিজকে উপলব্ধি করে এবং তাহার ফলে বন্ধনে পতিত হয়। পরমাত্মা বা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এখানে আবরিত। এই আবরণ বা অবিদ্যার মোহ হইতে জীবকে মুক্ত করাই গীতোক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য। হেত্বাধীন কর্ত্তা এবং কর্ত্তাধীন করণ। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বা দৈবের প্রভাবে জীবই কর্ত্তা। কর্ত্তৃত্বাভিমান উপজাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অসৎকর্ম্ম বা কাম্য কর্ম্মে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে বা করণসমূহ প্রযুক্ত হয়। এই প্রবৃত্তির ফলে বিভিন্ন দেবতার উপাসনায় তাহার চিত্তে উন্মুখতা জাগে। দেবতাগণ পূর্ব্ব কর্ম্মের সংস্কারানুযায়ী আমাদের মনকে কর্ম্মে প্রযুক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা 'ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ' (ভাঃ- ১।২।৫) কর্ম্মের মূলে ভগবদ্-শক্তির এই প্রণোদনাত্মক ভাবটিই দৈব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 'অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্' ভগবান পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছেন। কাম্যকর্ম্মের আকর্ষণে পতিত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয়চেষ্টা, সবই দেবতাদের অধীন হইয়া পড়ে। জীবের প্রাণ-কর্ম্মে চৈতন্যাংশ উপহিত হয়। দৈব এক্ষেত্রে জীবের জন্ম এবং কর্ম্ম-চক্রে বিবর্ত্তন ঘটাইতে থাকে। অজ্ঞানতার ও অন্ধতার সে রাজ্য, গুণকর্ম্মের সেখানে প্রভাব। জীবের সর্ব্বকর্ম্মের মূলে ভগবানের সম্বন্ধটি উদ্‌বুদ্ধ হইলে পরম দেবতার কৃপাশক্তি লাভ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হয়। সেই কৃপাশক্তির প্রভাবে কর্ম্মফল এবং কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব-বোধ হইতে সে মুক্ত হয়। তাহার শরীর, বাক্য এবং মনের মূলে পরম দেবতার কৃপা-প্রণোদিত হওয়াতে ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণও তাঁহার আত্মোন্নয়নে আনুকূল্য করিতে অগ্রসর হন। বিভিন্ন

দেবগণের প্রতিকূলতার প্রভাব হইতে মুক্ত তাঁহার অন্তর-শতদল দেবতার যিনি পরম দেবতা তাঁহার প্রেমের স্পর্শে বিকশিত হইয়া উঠে। পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব এই ভাবে জীবের অন্তরে সাক্ষাৎসম্পর্কে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁহারই বিভূতিস্বরূপে দেবশক্তির উজ্জীবনে জীবের মন এবং দশেন্দ্রিয় পরিচালিত হয়। অহঙ্কারাদির অধিষ্ঠাতা শঙ্কর প্রভৃতি দেবতার অনুকূল শক্তিসহযোগে জীব কর্ম্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত তাহার দিব্যস্বরূপে সে অবস্থায় সংস্থিতি লাভ করে। ঊর্দ্ধলোক হইতে শ্রীভগবানের কৃপার প্রবাহ অবতরণ করিয়া জীবকে উদার বীর্য্যে উদ্দীপিত করে। জীবের কর্তৃত্বাভিমান এই ভাবে শ্রীভগবানে প্রণিহিত হওয়াতে ভগবৎ-সম্বন্ধে বিভিন্ন করণের ব্যবধানও তাহার পক্ষে অনুভূত হয় না। তখন 'আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন' এই ভাবে ভগবৎ-ভজনটি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জীবের জীবনে সত্য হইয়া উঠে।

'হৃদয়ে প্রেরণ কর—জিহ্বায় কহাও বাণী,
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি।'

তখন এই ভাব। জীব সে অবস্থায় যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী। কর্তৃত্ব যাঁহার—ফলভোগীও হইবেন তিনিই। কর্তৃত্ব অধিকার করিয়াছেন ভগবান; সুতরাং—'হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে' অর্থাৎ সমস্ত লোক হনন করিলেও সে হত্যাকারী হয় না।

এইভাবে ভগবানে নিষ্ঠাবুদ্ধি রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে চিত্তে অনাসক্তি উদ্রিক্ত হইলে বা চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইলে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি লাভ হয়। ইহা কিরূপে লাভ করা যায়? অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪তম শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রসন্নাত্মা। তাঁহারা শোক করেন না, কামনা করেন না। তাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে পরাভক্তির প্রকর্ষতার প্রতিষ্ঠাসূত্রেই এখানে জ্ঞান-মিশ্রা

ভক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সাধ্যস্বরূপে নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকট সাধ্যের নির্ণয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে প্রভুর কৃপা-প্রণোদিত হইয়া রায় 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' প্রভৃতি অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্লোকটি উল্লেখ করেন। প্রভু বলিলেন, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর'। বাহ্যই বটে! অন্ততঃ অষ্টাদশ অধ্যায়ে আসিয়া যখন শ্রীভগবানের মুখে আমাদের প্রতি তাঁহার পরম প্রীতির প্রগাঢ় রীতির স্পর্শটি অন্তরে আমরা লাভ করি তখন আত্মনিষ্ঠ নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আমাদের নিকট বাহ্য হইয়াই পড়ে। প্রীতি-প্রণোদিত শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া অনুলোম গতির ক্রম-পারম্পর্য্যে আমাদের কাছে ভগবান আত্মমাধুর্য্য উন্মোচনে আকুল হইয়া এমন ভাবেই আগাইয়া আসিয়াছেন। কথার চাতুরী ছড়াইয়া দাতা প্রকট করিয়াছেন আমাদের প্রতি তাঁহার ব্যথা, দেখাইয়াছেন আমাদের জন্য তাঁহার মমতা। আমরা অহঙ্কার ছাড়িয়া একটু আগাইয়া গেলেই ভগবদুক্তির মূলীভূত আবেগটি আমাদের সমগ্র অন্তর আলো করে। পরবর্ত্তী ৫৫ তম শ্লোকে ভগবানের পূর্ব্বোক্তির মূলীভূত উদ্দেশ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমি কে এবং কত প্রকার আমার স্বরূপ, শুধু ভক্তির দ্বারাই সমগ্রভাবে আমার সেই তত্ত্বের উপলব্ধি হইতে পারে। ভক্ত আমাকে তত্ত্বত অর্থাৎ সমগ্রভাবে জানিয়া আমার মধ্যে প্রবেশ করেন। 'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ'—ঠিক এই কথাই আমরা ভগবানের মুখে আগেও শুনিয়াছি। একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তিনি তাঁহার নিকট পরাভক্তির এই মাহাত্ম্যই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাঁহার উপদেশের উপসংহার-ভাগে আসিয়া সেই পরাভক্তির মাহাত্ম্যই নিজবীর্য্যের সমধিক মাধুর্য্যে তিনি প্রকট করিলেন। প্রতিলোম সাধনার পথ যিনি প্রথম দুই ষট্‌কে দেখাইয়াছিলেন—তিনিই প্রেমধর্ম্মের অনুলোমক্রমে আমাদের কাছে নামিয়া আসিলেন। পূর্ব্বোক্তির পুনরাবৃত্তির দ্বারা শ্রীভগবান আমাদের প্রতি প্রজ্ঞানময় সংবেদনটি সমধিক পরিস্ফুট করিলেন। উভয় উক্তির মধ্যে

পার্থক্য মাত্র এইটুকু। তিনি এবার ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্যের বিচার ছাড়িয়া তাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য জীবের নিকট দাবী করিলেন। এ দাবী শুধু কর্ম্মফল ত্যাগের নয়, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, এমন কি, সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম, সামান্য-ধর্ম্ম সর্ব্ব-ত্যাগের দাবী। কেবল ত্যাগ নয়, দাবী পরিত্যাগের অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগের। কেবল ত্যাগের অর্থ কর্ম্মফল ত্যাগ ইহা ভগবান প্রথম শ্লোকেই বলিয়াছেন—'সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহু স্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ' 'পরি' এই উপসর্গের অস্যার্থঃ—'সর্ব্বতোভাবঃ।' (শব্দকল্পদ্রুম) ফলকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা জ্ঞানযোগেরই পথ। এক্ষেত্রে তাহা উদ্দিষ্ট নয়। দাবী প্রীতির —ভক্তির। এই দাবীতে জীবের প্রতি শ্রীভগবানের প্রীতির বিবর্ত্তের আবর্ত্ত-রীতির পূর্ণ পরিণতি বা পরিপূর্ত্তির পরিচয় আমরা পাই। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' এই প্রতিশ্রুতি আমরা ভগবানের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু "সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় গোপীর ভজনে।" সম্ভবতঃ নিজের এই দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়াই ভগবান গীতার নবম অধ্যায়ে ভক্তের প্রেমবশ্যতার পারতন্ত্র্যে ভক্ত-রক্ষার জন্য নিজে প্রতিজ্ঞা করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। পরে তিনি অর্জ্জুনের মুখ দিয়া নিজের অন্তরের আকুলতাকে অভিব্যক্ত করাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চিত জানিও। তুমি ঢাকে-ঢোলে জগতে এই সত্যটি প্রচার করিয়া দাও। কিন্তু দেখা যায় গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে গীতা-বিজ্ঞানের চরম কথাটি শুনাইতে উন্মুখ হইয়া ভগবান স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভক্ত হও। আমাতে পূজাপরায়ণ হও। আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইজন্য আমি সত্যপূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এইরূপে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকট ক্রমে ক্রমে চারটি দাবী করিয়াছেন।

গীতার নবম অধ্যায়ের উপসংহারেও তিনি উক্ত প্রকার দাবী করিয়াছেন দেখা যায়। তাঁহার কথা রক্ষা করিতে হইলে অর্জ্জুনকে তৎপরায়ণ হইতে হইবে, তাঁহাতে যুক্ত হইতে হইবে এবং তবে তাঁহাকে লাভ করিবেন—এমন কথাই সেখানে উল্লেখ ছিল। অন্য কথায় অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান মন্মনা হও, মদ্ভক্ত হও, মৎযাজী হও, আমাকে নমস্কার কর বলিয়া যে কয়েকটি আদেশ করেন, সেগুলি তাঁহাকে লাভ করিবার প্রকরণ বা সাধনাঙ্গ-স্বরূপেই উপদিষ্ট হয়। বস্তুতঃ তিনি তখনও বিনাসর্ত্তে অর্জ্জুনের কাছে ধরা দেন নাই কিংবা অযাচিতভাবে তাঁহাকে ভক্তি বিতরণে উন্মুখ হন নাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও ভগবান বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপর জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যজ্ঞ, দান তপস্যা এই সব কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণটি সঙ্গে সঙ্গেই দেখানো হইয়াছে এইগুলি চিত্তশুদ্ধিজনক। তবে কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক এইগুলির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ম্মফলে যিনি আসক্তি ত্যাগ করেন তিনিই ত্যাগী। এই প্রসঙ্গে তামস ত্যাগী, রাজস ত্যাগী এবং সাত্ত্বিক ত্যাগীর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—দেহাভিমানী ব্যক্তিটি নিঃশেষরূপে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যাহারা কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করেন তাঁহারই ত্যাগী। এই ভাবে ভগবান কয়েকটি শ্লোকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তাহার ফল ত্যাগের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। গীতার উপসংহার ভাগেও ৪৫শ শ্লোক হইতে ৫৭তম শ্লোক পর্য্যন্ত তাঁহাকে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অর্জ্জুনকে তৎপর হইতে বলিয়াছেন এবং ইহাও জানাইয়াছেন যে, সেই ক্ষেত্রেই তিনি অর্জ্জুনকে সর্ব্বদুঃখ অর্থাৎ সংসারের হেতুভূত সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন। পরন্তু অর্জ্জুন সেই পথে না চলিলে তাঁহার সমূহ বিপদ ঘটিবে—'অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।' এইরূপ কঠোর শাসন-বাক্যও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনকে তাঁহার মুখ হইতেই শুনিতে হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের

৬৫তম শ্লোকে কিন্তু ভগবদাদেশ-সংশ্লিষ্ট সর্ত্ত কয়েকটি নাই। সাধনার দ্বারা তাঁহাতে একান্ত এবং যুক্তচিত্ত হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে নতুবা নয়, এই ভাবটি গীতার উপসংহারভাগে ভগবনির্দ্দেশে আমরা পাই না। পরন্তু তিনি এদিক ওদিক কোন দিকে না তাকাইয়াই অর্জ্জুনের নিকট এক প্রকার তিন সত্য করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ের তাঁহার উক্তিটি স্মরণ করিয়া বলিতেছেন যে একথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি তথাপি দৃঢ়তা বিধানের জন্য পুনরায় বলিতেছি। বোঝা যাইতেছে, এক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রিয় সম্বন্ধেরই বাঁধনে তিনি পড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আমার কথা অনুসারে কাজ করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। তুমি আমাকে মন অর্পণ কর। সর্ব্বদা আমার বিষয় অর্থাৎ আমার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির বিষয় চিন্তা কর। তুমি আমার ভক্ত হও অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের বা যোগমার্গের সাধকগণের ন্যায় আমার পরমাত্ম-স্বরূপের ধ্যানমাত্রযোগে অন্য লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন তুচ্ছ করিয়া আমাকে আপন করিয়া লও। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমার সেবায় নিযুক্ত হও। আমাকে পূজা কর—ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্যাদির দ্বারা আমার অর্চ্চনা কর। আমার পায়ে পড়িয়া যাও। ভূমিতে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গে আমাকে প্রণাম কর। ইহার সমস্তই কর বা কোন একটিই কর তাহা হইলেই তুমি আমাকে পাইবে। অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিতেছ তাহার মূল্য কি? বিশেষতঃ মথুরা অঞ্চলের লোকেরা প্রতি বাক্যেই এইরূপ শপথ করিয়া থাকে। কিন্তু পরে তাহারা কথা রাখে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ উত্থাপন করিয়াছেন সে কথা। তিনি বলিয়াছেন—'নন্থ মাথুর-দেশোদ্ভূতা লোকাঃ প্রতিবাক্যমেব শপথং কুর্ব্বন্তি।' অর্জ্জুনের মনের সন্দেহটির ভাব ভগবানের চিত্তেও জাগিল। তাই তো, বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আসিবার সময় তো গোপীদের কাছেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন—

'গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে।

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্ব-প্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ।'

(ভাঃ-১০।৩৯।৩৪-৩৫)।

অর্থাৎ গোপীগণ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রস্থানে গোপীগণকে অতিশয় সন্তপ্তা দেখিয়া 'আমি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ প্রেমপূর্ণ বচন দূত দ্বারা প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিলেন। সত্যই তো, সে প্রতিজ্ঞা তিনি এ পর্য্যন্ত পালন করিয়াছেন কি? অর্জ্জুনের এই সন্দেহের নিরসন করিবার জন্য তিনি বলিলেন, অর্জ্জুন, তুমি আমার প্রিয়, প্রিয় ব্যক্তিকে কেহ প্রতারিত করে না, 'ত্বং মে প্রিয়োঽসি ন হি প্রিয়ং কোঽপি বঞ্চয়তীভাব':—(চক্রবর্ত্তীপাদ)। আমার কথা অনুসারে কাজ করিলে তুমিও প্রতারিত হইবে না। আমি তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা কখনও লঙ্ঘন করিব না। অর্জ্জুনের প্রার্থনার মূলে তাঁহাকে ছাড়া তাঁহার অন্য প্রার্থনার কিছু আছে কিনা এই প্রশ্ন ভগবানের মনে উদিত হওয়াতেই ৫৭তম শ্লোকের উক্তির ভঙ্গীটির এখন তিনি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পরে অর্জ্জুনের মনের উপযোগী কথা তাঁহাকে দিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৬ তম শ্লোক হইতে ৬৫ তম শ্লোকে কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা এবং কর্ম্মজ্ঞানাদিতে অনাবৃত শুদ্ধাভক্তির পথে সাধ্যতত্ত্ব অধিগত হইবার ক্রমটি গুহ্য, গুহ্যতর এবং গুহ্যতমস্বরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। গুহ্য এবং গুহ্যতর সাধনার পথে সাধকদের নিজের জন্য আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনারই প্রাধান্য। ভগবানের সেবা-প্রার্থীগণ নিজেরা তো মোক্ষ চাহেনই না, ভগবান তাঁহাদিগকে মোক্ষ দান করিতে আসিলেও তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করেন। এইটি গুহ্যতম।

শ্রীভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে কয়েকটি শ্লোকে জ্ঞান ও কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির সাধ্য বস্তুকে 'অনাবৃত্তি', 'শাশ্বতপদ', 'শাশ্বত স্থান' প্রভৃতি

পদে উল্লেখ করিয়া পরিশেষে গুহ্যতমতত্ত্ব স্বরূপে তাঁহাকে পাওয়া অর্থাৎ তাঁহার সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। আমাদিগকে আপন করিবার তাঁহার এই আগ্রহাতিশয্যের দিকটা উপেক্ষা করিয়া শুধু নিজেদের বিচারই কি আমরা বড় বলিয়া বুঝিব? তিনি তো প্রপন্নার্ত্তিহরণকারী শ্রীহরিরূপে অর্জ্জুনের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। আমাদের সকল কর্ম্ম শোধনের ভার তিনি যে নিজেই লইয়াছেন।

শরণাগতিতে পরিপূর্ত্তি

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৬তম শ্লোকটি আমাদিগকে অনেকখানি আশ্বস্ত করে। কর্ম্মের গতি অতি গহন। যাঁহারা মুনি তাঁহারাও কোনটি কর্ম্ম, কোনটি অকর্ম্ম এই বিচারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ কর্ম্ম, অকর্ম্ম এবং বিকর্ম্মের গ্রন্থি মোচন করিতে গিয়া আমরা গোলে পড়িয়া যাই। এই অধ্যায়ের উপসংহারভাগে গীতোক্ত কর্ম্ম-বিজ্ঞানের সার কথাটি ভগবান বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সূত্রে তাঁহার মুখে সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা এবং বিগতস্পৃহ হইয়া সন্ন্যাসের পথে কিরূপে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ হয়, জ্ঞানের পরমনিষ্ঠা বস্তুটি কি, তিনি বুঝাইতে বসিলেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে যুক্ত হইয়া ধৃতির সাহায্যে বিষয়-সংস্পর্শ হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া ধ্যানযোগ এবং বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ হইতে বিমুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়, এ সব কথা এখানে আমরা শুনি। চিত্ত আমাদের পরিশ্রান্ত হইয়া উঠে। এত সব সাধ্য-সাধনা করিয়া উঠা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব ? বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীব আমরা। আমাদের উপায় কি ? অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৬ তম শ্লোকটি শুনিয়া আমরা ভরসা পাই। ভগবান বলিলেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব-কর্ম্ম—বিহিত কর্ম্ম কি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম, যে কোন কর্ম্ম আমরা করি না কেন, আমরা তাহাতেই তাঁহার প্রসাদে শাশ্বত অভয় পদের অধিকারী হইতে পারি। স্বয়ং তাঁহার মুখে এমন কথা শুনিয়া আমরা বুকে অনেকখানি বল পাই। নবম অধ্যায়ের ৩২শ শ্লোকে আমরা শ্রীভগবানের মুখে কতকটা এই ধরণের কথাই শুনিয়াছি।

'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥'

কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ভজন অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির পরিশুদ্ধির প্রশ্ন ছিল। 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা'—ধর্ম্মাত্মা বা ধার্ম্মিক হইবার অপেক্ষা সেখানে

ছিল। কিন্তু জীবের পরমার্থ কি ধর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধ হয় ? নচিকেতা যমকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ।'

(কঠোপনিষদ-১।২।১৪)

ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য এবং কারণ হইতে ভিন্ন, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হইতেও ভিন্ন বলিয়া যে বস্তু আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই আমাকে বলুন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম প্রতিপালনের পথে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মে নয় এবং আমাদের কোন কর্ম্মেই নয়। কাম্যকর্ম্মেই স্বভাবত আমাদের প্রবৃত্তি। বস্তুতঃ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন কর্ম্মই আমরা করি না কেন, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি পাইব। গীতোক্ত উপদেশের মধ্যে এমন আশ্বস্তি আমরা নবম অধ্যায়ে পাই নাই। শুধু নবম অধ্যায়ে কেন ইতিপূর্ব্বে গীতার কোথায়ও পাই নাই। কিন্তু তবু আমাদের বুক ধুক্ ধুক্ করে—ভগবদ্ভুক্তিতেও যেন চুক কিছু থাকিয়াই যায়। ভগবানকে সর্ব্বভাবে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। নবম অধ্যায়েও 'ব্যাপাশ্রয়' এখানেও সেই 'ব্যাপাশ্রয়', পার্থক্য শুধু এক্ষেত্রে বিহিত কি অবিহিত আমাদের যে কোন কর্ম্ম করার খোলামেলা অধিকার আমরা পাইতেছি। বস্তুতঃ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের কোন ঝক্কিই আমাদের থাকিতেছে না। কর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের প্রতি তাঁহার প্রসাদের কথা এখানে আসিয়াছে, নবম অধ্যায়ে এইটি নাই। কিন্তু তাঁহাকে আশ্রয় করিবার যে কথাটি তিনি বলিতেছেন, তাহা পালন করিবার অধিকারই বা আমাদের কোথায় ? তাঁহাকে তো আশ্রয় করিব, কিন্তু সে তিনি কেমন, আমাদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি ? তাঁহার প্রসাদের মহিমা তো শুনিলাম। কিন্তু যদি তিনি আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া পড়েন, বিশ্বাস কি ? আমরা উদ্বেগভরে শ্রীভগবানের মুখ হইতে আরও কিছু শুনিতে চাই। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় করিব—ইহারই

বা অপেক্ষা কেন? তিনি নিজেই তো বলিয়াছেন, আমিই সকলের গতি, আমিই প্রভু। আমিই সকলের রক্ষক এবং প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ হিতকর্ত্তা বা সুহৃৎ। তাঁহার এই উক্তিই যদি সত্য হয় তবে আমরা তাহাকে আশ্রয় করিব, তবে তাহাকে পাইবার ভাগ্য আমাদের ঘটিবে ইহাই বা কেন? আমরা তাঁহার আশ্রয় লইতে না পারার ক্ষেত্রেও তিনি কি আমাদিগকে আশ্রয় দিতে পারেন না? এই কথাই আমাদের মনে জাগে। জীবের প্রতি তেমন প্রীতির রীতির পরিচয় কি তাহার কাছে মিলিবে না? এই অবস্থায় শুনিলাম ভগবান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যেন তাঁহার শেষ কথাটি—হে অর্জ্জুন, গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা আমি তোমাকে শুনাইলাম। এই দুইটি জ্ঞান—কেমন? বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পথে পারলৌকিক পুরুষার্থ লাভের জ্ঞাপক জ্ঞানকে শ্রীভগবান এক্ষেত্রে গুহ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কর্ম্মযোগের পথে জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগের পথে ভক্তির অধিকারী হইতে হয়। ভগবানকে কর্ম্মফল অর্পণরূপ ভক্তিযোগকেই তিনি গুহ্যতর জ্ঞানের মর্য্যাদা দিয়াছেন। ভগবান তাঁহার উপদেশে গুহ্য বা বিহিত কর্ম্মের কথা বলিয়া তদপেক্ষা গুহ্যতর এই জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর অন্তর্য্যামী-স্বরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তিনি ভূতবর্গকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়া দ্বারা চালিত করিতেছেন। তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গুহ্যতর এই জ্ঞানে ভগবানকে পাইবার পথটি আমরা পাইতেছি না, পাওয়া যাইতেছে—সালোক্য, সামীপ্য প্রভৃতি পঞ্চবিধা মুক্তি। ফলতঃ ভগবদুক্তি অনুসারে আমরা ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অর্থাৎ গীতার ভাষায় কূটস্থ অন্তর্য্যামীস্বরূপ যিনি সেই ঈশ্বরের শরণাগত হইলে তাঁহার প্রসাদ লাভ করিব এই ভরসাই পাইতেছি। ফলে হারাইতেছি

যিনি আমাদের বেদনায় পাগল হইয়া আসিয়াছেন আমাদের কাছে সেই প্রেমের দেবতাকে। বিশ্বের মাঝে বিশ্বের দেবতাকে পাইয়াও আমরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছি। আমরা ধাঁধার মধ্যে পড়ি। গুহ্যতর এই সাধনার কথা উল্লেখ করিয়া ভগবান যেন অর্জ্জুনের মনটি বুঝিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, গুহ্য এবং গুহ্যতর সাধনাঙ্গের সম্বন্ধে আমি তোমাকে সব কথা বলিলাম। অশেষপ্রকারে আলোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তুমি তাহাই কর। এ কেমন কথা হইল—এতদূর লইয়া আসিয়া অবশেষে পথে বসাইয়া দেওয়া? আমাদের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগে। আমরা চোখে আঁধার দেখি। আমাদের ইচ্ছার দিকে তাকানো! সর্ব্বনাশের কথা! তাঁহাকে পাইবার জন্য আমাদের ইচ্ছা যে হইবে না, ইহা কী তাঁহার জানা নাই? কোথায় সে কৃপা ভাগবতে আমরা যাহার পরিচয় পাইয়াছি—

'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্।' (ভাঃ-৫।২৯।১৯)

ভগবান প্রার্থিত হইয়া সকাম মনুষ্যদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন না। যেহেতু দানের পর তাহারা আবার প্রার্থনা করিয়া থাকে। ভজনকারীরা ইচ্ছা না করিলেও তিনি সর্ব্ববিধ কামনার পরিপূর্ত্তিস্বরূপ নিজ পাদপল্লব তাহাদিগকে দান করেন। কোথায় তিনি? অর্জ্জুন কি তবে ভুল করিয়াছেন? অর্জ্জুন ভগবানের চরণে পতিত হইয়া প্রথমেই এই প্রার্থনা করেন যে আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলুন। ভগবান সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন কোথায়? কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি যে পথ তুমি ভাল মনে কর, বিশেষরূপে বিচার করিয়া সেই পথ অবলম্বন কর। স্বভাব-নিয়ত পথের অনুসরণ করিতে এই নির্দ্দেশ নূতন নহে। কিন্তু স্বভাবানুযায়ী গুণ, কর্ম্ম নির্দ্ধারণের নিরিখটি কোথায়? দেশ, কাল এবং

জন্ম-কর্ম্মসম্পর্কে পাত্রানুযায়ী স্বভাবের তো নিত্য বিপর্যায় ঘটে। একমাত্র ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধের সূত্রেই জীবের স্বভাব বা স্বরূপধর্ম্মের নির্দ্ধারণ সঙ্গত এবং সার্থক হইতে পারে। কিন্তু জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ যদি নিত্য হইত তবে তো সাধন-ভজনের কোন প্রয়োজনই দেখা দিত না। শ্রীভগবানের নিজের স্বভাবও একটি আছে। "জীব নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব"। জীবকে স্বভাব-নিয়ত পথ অনুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের স্বভাবটির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল না? যদি তিনি নিজের স্বভাবের দিকে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে 'তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর', ইহা বলিযা তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কি? বাস্তবিকপক্ষে শ্রীভগবান অন্তরে অন্তরে তাঁহার স্বভাব-প্রভাবিত সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপ তাঁহার ব্যক্ত ভাবটি উন্মুক্ত করিবার আগ্রহ লইয়াই গীতার উপসংহারে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। গুহ্য এবং গুহ্যতর জ্ঞানের কথা বলিয়া গুহ্যতম জ্ঞানটি তিনি তাঁহার উক্তিতে হয়ত উহ্য রাখিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু পারিলেন না। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তৎপ্রণীত ভাষ্যে এই রহস্যটি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'অধুনা তু কর্ম্মযোগাৎ তৎফলভূত জ্ঞানাচ্চ সর্ব্বাস্মাদতিশয়েন গুহ্যং রহস্যং গুহ্যতমং পরমং সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং মে মম বচো বাক্যং ভূয়ঃ শৃণু'—এই কথা ভগবানকে বলিতে হইল। অবশেষে জীবের প্রতি অনুগ্রহের পরমবীর্য্যে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সেই গুহ্যতম তত্ত্বটি তিনটি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার নিজের স্বভাবেরই এই দোষ। "বিদিত হইল যত গোপ্য গুণগ্রাম" (চৈঃ ভাঃ)। ভগবান প্রেমার্দ্র কণ্ঠে শ্রীঅর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তবে শোন, আবার শোন, আমার প্রাণের গোপন কথাটি তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমার একনিষ্ঠ ভক্ত, তোমার পক্ষে যাহা শ্রেয় আমি তাহাই বলিতেছি।

তুমি আমাকে তোমার মনটি দাও। আমার ভক্ত হও, আমাকে

ভজনা কর, আমাকে নমস্কার কর। তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি —তুমি আমাকে লাভ করিবে। তুমি আমার প্রিয়।

ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—ধর্ম্ম ছাড়া যাঁহার মুখে কোন কথাই আমরা শুনি নাই ; এমন কি অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকেও ধর্ম্মের প্রতি যিনি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে ভুলেন নাই, তাঁহারই মুখে আমরা শুনিতে পাইলাম ভগবৎ-প্রেমের পরমবীর্য্য-প্রণোদিত বৈপ্লবিক বাণী। ভগবান বলিলেন—দাও, সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দাও। একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না। একেবারে ঢালা হুকুম।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণে এবং রামায়ণ প্রভৃতি ইতিহাস শাস্ত্রে শরণাগতির রীতি অবলম্বনের জন্য জীবের প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শরণাগতির পথে কোন প্রকরণ অবলম্বন করিয়া চলিতে হয় না। ধর্ম্মের পথে চলিতে আমাদের মন স্বভাবতই আগাইতে চায় না। শরণাগতিতে সে দায় নাই। শরণাগতিতে ধর্ম্মের পথে তো চলিতে হয়ই না, বরং সে পথ ছাড়িতেই হয়। সাধন-ভজনে নিয়ম-নিষ্ঠার কোনও বালাই শরণাগতিতে নাই। শরণাগতির জন্য দেশের নিয়ম, কালের নিয়মের অপেক্ষা করিতে হয় না। শুদ্ধি, অশুদ্ধির সম্বন্ধে বিচারেরও এক্ষেত্রে কোন প্রয়োজন নাই। পাপী, তাপী সকলেই এ পথে ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে পারে। শরণাগতি লাভের জন্য আমাদের পক্ষে দরকার শুধু নিজেদের মনটি ভগবানের দিকে তুলিয়া ধরা। কাজটি অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু কাজটি খুবই কঠিন। এজন্য সাধন-ভজনের প্রয়োজন যে তাঁহার কৃপা ব্যতীত কিছুতেই পূর্ণ হয় না এই বিশ্বাসে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। এই অবস্থায় অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। নানারূপ সংস্কার চিত্তে উদিত হইয়া অন্তরায় সৃষ্টি করিতে থাকে। যদি নিজেদের স্বার্থ-সম্পৃক্ত সামর্থ্যের দিকে

ঝোঁক আমরা অন্তরে অনুভব করি কিংবা অহং-অভিমান আমাদের চিত্তে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই অবস্থা লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ বহু সুকৃতির ফলে শরণাগতির পথে আমাদের চিত্তের উদ্দীপ্তি ঘটে ভাগবতের উক্তি অনুসারে—

'ন যস্য জন্ম-কর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রম-জাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥'
(ভাঃ-১১।২।৪৯)

অর্থাৎ ভগবান আমাদের প্রিয় ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি না করিলে শরণাগতের এই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা মিলে না। তাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে পাইলে তবে মিলে শরণাগতি। ভগবানের করুণার মাধুর্য্য-বীর্য্য শরণাগতির পথে প্রত্যক্ষভাবে তখন আমাদের চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। আমাদিগকে কিছুই করিতে হয় না, কৃপা শক্তিই সব করে। শরণাগতির রীতিতে অভীষ্টতত্ত্ব প্রাণময়। শরণাগতের ভগবান বড় হিসাবে ব্রহ্ম নহেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—'অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম—বৃহতি বৃংহয়তি চ' অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে বাড়ান এই হিসাবে ব্রহ্ম। শরণাগতের কৃষ্ণ নিজের জন্য মান খোঁজেন না। তিনি অমানী মানদ। আমাদিগকে তিনি মান দান করেন। শরণাগতের ভগবান আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন, তিনি সর্ব্বদা জাগ্রত আছেন আমাদের জন্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতার দেবতা আমাদের মনের প্রতিবেশোপযোগী সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে আমাদেরই কাছে আগাইয়া আসিয়াছেন। আমাদের পক্ষে সর্ব্বভাবে বরণযোগ্য তাঁহার শ্রীবিগ্রহ তিনি প্রকট করিয়াছেন। ভগবৎ-কৃপার এই খোলামেলা খেলার প্রতিবেশটি পাইয়া আমরা অন্তরে একান্ত আশ্বস্তি অনুভব করি এবং নিজেদের সকল কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হই। আমাদের গীতাপাঠ তখনই সার্থক হয়। বাস্তবিকপক্ষে ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যা—এ সব পথে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীভগবানের অনুভাবনা চিত্তে মিলে না। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

'মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥

ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমং।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনং।
কেচিদ্‌যজ্ঞং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥'

(১১।১৪।৮-১০)

অর্থাৎ আমার মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া মানবগণ কর্ম্ম ও অভিরুচি অনুসারে শ্রেয়ঃসাধন ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। কর্ম্মবাদীগণ ধর্ম্মকে, কাব্যালঙ্কারবাদীগণ যশকে, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কামকে, যোগশাস্ত্রবিদগণ সত্য, শম ও দমকে, ইহবাদীগণ ঐশ্বর্য্যকে, লোকায়তবাদীগণ দান, ভোজনাদিকে, কেহ কেহ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানকে আবার কেহ কেহ ব্রত, নিয়ম ও যমকে পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমুদয় পুরুষার্থের প্রাপ্য ফল সকল অনিত্য এবং দুঃখপ্রদ। ভগবান অর্জ্জুনকে যে পথ দেখাইতেছেন সেগুলি এই সকল হইতে স্বতন্ত্র। তিনি কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি হইতে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির পথই গুহ্য এবং গুহ্যতররূপে অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত করিতেছেন। এ পথের সাধনা সুদুষ্কর তো বটেই, অধিকন্তু এগুলি বড় জোর তাঁহাকে পাইবার উপায়স্বরূপেই গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এগুলি উপেয় নয়; ভগবানের সম্বন্ধে এইগুলির সাহায্যে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমাদের চিত্তের সংযোগ সাধিত হয় না। কিন্তু শরণাগতিতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবানেই আমাদের চিত্ত ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। আমরা নিজেদের কাজের দিকে তাকাই না, তাকাই তাঁহার দিকে। নিজেরা কি করিতেছি তাহার বিচার করি না, আমাদের লক্ষ্য গিয়া পড়ে তিনি কি করিতেছেন সেই দিকে। প্রকৃতপক্ষে শরণাগতিতে ভক্তির পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি ঘটে এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের স্বরূপধর্ম্মে আমরা প্রতিষ্ঠা পাই। শরণাগতের পক্ষে পরাজয়ের ভয় নাই। তাঁহার সর্ব্বত্র জয়। বৃন্দাবন-লীলায় গোবর্দ্ধনধারী হরির শ্রীমুখে আমরা শরণাগতির এমন

মাহাত্মাই শুনিতে পাই-

'তস্মাৎ মৎ-শরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্ ।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ।'
(ভাঃ-১০।২৫।১৮) ।

আমার শরণাগত যাহারা, যাহারা আমাকে নিজেদের জীবন দেবতারূপে বরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে এবং তাহাদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র গৃহরূপ গোষ্ঠকে নিজবার্য্য-প্রভাবে রক্ষা করিব, এই আমার স্বকল্পিত ব্রত। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া শরণাগত বিভীষণকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান এমনই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন—

'সকৃদেব প্রপন্নো-
যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ
দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লঙ্কেশ্বর রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগতি অবলম্বনের জন্য উপস্থিত হইলে জাম্বুবান এবং সুগ্রীব যুদ্ধকালে তাঁহার ন্যায় শত্রুকুলজাত ব্যক্তিকে বিশ্বাস না করিবার জন্য সীতাপতিকে পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলেন, একবার যে ব্যক্তি প্রপন্ন হইয়া 'আমি আপনার শরণাগত হইলাম' এইরূপ প্রার্থনা করে আমি তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত। এই কথা বলিয়া তিনি বিভীষণকে আশ্রয় দান করেন।

ভাগবতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইবার জন্য গোকুলে আগত শ্রীঅক্রূর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বন্দনা করিয়া বলেন—

'কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ।'

অর্থাৎ হে প্রভু, আপনি ভক্তপ্রিয়। আপনি সত্যবাদী। আপনি কৃতজ্ঞ। আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপরের শরণাগত হইবে? আপনার লাভালাভ কিছুই নাই। আপনার ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা আপনার এতই প্রিয় যে আপনি তাঁহাদের অভীষ্ট তো পূর্ণ করিয়াই থাকেন, এমন কি, নিজেকে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে দান করেন। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের শেষ আজ্ঞায় শরণাগতির এই মহিমাই সত্য হইয়াছে। সত্য হইয়াছে তাঁহার কথায় এবং সত্য হইয়াছে তাঁহার কাজে। তাঁহার কথায় আমাদের অন্তর গলিয়া গেলে প্রিয়স্বরূপে তাঁহার কাজটিও আমাদের চিত্তে প্রকট হইবে। আমাদের সকল শঙ্কা দূর হইবে। জীবনের সব সমস্যার সমাধান ঘটিবে। ভগবান অর্জ্জুনকে শরণাগত হইবার আদেশ দান করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষা শেষ করিয়াছেন। 'যথেচ্ছসি তথা কুরু'—দায়িত্বহীন এই ধরণের লঘুতা হইতে শ্রীভগবানের উপদেশ শরণাগতির বীর্য্য-সংস্পর্শে জগৎ-গুরুর দায়িত্বে আচার্য্য-কৃত্যে জীবের প্রতি তাঁহার প্রীতিতে পরম ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছে।

সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের দাবী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের দাবীর মূলে জীবোদ্ধারে শ্রীভগবানের আকুতির প্রগাঢ়তা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রভু বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ-কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া।' (চৈঃ চঃ)

'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।'

অর্থাৎ আমার প্রাণের কথা তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তোমার হিত যাহাতে হয়, আমি তাহা না করিয়া নিরস্ত থাকিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার সকল কথার সার কথা যেটি তোমাকে পুনরায় তাহা বলিতেছি—শোন। কথাটি কি? কথাটি এই—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।'

প্রভু বলিয়াছেন—

'পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান
সব শাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান।
এই আজ্ঞা বলে যদি ভক্তো শ্রদ্ধা হয়
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়।'

শেষ আজ্ঞাটি তদনুযায়ী। সেটি এই—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণাগতি অবলম্বন কর। আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে উদ্ধার করিব—শোক করিও না। ঠাকুরটির চাতুরী আছে বলিতে হইবে॥ সব দিক হইতে গোছাইয়া

আনিয়া তিনি নিজের কাজটি শেষটায় বাগাইয়া লইতে বসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—অর্জ্জুন, আমি তোমার প্রিয়, এই সত্যটি উপলব্ধি কর, তবেই তুমি আমার ভক্ত হইবে। আমার ভক্ত হইলে আমার সহিত প্রীতির সম্বন্ধসূত্রে তোমার মন নিয়ত আমার ভাবনায় যুক্ত থাকিবে। তুমি মন্মনা হইবে। মন্মনা হইলে তোমার সমস্ত কর্ম্ম আমার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হইতে থাকিবে। তোমার সর্ব্ব কর্ম্ম হইবে আমারই অর্চ্চনা, তুমি মদ্‌যাজী হইবে। এই ভাবে মদ্‌যাজী হইলে তোমার জীবন আমারই নমস্কারে পরিণত হইবে। তখন তুমি আমাকেই চাহিবে সুতরাং তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়কে মোক্ষযোগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। মোক্ষের মোহ আছে, মুক্তিতে সুখ আছে, নিবৃত্তি আছে। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার কাছে মোক্ষও তুচ্ছ হইয়া যায়। শ্রীভগবান পরম চতুর। তিনি মোক্ষদানের ছলে নিজেকেই দিয়া ফেলিয়াছেন। এইখানেই হইতেছে ভগবৎ-প্রীতির আবর্ত্ত-রীতি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান গুহ্য, গুহ্যতর এবং গুহ্যতম এই তিন প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। বিষয়টি আরও একটু বিস্তার করা যাইতেছে। ফলতঃ প্রথমোক্ত জ্ঞান যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম্মের ফলে লাভ হয়। এই জ্ঞান কর্ম্মমিশ্রা জ্ঞান। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন—'গুহ্যাৎ কর্ম্মযোগাৎ।' ইহার পর গুহ্যতর জ্ঞান। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬২তম শ্লোকে এই জ্ঞানে ভগবানের প্রসাদে পরা শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। সরস্বতীপাদের উক্তি অনুসারে—'গুহ্যতরং জ্ঞানযোগাখ্যাতম্।' গুহ্যতর জ্ঞান—জ্ঞানযোগ। ইহার পর গুহ্যতম জ্ঞান। সরস্বতীপাদ বলেন—'গুহ্যতমং পরমং সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং।' এই সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি—'মামেবৈষ্যসি' অর্থাৎ তাঁহাকে পাওয়া। বলা বাহুল্য, গুহ্য বা গুহ্যতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই, ফলত্যাগ করিতেই বলা হইয়াছে। এ সমস্ত কর্ম্মও ফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কৃত হইলে জ্ঞানযোগের

ফলস্বরূপ শাশ্বতপদ বা মোক্ষই মিলে। কিন্তু ভগবানকে পাওয়া যায় না।

গুহ্যতম পরম বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি, সুতরাং কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা প্রাপ্তির জন্য ভগবান এখানে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। ভগবৎ-প্রীতির বিবর্ত্ত-রীতির এই আবর্ত্তের তোড়ে যিনি পড়েন তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হয়। 'কৃষ্ণের যতেক গুণ ভক্তেতে সঞ্চরে'—স্বতন্ত্রভাবে স্বধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার কিছু থাকে না। অর্থাৎ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ভগবৎ-সেবা করিতে হইবে এই ভাবটি দূর হয়। তাঁহার জীবন সমগ্রভাবে ভগবৎ-সেবায় পরিণত হয়—সে সেবা নিত্যসেবা, কৃতি-সাধ্য বস্তু নয়। 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেমে' তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবান তাঁহার করণ-কলেবর রক্ষা করিতে ব্যগ্র হন তাঁহার নিজেরই দায়ে। তাঁহার দ্বারা তিনি জীবোদ্ধারে নিজ প্রয়োজন সাধন করিবেন বলিয়া। কিন্তু জাতপ্রেম ভক্তের নিজেকে রক্ষা করিবার কোন প্রশ্নই থাকে না। চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের সাধনা করিবার প্রশ্ন তাঁহার পক্ষে নাই। তাঁহাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিবার ভার তো ভগবানই লইয়াছেন। গুহ্যতর জ্ঞানযোগে শাশ্বত-পদ বা মোক্ষ মিলে। সেই যে প্রয়োজন তৎপ্রতিও তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। কারণ মোক্ষ তাঁহার পক্ষে পরিত্যাজ্যই হইয়া পড়ে। ভগবানকেই তিনি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পাইতেছেন। ভগবৎ-প্রীতির আবর্ত্ত-গতির এইখানেই পরম পরিণতি। সারতত্ত্ব কৃষ্ণসেবা। ইহাই বেদে মধুবিদ্যাস্বরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বিদ্যার বিস্তার-প্রকরণ পরিদৃষ্ট হয়। আদিত্যের উর্দ্ধরশ্মি সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—'অথ যেঽস্যোর্দ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্দ্ধা মধুনাড্যো গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পংতা অমৃতা আপঃ। তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্ ব্রহ্মাভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত। তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্ বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য মধ্যে

ক্ষোভত ইব। তে বা এতে রসানাং রসা। বেদা হি রসাস্তেষামেতে রসাস্তানি বা এতান্যমৃতানামমৃতানি বেদাহ্যমৃতাস্তেষামেতান্যমৃতানি।' অর্থাৎ আদিত্যের ঊর্দ্ধরশ্মিসমূহ মধুনাড়ী, গুহ্য উপাসনা-প্রণালী, মধুকৃত ব্রহ্ম বা প্রণব (ওঁ-কার)। গুহ্য উপাসনাসমূহ দ্বারা উত্তপ্ত প্রণব হইতে রস বা মধু ক্ষরিত হইয়া আদিত্যমণ্ডলে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সাধক ওঁকারের উপাসনায় বা তাহার অনুধ্যানে অন্তরাকাশে শ্রীভগবানের চিন্ময় বিলাসদ্যোতক এই মাধুর্য্য-বীর্য্য-বিপ্লুত চাঞ্চল্য অনুভব করেন। এইবার আদিত্যমণ্ডলে ঊর্দ্ধরশ্মির বিকাশ এবং ওঁকারের এই ক্ষোভিত হওয়ার রহস্যটি কি আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব। প্রকৃতপক্ষে ওঁকার প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়রূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হৃদয়ই আদিত্যমণ্ডল। কিন্তু সাধারণ জীবের হৃদয়ে এই ওঁকার পূর্ণস্বরূপ হইলেও অধোমুখে বা আবৃতভাবে অবস্থান করেন। ঊর্দ্ধরশ্মি আমাদের চিত্তে পরিস্ফূর্ত্ত হয় না, মাত্রাগত অবস্থায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আদিত্যের পূর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত রশ্মি ঋক্, দক্ষিণে যজু, পশ্চিমে সাম এবং উত্তরে অথর্ব্ব। এই ত্রিমাত্রাকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধরশ্মি, তাহা অমাত্র বা চিরমাত্র। ইহাই ওঁকারের অপাবৃতস্বরূপ এবং ইহাই গায়ত্রীর নিজবীজ। গুহ্য আদেশের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে তৎবীর্য্য প্রণিহিত রূপ, গুণ ও লীলার দিব্য রস-সংশ্লেষে স্বরধর্ম্মে তিনি ব্যঞ্জিত হন। যিনি ছিলেন ধ্বনিরূপে অব্যক্ত, তিনিই বর্ণে বা স্বরে আমাদের নজরে পড়িয়া যান। তাঁহার আদরটি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত বা প্রত্যক্ষীভূত ভাবে স্ফুরিত এই বর্ণই নাম। নামাশ্রয়ে আত্মতত্ত্বের উন্মেষে জীবের হৃদয়স্থ এই ওঁকার ঊর্দ্ধগত হন এবং চিন্ময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া জীবকে দর্শন দান করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—'যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্।' (ছাঃ-১।৪।৪) অর্থাৎ ত্রয়ী বা তিন বেদের

মিলিত রূপ এই ওঁকারের ঋক্‌কে যখনই কেহ আয়ত্ত করেন, তখন ওঁকারের পূর্ণস্বরূপটি সাম বা গান এবং যজু বা আত্মনিবেদন বা যজ্ঞধর্ম্মে দীপ্ত হইয়া তাঁহার জিহ্বায় নাচিয়া উঠে। অক্ষর হয় স্বর। ইহার স্বরূপ অমৃত এবং অভয়। ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেবগণ অমরত্ব এবং অভয়ত্ব লাভ করেন। এই অনুভূতির মূলে থাকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীভগবানের বাণী বা বচনের রস-সংস্পর্শ। রূপটি হইল 'সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং।' ধ্বনি নহে স্বর। কবি রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে আমরা পাই—'তোমার বাণী নয় গো প্রিয়, তোমার বাণী নয়, মাঝে মাঝে তোমার যেন পরশখানি রয়।' সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়রূপে আমাদের অন্তরে ভগবানের স্পর্শ পাওয়া—তাঁহার চিন্ময় লীলার এমন উন্মেষটিই গুহ্য আদেশের গুহ্যতম তাৎপর্য্য। শ্রুতি বলেন—এই গুহ্য আদেশ বা উপাসনা-প্রণালী রসেরও রস। বেদ সকল অমৃত। গুহ্য আদেশ-সমূহ অমৃতেরও অমৃত। 'সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ' বেদসমূহ এমন শ্রীভগবানের আদেশ। গীতোক্ত আদেশসমূহও আবার সমগ্র বেদের মন্থন হইতে উদ্ভূত অমৃত। এই গুহ্যতত্ত্ব গুহ্যতম। 'ইতি জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া'—পরে 'ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে', 'সর্ব্বং গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ', 'য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি'—গুহ্য এবং গুহ্যতরস্বরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তিযোগই যে গুহ্যতম এবং সকলের অবলম্বনীয় গীতায় এই সত্য সুস্পষ্টীকৃত হইয়াছে। গীতার আদেশ স্বরূপ-ধর্ম্মে এই গুহ্য-আদেশ। এই আদেশের অন্তর্নিহিত পরম মাধুর্য্য-রসের উন্মেষটি ঘটিয়াছে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-ভজনের জন্য প্রেমোৎকর্ষ-পারবশ্যে ভক্তের স্বরূপধর্ম্মের উজ্জীবনে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকটির উপর এজন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়া থাকে। কোন কোন আচার্য্য এই শ্লোকটিকে গীতার সর্ব্বোত্তম বাণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই শ্লোকে গীতোক্ত সর্ব্বগুহ্যতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে

ভগবান অর্জ্জুনকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্জ্জুনের এই শরণাগতির ফলে লভ্য কি মিলিবে ভগবান তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণাগত হও। আমি কর্ম্মবন্ধনরূপ পাপ হইতে তোমাকে রক্ষা করিব ; সুতরাং তুমি শোক করিও না। যাহারা শুদ্ধাভক্তির অধিকারী নহে তাহাদের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠান বর্জ্জন বিধেয় নহে। সে ক্ষেত্রে বিহিত-কর্ম্ম বর্জ্জনের ফলে তাহারা স্বেচ্ছাচারবশে নিজেদের পতনের কারণ সৃষ্টি করে। ফলতঃ শ্রবণাদি শুদ্ধাভক্তি লাভে অধিকারী হইয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করে, তাহাদের পক্ষেই ধর্ম্মত্যাগ বিধেয়, অপরের নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—অধিকারী না হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে নাশেরই কারণ ঘটে। গোদাবরী-তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি রায়ের মুখে প্রকটিত হয়। শ্রীল রামানন্দের উক্তির যুক্তির ক্রমটি প্রাণঢালা আত্যন্তিক অনুরক্তিজনিত প্রেমভক্তির পরিচায়ক নহে বলিয়াই প্রভু শ্লোকটি শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই এবং 'বাহ্য' বলিয়াছেন। শ্রীল রায় 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' গীতোক্ত এই শ্লোকটি মহাপ্রভুকে শুনাইবার পূর্ব্বে ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটিকে ক্রমস্বরূপে গ্রহণ করেন।

'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।'

অর্থটি এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির গুণ দোষ বিচার করিয়া দেখিয়া যিনি সর্ব্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন তিনিও সত্তম। পতিপরায়ণা নারী যেমন অন্য পুরুষের সহিত গুণ-দোষ বিচার করিয়া স্বামীকে সেবা করিতে যান না, সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রতি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভজন-প্রবৃত্তি প্রেমাশ্রয়ে যাঁহার অন্তরে উদ্দীপ্তি লাভ করিয়াছে, তিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির

গুণ দোষ বিচার করিয়া ভগবৎ-ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে তেমন সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধাই উপজাত হয় নাই বুঝিতে হয়। সুতরাং সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের অধিকার সেখানে বর্ত্তে না। এই বিবেচনা করিয়াই প্রভু রায়ের উক্তিকে 'বাহ্য' বলিয়াছেন।

গীতার ভাষ্যকার আচার্য্যগণ অর্জ্জুনের প্রতি শরণাগতি অবলম্বনের সম্বন্ধে উপদিষ্ট গীতোক্ত শ্লোকটির বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ বলিতে কেহ কেহ ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, সেক্ষেত্রে কেবল ফলত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে, অনুষ্ঠান ত্যাগের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু ফলাকাঙ্খা-রহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং তাহাতে জ্ঞানই মিলে। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী পাদের সুস্পষ্টভাবে ইহাই সিদ্ধান্ত। তিনি বলিয়াছেন, ভগবান পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে গুহ্য। জ্ঞানযোগের কথা গুহ্যতর এবং তৎপরে গুহ্যতম কথাটি বলিলেন—মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। এজন্য আমি সত্য করিতেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে, এইরূপ করিলে তুমি আমাকে পাইবেই। গীতার ৬৬তম শ্লোকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বলিতে শুধু কর্ম্মের ফলত্যাগ নহে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগও উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর আলোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—'কেচিদ্ বর্ণধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রমধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্যধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিদ্যমানা-নবিদ্যমানান্ বা শরণত্বেনাদৃত্য মামীশ্বরমেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্বধর্ম্মাণাম-ধিষ্ঠাতারং ফলদাতারং চ শরণং ব্রজ। ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা, কিং তৈরন্যসাপেক্ষৈঃ ভগবদনুগ্রহাদেব তু অন্য নিরপেক্ষাদহং কৃতার্থো ভবিষ্যামিতি নিশ্চয়েন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিমনন্তং শ্রীবাসুদেবমেব ভগবন্ত-

মনুক্ষণভাবনয়া ভজস্ব। ইদমেব পরমং তত্ত্বং নাতোঽধিকমস্তীতি বিচারপূর্ব্বকেন প্রেমপ্রকর্ষেণ সর্ব্বাননাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়েত্যর্থঃ।' অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম কি সামান্যধর্ম্ম সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অন্যকথায় সেগুলি থাকুক বা যাউক সে সম্বন্ধে দৃক্‌পাত না করিয়া, এক এবং অদ্বিতীয় সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ এবং ফলদাতা আমারই শরণ গ্রহণ কর। তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মসমূহ থাকুক বা না থাকুক, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কোন ধর্ম্মই ফল দিতে পারে না; সুতরাং ধর্ম্মের জন্য ভাবনা করা কি দরকার? ভগবদনুগ্রহেই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব এইরূপ দৃঢ়তার সহিত পরমানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীভগবানের অনুক্ষণ চিন্তায় মনকে নিমগ্ন রাখিয়া ভজন কর। সমস্ত অনাত্মবিষয়ে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কর।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের নিকট ভগবান শুদ্ধা ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং যোগ উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।'
(১১।১৪।২৯)

অর্থাৎ হে উদ্ধব, যোগের দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। বেদাধ্যয়ন বা তপস্যা কিংবা ত্যাগের পথে সাধনা করিয়াও আমাকে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত ভক্তিতেই আমাকে পাওয়া যায়। এই ভক্তি বর্ণাশ্রমাদি সাধনার অপেক্ষা করে না। ভগবানের নির্দ্দেশে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগের অর্থটি সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন—

'তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেবচ।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ।'
(ভাঃ-১১।১২।১৩)

অতএব হে উদ্ধব, তুমি শ্রৌতবিধি, স্মার্ত্তবিধি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভাবে আমার শরণাগত হও, তাহা হইলেই আমা দ্বারা অকুতোভয় হইবে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ভয়শূন্য হইবে।

ভাগবতে উদ্ধবের নিকট যে প্রতিশ্রুতি, গীতায় অর্জ্জুনের নিকটও সেই একই প্রতিশ্রুতি। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ ভাগবতের উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'তস্মাত্ত্বমুদ্ধবেত্যাদিনা কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ সম্যগেব ত্যজিতং।' তিনি বলেন—'পরমাশ্রয়ত্বেন পরমসন্তং তদভীষ্টং মামেকমেব শরণং যাহি শরণাগতিপর্য্যন্ততয়া ভজেত্যর্থঃ। ততশ্চ হি নিশ্চিতং ময়া ত্বমকুতোভয়ঃ স্যাঃ ভবিষ্যসি। তত্র কৈমুত্যায়াত্মনঃ স্বভাবতঃ সর্ব্বহিতত্বং দর্শয়তি। সর্ব্বদেহিনামাত্মানং পরমাত্মানমিতি। একমেব শরণমিত্যেব দর্শয়তি সর্ব্বাত্মভাবেনেতি। তদেব বিবৃণোতি উৎসৃজ্যেত্যাদিনা। শ্রোতব্যং শ্রুতমেবেতি জ্ঞানাশ্রয়ত্বমপি নিরাকরোতি। তত্রৈকমিতি তদাত্বে এবেতি কালান্তরে চ শ্রিয়ান্তরস্য ভাবনামপি নিষেধতি স্ম।' অর্থাৎ আমাকে পরমাশ্রয়স্বরূপ জানিয়া শরণাগতি পর্য্যন্ত আমাকে ভজনা কর। তাহার ফলে আমার কৃপায় নিশ্চয়ই তুমি অকুতোভয়ত্ব লাভ করিবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় বলেন—'বিহিতং কর্ম্ম নিষিদ্ধঞ্চ কর্ম্ম ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। ময়ৈব অকুতোভয়ঃ স্যা ইতি তব নাস্তি কর্ম্মাধিকারো নাপি জ্ঞানাধিকারস্তদপি তং তমাত্মন্যারোপ্য প্রত্যবায়ভয়ং সংসারভয়ঞ্চ মন্যসে চেত্তদা তদ্ভয়দ্বয়াৎ ত্রাতা অহং বিদ্যমান এবাস্মীত্যর্থঃ।' অর্থাৎ তোমার কর্ম্মাধিকারও নাই, জ্ঞানাধিকারও নাই এ অবস্থায় কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সাধনা পরিত্যাগ করিলে তোমার প্রত্যবায় ঘটিবে এবং তোমার পক্ষে সংসার-বন্ধনের কারণ সৃষ্ট হইবে। যদি এইরূপ ভয় তোমার চিত্তে উদিত হয়, তাহার উত্তরে বলিতেছি উক্ত উভয় ভয়ের ত্রাতাস্বরূপে আমিই বিদ্যমান রহিয়াছি—আমিই তোমাকে রক্ষা করিব।

শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ বলেন—'প্রিয়স্যেত্যাগ্রহতশ্চেত্যর্থঃ।' প্রিয়ের জন্য এতই আগ্রহ। ভাগবতে নারদ বেদব্যাসকে বলিয়াছেন—

'ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।' (১।৫।১৭)

অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হরির চরণাম্বুজ ভজন করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অপক্ক দশাতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন তথাপি তাঁহার কি স্বধর্ম্ম-ত্যাগজনিত অমঙ্গল কখনো হয়? না কদাপি হয় না। পরন্তু হরিভজন ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন ব্যক্তি কি পরমার্থ লাভ করিতে পারে বা করিয়াছে? কখনই না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—'বিকর্ম্মবতি ভৃত্যে দণ্ডয়ন্ত এব প্রভবো দৃশ্যন্তে ইতি। হরিরেব তং দণ্ডয়তু। ন। প্রিয়স্য। ভক্তস্য প্রিয়ত্বাদেবাদণ্ড্যত্বং।'

ভাগবতে করভাজন ঋষি নিমি মহারাজকে বলিলেন—

'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং,
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥' (১১।৫।৩৭)

অর্থাৎ হে মহারাজ, যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমবিহিত সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রবন্ধে মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন তিনি আর দেব, ঋষি, পিতৃভূত ও আত্মীয়স্বজনগণের নিকট ঋণগ্রস্ত থাকেন না অর্থাৎ তাঁহাকে আর পঞ্চাগ্নির অনুষ্ঠান করিতে হয় না। একান্ত ভক্তিযোগেই তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়।

ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—'ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।' তাঁহার ভক্তের বিনাশ নাই। কেন, কিসের জোরে? ভক্তিরই জোরে, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিরও বিনাশ নাই। এমন কি সাধনক্ষেত্রে বৈগুণ্য আপতিত হইলেও নয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—'ভক্তি বাসনায়াস্ত্বনুচ্ছিত্তি-

ধর্ম্মত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ তদাপি সত্ত্বাৎ কর্ম্মান্যধিকারাদিত্যাহ' অর্থাৎ ভক্তির বিনাশ নাই। সাধকের পতিত বা মৃত অবস্থাতেও তাহা চিৎশক্তি-স্বরূপে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। তিনি বলেন—'ভক্তিবাসনায়া স্ববিচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ' অর্থাৎ ভক্তি-বাসনা হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি। স্বরূপশক্তি নিত্য এবং অবিনাশী বস্তু।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও শ্রীভগবান গুহ্যতম জ্ঞান এই ভক্তিযোগের কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন। 'গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে'—সেক্ষেত্রে অর্জ্জুনের আচরণের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অর্জ্জুন তাঁহার সম্বন্ধে অসূয়াবিহীন অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে অদোষদর্শী—এই বিচারে। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্জ্জুনের গুণ-দোষ সম্বন্ধে ভগবানের বিচার করিবার অবসর নাই। বস্তুতঃ অর্জ্জুনের গুণ-দোষ নিরপেক্ষভাবেই তিনি তাঁহাকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রেমভক্তির এমনই মহিমা। ইহাতে বৈগুণ্যের বিচার নাই। অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়। তাঁহার সম্বন্ধে অর্জ্জুনের বৈগুণ্য থাকিলেও ভগবান নিজেই তাহা শোধন করিয়া লইতে এবার প্রস্তুত হইয়াছেন।

"ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাক্ বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াম্
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্।'

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সেবক গুরুতর অপরাধ করিলেও তৎপ্রতি দৃকপাত করেন না কিন্তু অল্প সেবাকেও অধিক বলিয়া স্বীকার করেন এবং দুর্জ্জনেতেও অসূয়ার কারণ দেখেন না, এমন পুরুষোত্তমস্বরূপ পরম দেবতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমাদের নিকট প্রকট হইয়াছেন। 'অল্পসেবা বহু মানে আত্ম-পর্য্যন্ত প্রসাদ'—এমনই তাঁহার করুণা, এমনই তাঁহার সৌশীল্য।

শ্রীভগবান তাঁহার বর্ত্তমান উক্তিটি শুধু গুহ্যতম নয়—সর্ব্বগুহ্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উদ্ধবের নিকট ভগবানেরই শ্রীমুখে আমরা অনুরূপ আশ্বাস লাভ করিয়াছি—

'নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যক্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ।'

অর্থাৎ হে উদ্ধব, এই ধর্ম্মের উপক্রমে বৈগুণ্য ঘটিলেও যদি আমাতে চিত্ত নিষ্ঠিত হয় তবে ইহার অণুমাত্রও ধ্বংস সাধিত হয় না। 'অঙ্গস্যাপ্যুপক্রমে সতি পরিসমাপ্ত্যভাবেঽপি অণ্বপি ঈষদপি ধ্বংসো বৈগুণ্যাদিভির্নাশো নাস্তি'—(চক্রবর্ত্তীপাদ) অর্থাৎ এই ভক্তির ধর্ম্ম নির্গুণ এবং আমা কর্ত্তৃক ইহা সম্যক্ ব্যবসিত হইয়া থাকে এবং ইহার পূর্ণাঙ্গতা বিধানের ভার আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি। জীবের পক্ষে আর কি প্রয়োজন? ধর্ম্ম সাধন করিব—আমাদের নেশা, আমাদের সংস্কার। কিন্তু পারিব কি? ভগবৎ-প্রেমের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শ অন্তরে উপলব্ধি না করা পর্য্যন্তই বুদ্ধি-বিচারের এমন দৌড়। ভগবৎ-প্রেমের প্লাবনে পড়িলে তাহার বেগ আমাদের সবই যে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। দেখিব তিনি আমাদের প্রীতির বন্ধনে পড়িয়া আমাদের জন্য নিজেই ধর্ম্মের সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। শ্রীভগবানের অযাচিত প্রেমের এমন লীলাটি আমরা অন্তরে উপলব্ধি করিলেই আমাদের পরমার্থ সিদ্ধ হয়।

ভগবান উদ্ধবের নিকট আমাদের প্রতি তাঁহার পরম প্রীতি প্রণোদিত এমন প্রেমের দাবী করিয়াছেন। তাঁহার দাবীটি আমরা মানিয়া লইতে পারিব কি?

'জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধাঃ।'

(ভাঃ-১১।২৯।৩১)

অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ মানুষের যত প্রকার কাম্য আছে, সব লইয়াই আমি তোমার। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারিব কি প্রাণ খুলিয়া যে, হাঁ, তুমিই আমাদের সব। আমরা তোমাকেই চাই। চাই—

'স্থানেতে এই স্থানে কালেতে এইক্ষণ
প্রাণসখা মম প্রিয়-দরশন।
যারে দেখিলেই জুড়ায় তাপিত জীবন
ভুলিলে হৃদয় হয় রে শ্মশান—
ভক্তের ভগবান।'

শরণাগতিতে স্বরূপনিষ্ঠা

'আমাকে পাইবে'—গীতার ইহাই সার কথা। গীতোক্ত সন্ন্যাস এবং ত্যাগ শ্রীভগবানের এই একটি উক্তিতেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভগবানকে আমরা পাইব, এমন কথা পাইলে বুক ভরিয়া না যাইবে কেন ? ভগবানকে পাইলে পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন প্রশ্নই আমাদের থাকে না। সুতরাং অর্জ্জুন ভগবানের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন। অপর পক্ষে শরণাগত ভক্তকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার আকুলতায় ভগবৎ-মাধুর্য্য প্রোজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তাটি এখানে ভগবানের। নিবেদিতাত্ম ভক্তের জন্য বিশেষভাবে কিছু না করিতে পারিলে ভগবানের তৃপ্তি নাই, নিবৃত্তি নাই তাঁহার। শ্রীভগবান উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ। (ভাঃ-১১।২৯।৩২)

অর্থাৎ মানুষ যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহার নিমিত্ত যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি অপেক্ষা বিশেষ কিছু করিবার জন্য আমার অভিলাষ জাগ্রত হয়। শ্রীধর স্বামীপাদ 'বিচিকীর্ষিত' শব্দে 'বিশিষ্টং কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি' এই অর্থ বুঝাইয়াছেন। আমরা সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে আমাদের যে পাপ হইবে, ভগবান তাহা হইতে আমাদের উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। তিনি যদি আমাদের রক্ষা করেন, তবে আমরা তাঁহার শরণাগত হইতে পারি, এইরূপ ভাবে শ্লোকটির বিচার করিলে নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির দিকেই আমাদের দৃষ্টি রহিয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের প্রতি আমাদের চিত্তে প্রকৃত প্রীতি বা

অনন্যাভিলষিতাশূন্য শুদ্ধাভক্তির সঞ্চার হয় নাই বুঝিতে হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে এই অধ্যায়ে আমরা ভগবানের নিকট হইতে যেমন আশ্বাস পাইয়াছি, সমগ্র গীতার কোথায়ও সে বস্তুটি মিলে নাই। নিজে তিনি এমন ভাবে ভক্ত প্রীতির দায়ে পড়িয়া পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন নাই। শ্রীভগবানের কারুণ্যোজ্জ্বল এই লাবণ্য-লীলাটি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমাদের গীতাপাঠ সার্থক হইবে।

'আপন মাধুর্য্য কৃষ্ণ না পারে বুঝিতে
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে।'

ভক্তের কাছে নিজকে দেওয়ার অঙ্গীকারে তো ভক্তভাবই অঙ্গীকার করিতে হয়। এই তো সেই রূপ—

'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যে-পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।' (মু-৩।১।৩)

সোণার বরণ—এই তো সেই পুরুষরতন, যাঁহাকে দর্শন করিলে পুণ্য ও পাপ এতদুভয় হইতে মুক্ত হইয়া জীব পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়। সমাত্ম-সম্বন্ধের সর্ব্বভাবে তাঁহার সেবা মিলে। শ্রীভগবানের পরম প্রীতির এমন স্পর্শ যাঁহারা অন্তরে অনুভব করিয়াছেন—'উভেহ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃনুতে' (তৈঃ উঃ-২।১) পাপ-পুণ্য উভয় হইতে তাঁহারা মুক্ত হন। আচার্য্য রামানুজ অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৫তম শ্লোকের ভাষ্যে প্রিয়ভক্তের প্রতি ভগবানের এমন আগ্রহের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—'যস্য ময়ি অতিমাত্রপ্রীতিঃ বর্ত্ততে মম অপি তস্মিন্ অতিমাত্র-প্রীতিঃ ভবতি ইতি। তদ্বিয়োগম্ অসহমানঃ অহং তং মাং প্রাপয়ামি। অতঃ সত্যম্ এব প্রতিজ্ঞাতং মাম্ এব এষ্যসি ইতি।' অর্থাৎ তুমি আমার প্রিয়। আমার প্রতি যাহার প্রীতি অত্যন্ত অধিক, তাহার প্রতি আমারও প্রীতি অত্যন্ত অধিক হয়। অতএব এইরূপ ভক্তের সহিত

বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সে যাহাতে আমাকে পায় আমি তাহাই করিয়া থাকি। সুতরাং 'তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে' ভগবানের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য যথার্থই সত্য। ৬৬তম শ্লোকের 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' এই ভগবদুক্তির তাৎপর্য্যে প্রিয় ভক্তের সর্ব্ববিধ শোকের কারণ দূর করিবার জন্য ভগবানের স্বরূপ-ধর্ম্মগত অভিলাষই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের মনের ভাবের বিচারেই উক্তিটির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

'নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।'

চরিতামৃতের বাণী এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত প্রেম-পরায়ণ নিবেদিতাত্ম ভক্তের জন্য কিছু করিতে না পারিলে ভগবানের শান্তি নাই। তাঁহার এই আকুলতায় তিনি পাত্রাপাত্র সম্বন্ধ বিস্মৃত হন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার কিছু ভক্তের থাকে না। নিজের রক্ষার প্রতি দৃষ্টি সে তো দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের পক্ষেই থাকিতে পারে। জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে এমন প্রবৃত্তি কখনই থাকা সম্ভব নয়। তিনি ভগবানের কাছে নিজের রক্ষা চাহিবেন কিংবা তাঁহার সেবা-সম্পর্কে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপ-পুণ্যের বিচার তাঁহার চিত্তে উদ্গত হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে এমন ধারণা করিলে অপরাধ হয়। কিন্তু ভক্ত নিজের রক্ষা না চাহিলেও ভগবান নিবেদিতাত্ম ভক্তকে রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রতি প্রীতির এমন টানে বা সেই আনুষঙ্গে ভগবান জগতের পাপী, তাপী প্রভৃতি ভগবৎ-বিমুখজনেরও কল্যাণ-সাধনে আগ্রহান্বিত হন। ভগবদুক্তিতে এইভাবে ভক্তাশ্রয়ত্বে সর্ব্বজীবের প্রতি কল্যাণেচ্ছা পরিপূর্ত্তির উপযোগী শ্রীভগবানের অযাচিত প্রেম-মাধুর্য্য প্রকটিত হওয়ায় ত্রিভুবন প্রেমময় হইয়াছে। ভক্তের শোক জগতের জীবের জন্য। নৃসিংহদেবের নিকট ভক্তবর প্রহ্লাদ এই শোক ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভয়মুদ্বহতো বিমূঢ়ান্।'

অর্থাৎ প্রহ্লাদ বলিতেছেন 'আমাকে উদ্ধার করুন' এমন প্রার্থনা আমি আপনার নিকট করি না। আপনার নাম-প্রেমে মত্ত আমার পক্ষে সংসার-বৈতরণী পার হইবার কোন ভয় নাই। যাহারা মায়াবদ্ধ জীব তাহাদের জন্য আমার শোক। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইলে অর্জ্জুনের পক্ষে এমন শোকের কারণ ঘটিবে না ভগবান এই আশ্বাস দিয়াছেন। এতদ্বারা ভক্তের চিত্তে উপজাত জগতের সর্ব্ব জীবের প্রতি প্রেমের ঔদার্য্য এবং মাধুর্য্যেরই মাহাত্ম্য ভগবদুক্তিতে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

গীতোক্ত উপদেশের মূলীভূত শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় এই সংবেদনটি অন্তরে লাভ করিলে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করা ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় থাকে না। এমন ভক্ত—

'বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত।' (চৈঃ চঃ)

ভাগবতে করভাজন ঋষি নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

'স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।'

যিনি লোক-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, নিষিদ্ধ পাপানুষ্ঠানে তাঁহার মতিগতি থাকে না। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি তাঁহার দ্বারা কোন পাপ কার্য্য হইয়া যায়, স্বয়ং ভগবান তাঁহার চিত্তের সকল মালিন্য পরম আগ্রহের সহিত বিদূরিত করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎ-প্রেমে চিত্তকে প্রভাবিত করিবার পক্ষে যদি

অনুকূল না হয় তবে তেমন আন্তরিকতাবিহীন সাধন-ভজনাদি কর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ভাবটির কোন মূল্যই থাকে না। গীতোক্ত সাধন-প্রকরণগুলিও পরোক্ষ। সেগুলির মাধ্যমে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমাদের চিত্তে শ্রীভগবানের আত্মসম্বন্ধটি উদ্দীপিত করাই গীতোক্ত-উপদেশের মুখ্য লক্ষ্য। গীতার দেবতা তাঁহার বচনের কম্পনে কম্পনে আমাদের কত যে আপন যেন শুধু এই ব্যথাটিই ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। সুরে সুরে তাঁহার আদর আমাদের অন্তরের তারে তারে ছড়াইয়া অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে তিনি আমাদিগকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। জীবের জন্য এই ব্যথা, এই আকুলতা—গীতার আত্মা এবং এইটিই সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ। 'আত্মানম্ একম্ জানথ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'—এক আত্মাকেই জান, অন্য সব কথা ছাড়িয়া দাও। গীতার বাণীর ইহাই ধ্বনি এবং এই ধ্বনির অন্তরে গীতোক্ত সাধনার জ্ঞেয় তত্ত্বটি প্রেম-ভক্তিতে প্রমূর্ত্ত। এমন ভক্তিতে অভীষ্টে একনিষ্ঠতার ফলে অন্য বিচার চলে না। এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই বিধেয় হইয়া পড়ে। শ্রীভগবান উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—'নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তো চিরাৎ। স্পর্দ্ধাসূয়া তিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি'—অর্থাৎ যিনি সমুদয় নরে নিত্য মদ্ভাব ভাবনা করেন অচিরাৎ তাঁহার অহঙ্কারের সহিত স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কার-প্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় মানুষের জাতি-বর্ণ বিচার করিবে কে? এই বিচারের উপরই তো বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। প্রশ্ন উঠিতে পারে সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অনহঙ্কৃত অবস্থায় অনাসক্তভাবে আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানও তো সম্ভব হইতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, অজ্ঞ জনসমাজে বুদ্ধিভেদ সৃষ্ট না হইতে পারে, এমন ভাবে মনে মুখে মিলাইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। গীতায় শ্রীভগবান নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।' সত্য-নিষ্ঠাই ধর্ম্ম। সরল সত্যকে

অকুণ্ঠভাবে অনুসরণ করিলেই ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া থাকে। ফলতঃ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যেমন ভগবদাজ্ঞা রহিয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগতি অবলম্বনের আজ্ঞাও তিনিই দিয়াছেন। দিয়াছেন আমাদের প্রেমে পড়িয়া। তিনি আত্মারূপে এমন পরম বচনেই প্রমূর্ত্ত। সুতরাং 'অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শোন উতরোল, লহ প্রেম হৃদয়ে ধরিয়া'—ঠাকুর নরোত্তমের উক্তিতে শ্রুতির তাৎপর্য্যই মাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি—

'এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ।' (চৈঃ চঃ)

শরণাগতি অবলম্বনকারী ভক্তের জন্য সব কাজ ভগবান নিজেই করিবেন এইটিই যে তাঁহার অন্তরের আগ্রহ। ভক্ত এমন ক্ষেত্রে ভগবদিচ্ছার প্রতিবাদী হইতে পারেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ বলেন—'ননু যোহি যচ্ছরণো ভবতি, স হি মূল্যক্রীতঃ পশুরিব তদধীনঃ। স তং যৎকারয়তি তদেব করোতি। যত্র স্থাপয়তি তত্রৈব তিষ্ঠতি। যদ্ভোজয়তি তদেব ভুঙ্‌তে। ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্।' অর্থাৎ যিনি যাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি মূল্যক্রীত পশুর মতই তাঁহার অধীন হইয়া থাকেন। তিনি যাহা করান, তিনি তাহাই করেন। যাহা খাওয়ান তাহাই খান। যেখানে তাঁহাকে রাখেন, সেইখানেই তিনি থাকেন। ইহাই হইতেছে শরণাপত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের তত্ত্ব। আড়বার কুলাচার্য্য শ্রীমৎ লোকাচার্য্য স্বামী বলেন—'স্ব স্বেন মৃগ্যমাণো গুণো দোষবৎ প্রতিবন্ধকো ভবতি' অর্থাৎ শরণাগত ব্যক্তি যদি নিজ স্বরূপ রক্ষার জন্য স্বপ্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার সেই স্বরূপ-রক্ষারূপ গুণই দোষরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করার অর্থ কেবল ফল ত্যাগ নহে, অনুষ্ঠানও ত্যাগ। ফলতঃ শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইয়া যাঁহারা শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের ফল এবং অনুষ্ঠান দুই-ই ত্যাগ করা বিধেয় হইয়া পড়ে। প্রশ্ন উঠিবে

এই যে, তবে জীবের পক্ষে কোন ধর্ম্মই থাকিবে না? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, কেহই তাহার স্বরূপধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম সে অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে। জন্মকর্ম্মজনিত আগন্তুক হিসাবে তাহার পক্ষে যে সব ধর্ম্ম লৌকিক এবং সামাজিক হিসাবে কৃত্যস্বরূপে পরিণত হইয়াছিল, স্বরূপধর্ম্মে উজ্জীবন লাভের পরে আর সেগুলি তাহার পক্ষে কৃত্য থাকিবে না—থাকিবে কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণভজনরূপ নিত্য ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে চিত্তে আসক্তি জন্মিলে আশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে না। পরন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালনের প্রতি দৃষ্টিবশত নিত্য ভক্ত্যঙ্গে নিষ্ঠা-বুদ্ধি শিথিল হইলেই দোষের কারণ সৃষ্টি হয়। ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

'স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োরেষ নির্ণয়ঃ। (১১।২১।২)

কৃষ্ণভজন থাকিবে, কারণ তাহা জীবের স্বরূপনিষ্ঠিত ধর্ম্ম। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ 'আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্' এই ব্রহ্মসূত্রের (৪।১।১২) ভাষ্যে বলিয়াছেন—'আপ্রায়ণাৎ মোক্ষ-পর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি মোক্ষে চ, কুতঃ হি? যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তিঃ। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণ শ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তৈরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্য-ভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্য-বলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্।" অর্থাৎ মুক্তির পরেও উপাসনা করিতে হইবে। এমন বিধান কোথায় এবং কেনই বা এই উপাসনা? সৌপর্ণ শ্রুতি বলেন, মুক্ত পুরুষেরাও উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বলেই তাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন। যেরূপ পিত্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তি মিছরি খাওয়ার ফলে পিত্তের দোষ বিদূরিত হইলেও মিছরির মিষ্টত্ব মিছরি ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি জন্মায় তদ্রূপ।

করিষ্যে বচনং তব

"করিষ্যে বচনং তব"—গীতায় শ্রীভগবানের অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী উপদেশের মূলীভূত মাধুর্য্যের বীর্য্য এবং তাহার সঞ্চারে চাতুর্য্য সম্ভবতঃ অর্জ্জুনের এই একটি উক্তিতেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 'তোমার কথানুসারে কাজ করিব' অর্জ্জুনের মুখ হইতে এই একটি কথা আদায় করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবানকে কত কৌশলই না অবলম্বন করিতে হইয়াছে! তাঁহার ধৈর্য্য কতখানি, এ বিষয়ে চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এত কথা বলিবার পরও তিনি বলিতেছেন, অর্জ্জুন, তুমি যদি এখনো আমার কথা বুঝিতে না পারিয়া থাকো, এখনো আমার কথায় তোমার মন একাগ্র না হইয়া থাকে, তবে বলো, আমি আবার তোমাকে বুঝাইব। আমার কথায় তোমার মন যাহাতে মজে আমি তাহাই করিব। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মত বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবানের কথায় মন লাগানো এতই কঠিন। আমরা সকলের কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি, শুধু ভগবানের কথা ছাড়া। চিন্তা করিলে বুঝা যায়, আমাদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কোনক্ষেত্রেই নাই। আমরা প্রত্যেকেই অপরের কথা অনুসারে জীবনের পথে প্রতিনিয়ত চলিতেছি। আমরা পরের আজ্ঞা পালন করিতেছি। সংসারের চিন্তায়, সাংসারিক প্রতিবেশ হইতে আমাদের মনের মূলে স্বার্থবুদ্ধি-প্রণিহিত সংস্কার বা অবিদ্যার ব্যক্ত ভাবটি পশুর মত আমাদের জীবনকে পরিচালিত করিতেছে। আমরা অন্ধভাবে যাহাদিগকে আপন বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাদেরই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছি। এইরূপে ক্রীতদাসের মত আমাদের মন অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা মরণের পথে প্রধাবিত হইতেছি। তবু দৃষ্টি আমাদের খোলে না। ভগবানের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য, ভগবানের কথা শুনিবার জন্য আমাদের চিত্তবৃত্তি উন্মুখ নয়। প্রত্যুত জোর করিয়া চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের দিকে তুলিতে

গেলে সে ছুটিয়া আসিয়া বাহিরে পড়ে ; আকুল হইয়া সংসারের বোঝা বশংবদভাবে মাথা পাতিয়া লয়।

প্রশ্ন উঠিবে এই যে, ভগবানের কথা আমরা তো শুনিতেছি না, কিন্তু দোষ কি শুধু আমাদের ? ভগবান অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া প্রকটভাবে যেমন কথা বলিয়াছিলেন, আমাদের সঙ্গে সেভাবে কথা বলেন কি ? কোথায় তিনি, কত দূরে তিনি, কে জানে ? সুতরাং আমাদের মন যাহাদের কাছে পায়, তাহাদের কথা শুনিতে চায়, তাহাদের আজ্ঞাই পালন করে। দূরত্বের অনুভূতিতে পরবোধের প্রতীতি—সুতরাং ভগবান আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া নিজেই আমাদের পর হইয়া পড়িতেছেন। তিনি আমাদের কেহ নহেন, আমরা ইহাই বুঝিয়া লইয়াছি। সুতরাং তাঁহার কথা শুনিতে আমাদের মনে আগ্রহ জাগিবে কেন ?

এমন বিচারের উত্তর এই যে, ভগবান অর্জ্জুনের নিকট এবং আমাদের কাছ হইতে তিনি দূরে আমাদের এই যে বিশ্বাস, ইহার মূলে কতটা যে সত্য আছে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ফলতঃ তিনি অর্জ্জুনের নিকট লীলাবিগ্রহে প্রকট থাকিলেও অর্জ্জুন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আত্মভাবে প্রকট দেখেন নাই। যদি তাহাই হইত তবে গীতার সুরুতেই তিনি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। তাঁহার কথা তিনি শুনিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই, পরন্তু এমন কথাও তিনি বলিয়াছেন যে, বরং ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবু তোমার কথা শুনিয়া পাপের দায়ে পড়িব না। বস্তুতঃ ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার উক্তির অন্তর্নিহিত আত্মভাবটি অর্জ্জুনের নিকট যখন ব্যক্ত হইল তখনই তিনি তাঁহার কথা শুনিতে প্রস্তুত হইলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের কথার ভিতর দিয়াই তাঁহাকে অর্জ্জুনের নিকট আত্মভাব প্রকট করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার তেমন কথা শ্রবণের সূত্রে তাঁহাকে আপন করিয়া পাইয়া তবে তাঁহার কাছে অর্জ্জুনের আত্মনিবেদন সত্য হইয়াছে। অন্য কথায় ইহাই বলিতে হয় যে—

ভগবানের কথার মধ্যেই তিনি আত্মরূপে জাগ্রত, তিনি সংস্থিত। সেইভাবে আমাদের কাছেও তিনি নিত্য ও সত্যস্বরূপে রহিয়াছেন। ফলতঃ আমাদের মনের উজ্জীবনে এবং তাঁহার আজ্ঞা পালনে আমাদের প্রবৃত্তি জাগ্রত করিবার শক্তি তাঁহার কথাতেই একান্ত এবং জীবন্ত রহিয়াছে।

সুতরাং ভগবানের কথাতেই ভগবান আমাদের আপনস্বরূপে নিকট এবং প্রকটরূপে চিৎঘন-লীলাবিগ্রহ। ভগবানের এই কথা হইতে তিনি আমাদের বঞ্চিত তো রাখেন নাই! প্রকৃতপ্রস্তাবে বচনের ভিতর দিয়াই অর্জ্জুনের স্বরূপধর্ম্ম উদ্দীপ্ত করিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার শরণাগতি অবলম্বনের জন্য যেমন আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও তিনি সেইভাবেই সর্বদা আপন করিয়া লইতে চাহিতেছেন। আমরা অর্জ্জুন না হইতে পারি, অর্জ্জুনের মত অধিকার আমাদের না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য ভগবান তাঁহার স্বভাব পাল্টাইয়া ফেলিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বচনের মাধুর্য্যে এবং ঔদার্য্যে আত্মভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার মত অমৃতের উৎস আমাদের কাছেও উন্মুক্ত রহিয়াছে। 'জীব লাগি কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ।' শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবুদ্ধি আমাদের অন্তরে যদি জাগ্রত হয় তবে ভগবানের বচনের ভিতর দিয়া আমাদের স্বরূপধর্ম্ম উজ্জীবনে তাঁহার আত্মলীলাও আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইতে পারে এবং অর্জ্জুনের মতই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে আমরাও উন্মুখ হই। "করিষ্যে বচনং তব"—এমন কথা আমাদের মুখ দিয়াও তখন উচ্চারিত হইবে এবং সেই উচ্চারণে আমাদের মন, প্রাণ এবং দেহ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহার চরণে নিবেদিত হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের কথাতে আসক্তি এবং ভগবানে আসক্তি একই বস্তু। কথায় আসক্তি হইতে চিত্তে প্রেম উপজাত হইয়া আমাদের পক্ষে শরণাগতির অবলম্বনের উপযোগী নিত্যলীলার পরিস্ফূর্ত্তি সাধিত হয়। ভাগবতে নারদ সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেবের নিকট ভগবৎ-কথার শ্রবণাকর্ষী এই চাতুর্য্যই উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন—

'তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ।' (ভাঃ-১।৫।২৬)

অর্থাৎ সেখানে সাধুগণ প্রত্যহ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই মধুর কথা আমি শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাদের কথার প্রত্যেকটি পদ শ্রবণ করিবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ থাকিত। এইভাবে কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে আমার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে রতি বা আসক্তি জাগ্রত হইল।

শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবুদ্ধি হইলে ভগবৎ-কৃপা সম্পর্কে মনের এই উজ্জীবন-রীতিতে শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্ব অন্য কথায় আমাদের জীবনে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাব কাজ করে। এই প্রভাবটি উত্তরোত্তর আত্মমাধুর্য্য বিস্তার করিয়া আমাদিগকে আত্মোপলব্ধির পথে লইয়া গিয়া শরণাগতিতে জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি জাগে। আমাদের মনে ভগবানের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পরিস্ফুর্ত্তির ইহাই সূত্রস্বরূপ। শাস্ত্রের বচনে ভগবৎ-সম্বন্ধ আমাদের পক্ষে পরোক্ষ থাকে, সাধুসঙ্গে তাহা আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষতা লাভ করে। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

'বৈষ্ণবের পদরেণু, ভূষণ করিয়া তনু
যাহা হইতে অনুভব হয়।
মার্জিত হয় ভজন সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ
অবিদ্যা অজ্ঞান পরাজয়।'

ভাগবতও বলেন—

'জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।

'একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পাদারবিন্দরজসাপ্লুতদেহিনাং স্যাৎ।'

অর্থাৎ ভগবানে পরাভক্তিরূপ জ্ঞান অতি দুর্লভ। নরসখা নারায়ণ নারদকে ইহা উপদেশ করেন। অকিঞ্চন ভক্তের চরণ-রেণুতে অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া তবে এই দুর্লভ বস্তু মিলে। দৈত্যবালকদিগকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে প্রহ্লাদ এই সত্যটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'হে দৈত্যবালকগণ, যদি তোমরা আমার বাক্যে শ্রদ্ধা কর তবে তোমাদের বৈশারদী ধী লাভ হইবে অর্থাৎ তোমাদের মন পরিশুদ্ধ হইবে। তোমাদের সংসারচ্ছেদনিপুণা ভগবদ্বিষয়ক মতি জন্মিবে। এইভাবে সাধুসঙ্গে মনের পরিশুদ্ধি-প্রাক্রিয়ার আশ্রয়ে ক্রমে গুরুরূপে শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় শক্তি আমাদের চিত্তে জাগ্রত হয়। সে অবস্থায় আমরা আচার্য্যবান হই; তখন ভগবানের লীলাটি অনপেক্ষ এবং নিরুপাধিক ভাবে আমাদের মনের মূলে নৈরন্তর্য্যে মাধুর্য্য বিস্তার করিতে থাকে। এমন কৃপার স্পর্শ অন্তরে পাইলে আর ভয়ের কারণ থাকে না। স্বধর্ম্ম-পালনের জন্য তখন আর আমাদের অপেক্ষা করিতে হয় না। আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যতই দুষ্কৃতি থাকুক না কেন, ভগবৎ-কৃপাতেই সব নিরাকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে গুরুতে আত্মতত্ত্ব পরিস্ফূর্ত্ত হইলে ভগবানের পক্ষে আমাদের দোষের বিচার করিবার শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। জীব যদি আমার আজ্ঞা পালন করে, তবেই তাহাকে গ্রহণ করিব, নতুবা তাহাকে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করাইব, জীবের দণ্ডদাতা বা শাস্তাস্বরূপে ভগবানের থাকে পরম স্বতন্ত্রতার এমন ভাব। এই ভাব আমাদের ভয়ের কারণ-স্বরূপে কাজ করে। গুরুকৃপারসে আমাদের চিত্ত নিষিক্ত হইলে এই স্বাতন্ত্র্য ভগবান হারাইয়া ফেলেন। তাঁহার কৃপা তখন অযাচিতভাবে এবং অজস্র-ধারায় প্রবাহিত হইয়া পরম মাধুর্য্যে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে জীবকে আপন করিয়া লয়। শাস্ত্রের বহুবিধ বচনের বিভিন্ন অর্থের পাকে তখন আর পড়িয়া থাকিতে হয় না। গুরুতে শ্রদ্ধাবুদ্ধি নিষ্ঠিত হইলে শাস্ত্রবিধি

পরোক্ষ হইয়া যায়। গুরুর বচনামৃতে আমাদের মনকে আকর্ষণ করিয়া আমাদের কাজের ভারটি ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। 'সাধুগুরু শাস্ত্রবাক্য' হৃদয়ে ঐক্য করিয়া সে অবস্থায় ভগবৎ-মাধুর্য্যের প্রভাবে আমরা অনন্যভাবে তাঁহাকে জীবনে উপলব্ধি করিবার ধারাটি অব্যবহিত এবং নিশ্চিতভাবে পাই। প্রহ্লাদও এই কথা বলিয়াছেন—'আমি বালক, আমি অসুরের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার মা ছিলেন স্ত্রীলোক, তবু দেখ, গুরু-কৃপার শক্তি অমোঘ। গুরুবাক্যে নিষ্ঠাবুদ্ধি জন্মিলে, হে অসুর বালকগণ, আমার ন্যায় তোমাদেরও ভগবদ্বিষয়ক মতি লাভ হইবে।'

প্রহ্লাদ অসুরবালকদের প্রতি উপদেশ প্রদানকালে তাঁহার নিজের বাক্যে অসুরবালকদিগকে শ্রদ্ধাবুদ্ধিযুক্ত হইতে বলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার উক্তি অহঙ্কারগর্ভ আমাদের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাঁহার উক্তি একটু ধীরভাবে অনুধাবন করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে তিনি নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার যে উক্তি তাহাতে গুরুর বীর্য্যের তাৎপর্য্যই তিনি অসুরবালকদিগকে ধরাইয়া দিয়াছেন। তিনি জাগাইয়া দিয়াছেন তাঁহার গুরু নারদের প্রতি অসুরবালকদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি। দেবর্ষি নারদের কৃপার অবলম্বনসূত্রে বালক বন্ধুদের সঙ্গে তিনি তাঁহার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বালক, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বভাবে যে অনধিকারী, সে-ও যখন গুরুকৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছে, তখন যিনি যতই অনধিকারী হোন বা অযোগ্য হোন—কেহই তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে না—প্রহ্লাদের উক্তির ইহাই তাৎপর্য্য। মৎগুরু যিনি—তিনিই জগৎগুরু—এই পরম সত্যে উদ্দীপ্ত প্রহ্লাদের বচনে শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় আত্মমাধুর্য্যই অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভাগ্যবানে।" আচার্য্যের বচনে নিষ্ঠাতে এই ভাবে শ্রদ্ধার পরিপূর্ত্তির পথে গুরুপরম্পরাসূত্রে শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের চিত্তবৃত্তির সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সংযোগ সাধিত হয়। অর্জ্জুন যেমন কথার

ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের আত্মভাবের ব্যক্তরূপের আকর্ষণে পড়িয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, সংসারাসক্ত জীবও গুরুর উপদেশে প্রত্যক্ষসূত্রে শ্রীভগবানেরই বচনের চাতুর্য্যে পড়িয়া নিজ নিজ স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শ্রীভগবানের বচনে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আত্মভাবের এই উদ্দীপ্তি লাভই সাধন-ভজনের মুখ্য কথা। শ্রীগুরুর বচন প্রতিপালনের আগ্রহে শ্রীভগবান বাঙ্ময় প্রভাবে চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের লীলাময় ছন্দে জীবের অন্তর আলো করিয়া সর্ব্বসম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া থাকেন। আমাদের সাধনা ভগবৎ-সম্বন্ধে তখন স্বাভাবিকতা লাভ করে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শাস্ত্রে নিষ্ঠাবুদ্ধি হইতে ভগবানের আজ্ঞা প্রতি-পালনে প্রজ্ঞা লাভের সূত্রটি জীবের অধ্যাত্ম-জীবনে অগ্রগতির পক্ষে প্রথমে প্রেরণা যোগায় মাত্র। এই শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে ভগবানের প্রতি জীবের আভিমুখ্য জাগে। এইখানে জীবের চিত্তে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবদনুভূতির সংযোগ লাভ হয়। সাধু বা ভাগবতগণের সঙ্গলাভে জীবকে সুযোগ দিয়া ভগবান গুরুকে আশ্রয় করিবার প্রত্যক্ষানুভূতির বীর্য্য জীবের মনোমূলে সঞ্চার করেন। সাধুসঙ্গের এমনই প্রভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়।' (চৈঃ চঃ)

শ্রীভগবান উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

'সৎসঙ্গেন হি দৈত্যেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ।
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে।
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্ব্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ।

সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে।
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।'

(ভাঃ-১১।১২।৩—৬)

অর্থাৎ সাধুসঙ্গ দ্বারা দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর ও মনুষ্য মধ্যে রজস্তম স্বভাব বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ প্রভৃতি জীবসকল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময় এবং বিভীষণ প্রভৃতি অনেকেই সাধুসঙ্গবশতঃ আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, বণিক্‌পথ, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ ও যজ্ঞপত্নীগণ ইহারা কেহই বেদাধ্যয়ন করে নাই, তীর্থ সেবা করে নাই, ব্রত-তপস্যা করে নাই। কেবল আমার কিংবা আমার ভক্তের সংসর্গ-প্রভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীমৎ উদ্ধবের প্রতি এই ভগবদুক্তিতে "সৎসঙ্গ" "মৎসঙ্গ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ সৎসঙ্গ সাক্ষাৎভাবে ভগবৎ-সঙ্গেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলিয়াছেন—

'তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশীষঃ।'

অর্থাৎ মহৎ সঙ্গের মহিমার নিকট স্বর্গ এমন কি মোক্ষও তুচ্ছ। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মহৎ সঙ্গ নির্গুণ। ত্রিগুণের অতীত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবানের শক্তিস্বরূপ ভক্তি হইতে সঞ্জাত। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীভগবানের বচনের এই যে আকর্ষণ, শাস্ত্রের ভিতর দিয়া বহুভাবে যাহার ব্যাপ্তি, সাধুসঙ্গের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-ধর্ম্মে তাহারই অখণ্ডৈকরসে উদ্দীপ্তি এবং পরে গুরুর সমাশ্রয়ে সেই ব্যক্তিত্বের অনুগতি—এ সব ভগবানেরই কীর্ত্তি অর্থাৎ ভগবানের কৃপাই প্রত্যক্ষভাবে জীবোদ্ধারণের মূলে এসব ক্ষেত্রে আত্মসম্বন্ধের সংবেদনস্বরূপে কাজ করে। এই তিনের ভিতর দিয়া

একই বাক্,·একেরই তাক্ রহিয়াছে। আমাদের মুখ হইতে 'করিষ্যে বচনং তব' এই কথাটি আদায় করিবার জন্য ভগবানেরই ইহা ছন্দোময় লীলা, জীবের প্রতি তাঁহারই প্রেমের খেলা। যতদিন এমন কৃপার সংশ্লেষে আমাদের অজ্ঞানতা বিদূরিত না হয়, ততদিনই পরোক্ষতার বিচার থাকে, স্বধর্ম্মাচরণের অপেক্ষা রহে, আমরা ততদিনই তিনের মূলে পৃথক পৃথক ভাব অনুভব করি। প্রত্যুত ভগবানের কথায় যখন আমাদের অন্তরে ব্যথা জাগে তখন তিনে মিলিয়া তাঁহার গোটা রূপ বা স্বরূপেই তিনি আমাদের কাছে ধরা পড়িয়া যান। ভক্তাধীন শ্রীভগবানের স্নেহের টানে আমাদের আত্মনিবেদনে সে অবস্থায় সর্ব্বত্র তাঁহার চিদাকারই আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠে এবং সত্য হয় সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বভাবে তাঁহার চরণে আমাদের নমস্কার। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—ভগবানের এই আদেশ পালনে তখনই আমরা অধিকার অর্জ্জন করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বপাবনকারী বিভিন্ন ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষানুভূতিলব্ধ ভগবৎ-মাধুর্য্য-প্রণিহিত বৈপ্লবিক বীর্য্যে যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া মানব-ধর্ম্মকে উজ্জীবিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তরের অগ্নিময় অবদানের সংস্পর্শে দুর্নীতির তিমির-গর্ভ হইতে মানব-সমাজের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। তাঁহারা বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন যজ্ঞ করিয়া মানুষকে জাগাইয়াছেন। জাতি, বর্ণ বা আশ্রমধর্ম্মের খুঁটিনাটি পরিপাটি নয়—একান্ত ভগবন্নিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রভাবে সর্ব্ববিধ স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রাণপাতী বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা মানুষকে প্রাণবীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—শুধু সুবিধামত শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া নয়। তাঁহারা মানবতা-বিরোধী অনুদারতা এবং অপ্রেমজনিত সংস্কার হইতে মানুষের মনকে মুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যুত সব সংস্কার হইতে ধর্ম্মের নামে উপজাত কুসংস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। প্রাণবান ধর্ম্মাচার্য্যগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া যুগাগত এমন কুসংস্কারের ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে মানুষকে রক্ষা করিয়াছেন। যুগোচিত পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাঁহারা অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন সত্যের প্রতি

আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করিয়াছেন। ইঁহারা যজ্ঞমূর্ত্তি। ইঁহাদের বচনে এবং আচরণে যজ্ঞানলের দীপ্তি থাকে। বিশ্বমানবের সেবার জন্য বৈপ্লবিক এই তাপই ধর্ম্মের প্রাণ—গতানুগতিক ধারা মানিয়া লওয়া নয়। গীতার অক্ষরে অক্ষরে এমন যজ্ঞানলের উষ্ণতা রহিয়াছে। গীতার দেবতা প্রিয়স্বরূপ তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্তরের অগ্নিময় আকুলতায় আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। সেই আহ্বানে সর্ব্ববিধ অবীর্য্য দগ্ধ হইয়া যাক। জাগুক আমাদের অন্তরে মানুষের জন্য প্রেম। সেই প্রেমের দুরন্ত জ্বালায় আমাদের ভজন-সাধন জীবন্ত হইয়া উঠুক। তবেই নর-নারায়ণের চরণে সর্ব্বভাবে আত্মনিবেদন আমাদের জীবন সার্থকতা লাভ করিবে। আমাদের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে। নরদেহধারী নারায়ণের জয় হোক্।

অর্জ্জুনের দান

'অর্জ্জুনঃ কেশবস্যাত্মা কৃষ্ণশ্চাত্মা কিরীটিনঃ' অর্থাৎ অর্জ্জুন কেশবের আত্মা এবং কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মা। ভক্ত ভগবানের সমাত্ম-সম্বন্ধে এই আত্ম-তত্ত্বই গীতোক্ত উপদেশে প্রমূর্ত্ত। প্রকৃতপক্ষে অর্জ্জুন প্রকৃষ্টরূপেই শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন, কার্পণ্যদোষে আমার চিত্তবৃত্তি বিমলিন হইয়াছে। আমার পক্ষে যাহা শ্রেয় তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। আমি প্রপন্ন হইয়া তোমার চরণে পতিত হইলাম। অর্জ্জুনের প্রত্যেকটি কথায় তাঁহার আন্তরিকতা পরিস্ফুট। অর্জ্জুনের প্রপত্তির মধ্যে কোন ত্রুটি নাই, ইহা সুস্পষ্ট। তবু শ্রীভগবানের উপদেশ লাভ করিবার পর স্বজনের মায়া তিনি কাটাইতে পারিলেন না কেন? গীতোক্ত উপদেশে শ্রীভগবানের আত্ম-মাধুর্য্য নিত্য ভাবে তিনি উপলব্ধি করিলেন না; ইহারই বা কারণ কি? যদি শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের তেমন বীর্য্য তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিত, তবে গীতোক্ত জ্ঞান তাঁহার পক্ষে পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত না এবং অশ্বমেধ-পর্ব্বে তিনি পুনরায় গীতা উপদেশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিতেন না। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া ভগবানকেও এমন কথা বলিতে হইত না যে, আমি যোগযুক্ত অবস্থায় পরব্রহ্ম-তত্ত্ব তোমাকে উপদেশ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে পুনরায় বলা অসম্ভব। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকট তাঁহার অবতারীয় যোগৈশ্বর্য্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিত্য ভাবটি তিনি ব্যক্ত করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বলিব কি, অর্জ্জুন প্রকৃত প্রেম-ভক্তি আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন? প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করে সে ভৃত্য নহে, আর যে প্রভু ভৃত্যের নিকট নিজের প্রভুত্ব ইচ্ছা করেন, তিনিও প্রকৃত স্বামী নহেন। ভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয় হইয়া পড়ে। অর্জ্জুনের

নিকট তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমাকে লাভ করিবে এমন প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিষয়টির সম্বন্ধে ভগবানের বিবেচনা করা উচিত ছিল না কি? যে সকল মানব ভগবানের শরণাগত ও একান্ত তাঁহারা ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। দোষ অর্জ্জুনের নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে দোষটি উপদেষ্টা যিনি তাঁহার। অর্জ্জুন ভগবদ্ভক্তির সংবেদন-সূত্রটি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং নিত্য লীলার উৎস-মুখেও যে তাঁহার চিত্ত অনুপ্রবেশে উন্মুখতা লাভ করিয়াছিল, এ কথা বলিতেই হয়। কুরুক্ষেত্রের রণ-কোলাহল স্তব্ধ করিয়া বৃন্দাবনের বাঁশরীর মাধুরী অর্জ্জুনের কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভিক প্রশ্নে অর্জ্জুনের মুখে 'কেশিনিসূদন' এই সম্বোধনে সে পরিচয় পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই একবার মাত্র এই একটি নাম তাঁহার মুখে আমরা শুনিতে পাই। কেশিবধ তো বৃন্দাবনের ব্যাপার। ব্রজের রাখালেরই সে কীর্ত্তি। সমগ্র মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা সম্পর্কিত নাম সম্ভবতঃ উচ্চারিত হইয়াছে দুইবার। একবার কুরুরাজ-সভায় বস্ত্রাকর্ষণ-বিপন্না দ্রৌপদীর মুখ হইতে 'গোপীজনপ্রিয়' এই সম্বোধনে এবং দ্বিতীয়বার অর্জ্জুনের মুখে 'কেশিনিসূদন' এই মন্ত্রে। কর্ণের আদেশে দুঃশাসন সবলে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। একান্ত অসহায় হইয়া পাঞ্চালী সর্ব্ববিপদভঞ্জন নারায়ণের শরণাগত হইলেন। মহাভারতে দৃষ্ট হয়—

'আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥
কৌরবার্ণবমগ্নাং মাং উদ্ধরস্ব জনার্দ্দন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম ॥'

অর্থাৎ হে গোবিন্দ, গোপীজনপ্রিয়, আমি তোমার শরণাগতা, কৌরব-সাগরে আজ মগ্না, আমাকে রক্ষা কর। ফলতঃ সেবার জন্য চিত্ত-বৃত্তির সাক্ষাৎ উন্মুখতাতেই জিহ্বায় নাম স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়, নতুবা নামের

স্ফুরণ ঘটে না। সেরা প্রেমেরই ধর্ম্ম সুতরাং অর্জ্জুন বৃন্দাবন-লীলা আস্বাদনে অধিকারী হইয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বুঝা যায় শ্রীভগবানের আত্ম-মাধুর্য্যের নিত্য-সম্বন্ধ উপভোগে তাঁহার চিত্ত ছন্দায়িত হইয়াছিল; কিন্তু ভগবান তথাপি তাঁহাকে প্রেমভক্তি দিতে সমর্থ হন নাই। কথাটির সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমাদের মনে স্বভাবতই বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু স্বয়ং শুকদেবের শ্রীমুখেরই তেমন উক্তি ভাগবতে পরিদৃষ্ট হয়। মহারাজ পরীক্ষিতকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—

'রাজন্ পতিগু´রুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগঃ।'

(ভাঃ-৫।৬।১৮)

অর্থাৎ হে মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের ও যদুগণের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য এবং সুহৃৎ। কদাচিৎ দৌত্যকার্য্যে তিনি আপনাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার ভজনা করেন তাঁহাদিগকে তিনি মুক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তিযোগ বা প্রেমভক্তি কাহাকেও তিনি দেন না। কারণটি কি? কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রেম পদার্থটি শ্রীভগবানে নাই। ভক্তের নিকট হইতে ভগবানকে তাহা ঋণস্বরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানমূর্ত্তিতে চতুর্ভু´জধারী। তিনি পূর্ণতম ভগবৎ-তত্ত্ব নহেন—

'কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু।'

(ভঃ রঃ সিঃ—১২০)

অর্থাৎ বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকাতে পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব অর্জ্জুনের মুখে বৃন্দাবন-লীলা সম্পর্কিত ছন্দোময় নামের উক্তিতেই প্রতিপন্ন

হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম তত্ত্ব আস্বাদনে তিনি অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই অধিকারের জোরেই তিনি ভগবানকে আচার্য্যের আসনে বসাইয়াছেন। এইটি সর্ব্বভাবে তাঁহার ভগবৎ-সেবা। ভগবান নিজেও এই মর্য্যাদার ভিখারী। কারণ জীবের প্রতি তাঁহার বেদনা নিত্য এবং সত্য। তিনি জীবকে আপন করিতে পারিলে কৃতার্থ হন। গুরুরূপে তিনি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জীবকে কৃপা করিবার সুযোগ লাভ করেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে সেই সুযোগ দিয়াছেন। জীবকে উদ্ধার করা ঈশ্বরের স্বভাব। এজন্য তিনি পুনঃ পুনঃ জীবকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং নিজেও জীবকে নিস্তার করার উদ্দেশ্যেই অবতারাদি গ্রহণ করেন। তথাপি জীবকে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আকুল না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করেন। আচার্য্য সংসারী জীবকে আশ্রয় দান করেন এবং বহু উপদেশাদির দ্বারা তাহাদের চিত্তের পরিশুদ্ধি সাধন করিয়া তাহাদিগকে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপযোগী করিয়া ভগবানের সেই দুঃখ দূরীকরণের সুযোগ সৃষ্টি করেন। জীবকে নিজ করিয়া পাইয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছার পরিপূর্ত্তি সাধিত হয়। সুতরাং আচার্য্য বা গুরু ঈশ্বরেরও উপকারক। আড়বার কুলাচার্য্য শ্রীমৎ লোকাচার স্বামী তৎপ্রণীত শ্রীবচন-ভূষণ গ্রন্থে আচার্য্যের এই বৈভব উন্মুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—'ঈশ্বরশ্চ স্বয়ং আচার্য্যত্ব আশাং কৃত্বা তিষ্ঠতি'। অর্থাৎ ঈশ্বর জন্মরহিত হইয়াও আচার্য্যের বৈভবের বিষয় জ্ঞাত হইয়া আচার্য্যত্ব লাভের আশায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অপেক্ষা করিয়া থাকেন। গীতায় অর্জ্জুনকে তত্ত্ব-বিবেকাদিমূলক উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভয় প্রদানের আগ্রহ হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্জ্জুন-কৃত উপকারটি ভগবানকে অভিভূত করে। তিনি অবশেষে কোনদিকে না তাকাইয়া অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন—দাবী করেন শুধু শরণাগতির। এইভাবে অর্জ্জুন একাধারে বিশ্বাত্ম-দেবতার এবং বিশ্বমানবের পরম উপকারী। জীবের উদ্ধারে শ্রীভগবানের

স্বরূপধর্ম্মগত সংবেদনের সত্য এবং নিত্য স্বরূপটি লীলা সহচরস্বরূপে অর্জ্জুন একান্ত এবং জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের উক্তি এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—'অর্জ্জুনস্য মোহং গীতাশাস্ত্রেণ........প্রাকৃতলোক প্রতীত্যৈবোক্তির্বস্তুতস্তু ভগবন্নিত্য-পার্ষদত্বান্ন সংসারশঙ্কাগন্ধোঽপি। কিন্তু জীবহিতগ্রাহণচাতুর্য্যধুরন্ধরাণাং মহাকৃপালুনাং মহতামপ্যেকং মহাপ্রসিদ্ধং জনমবলম্ব্যৈব হিতোপদেশসন্ততিরিতি নীতির্দৃষ্টা' অর্থাৎ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ। জগজ্জীবের নিকট মঙ্গলের উপদেশ তাহাদের গ্রহণোপযোগী করিয়া প্রচার করিতে হইলে মহাকৃপালু মহৎগণের মধ্য হইতেই কোনও মহাপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া হিতোপদেশ বিস্তার করিতে হয়। এই নীতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং অর্জ্জুন প্রেমভক্তি লাভ করেন নাই এ কথা কেমন করিয়া বলিব? প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি প্রেমভক্তি দানে শ্রীভগবানকে প্রণোদিত করিয়াছেন। এইখানেই শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যস্বরূপে অর্জ্জুনের প্রপত্তির মৌলিক রহস্যটি সম্পুটিত রহিয়াছে। আচার্য্যরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি ভগবৎ-প্রাপ্তির বিভিন্ন প্রকরণের সম্বন্ধে পরিপ্রশ্নসূত্রে পরম প্রেমভক্তির বীর্য্য-স্বরূপ শরণাগতিকে জীবের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট করিয়া অর্জ্জুন প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্য লীলার পরিবেশটির পত্তন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের পার্থ-সারথীর উপদেশের শ্রুতিপথে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে বৃন্দাবনের সুর। একটু ভাবিলেই আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করিব। ভগবান তো উপদেশ দিলেন, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে। আমরা তাঁহার মুখে এমন উপদেশ পাইলাম। ইহাও বুঝিলাম যে, তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিলে আমরা তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারি, পাইতে পারি তাঁহাকে। কিন্তু আমাদের মধ্যে আমরা কয়জন তাঁহার সেই উপদেশ অনুসরণ করিবার মত অধিকার অর্জ্জন করিয়াছি? কর্ম্মত্যাগ বা ধর্ম্মত্যাগের অধিকার যিনি লাভ করিয়াছেন,

তাঁহারই আছে সেই অধিকার। কর্ম্ম করি বা না করি, ধর্ম্ম থাকুক বা না থাকুক, আমাদের প্রয়োজন কৃষ্ণকে পাওয়া, নতুবা ধর্ম্মের কোন মূল্যই নাই। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কোন কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় না এইরূপ নিশ্চয়তা বোধ যাঁহার চিত্তে জাগ্রত হইয়াছে তাঁহার পক্ষে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করাই বিধেয় হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি থাকিলে শরণাগতি অবলম্বন করা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মত্যাগোপযোগী গুণাতীতা ভক্তির প্রতিবেশটিতে চিত্তকে উন্নীত করা আমাদের পক্ষে কি সম্ভব? নিজকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া যে সেই অবস্থা পাইতে হয়। স্বয়ং যাঁহারা ব্রজগোপী তাঁহাদের পক্ষেও কি তাহা সম্ভব হইয়াছিল? কালিন্দীর পুলিন-বিপিনে যতদূর পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নার আলো বিস্তারিত ছিল, সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সন্ধানে নিজেদের চেষ্টা তাঁহারা ছাড়েন নাই। পরিশেষে যখন দেখিলেন বনভূমি অন্ধকারগ্রস্ত, তখনই তাঁহারা নিরস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। ভাগবতের লীলাটি এইরূপ—

'ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্র-জ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ।'

(ভাঃ ১০।৩০।৪২)

গোপীগন বনের যে পর্য্যন্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিস্তৃত ছিল ততদূর পর্য্যন্ত কৃষ্ণান্বেষণের জন্য প্রবেশ করিলেন। অতঃপর বনভূমি ঘনান্ধকার-গ্রস্ত দেখিয়া অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। গোপীগণের আকুল গীতিতে ধ্বনিত হইল শরণাগতি। বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাই—

"প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতি গোচরে॥"

না, কৃষ্ণ গহন বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার পদচিহ্ন এখানে আর দেখা যাইতেছে না, ফিরিয়া আইস। চন্দ্রের জ্যোৎস্না ওদিকে আর নাই, দিগন্ত ব্যাপিয়া অন্ধকার। ভাগবতের উক্ত শ্লোকের

ভাষ্যে শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেন—"স্তদিচ্ছাং বিনা স ন লভ্যো যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য। ইতি শ্রুতিং প্রমাণীকুর্ব্বত্য" —অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যাঁহাকে তিনি বরণ করেন, তাঁহারই তিনি লভ্য হইয়া থাকেন। গোপীগণ এই শ্রুতি বাক্য প্রমাণিত করিলেন। গোপীগণ ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন যে, তাঁহার দর্শন লাভে "তৎকারুণ্যমেব হেতুস্তৎ-কারুণ্যে চ তৎসঙ্কীর্ত্তনমেব হেতুরিতি সিদ্ধান্তং" চক্রবর্ত্তীপাদের ভাষায় তাঁহার করুণাই তাঁহাকে দর্শন লাভের একমাত্র উপায়, উপায় তাঁহার শরণাগতি। কীর্ত্তনেই শরণাগতির পরিপূর্ত্তি। আচার্য্য শ্রীধর স্বামীপাদের ইহাই সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন—'নামোচ্চারণাৎ তদ্‌বিষয়া নামোচ্চারক পুরুষবিষয়া মদীয়োহয়ম্ ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোর্মতি ভবতি।' নাম উচ্চারণ করিলে নামোচ্চারণকারী ব্যক্তি আমার জন, আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয় শ্রীভগবানের এইরূপ মতি হয়। ভগবৎ-কৃপার তেমন সংস্পর্শে শরণাগতি সত্য হয়, শরণাগতি সত্য হয় দিব্য-জীবনের সংবেদনে, শরণাগতি সত্য হয় পশুর পরিচ্ছিন্ন জড় মনোধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন সত্যের মননে। শরণাগতি সত্য হয় সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবৎ-প্রেমানুভূতিতে উদ্দীপিত চিত্তের অত্যুগ্র এবং উদগ্র উৎকণ্ঠায়। ভগবৎ-প্রেমের আকুল ব্যাকুল তেমন আলোড়ন মনের মূলে উপলব্ধি করা তো সহজ বস্তু নয়। আর কিছু নয়, ভগবানকে পাইবার জন্য আকুলতা হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। সেই জিনিষ দুর্লভ—'হেন প্রেম নৃলোকে না হয়' এমনই ব্যাপার। আমরা বদ্ধ জীব। বহিরঙ্গে আমাদের চিত্তবৃত্তি সতত উন্মুখ। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ বলিতে আমরা বহিরার্থে আসক্তিই সোজা বুঝিয়া লইব। আমাদের স্বার্থ সাধনাই আমাদের পক্ষে বড় হইবে। কারণ ইন্দ্রিয়সুখ-সঞ্জাত স্থূল ভোগকেই আমরা নিজেদের স্বার্থ এবং তাহাতেই আমাদের সুখ বুঝিয়া থাকি। ধর্ম্মত্যাগ বলিতে 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' ইহাই আমরা বুঝিব, এমন ভয়ের কারণ

রহিয়াছে। এই সঙ্কট হইতে আমাদের রক্ষা পাইবার উপায় কি? বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে বস্তুটি লাভ করা যায়, উপদেশ না করিয়া অযাচিতভাবে সেই বস্তুটি দিয়া ভগবান আমাদিগকে কৃপাটি করিলেই তো আমরা রক্ষা পাইতাম। আমাদের প্রতি তাঁহার কৃপার স্বরূপটি অঙ্গে মাখাইয়া তিনি আমাদিগকে দেখা দিলেই আমরা বাঁচিয়া যাইতাম। গাহিতাম তাঁহারই জয়। অর্জ্জুন এই অযাচিত কৃপা বা প্রেমদানের পথে নররূপী নারায়ণকে আমাদের কাছে আগাইয়া আনিয়াছেন। "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ"—তোমার প্রসাদে আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনগণের মমতায় পড়িয়া আমার চিত্তে যে বিষাদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি। আমার স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে—'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস' এই সত্যে আমার চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেন—'যথা কথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে।' অর্থাৎ সকল কল্যাণ-ভাজন যিনি তাঁহার সহিত চিত্তের সম্বন্ধই স্মৃতি। অর্জ্জুন বিশ্বমানবের স্বরূপনিষ্ঠ এই স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়াছেন। ভগবানকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করাইয়াছেন। বৃন্দাবনের সুর নবদ্বীপে মধুর হইতে মধুর ঝঙ্কারে বাজিয়াছে। সে ঝঙ্কার চরাচরে নাম, গুণ ও লীলার ত্রিধারায় জমিয়া উঠিয়াছে। গীতোক্ত আদর্শের এই বিবর্ত্ত-রীতি যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই গীতার প্রকৃত তত্ত্বার্থবিৎ পুরুষ।

উপসংহার

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা। তাঁহার পুত্রেরা এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্রগণ যুদ্ধে কি করিল, সঞ্জয়ের নিকট তাঁহার এই প্রশ্ন। ধৃতরাষ্ট্রের বহিঃদৃষ্টির অন্ধতা তাঁহার অজ্ঞানান্ধতারই পরিচায়ক। নিজ পুত্রগণের মায়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছে। অন্ধতাজনিত তাঁহার চিত্তের এই দুর্ব্বলতার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। শকুনির কুমন্ত্রণায় পরিচালিত তাঁহার পুত্রগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে পুত্রগণের ক্রমিক জয়লাভে আগ্রহান্বিত ধৃতরাষ্ট্র 'কিং জিতং, কিং জিতং' এবার কি জিনিষ জয় করা হইল, তাহা অবগত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছেন।

'ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত।'

পুত্রগণের জয়ের উল্লাস কিছুতেই তিনি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতির পৈশাচিক আনন্দে পুত্র-মায়ায় অন্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র উন্মত্ত। ইহার পর ত্রয়োদশ বৎসরের দ্যূতপণে উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডবেরা উপপ্লব্য নগরে বাস করিতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে তাঁহাদের নিকট দূতস্বরূপে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার দাবী পরিত্যাগ করিতে বলেন। সঞ্জয় দৌত্যকার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বলেন—মহারাজ, আমি পথশ্রমে আজ বড় পরিশ্রান্ত। আগামী কল্য রাজসভায় পাণ্ডবেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিব। ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। সঞ্জয় কি জানি কি বলেন। যদি তাঁহার বক্তব্য দুর্য্যোধনাদির অনুকূল না হয়—তাঁহার দারুণ দুশ্চিন্তা। এই চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রা নাই। প্রত্যুষে উঠিয়াই পরামর্শের জন্য তিনি

বিদুরকে ডাকিয়া আনিলেন। পুত্রস্নেহের এমনই দায়—মায়ার এমনই খেলায় ধৃতরাষ্ট্র বিচার-শক্তিবিহীন। আমরা এমনই মায়াবদ্ধ জীব। দৃষ্টিশক্তিহীন আমরাও। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে স্বার্থভীরু দুর্ব্বল আমাদের বুক সদা সর্ব্বদা দুরু দুরু করিয়া কাঁপে এবং স্বার্থ-প্রয়োজনের আলোড়নে অনুরূপ অনুসন্ধানে আমরা প্রতিনিয়ত ব্যগ্র থাকি। গীতার প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্রের মুখে সঞ্জয়ের নিকট হইতে কুরুক্ষেত্রের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল প্রশ্নটি ব্যক্ত হইয়াছে। সঞ্জয় এই প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে বাসুদেবার্জ্জুনের সংবাদ তাঁহাকে শুনাইলেন। সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ, সে সংবাদ অদ্ভুত। সে সংবাদ রোমাঞ্চকর। ব্যাসদেবের প্রসাদে লব্ধ দিব্যচক্ষুর দ্বারা আমি পরম গুহ্যতত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি নিজে। আমি দেখিয়াছি স্বচক্ষুতে ভগবানের বিশ্বরূপ। আমি যাহা শুনিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার নয়। কেশবার্জ্জুনের সেই পুণ্যকথা মুহুর্মুহু আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। মহাবিস্ময়ে আমি প্রতি অঙ্গে পুলক অনুভব করিতেছি। যে পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন সে পক্ষে রাজ্যশ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় এবং অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজ করিবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সঞ্জয়ের উক্তির ইহাই শ্রুতিফল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়,
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।'

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা সকলই অভিন্ন। এগুলির মধ্যে শ্রবণই প্রধান। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখ হইতে শ্রবণের অনন্যসাধ্য মাহাত্ম্য আমরা অবগত হইয়াছি। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বলেন—'শ্রবণং নামরূপ-গুণপরিকর-লীলাময়-শব্দানাং শ্রোত্র-স্পর্শঃ।' কীর্ত্তন এবং স্মরণ শ্রবণেরই ক্রম-স্বরূপে চিত্তে স্বতঃস্ফুরিত হয়। তাঁহার মতে "সর্ব্বস্ত শ্রীকৃষ্ণনামাদি-

শ্রবণং পরমভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে" অর্থাৎ পরম ভাগ্যবশেই মানুষ শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণে অধিকারী হয়।

ব্যাসদেব শ্রীভগবানের আবেশাবতারস্বরূপে সম্পূজিত। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি—

'কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুং
কোহ্যন্যো ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃৎ ভবেৎ।'

অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্বয়ং প্রভু নারায়ণ বলিয়া জানিবে।

'মতি মন্থানমাবিধ্য যেনাসৌ শ্রুতিসাগরাৎ।
জগদ্ধিতায় জনিতো মহাভারতচন্দ্রমা।'

ব্যাসদেব বেদরূপ সমুদ্রকে বুদ্ধিরূপ দণ্ড দ্বারা মন্থন করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য মহাভারতরূপ চন্দ্রমাকে সমুত্থিত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনকে শিক্ষাদান কালে বলেন—

'ব্যাস-কৃপায় শুকদেব লীলাদি শ্রবণ,
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন।'

প্রভুর উক্তিটি ভাগবতী। ভাগবত বলেন—

'হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়নিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন-প্রিয়ঃ।'

(ভাঃ-১।৭।১১)

অর্থাৎ বিষ্ণুজনের নিত্যপ্রিয় ভগবান শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ গুণ শ্রবণে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ভাগবতে পরিদৃষ্ট হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন পৈলাদি নিজ শিষ্যগণকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভাগবত-তত্ত্ব শুকদেবকেই উপদেশ করেন। (ভাঃ-৯।২২।২৩) বস্তুত ভগবান বেদব্যাস ভাগবত-কথার আচার্য্য এবং উপদেষ্টা। এসম্বন্ধে তাঁহার নিজ মুখের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

'সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে।
বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দেবং কেশবাৎ পরম্।'

অর্থাৎ দুই বাহু উত্তোলন করিয়া এবং সত্য, সত্য, সত্য এইরূপ ত্রিসত্য করিয়া আমি বলিতেছি যে বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনও শাস্ত্র নাই এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন দেবতা নাই। সুতরাং 'কহ কৃষ্ণ, গাহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণের নাম।' বেদব্যাসের উক্তিতে তাঁহার চিত্তের এমন আকুতিই ব্যক্ত হইয়াছে। কলির কৃপায় ব্যাসজীর ইচ্ছা পূর্ণ হইল। কৃষ্ণনামটি জীবকে শুনাইবার জন্য এবং জীবের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবার জন্য পিপাসা তাঁহার মিটিল। 'ধন্য কলি, ধন্য কলি' কলিযুগাগমনভীত ঋষিগণ তাঁহার মুখে এই বাণী শ্রবণে আশ্বস্ত হইলেন। ভগবান স্বয়ং পূর্ব্বে ব্যাসদেবের নিকট কথা দিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে উক্তি—

'উপপুরাণেতে শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন।'

অহমেব ক্বচিৎ ব্রহ্মন্
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি
কলৌ পাপহতান্নরান্।'

অর্থাৎ হে ব্রহ্মণ, আমি কোন কলিযুগে অর্থাৎ বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক পাপহত নরদিগকে হরিভক্তি দিব। ব্যাসদেবের কৃপা-প্রণোদিত হইয়া শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে উদ্দেশ করিয়া বিশ্ববাসীকে শুনাইলেন—

'কলের্দোষনিধের্রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাৎ এব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ কৃষ্ণনামের কীর্ত্তনসূত্রে গীতার পরম গুহ্যতত্ত্ব মর্ত্ত্যধামে প্রমূর্ত্ত হইল। মহাভারতরূপ সরোবরের পঙ্কজস্বরূপ গীতার কলিমল-বিধ্বংসী প্রভা বিশ্বজীবের কল্যাণ-কল্পে বিস্তার লাভ করিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতার উপসংহারে গীতার দেবতা সর্ব্বগুহ্যতম তাঁহার পরম বচনটি অর্জ্জুনকে শুনাইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন

নাই। কলির মায়াবদ্ধ জীবের জন্য তাঁহার চিত্তের বেদনা রহিয়াই গিয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৮তম শ্লোকে এই বেদনাটি ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন—

"য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।"

অর্থাৎ গীতার এই পরম গুহ্যতত্ত্ব যিনি ব্যাখ্যা দ্বারা আমার ভক্তকে হৃদয়ঙ্গম করাইবেন তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভগবান তো তাঁহার মনের আবেগে প্রাণের কথা বলিয়া গেলেন, কিন্তু সে কথায় কাজ হইবে কি? আমাদের অন্তর তাঁহার কথায় গলিবে কি? কমল দল মেলিবে কি? বাংলার সাধক বলিয়াছেন—

'কমল মেলে কি আঁখি,
তারে সঙ্গে না দেখি,
যদি রবি এসে না দেয় সাড়া
রাতের শয়নে।'

গীতোক্ত পরম গুহ্য বা গুহ্যতম তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই সমস্যায় পতিত হইতে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের মধুবিদ্যার তত্ত্বটি আমরা ইতঃপূর্বে আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেখানে শ্রুতি বলিয়াছেন, গুহ্য-উপাসনা-প্রণালী মধুকৃত। ব্রহ্ম বা প্রণব ওঁকাররূপ ফুলের এই মধু। গুহ্যতম এই উপাসনা-প্রণালীরূপ এই পুষ্পের মধু মিলে কোথায়? মিলে ভগবানের কেমন আদেশ হইতে যাহা হইতে এই ফুল দল মেলে এবং তাহাতে মধু জমে? ধারাটি এই, গুহ্যতম আদেশের মধুরসে প্রণব ক্ষোভিত হয়—ফুটিয়া উঠে ব্রহ্মের 'পুষ্পংতা অমৃতা আপঃ।' প্রণব-পুষ্প ঊর্দ্ধমুখে দল মেলে এবং পীতপরাগ-পটলের ভরে তাহা হইতে মধুধারা ক্ষরিত হয়। আমাদের মন ভোমরা সেই কমলের মধুপানে মাতিয়া উঠে। শ্রীভগবানের চিন্ময় লীলাচ্ছন্দের মধুর স্পর্শ

পাইলে মন জাগে, ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত রসে উদ্দাপিত হয়। শাস্ত্রের আদেশ আমরা অনেকেই শুনি, প্রতিনিয়তই শুনি, কিন্তু কয়টি আদেশ প্রতিপালনে আমাদের চিত্তে উন্মুখতা জাগ্রত হয়—বলুন তো ? বস্তুতঃ সকল আদেশ আমাদের কর্ণমূলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তরকে অপ্রাকৃত রসধর্ম্মে উচ্ছল করিয়া তোলে না। প্রত্যুত যেরূপ আদেশের মধ্যে উপদেষ্টাকে সেই আদেশের অনুবর্ত্তনে নিজমাধুর্য্যের প্রবর্ত্তক-স্বরূপে আমরা পাই, আমরা সেইরূপ আদেশের প্রতিপালনেই উদ্‌যুক্ত হই। উপদেষ্টা যেখানে আদেশের সাধনাঙ্গে নিজেকে ছড়াইয়া জড়াইয়া আমাদের সহিত মিলাইয়া দেন, আমরা সেইখানেই তাঁহার দিকে চাই। আমাদিগকে উপদেশ করিতে বা আদেশ দিতে গিয়া ভগবান নিজে আমাদের উজ্জীবনের জন্য সেখানে সেই আদেশ প্রতি-পালনে প্রবৃত্ত হন বা আচরণ করেন, তাঁহার তেমন আদেশেই সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আকৃষ্ট হই। বৃন্দাবনে কি ঘটিয়াছিল ? রাসরসারম্ভে গোপীদের সহিত লুকোচুরি খেলা। সে তো অশেষে বিশেষে রসাস্বাদনেরই চাতুরী। বস্তুতঃ গোপীদের কাছে ধরা তিনি আগেই দিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরের শ্রীমুখে বাঁশীটি যখন বাজিয়াছিল, তখন ব্যাপারটি দাঁড়ায় কি ? গোপীরা বাঁশী শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, আমরা ইহাই দেখি। অনুভূতির গূঢ়স্তরে কিন্তু ঘটনাটি ঘটে অন্যরকম। গোপীরা কৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বংশী-ধ্বনির বীজ গুহ্যাদেশের স্বরূপটি তাঁহাদের কাছে আত্মমাধুরীর চাতুরী লইয়া প্রকটিত হয়। কৃষ্ণই গোপীদের কাছে ছুটিয়া যান এবং আত্মমাধুর্য্যের পরমবীর্য্যে তাঁহাদিগকে নিজকে দান করেন, বরণ করেন তাঁহাদিগকে। বেণুধ্বনির অন্তর্গূঢ় গুহ্যতম আদেশে গোপীদের নিকট শ্রীভগবানের আত্মমাধুর্য্যে উন্মেষের এই রহস্যটি শ্রীমৎ শুকদেব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূত-মনোহরম্।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে।'

অর্থাৎ গোপীগণ সর্ব্বভূতমনোহর শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তাঁহাদের নিকট উপনীত হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ বলেন, গোপীরা পরমানন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-বিহ্বল চিত্তে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন এবং তাঁহার কথা বলিতে উদ্যত হন। কিন্তু প্রেমবিহ্বলতাবশত বর্ণনা করিতে পারেন না। গোপীদের কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনেচ্ছাজনিত কামবেগ সর্ব্বজ্ঞ শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে অভিব্যক্তি লাভ করে। গুহ্যতম আদেশের পরম বীর্য্যটি এখানে প্রকটিত। প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে আদেশ দিতে গিয়া ভগবান যদি সেই আদেশের মধ্যে নিজেকে আমাদের ভাবে মিশাইয়া আপন করিয়া না দেন তবে তাঁহার আদেশ পরমবীর্য্যে আমাদের অন্তরগ্রাহ্য হয় না। গীতার গুহ্যতম আদেশে প্রেমের ঠাকুর নিজেকে এই ভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া সর্ব্বভাবে অর্জ্জুনের আপন হইয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদনের উপযোগী রসধর্ম্মে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন। জীবকে নিজের ভাবে প্রপন্ন করিবার পথে ভগবানের প্রীতির ইহাই রীতি। তাঁহার গুহ্যতম আদেশের ইহাই তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে ভগবদুপদেশ বা ভগবৎ-আজ্ঞার মূলে উপদেষ্টৃস্বরূপে শ্রীভগবানের পতিতপাবন লীলা-রসের এমন উন্মেষটি অনুভব না করিলে বিষয়াসক্ত জীব সে আদেশ পালনে প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় সর্ব্বসম্বন্ধে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে প্রণোদিত হয় না। আবার তেমন প্রতিবেশটি না পাইলে ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আমাদের চিত্ত শরণাগতির পথে প্রণোদিত হয় না। শাস্ত্রের বচন বা আদেশ কিংবা উপদেশে মায়াবদ্ধ জীবের মনোধর্ম্মের উজ্জীবনে এইখানেই সঙ্কট সৃষ্টি হইয়া থাকে। সে সব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভজন-প্রবৃত্তির উজ্জীবনোপযোগী মাধুর্য্য-বীর্য্য আমরা অন্তরে অনুভব করি না। ফলতঃ আদেশটি পরোক্ষই থাকিয়া যায়। কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভজনই রাগানুগ মার্গে ভজন—পরোক্ষতার স্থান এক্ষেত্রে নাই। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৮তম শ্লোকে ভগবান কিন্তু তাঁহার গুহ্যতম আদেশ আমাদের চিত্তে উদ্দীপিত করিবার ভারটি

অপরের উপর দিতে চাহিয়াছেন—'য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি' অর্থাৎ যিনি এই পরম গুহ্যতত্ত্বটি আমার ভক্তগণের চিত্তে উদ্রিক্ত করিবেন ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হয় কিরূপে ? কারণ গুহ্যতম আদেশের ক্ষেত্রে কাজটি যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে নিজেরই করিতে হয়। গুহ্যতম আদেশে নিজেকে দান করিয়া জীবকে সমাত্মসম্বন্ধে আকর্ষণ করিবার উপযোগী মাধুর্য্যের বীর্য্যটিই যদি না থাকে, যদি তাহা গোপনই রহিয়া যায়, রহে অব্যক্ত বা পরোক্ষ, তবে সর্ব্বজীবের চিত্ত তাহার উজ্জীবন-রসে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে স্পর্শ করে না। তাহারা সে আদেশ প্রতিপালনে প্রণোদিতও হয় না। সে ক্ষেত্রে 'বাক্-বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান-কৌশলং' অর্থাৎ গীতা-শাস্ত্রের শব্দগুলি আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না। বস্তুতঃ ব্যাখ্যাকর্ত্তার চিত্তে শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দ-সেবায় লুব্ধতা না জাগিলে তাঁহার বচন ছন্দোময় রূপ লাভ করিয়া ভগবানের সহিত আমাদের মনের সম্বন্ধ উদ্রিক্ত করিতে সামর্থ্যসম্পন্ন হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎ-গুণানুকথনে মহৎজনগণের চিত্তের ব্যগ্রতা হইতেই আমাদের মন সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবৎ-প্রেমে উন্মুখতা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে জীবকে সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে তাঁহার শরণাগতি দিতে হইলে ভগবৎ-তত্ত্বে সৌলভ্য, সৌশীল্য এবং বাৎসল্য এই সব গুণের পরিপূর্ণতা থাকা প্রয়োজন। সৌলভ্য বলিতে সকল জীবকে দর্শন দানে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার রূপ-মাধুরী, সৌশীল্য বলিতে পতিত, নীচ, অকৃতী, অনধিকারী প্রভৃতি সর্ব্ব জীবকে সমভাবে আপন করিয়া লইবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা এবং বাৎসল্য বলিতে জীবের দোষকে গুণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কোলে বুকে করিবার আগ্রহ অন্তরে লইয়া ভগবানের আগাইয়া আসা বুঝায়। ভগবৎ-কথামৃতে এমন লীলার প্রত্যক্ষানুভূতির রসের উজ্জীবন তো করিবেন তিনি স্বয়ং। শব্দব্রহ্ম বেদ এবং পরব্রহ্ম ভগবৎ-তত্ত্ব। বেদার্থ-প্রতিপাদনে পরব্রহ্ম-স্বরূপ দেবতার অপরোক্ষানুভূতি আত্ম-লীলাকে আশ্রয় করিয়াই

জীবের চিত্তে উদ্দীপিত হয় এবং তেমন প্রত্যক্ষানুভূতিমূলক বচনের শ্রবণেই আমাদের পক্ষে অর্থের উপলব্ধি ঘটে। ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৯তম শ্লোকে বলিয়াছেন, ভক্তের নিকট যাঁহারা গীতা ব্যাখ্যা করিবেন, তাঁহারা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, এমন কি তাঁহাদের অপেক্ষা জগতে ভগবানের প্রিয় আর কেহই নাই। এমন প্রিয়কে পাইয়া ভগবানের প্রাণের পিপাসা মিটিবে কি উপায়ে? ভগবান তেমন প্রিয়ের সন্ধানে ছুটিলেন। ভক্তদের নিকট গীতা পাঠ বা ব্যাখ্যা করিবার আদেশ ভগবান দিলেন; নিষেধ রহিল যাঁহারা তপস্যাবিহীন তাহাদিগকে কখনও গীতা শুনাইবে না। তপস্বী হইলেও গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন ব্যক্তিদিগকে কখনও ইহা বলিবে না। ভক্ত ও তপস্বী হইলেও যাঁহারা ভগবৎ-কথা শুনিতে আগ্রহবিহীন তাহাদের কাহাকেও ইহা বলিবে না। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণরূপ আমাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিজনিত অসূয়াপরায়ণ তাহাদিগকে গীতা কখনও শুনাইবে না। শুনাইবে—

"এতৈর্দোষৈ বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ
সাধবে শুচয়ে ব্রয়াদ্ভক্তিঃ স্যাচ্ছূদ্রযোষিতাং।'
(ভাঃ-১১।২৯।২৯)

অর্থাৎ উদ্ধবের নিকট ভগবান তাঁহার কথা শ্রবণে অধিকারী নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত অসূয়াবিহীন ভক্ত আমার প্রিয়, তাহাদিগকে এবং শুচি ও সাধু ব্যক্তিকে ইহা বলিবে। শূদ্র এবং স্ত্রীলোক প্রভৃতি জন্মকর্ম্মজনিত অনধিকারী ব্যক্তিও যদি আমার ভক্ত হয় তবে তাহাদিগকেও বলিবে। ভগবৎ-কথা সম্বন্ধে আসক্তি-যুক্ত ভক্তের জন্য ভগবানের এমনই ব্যাকুলতা। কৃষ্ণকথা শুনিতে আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিদের জাতি-বর্ণাদি কোন বিচার নাই। কিন্তু সে আগ্রহ কোথায়? বিষয়াসক্ত জীবের কৃষ্ণকথা শুনিতে রুচি জন্মে না। তাহারা কৃচ্ছ্রতাসাধ্য অন্য সাধন-ভজন বরং করিবে কিন্তু এটি নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই

ভাগ্যবান।' জীবের স্বভাবগত দৈন্য ও কার্পণ্যের বিচার করিয়া প্রেমের দেবতা মহাচিন্তায় পড়িলেন। জীবের প্রতি প্রীতির দায়ে ভগবান অভিনব একটি সঙ্কল্প করিলেন। যে কাজটি তিনি কোন দিন করেন নাই, এমন একটি আচরণ করিবার জন্য তাঁহার অন্তরে উদগ্র অভিলাষ জাগ্রত হইল। চরিতামৃতে এই সঙ্কল্পের রহস্যটি 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' অর্থাৎ ভগবানের এমন আচরণের স্বরূপটি ব্যক্ত হইয়াছে—

'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সঙ্কীর্ত্তন
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।
আপনে করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সভারে।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখানো না যায়
এই তো সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়।'

সুতরাং—

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।'

যুগধর্ম্ম প্রতিপালিত হইল, কৃষ্ণের ইচ্ছাও পূর্ণ হইল।

'কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার।

সর্ব্বোপনিষদসার গীতার মাহাত্ম্যও এই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইল— চৈতন্যলীলায় নিত্য হইল, সত্য হইল—কৃষ্ণলীলা।

"গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে।"

গীতার গুহ্যতম আদেশ ভক্ত-মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারণের শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে প্রমূর্ত্ত হইল। কৃষ্ণকথা শ্রবণানুধ্যানে আমরা ভগবানের পতিতপাবন-লীলা প্রত্যক্ষ করিলাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। মায়ান্ধ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের সংবাদ জানিবার জন্য আজও উৎকর্ণ রহিয়াছেন এবং সঞ্জয়ও কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ

শ্রবণ করাইতেছেন। কৃষ্ণনাম মধুরভাবে কাণে বাজিলেই আমাদের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা সম্ভব নয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, শ্রীভগবানের নিজের উক্তি অনুসারে তাঁহার গীতার কথা বলিবার অধিকার নাই। ভগবৎ-কৃপার প্রত্যক্ষ স্পর্শ যিনি অন্তরে লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ গীতার দেবতার পরম বচনরূপ গুহ্যতম আদেশের চাতুর্য্যের তাৎপর্য্যে জীবের প্রতি করুণার বদান্য মহিমা যাঁহার অন্তরে লাবণ্য-লীলা বিস্তার করিয়াছে, গীতার কথা বলিতে তিনিই অধিকারী হইয়া থাকেন। তারপর পাঠ। ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭০তম শ্লোকে বলিয়াছেন—যিনি গীতার কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ পাঠ করিবেন, জ্ঞানযজ্ঞের পথে শ্রীভগবানকে তিনি পূজা করিবেন। শাস্ত্রার্থে নিশ্চয়াত্মক নিষ্ঠায় আত্মানুভূতি জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। গুরু-মুখোচ্চারিত মন্ত্রে বা নামে ভগবানের গুহ্যতম আদেশের বীর্য্য সংস্পর্শে চিত্তের উদ্দীপ্তি লাভ হইয়া থাকে। এমন উদ্দীপ্তিতে ভগবৎ-তত্ত্বে চিত্তের অনুপ্রবেশই জ্ঞানযজ্ঞ। গুরু-পরম্পরাগত এই যজ্ঞের বীর্য্যটি গীতার্থে সম্পূটিত রহিয়াছে। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'প্রোক্তা মণীষিভি গীতা স্তবরাজাদয়ঃ স্তবাঃ।' গীতা পাঠের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

'শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈ র্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্।' (স্কন্দপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণের স্তবরূপরত্নে যাঁহাদিগের জিহ্বা অলঙ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল মানব মুনি ও সিদ্ধগণের দ্বারা নমস্কৃত এবং দেবগণেরও বন্দনীয় হইয়া থাকেন। ইহার পর শ্রবণ। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭১তম শ্লোকে শ্রবণের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন যে যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াশূন্য হইয়া অর্থবোধ না হইলেও গীতা শ্রবণ করিবেন, তিনি

পাপমুক্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীদের পুণ্য লোক লাভ করিবেন ভগবান ইহাই বলিয়াছেন। আমাদের কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা মূলানুগত নহে বলিয়া মনে হয়। প্রত্যুত যেখানে গীতা-কথা শ্রবণের মূলে শ্রদ্ধা এবং অসূয়াশূন্যতা বা ভগবৎ-গুণের এমন উজ্জীবনের ভাব মনের মূলে জাগ্রত হয়, জাগ্রত হয় আগ্রহ, সেখানে অর্থবোধ ব্যাপারটি নিতান্তই পরোক্ষ হইয়া পড়ে, বিচার থাকে না, ঘটে আত্ম-রসের সঞ্চার। শব্দের শ্রোত্রস্পর্শমাত্রে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবৎ-প্রেম চিত্তে স্ফুরিত হয়। শ্রবণের আগ্রহই চিত্তকে দিব্য ভাবে উজ্জীবিত করে। সেই আগ্রহ হইতে লীলার ছন্দ বিকীরিত হইয়া শ্রোতাকে ধ্যানরসে অভিষিক্ত করে। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—'রাধাকৃষ্ণ-পদধ্যান, না শুনিও কথা আন।' শব্দের এখানে পশ্যন্তি স্তরে অনুভূতি। এখানে প্রত্যক্ষ দর্শন—'কৃষ্ণসেবা সমুদ্রে মজ্জন।' 'নহি নহি রক্ষতি ডু-কৃঞ্-করণে', ব্যাকরণের ব্যাপার এখানে নাই। যিনি অসূয়াবিহীন অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মর্ত্ত্যবুদ্ধি যাঁহার নাই তেমন শ্রোতার পক্ষে গীতার উপদেশ স্বতঃই অনুভবযুক্ত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় 'শুনিলেই হয় বড় হিত।' নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। উক্ত শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, তুমি অসূয়াবিহীন অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে তোমার দোষদৃষ্টি নাই, এজন্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সহিত অর্থাৎ তোমার পক্ষে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অনুভবোপযোগীভাবে আমার গুহ্যতম ভক্তিযোগের কথা আমি তোমাকে বলিব। তাহার ফলে সর্ব্বপ্রকার অশুভ অর্থাৎ ভক্তি-বিরোধী পাপ হইতে তুমি মুক্ত হইবে। বর্ত্তমানে 'সোঽপি মুক্তঃ' বলিতে সেইরূপ পাপ হইতে মুক্ত হইবার কথাই সুদৃঢ় করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভক্তি-বিরোধী পাপ হইতে মুক্ত হইলে আনু-কূল্যের পথে কৃষ্ণানুশীলনে উত্তমা ভক্তিই লভ্য হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এমন শ্রোতা ভক্তজনবাঞ্ছিত কৃষ্ণ-সেবানুকুল ধামই প্রাপ্ত হন—শ্লোকার্থের ইহাই তাৎপর্য্য।

বাস্তবিকপক্ষে গীতার সহিত সম্বন্ধ মাত্রেই জীব ভগবৎ-কৃপায়

অধিকারী হইয়া থাকে। সাধন-ভজনের কোন প্রয়োজন হয় না। সর্ব্ব জীবের স্বরূপধর্ম্মে উদ্দীপ্তির নিজ বীজ গীতায় স্বমহিমায় প্রকটিত রহিয়াছে। রহিয়াছে কৃষ্ণনামের অরুণোজ্জ্বল প্রভাবে, রহিয়াছে ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলা-মাধুর্য্যের পরমবীর্য্যে জীবের সর্ব্ববিধ অবীর্য্য দূর করিবার উপযোগী পরম প্রেমের মহিমায়। গীতার এই জীবোদ্ধারণ-শক্তি সার্থকতা লাভ করিয়াছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীরিত কৃষ্ণ-নামের মাধুরীতে। নিজনামামৃতে মত্ত হইয়া তিনি গীতার গুহ্যতম আদেশের মূলীভূত তত্ত্বটি আমাদের দৃষ্টিতে প্রমূর্ত্ত করিয়াছেন।

'বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানই
সে যদি গৌরাঙ্গ করে সার।
নয়নানন্দেতে ভণে, সেই সে সকলি জানে
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার।'

ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন—'গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে।' গৌরপদে রতি হইলে বেদ-বেদান্তসার গীতার্থে কৃষ্ণলীলার সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমরা অনুভূতি লাভে অধিকারী হই। গীতায় শ্রীভগবান আমাদিগকে অশেষভাবে আশার বাণী শুনাইয়াছেন— আমাদের যোগক্ষেম বহন করিবেন তিনি নিজে, এমন প্রতিশ্রুতিও তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা বদ্ধ জীব। আমাদের এই পতিত অবস্থার মধ্যে কি উপায়ে তাঁহাকে আমরা পাইতে পারি, গীতায় সেই কৌশলটি ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—'ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ।' অর্থাৎ মনের ঊর্দ্ধগতিতে প্রাণ এবং অধোগতিতে অপান—সব জুড়িয়া জীবের জন্য প্রেমময় ভগবানের প্রগাঢ় সংবেদনই যোগক্ষেম বহনের মূলতত্ত্বস্বরূপে নিহিত রহিয়াছে। ক্ষেমরূপে তাঁহাকে তাঁহার নামে এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে শুদ্ধসত্ত্বের সংস্পর্শে অপরিম্লান প্রাণধর্ম্মের জাগরণের পথে তাঁহাকে সর্ব্বাত্মস্বরূপে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে উপলব্ধি করিয়া যোগ এবং ক্ষেম দুইই জীবের পক্ষে লভ্য হইয়া থাকে। গীতার দেবতা বরাভয়প্রদ

হাস্যে এবং তাঁহার আদেশে উজ্জ্বল করিয়া তখন আমাদের দৃষ্টিপথ আলো করিয়া জাগেন। এইভাবে প্রণবের অর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল গীতায়। গীতার্থ প্রতিষ্ঠিত হইল ভাগবতে এবং ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং মাধুর্য্যরূপ কৃষ্ণলীলার প্রতিষ্ঠা হইল কৃষ্ণনামে।

'যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি।'

অর্থাৎ গীতার পঠন পাঠনের এবং শ্রবণের প্রতিবেশে প্রেমের দেবতার অযাচিত প্রেম এমন ভাবে উন্মুক্ত হইল—শ্রোত্রস্পর্শে প্রতি অঙ্গে পুলক সঞ্চারিত হইল। নয়নে বহিল প্রেমাশ্রু—উঠিল হরি হরি এই ধ্বনি। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ভক্তগণ শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় নিমগ্ন হইয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমলীলায় গীতার্থের সার জীবের অন্তরে সাক্ষাৎ সম্পর্কে সঞ্চার লাভ করিয়াছে। প্রভুর দক্ষিণাপথ ভ্রমণ-কালে শ্রীরঙ্গপুরে গমন করিলে একটি ঘটনা ঘটে। তাহা এই—

'সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন।
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে।
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে
আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে।
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ যাবৎ পঠন
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়।
বিপ্র কহে মুর্খ আমি শব্দার্থ না জানি
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি।

অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল-সুন্দর।
অর্জ্জুনেরে কহিছেন হিত উপদেশ
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ।
যাবৎ পড়ো তাবৎ পাও তাঁর দরশন
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন।
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমার অধিকার
তুমি সে জানহ গীতার অর্থ সার।'

প্রভুর এই প্রেমলীলা জয়যুক্ত হোক—উপসংহারে এই প্রার্থনা।

'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু